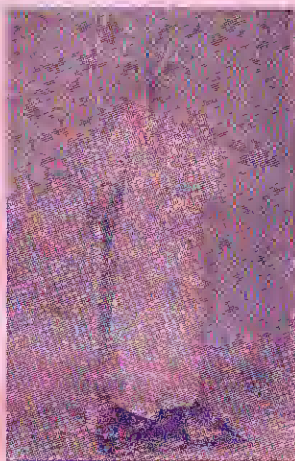




৩৫শ বর্ষ } কাঙ্ক্ষন, ১৩৮৯ { ১ম সংখ্যা



ত্রিদিগ-গোস্থামী পরিভ্রাজকাচার্য্যরূপে
শ্রীমন্ত্ৰিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্থামী মহারাজ

সম্পাদক—ত্রিদিগস্থামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
কার্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিশ্ট গুঁ ষিঙ্গুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

—(৯)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—

ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নান্দার্সন মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত উদ্ধমস্বী মহারাজ

ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিজ্ঞানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(১০)—

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—

ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবাস্কর-কর্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

ভৈরবপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্তৃক মুদ্রিত ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা
আচার্য্যাবর্ষ্য পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ



নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো ভয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

পঞ্চত্রিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগোরাঙ্গ ৪৯৬ গোবিন্দ হইতে ৪৯৭ মাধব,
বঙ্গাব্দ ১৩৮৯ ফাল্গুন হইতে ১৩৯০ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৮৩ মার্চ হইতে ১৯৮৪ ফেব্রুয়ারী ।]

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য—

ত্রিদিগ্বিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—

ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত আচার্য মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (পশ্চিমবঙ্গ) ।

॥*॥ বার্ষিক ভিক্ষা—১২'০০ টাকা ॥*॥

পঞ্চত্রিংশবর্ষ শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকার

বিষয়-সূচী

বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
অকাম (১৩)—সজ্জন	৭।২৭৩
অতিরিক্ত জেলাশাসকের পত্র (ইংরাজীতে)	১২ ৪৫৬
অতিরিক্ত জেলাশাসকের মন্তব্য	১২।৪৫৭
উদ্ধারের পথ	২।৬৪, ৪।১৩৯, ৫।১৭৭, ৬ ২১০, ৭।২৫০, ৮।২৭৮, ১০।৩৫০, ১১।৩৯৭, ১২।৪৩৪
একটি পত্র (শ্রীমতীশচন্দ্র দাসাদিকারী-প্রেরিত)	৯।৩২২
এ-দৌনের শ্রদ্ধাঞ্জলি (শ্রীমন্ত্ৰিপ্রজ্ঞান কেশব গোবামী মহারাজের বিরহ-বাসরে)	৩।১০৪
কুরুক্ষেত্র, গীতা ও মহাভারত	৩।১০১
কর্মোৎকর্ষণ (১২)—সজ্জন	৮।২৭১
গম্ভীর (২১)—সজ্জন	১২।৪১৯
গীতার মর্মবাণী—শ্রী	২।৫৯, ৪ ১৩১, ৫।১৭২, ৬।২০৮, ৭।২৪৭, ৮।২৫৩, ৯।৩৩৮, ১০।৩৬৮, ১১।৩৯৪, ১২।৪২৮
গীতোপনিষদে আরুণিবেদন—শ্রী	১।২২
গুরুসেবা—শ্রী	১।৩১
গোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠে বিগ্রহ-প্রকাশ মহোৎসব—শ্রী (নিমন্ত্রণ-পত্র)	২।৭৮
গোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠে নবনির্মিত মন্দিরের দারোদখাটন—শ্রী	৬।২২২
গোপাল-দেবাক্ষকম্—শ্রী (শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-বিরচিত)	১।। ৩৭৭
গোড়মণ্ডল-পরিক্রমা—শ্রী	১০।৩৭৫
গোড়ীয়ের পঞ্চবিংশ বর্ষ (সম্পাদকীয়)	১।৩৪
গোড়ীয় বেদান্ত সমিতির জনহিতার্থে অবদান—শ্রী	১২।৪৪৬
গ্রন্থ-বার্তা (আকাশবাণীতে সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থের প্রচার)	৭।২৬৪
গ্রন্থ-বার্তা (সিদ্ধান্তরত্ন)	১২।৪৫৮
চৈতন্যশতকম্— শ্রী (শ্রীমৎ সার্কর্ভোম-ভট্টাচার্য্য- বিরচিত)	১।১, ২।৪১, ২।৮১, ৪।১১৯, ৫।১৫৭, ৬।১৯৩

বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা—শ্রী (নিমন্ত্রণ-পত্র)	৫।১১১
জ্যেষ্ঠগৃহদাহ	৪।১৪৪
জন্মায়মী উপলক্ষে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের অভিভাষণ—শ্রী	১০।৫৬২
ঠাকুর শ্রীল বিলম্বদল	৭।২৫৯
দর্শনার্থীর মন্তব্য (শ্রীচুনীলাল গোস্বামী, এ্যাডভোকেট)	৯ ৩৪০
দীক্ষায় উপবীতের আবশ্যিকতা	১।১৪
দেবদেবীর পূজা ও বলিদান	২।৫৪, ৩।৯৭, ৪।১৩৫
দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ দর্শনান্তে বিশেষ কয়েক ব্যক্তির অভিমত—শ্রী (নির্মলা দেশপাণ্ডে, শ্রীকর বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ মিত্র)	৪।১৫৩
দেবাসুর	৮।২৮৭
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা—শ্রী	১২।৪২৯
নবদ্বীপ-শরহরস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-পরিচালিত নবদ্বীপধাম- পরিক্রমা ও গৌর-জন্মোৎসব	৩।১১০, ৪।১৪৯
নবদ্বীপে দাতব্য চক্ষু অপারেশন শিবির	১১।৪০৫,
নরোত্তম-প্রভোরচক্ৰ—শ্রীশ্রী (শ্রীল-বিষ্ণুনাথ-চক্রবর্ত্তি-বিরচিত)	৯।৩০১
নির্ঘ্যান-সংবাদ (শ্রীপাদ সান্দিপনদাস ব্রজবাসী)	১২।৪৪৫
পত্রোত্তর (শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজের প্রেরিত)	৯।৩২৫
প্রচার-প্রসঙ্গ (বঙ্গীয় ভাগবত সমাজ)	২।৭৩
প্রীতি	১২।৪২১
বদান্ত (৬)—সজ্জন	৪।১২৩
বাসুদেব গৌড়ীয় মঠে শ্রীকেশব গোস্বামী মহারাজের বিগ্রহ-প্রকাশ—শ্রী (নিমন্ত্রণ-পত্র)	৩।১১৬
বাসুদেব গৌড়ীয় মঠের নবনির্মিত শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন—শ্রী	৬।২২৬
বিরহ-বার্তা (শ্রীমতী সুশীলা দেবী)	২।৭১
বিরহার্তি কুসুমাজলি (শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের বিরহ-মহোৎসবে)	৩।৯৪
বিরহ-তিথি-বাসরে ভক্তিপুষ্পাজলি (শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের)	১০।৩৫৫
বিড়াল তপস্বী (কবিতা)	৫।১২০

বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
বৈষ্ণব-অপরাধ কি ভীষণ	৬।২১৮
বৈষ্ণব চিন্তিতে হইবে	৫।১৮৪
বৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম—শ্রী	১০।৩৪৭
বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র নির্মল হওয়া চাই	২।৩০৭
ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম	৫।১৬৭
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রী	১১।৪১৪
ভগবান্-কি নাই ?	১।২৬
ভক্তি-কুসুমাজলি (শ্রীল কেশব গোস্বামী	
প্রভুবরের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে)	১।২১
ভক্তিতত্ত্ব-বিবেক—প্রথম প্রবন্ধ	১।৮, ২।৪৮
" " —দ্বিতীয় "	৩।৮৭, ৪।১২৬
" " —তৃতীয় "	৫।১৬৪, ৬।২০২
" " —চতুর্থ "	৭।২৪১, ৮।২৭৫
ভব-বন্ধন ও ভব-ব্যাধি	১।১৭
মদনগোপাল-দেবাক্ষকম্—শ্রী (শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-বিরচিত)	১২।৪১৫
মানবজীবনের সার্থকতা কোথায় ?	২।৩২৬
মেঘালয় গোড়ায় মঠে ঝুলনযাত্রা ও জুম্মাউম্মী-মহোৎসব—শ্রী	১।৩৩২
মেঘালয় গোড়ায় মঠের বার্ষিক-উৎসবের নিমন্ত্রণ-পত্র (ইংরাজীতে)	৬।২৩১
মেদিনীপুরের সংক্ষিপ্ত প্রচার-প্রসঙ্গ	৩।১০৭
যুগধর্ম	৮।২৯৩, ১০।৩৫৭
রথযাত্রা-মহোৎসব—শ্রী	৮।২৯২
রথযাত্রা-দর্শন—শ্রী	২।৩১৬
রাধারমণ-গুরুবর-অরুণাকম্—শ্রী (শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-বিরচিত)	৭।৩৩
লালাবাবুর বৈরাগ্য (কবিতা)	৬।২৩০
শিক্ষাক্ষেত্র (বঙ্গভাষা)	১১।৩৮৪
শ্রদ্ধার্চা (শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের বিরহ-বাসরে)	৯।৩১৯
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব	৭।২৬৫
শ্রীচৈতন্য-শতকম্ (শ্রীমৎ সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য-বিরচিতম্)	১।১, ২।৪১,
	৩।৮১, ৪।১১৯, ৫।১৫৭, ৬।১৯৩
শ্রীশ্রীমহাপ্রভোরষ্টকম্ (শ্রীম্বরূপ-চরিতামৃত)	১০।৩৪১

বিষয়

সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

সজ্জন—সত্যসার (৩)	১।৫
—সম (৪)	২।৪৫
—নির্দোষ (৫)	৩।৮৫
—বদান্ত (৬)	৪।১২৩
—মুহু (৭)	৫।১৬১
—শুচি (৮)	৫।১৬২
—অকিঞ্চন (৯)	৬।১২৭
—সর্বোপকারক (১০)	৬।১২৮
—শান্ত (১১)	৭।২০৬
—কুষ্মৈকশরণ (১২)	৮।২৭১
—অকাম (১৩)	৮।২৭৩
—নিরীহ (১৪)	৯।৩০৫
—স্থির (১৫)	৯।৩০৬
—বিজিত-যড়্গুণ (১৬)	১০।৩৪৪
—মিতভুক (১৭)	১০।৩৪৬
—অপ্রমত্ত (১৮)	১১।৩৮০
—মানদ (১৯)	১১।৩৮১
—অমানী (২০)	১২।৪১৮
—গস্তীর (২১)	১২।৪১৯

সাবুসঙ্গে দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা-প্রসঙ্গ ১০।৩৭০, ১১।৫০২

স্বধামগত শ্রীমদ্ রাসবিহারীদাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব ২।৬২

স্বপ্নবিলাসামৃতাক্ষকম্ (শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-বিরচিত) ৮ ২৬৭

স্মৃতি ও পুরাণ ত্রিবিধ ৯।৩০৯

A letter from Additional District Magistrate, Nadia ১২.৫২৬

A programme of the Advent Anniversary
of Lord Shri Krishna ৬.২৩১

Column of remarks ৪.১৫২-১৫৩

Government of India, All India Radio,
Calcutta (Letter No. 15 (20)/88.PI) ৭।২৬৫

Statements about ownership and particulars about
newspaper "Shri Goudiya-Patrika" ১।৫০

। শ্রীশঙ্করগোরাঙ্গো জয়তঃ ।

স বৈ পুংসাং পরো যন্তো ভক্তিৰধোপজে ।



গঠিতকা প্রতিষ্ঠিতা যজ্ঞাত্মা স্প্রসীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোক্ষে অষ্টতুকী ভক্তি বিষমুগ্ধ ।

অল্প ধর্ম সৃষ্টরূপে পালে বেই জন ।
হরি-কথার রতি নৈলে পণ্ড সেই প্রম ।

৩৫শ বর্ষ } ১৬ গোবিন্দ, প্রজ্ঞান, ৪৯৬ গোরাঙ্গ { ১ম সংখ্যা
৩০ ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৯৩১৯৮৩

সান্নিধ্য

শ্রীচৈতন্য-শতকম্

[শ্রীমৎ সার্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতম্]

প্রণম্য ত্বং প্রভো, গৌর ! তব পাদে শতংব্রুবে ।

সদাশয়ানাং সাধুনাং সদুপার্থং মে কৃপাং কুরু ॥ ১ ॥

হে প্রভো, গৌর ! আপনার শাদপদে শত শত বার প্রণামপূর্বক বলিতেছি
যে, সদাশয় সাধুদিগের সুখের নিমিত্ত আমাকে কৃপা করুন ॥ ১ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ সেবাং স্থাপয়িত্বা গৃহে গৃহে ।

শ্রীমৎসকীর্তনে গৌরঃ নৃত্যতি প্রেমবিহবলঃ ॥ ২ ॥

গৃহে গৃহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা স্থাপিত করিয়া শ্রীমকোঁরাঙ্গ মহাপ্রভু
প্রেমে বিভোর হইয়া শ্রীনাম সংকীর্তনে নৃত্য করিতেছেন ॥ ২ ॥

জিহ্বায়াং হরিনাম-সাধন মহোদারা শতং নেত্রয়োঃ ।

সান্বর্জ্যৈ পদলকোঙ্গমো নিরবধি শ্বেদশ্চ বিভ্রাজতে ॥

শ্রীমদগৌরহরেঃ প্রগল্ভ মধুরা ভক্তি প্রদাতুর্জনেঃ ।

সেবা শ্রীভজযোষিতামনুগতা নিত্যা সদা শিক্ষ্যতে ॥ ৩ ॥

অহো ! বাহার জিহ্বায় হরিনামসাধন, নয়নে শত জলধারা, সর্বদেহে পুলকরাশির উদ্ভব ও সর্বদা ঘর্ম্ম বিরাজ করিতেছে, সেই প্রৌঢ়া-মধুর ভক্তি-প্রদাতা শ্রীমদগৌরহরির সেবা শ্রীভজবধুগণের নিত্যানুগামী জন সর্বদা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন ॥৩॥

কলিমল-পতিতানাং শোকমোহাবৃতানাং

নিজজন পতি-সেবা-বিন্দিচিন্তাকুলানাম্ ।

ইতি সমজনি গৌরস্মরণহেতুং বিচিন্ত্য

প্রকট-মধুরদেহো নামদাতা কৃপালুঃ ॥ ৪ ॥

কলিপাপে মগ্ন, শোক-মোহে আচ্ছন্ন এবং নিজ ধন ও জনের চিন্তায় ব্যাকুল ব্যক্তিগণের উদ্ধারহেতু বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দয়ালু, নামদাতা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মধুর শরীর প্রকট করিয়া আবির্ভূত হইলেন ॥৪॥

শ্রীশ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যে জগজ্জ্ঞানৈক কর্তার ।

যো মদ্যো ভক্তিহীনঃ স্যাৎ পচ্যতে নরকে ধ্রুবম্ ॥ ৫ ॥

জগতের একমাত্র ত্রাণকর্তা শ্রীশ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যে যে মূর্খ ব্যক্তি ভক্তিহীন, সে নিশ্চয়ই নরক ভোগ করিবে ॥৫॥

যঃ কৃষ্ণো রাধয়া কুঞ্জে বিলাসং কৃতবান্ পুন্না ।

গদাধরেণ সংযুক্তঃ স গোরো বসতে ভূবি ॥ ৬ ॥

পুরাকালে (ছাপরে) যে কৃষ্ণ কুঞ্জে শ্রীমতী রাধিকাসহ বিলাস করিয়া-ছিলেন, তিনিই পৃথিবীতে গৌররূপ ধারণপূর্বক শ্রীগদাধরের সহিত বাস করিয়াছিলেন ॥৬॥

সংসার-সপ'দষ্টানাং মর্চ্ছিতানাং কলৌ যুগে ।

ঔষধং ভগবন্মাম শ্রীমবৈষ্ণবসেবনম্ ॥ ৭ ॥

কলিযুগে সংসাররূপ-সর্পদংশনে মুচ্ছিত ব্যক্তিগণের পক্ষে শ্রীভগবানের নাম ও বৈষ্ণবসেবাই একমাত্র ঔষধ ॥৭॥

বিষয়াবিষ্ট মূর্খানাং চিত্তসংস্কারমৌষধম্ ।

বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা বৈষ্ণবোচ্ছ্রষ্ট-ভোজনম্ ॥ ৮ ॥

শ্রদ্ধাবুক্ত গুরুসেবা ও বৈষ্ণবের উচ্ছ্রষ্ট-ভোজনই বিষয়াসক্ত মূর্খ ব্যক্তি-
গণের চিত্তশুদ্ধিকারক একমাত্র ঔষধ ॥৮॥

বন্দে শ্রীকরণাসিন্ধুং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং ।

কৃপাং কুরু জগন্নাথ তব দাস্যং দদস্ব মে ॥ ৯ ॥

আমি করুণাসাগর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি । হে জগন্নাথ ?
আপনি আমার কৃপা করুন এবং আপনার সেবা দান করুন ॥৯॥

দাস্যং তে কৃপয়া নাথ দেহি দেহি মহাপ্রভো ।

পতিতানাং প্রেমদাতাস্যতো যাচে পুনঃ পুনঃ ॥ ১০ ॥

হে মহাপ্রভো, হে নাথ ! কৃপাপূর্বক আপনার দাসত্ব অর্থাৎ সেবা দান
করুন । যেহেতু আপনি পতিতজনের প্রেমদাতা, তাই আপনার শ্রীচরণে
বার বার যাক্ষা করিতেছি ॥১০॥

সংসার-সাগরে মগ্নং পতিতং গ্রাহি মাং প্রভো ।

দীনোদ্ধারে সমর্থস্বং অতন্তে শরণং গতঃ ॥ ১১ ॥

হে প্রভো ! আমি সংসাররূপ সাগরজলে পতিত ও বিশেষরূপে মগ্ন ।
আপনি এ পতিতকে ত্রাণ করুন । আপনি দীনজনকে উদ্ধার করিতে সমর্থ,
অতএব আমি আপনার শরণ লইলাম ॥১১॥

জগতাং গ্রাণকর্তৃসি ভর্তা দাতাসি সম্পদাম্ ।

গ্রাণং কুরুস্ব ভো নাথ দাস্যংদেহি শচীসূত ॥ ১২ ॥

হে নাথ ! আপনি জগতের উদ্ধার-কর্তা, পালক ও সম্পদদাতা । আপনি
আমাকে উদ্ধার করুন । হে শচীসূত গৌরাজ ! আপনার দাস্য আমার
দান করুন ॥১২॥

সর্বেষামবতারানাং পুরাণৈষৎশ্রুতং ফলম্ ।

তন্মান্মে নিষ্কৃতির্নাস্তি হ্যতন্তে শরণং গতঃ ॥ ১৩ ॥

পুরাণে বর্ণিত সর্বাবতারের যে-ফল শ্রুত হয়, উহাতে আমার নিষ্কৃতি
নাই । অতএব আমি আপনার শরণ লইলাম ॥১৩॥

বিচিত্র-মধুরাম্বর-শ্রুতি-মনোজ্ঞ-গীতে মৃদা

স্বভক্তগণমন্ডলী রচতি মধ্যগামী-প্রভুঃ ।

মনোহর-মনোহরো নট্যতি গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং

জগজ্জয়-বিভূষণে পরমধাম—নীলাচলে ॥ ১৪ ॥

নিজ ভক্তগণ কর্তৃক রচিত মণ্ডলে মধ্যবর্তী হইয়া বিচিত্র মধুর ভাষায়
কর্ণ রসায়ন গান করিতে করিতে সর্বমনোহরণকারী প্রভু গৌরচন্দ্র স্বয়ং
ত্রিজগতের ভূষণরূপ শ্রেষ্ঠধাম নীলাচলে (পুরীতে) নৃত্য করিতেন ॥১৪॥

বিলোক্য পুরুষোত্তমং কনক-গৌর-দেহো হরিঃ

মৃদা হৃদয়পঙ্কজে জলদকান্তমালিঙ্গিতুম্ ।

পপাত ধরণীতলে সকল ভাব-সংমুচ্ছিতঃ

কদাচিদপি নৈঙ্গতে পরমধারি সংস্পন্দনম্ ॥ ১৫ ॥

সুবর্ণের ন্যায় পীতকান্তিধারী শ্রীমদগৌরহরি মেঘশ্যামল পুরুষোত্তমকে
দর্শনকরতঃ আনন্দে হৃদয় মধো আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে সর্বভাবভরে
পৃথিবীতলে মুচ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন, অধিকন্তু অচেতন ও স্পন্দহীন হইয়া
পড়িলেন ॥১৫॥

গৌরস্য নরনে ধারা সগদ্গদবচো মূখে ।

পদলকান্ত-সংস্পর্শে ভাবে লুপ্ততি ভূতলে ॥ ১৬ ॥

শ্রীগৌরাজ মহাপ্রভুর চক্ষু হইতে বহু অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকে ।
মুখকমল হইতে গদগদবাণী নিঃসৃত হয় । তাহার সর্বদেহে আনন্দরাশির
উচ্চাঙ্গ হয় ও তিনি ভাবে বিভোর হইয়া পৃথিবী উপর লুপ্তিত হইতে
থাকেন ॥১৬॥

চৈতন্যচরণান্ভোজে যস্যাপি প্রীতিরচ্যুতা ।

বৃন্দাটবীণায়োস্তস্য ভক্তিঃ স্যচ্ছিত-জন্মনি ॥ ১৭ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের চরণকমলে যাহার দৃঢ়া ভক্তি হয়, তাহার বৃন্দাবনের
ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শত জন্মব্যাপিয়া ভক্তি জন্মিয়া থাকে ॥১৭॥

যথা রাধাপদান্ভোজে ভক্তিঃ স্যাৎ প্রেমলক্ষণা ।

তথৈব কৃষ্ণাচৈতন্যে বর্ধতে মধুরা রতিঃ ॥ ১৮ ॥

যে রূপ শ্রীরাধাপাদপদ্মের প্রেমলক্ষণা ভক্তি হয় সে রূপই শ্রীকৃষ্ণাচৈতন্যে
মধুরা রতি বদ্ধিত হইয়া থাকে ॥১৮॥ (ক্রমশঃ)

সজ্জন—সত্যসার (৩)

শুদ্ধ-বৈষ্ণবই ‘সত্যসার’ সংজ্ঞা-লাভের অধিকারী

সজ্জনের তৃতীয় গুণ, তিনি সত্যসার। সত্যসার বলিতে কায়মনো-বাক্যে যিনি সত্য হইতে বিচ্যুত হন না। সত্য হইতে বিচ্যুত হইলেই মানব অসাধু বা অবৈষ্ণব সংজ্ঞা লাভ করেন। সজ্জন বা শুদ্ধবৈষ্ণবই একমাত্র সত্যসার। যিনি অসত্যকে অসার জানেন এবং সত্যকেই নিষ্কপট সাররূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি সত্যসার।

তাৎকালিক সত্য দেশ-কাল-পাত্রভেদে পরিবর্তনশীল

লৌকিক নিরপেক্ষতা আশ্রয় করিয়া যে বস্তুধর্মের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়, তাহাই লোকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। কাম-ক্রোধাদি-সম্পন্ন মানব তাঁহার তাৎকালিক প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া যে সত্যানুভব করেন, তাহা তাঁহার তাৎকালিক সত্য হইতে পারে, কিন্তু কামক্রোধাদির অপগমে তিনি পূর্বসত্য-প্রতীতির ব্যত্যয় অনুভব করিয়া থাকেন। মানব-সত্যতার আদিমকালে জ্ঞানের অভাবক্রমে আজকালকার জড়বিজ্ঞান-বিষয়ক উপলব্ধি অনেকস্থলে অভাবময় ছিল। প্রাচীন গ্রীকগণের, চীনদেশীয় জ্ঞানিগণের, ভারতীয় বিদ্বৎ-সম্প্রদায়ের জড়বস্তুসমূহে ধারণাগত ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহারা যাহাকে সত্য বলিয়া অনুভব করিয়া গিয়াছেন, তাহার ধারণা অনেকাংশেই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। মানব, যখন মানব-সমাজের পূর্বাধিগত অভিজ্ঞতা লাভ করেন না, তখন তাহার সত্যপ্রতীতি নিতান্তই অল্প থাকে। অশিক্ষিত মানবের ধারণা, কামক্রোধহত সত্যপ্রতীতি-রূপ মানব-ধারণা শিক্ষাপ্রভাবে পরিবর্তিত হয়। তাৎকালিক সত্য দেশভেদে, কেন্দ্রভেদে ভিন্নরূপে সত্য বলিয়া ধারণা হয়। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব অনেকস্থলে অসত্যকে সত্য ধারণা করায়; আবার তাহাদের অপগমে অসত্য অন্তর্হিত হইলে সত্য আসিয়া অজ্ঞান-তমের নিরাস করে।

নিত্য-সত্যশ্রয়ী ও তাৎকালিক সত্যানুসন্ধিৎসুর

পরম্পর পার্থক্য

নিত্য সত্য ও তাৎকালিক সত্য ভেদ আছে। তাৎকালিক সত্যানুসন্ধান করিতে গিয়া জীব অন্যাভিলাষী হইয়া পড়েন, কখনও বা ধর্ম, অর্থ, কাম-ফল অনুসন্ধান করিতে গিয়া কর্মনিপুণ পুণ্যবান হন, কখনও বা মুমুক্ষু হইবার পিপাসায় পাপ-পুণ্য ছাড়িয়া অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদী হন। ইহাদিগকে অজ্ঞানী, কুকর্মরত ও যথেষ্টাচারী বলা হয়। ইহাদিগের প্রত্যেকের সত্য-

ধারণা ভ্রমপূর্ণ, অসম্পূর্ণ ও তাৎকালিক হয়মিশ্র। অপ্রাকৃত হরিজনের ধারণা সেরূপ হয় নহে। তিনি হরিকেই পরম সত্য জানেন।

ভগবদ্-বৈমুখ্য ও স্তম্ভতার অপব্যবহার-ফলেই

জীবের অধোগতি

হরি হইতে বিচ্যুত হইয়া হরিজন যখন হরিবিমুখ অভিমান করেন, তখনই তাঁহার পরম সত্যবস্তু হরির উপলব্ধি হ্রাস হইয়া হইয়া পড়ে। বৈমুখ্য-কুহক তাঁহার অশ্রিতা ও বৃত্তিকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে অসত্য বস্তুতে সত্যের আরোপ করায়। হরিজনই আংশিক জ্ঞানকে সত্য জানিয়া হরিদর্শনে বিমুখ হইয়া পরমাত্মা দেখেন; তখন তাঁহার সত্য দর্শনে পরমাত্মা প্রকটিত হন। আবার অপ্রাকৃত সবিশেষ দর্শনের চিন্মাত্রাবরণকেও বস্তু বলিয়া প্রতীতি হইলে তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ হন। আবার তাদৃশ জ্ঞানভাবে বহির্দর্শনে দেবীধামে সত্য অহুভব করিতে গিয়া বিবর্তবাদাশ্রয়ে গুণমায়্য-নির্গমিত দেহকেই আমি বলিয়া বসেন। এই অহঙ্কারটী ক্রমশঃ হরিবিমুখ বাহ্যদর্শনে স্থিরা হইয়া বুদ্ধি নামে অভিহিত হয়। পরে নশ্বর অনিত্য স্থিরাবুদ্ধি চাঞ্চল্যবশতঃ সঙ্কল্প বিকল্প করিতে গিয়া হতবুদ্ধি হইয়া মনে আমিহের অস্তিত্ব দেখেন। মন দেবীধামের গুণমায়ার আশ্রয়ে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ গ্রহণ করিয়া স্থূলভাবে জড় ভোগের মালিক হয়। এইখানে তাঁহার হরিবৈমুখ্যের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। পরম-সত্য বস্তু কৃষ্ণ হইতে বিমুখ হইতে হইতে জীব কোথায় আসিয়া পড়লেন। সকলই তাঁহার স্তম্ভতার বিক্রম। মধুর লীলাময় শিখিলৈগুয়া হরি; সর্ব-শক্তিমান্ ঐশ্বর্য্য-বিগ্রহ হরির পরমসত্য বাতীত পরমাত্মার পূর্ণজ্ঞানে আংশিক কেবল মধুরাভাবরূপ সত্য অহুভূতি ও পরে হরিদেহাবরণ-প্রভামাত্র ঔপনিষদ্ ব্রহ্মে সত্যপ্রভা প্রতীতি হইতে লাগিল। পরম-সত্য এইবার কুহকাবরণে দৃষ্ট হইতে আরম্ভ করায় জীবের অশ্রিতা অহঙ্কার-তত্ত্বের সেবায় নিযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ বুদ্ধি ও মনদ্বারা পরম সত্যোত্তর তাৎকালিক সত্যসমূহে আচ্ছন্ন হইল। তাৎকালিক কুণ্ঠদেশগত সত্যাহুভূতি তাহাকে সত্যসার হইতে দিল না।

প্রাকৃত সন্তোষবাদ-মূলেই সহজিয়া প্রভৃতি

অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি

এই দেবীধামে জীব গৌর-ভক্তাভিমানে বলী ইন্দ্রিয়বর্গকে পরমসত্যের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া নগ্নর বস্তুতে তাৎকালিক সত্যের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। শ্রীগৌর-ভগবান্ও তখন তাঁহাকে বিমুখ সেবায় নিযুক্ত করিলেন।

শ্রীগৌর-ভগবানকে বৈমুখ্য-বিকার-বশে কোন জীব, তখন নিজের ভোগের বস্তু জ্ঞান করিয়া ফেলিলেন। ‘বিশ্রলম্ব সন্তোগের পুষ্টিকারক’ এই পরম সত্য ভুলিয়া গিয়া প্রাকৃত সন্তোগকেই শ্রীগৌরাজ বুলিয়া বসিলেন। সেই সকল কাল্পনিক গৌরপরায়া জীব আপনাদিগকে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেভা, দরবেশ, সাই, সহজিয়া, সখীভেকাঁ, স্মার্ত্ত, জাতগৌঁসাই, অতিবাড়ী, গোপীছাড়ি, গৌরাজ-নাগরী প্রভৃতি অভিমান করিয়া শ্রীগৌরাজ ও তদীয় নিজজনজগণকে তাঁহাদেরই মতো জীববিশেষ মনে করলেন। সেজন্যই সত্যের অপলাপ হইবে দেখিয়া শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপ্রভু গাহিলেন, “কালঃ কলিবলিন ইন্দ্রিয়-বৈরিবর্গাঃ, শ্রীভক্তিমাৰ্গ ইহ কণ্ঠককোটিক্ৰুদঃ।” কি-প্রকারে গৌরভক্তিকে কলঙ্কিত করিয়া “গৌরভক্ত’ নামে আউল, বাউলাদির অভিমান শুদ্ধভক্তগণকে বাধা দিতে লাগিল, ঐগুলি জানিবার জন্য সেই সেই দলের গৌরভজ্ঞা অনেকেরই কোঁতুহল দেখা গেল। তবে যাঁহাদের তদৃশ কোঁতুহল, তাঁহারা “তদ্বিক্রিপ্রাপিতেন পরিপ্রঞ্জনেন সেবয়া” ভুলিয়া বৈষ্ণব-হিংসায় উত্তত হইয়া সত্য জানিয়া লইবেন, এক্রপ ঘৃণিত সঙ্কল্প করায় অসত্য ও অসারে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনই শুদ্ধ-গৌরভক্তগণের সত্য-সারস্ব

বৈষ্ণব বা গৌরভক্ত সত্যসার, সুতরাং উপরিলিখিত গৌরভক্ত-পরিচয়াকাজক্ষী দলের ভক্তি-বিরোধী চেষ্টাগুলি গৌরভক্তির অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। এই দুঃসঙ্গবর্জ্জনই তাঁহার সত্যসারস্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। “প্রকৃত-প্রস্তাবে শ্রীগৌরাজ-পদাশ্রিতগণের একমাত্র আরাধাই শ্রীগাঙ্গকীৰ্ত্তিকা-গিরিধরের শ্রীচরণযুগল” ইহাই গৌরভক্তের সত্যসারস্ব। ইহাই শুদ্ধগৌরভক্তের সত্যসারস্ব। ইহাই অবিশিষ্ট নিত্যশুদ্ধ গৌরভক্তের সত্যসারস্ব। ইহা হইতে বিচ্যুত হইয়া অসত্য অসার কথায় গৌরভজন হয় না। শ্রীগৌর-ভগবান্ মায়া নহেন, মায়াক্রীড়াপুত্তলী নহেন, হরিবিমুখ জীবের কল্পনার পণ্যদ্রব্যও নহেন। তিনিই গাঙ্গকীৰ্ত্তিকাগিরিধর। অন্য বস্তু নিশ্চয় নহেন। কৃষ্ণের ঙ্গাংশ ও বিভিন্নাংশ হইতেই যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি। রাধিকা হইতে যাবতীয় শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে। কল্পনারাজ্যে বা নিত্যসত্যে সকল অধিষ্ঠানের মূল্যশ্রয় শ্রীগাঙ্গকীৰ্ত্তিকা-গিরিধর। সুতরাং গৌর-পদাশ্রিতের তাঁহারাই একমাত্র আরাধ্য। অন্যথা “যেপান্য” শ্লোকানুসারে সেবা অবৈধ হইবে।

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

ভক্তিতত্ত্ব-বিবেক—প্রথম প্রবন্ধ *

ভক্তির স্বরূপবিবেক

যুগপদ্ভাজতে যস্মিন্ ভেদাভেদ-বিচিত্রতা ।

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং পঞ্চতত্ত্বাশ্রিতং স্বতঃ ॥

প্রণম্য গৌরচন্দ্রস্য সেবকান্ শুদ্ধবৈষ্ণবান্ ।

‘ভক্তিতত্ত্ববিবেক’খ্যং শাস্ত্রং বক্ষ্যামি যত্নতঃ ॥

বিশ্ববৈষ্ণব-দাসস্য ক্ষুদ্রশ্যাকিঞ্চনস্য মে ॥

এতস্মিন্নুত্তমে হোকং বলং ভাগবতী ক্ষমা ॥

হে অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবমহোদয়গণ! বিশুদ্ধ-হরিভক্তি আশ্বাদন ও বিশুদ্ধ-হরিভক্তি-প্রচারই আমাদের এই সভার উদ্দেশ্য। অতএব বিশুদ্ধ-হরিভক্তি যে কি, তাহা আমাদের সর্বাগ্রেই আলোচনা করা কর্তব্য। এই পবিত্র আলোচনার দ্বারা আমাদের দুইটা ফলাফল হইবে। প্রথমতঃ বিশুদ্ধ-হরিভক্তি বুঝিতে পারিলে আর আমাদের কিছুই অজ্ঞান থাকিবে না; আমরা অমিশ্র-ভাবে তাহা আশ্বাদন করিয়া চরিতার্থ হইব। দ্বিতীয়তঃ জীবের দুর্ভাগ্যক্রমে নানাপ্রকার মিশ্র-মত্ত আসিয়া আমাদের বুদ্ধিকে এতদূর দূষিত করে যে, পবিত্র-হরিভক্তি হইতে চ্যুত হইয়া আমরা মিশ্র-মত্তকেই আদর করিতে থাকি। শুদ্ধা ভক্তি জানিলে দেহরূপ মিশ্রমত্ত হইতে রক্ষা পাইব। মিশ্রমত্ত অপেক্ষা আমাদের শত্রু আর নাই। যাহারা বলেন যে, ভক্তি কিছু নয়, ঈশ্বর একটা ভান-মাত্র, কল্পনাশক্তি দ্বারা ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিয়া আমরাই ভক্তিরূপ একটা চিত্ত-ব্যাধিকে বরণ করিয়াছি, তাহারা আমাদের প্রতিপক্ষ হইলেও ততদূর অনিষ্ট করিতে সক্ষম হন না, যেহেতু আমরা সহসা তাহাদিগকে চিনিতে পারি এবং আমাদের সহজ কুচি-দ্বারা উচ্ছালিত হইয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারি। কিন্তু যাহারা বলেন যে, ঈশভক্তিই সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম, অথচ শুদ্ধভক্তি বিপরীত সিদ্ধান্ত ও আচারকে শিক্ষা দেন, তাহারা আমাদের অধিকতর অনিষ্ট করেন। ভক্তি-ছলে বিপরীত তত্ত্বে নীত করিয়া আমাদের অবশেষে ঈশভক্তি হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। এইজন্য আমাদের পূর্বাচার্যাগণ অনেক যত্নসহকারে শুদ্ধভক্তির স্বরূপ নির্ণয় করত

* বঙ্গাব্দ ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ, রবিবার শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-সভার অন্তরঙ্গ বিভাগে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই প্রথম প্রবন্ধ পাঠ করেন।

আমাদিগকে মিশ্র-মত হইতে ভূয়ো-ভূয়ঃ সতর্ক করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের উপদেশগুলি ক্রমশঃ আলোচনা করিতে থাকিব। শুদ্ধভক্তির স্বরূপ নির্ণয় করিবার উদ্দেশে তাঁহারা ভূরি ভূরি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে ‘শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু’ গ্রন্থখানি অত্যন্ত উপাদেয়। উক্ত গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী শুদ্ধভক্তির সামান্যলক্ষণে এই শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্মাচ্যুতম্ ।

আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরূপম্ ॥

অন্যাভিলাষিতাশূন্য এবং জ্ঞান-কর্মাচ্যুতদ্বারা অনাবৃত শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে আনুকূল্য-ময় অনুশীলনকেই উত্তমা ভক্তি বলি।

উক্ত শ্লোকটির এক একটা শব্দের বিশেষ আলোচনা না করিলে ভক্তির লক্ষণ বুঝা যাইবে না। এই শ্লোকে যে ‘উত্তমা ভক্তি’ বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ কি? ‘উত্তমা ভক্তি’ এই শব্দের দ্বারা কি আর একটা ‘অধমা ভক্তি’ আছে ইহা বুঝিতে হইবে, কি আর কিছু? উত্তমা ভক্তির অর্থ এই যে, শুদ্ধ বা অমিশ্র অবস্থায় যখন ভক্তি-লতিকা হ’ন, তখন তাঁহাকে উত্তমা ভক্তি বলি। উত্তম জল বলিলে যে রূপ নির্মল জলকে বুঝিতে হয়, অর্থাৎ জলে কোন প্রকার অন্য দ্রব্য, ঘ্রাণ বা বর্ণ মিশ্রিত নাই—এরূপ বুঝিতে হয়; সেইরূপ ‘উত্তমা ভক্তি’ শব্দে নির্মল, নিগুণ, অমিশ্র, কেবল ও অকিঞ্চনা ভক্তি বুঝিতে হইবে। এই সকল বিশেষণ দ্বারা ভক্তির অন্যথা বুঝিতে হইবে না; বরং ভক্তির অন্যথা ভাব-বজ্জিত হইলে শুদ্ধ হ্রস্ববই লক্ষিত হইবে। কেবল ভক্তি-শব্দটি ব্যবহার করিলে যে অর্থ হয়, ঐ সমস্ত বিশেষণ দ্বারা সেই অর্থই হইবে। তবে কি ভক্তি-রসাত্মক শ্রীরূপ গোস্বামী অকারণ উত্তমা বিশেষণটি ব্যবহার করিয়াছেন? উত্তর, না। যেমত অনেকস্থলে সমল জল দেখিতে পাওয়ায় জল-পানকর্তা স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, এই পানীয় জল কি নির্মল (Filtered)? সেইরূপ অনেক স্থলে মিশ্র ভক্তি লক্ষিত হওয়ায় উত্তমা ভক্তির লক্ষণ করা আচার্য্যের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। বস্তুতঃ রসাত্মক মহাশয় কেবল-ভক্তিরই লক্ষণ করিয়াছেন। ‘ছল-ভক্তি,’ ‘প্রতিবিম্ব-ভক্তি,’ ছায়া-ভক্তি,’ ‘কর্মাশ্রিত-ভক্তি,’ ‘জ্ঞানমিশ্র ভক্তি’ প্রভৃতি ভাব সকল যে ভক্তি নয়, তাহা ক্রমশঃ বিচারিত হইবে।

ভক্তির স্বরূপলক্ষণ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইল যে, আনুকূল্যময় কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। এট শ্লোকে অনুশীলন শব্দটির অর্থ-বিচারে ‘দুর্গম-সঙ্গমনী’-

টীকাকার শ্রীমজ্জীব গোস্বামী মহোদয় লিখিয়াছেন যে, অনুশীলন শব্দের অর্থ দ্বিবিধ। আদৌ প্রযুক্তি-নিবৃত্তি-স্বরূপ কায়-বাঙ্-মানস-চেষ্টারূপ। দ্বিতীয়তঃ শ্রীতি-বিসম্বাদক মনের ভাবরূপ। দ্বিবিধ হইলেও, ভাবরূপ অনুশীলন—চেষ্টারূপ অনুশীলনের অন্তর্গত। অতএব চেষ্টা ও ভাব উভয়ই পরস্পর উপমর্দন করত চেষ্টাই একমাত্র অনুশীলনের লক্ষণরূপে পর্য্যবেশিত হয়। কৃষ্ণ-সম্বন্ধে কায়-বাঙ্-মানসীয় চেষ্টা আনুকূল্যাত্মিক হইলেই ভক্তি-নাম লাভ করে। কৃষ্ণের প্রতি কংস-শিশুপালাদির ঘাঘ অহরহঃ প্রতিকূল-চেষ্টা থাকিলেও সে চেষ্টা ভক্তি-নাম প্রাপ্ত হয় না—অনুকূল-চেষ্টাই ভক্তি। ভজ্ ধাতু হইতে ‘ভক্তি’ শব্দ সাধিত হয়। অতএব গুরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

ভজ ইত্যেব বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীৰ্ত্তিতঃ।

তস্মাৎ সেবা বৃধেঃ প্রোক্তা ভক্তি-সাধনে ভূয়সী ॥

এই শ্লোকানুসারে কৃষ্ণসেবাকেই ভক্তি বলা হইয়াছে। সেবাই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। জীব ও কৃষ্ণের সেবক-সেবা ভাবই নিত্য।

মূলে যে ‘কৃষ্ণানুশীলন’-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ‘কেবল-ভক্তি’ শব্দের একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেই চরম বিশ্রাম। শ্রীকৃষ্ণ-রূপ ও শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণাদি অন্যান্য রূপেও ভক্তির ক্রিয়া হয়। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-রূপে ভক্তির যতদূর পূর্ণ-ক্রিয়া হয়, অন্যান্য রূপে তদপেক্ষা ন্যূনতা লক্ষিত হয়। এই বিষয়টী ভক্তির বিষয়-বিচারে পরে সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হইবে। সম্প্রতি এই পর্য্যন্ত জ্ঞাতব্য যে, ভগবত্তত্ত্ব ব্যতীত ভক্তির বিষয়াস্তর নাই। তত্ত্ব—ত্রিবিধ, অর্থাৎ, ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব। স্বরূপতঃ তত্ত্ব এক ও অখণ্ড হইলেও জীবের তত্ত্বালোচনার অধিকার-তারতম্যক্রমে ঐ তত্ত্ব ত্রিবিধাকারে লক্ষিত হয়। কেবল জ্ঞানমার্গে যাহারা তত্ত্ব দর্শন করিতে যত্ন করেন, তাহারা ব্রহ্ম বই আর চরমে কিছুই দেখিতে পান না। তাহারা এই মায়িক জগতের গুণগণকে ব্যতিরেক ভাবে চিন্তা করিতে করিতে ময়া হইতে উত্তীর্ণ হইবার যে অধ্যাত্মিক চেষ্টা করেন, তদ্বারা সমস্ত মায়ার বিপরীত গুণগণকে সজ্জীভূত করত একটি অচিন্ত্য, অব্যক্ত, নিরবয়ব, নিরাকার, নির্জিকার ব্রহ্মতে অবস্থিত হইয়া তত্ত্ব দর্শন করিয়াছি—এরূপ মনে করেন। বস্তুতঃ মায়িক গুণগণের অভাব হইলেই যে বস্তু-লাভ হয়—ইহার প্রমাণ কি? অধ্যাত্মিক তাত্ত্বিকগণ নিগূর্ণ শ্রুতিগণকে

প্রমাণ বলিয়া উক্তি করিয়া থাকেন। তাঁহার চক্ষু নাই, তিনি অবাঙ্-
মনসো-গোচর, তাঁহার শ্রোত্র নাই, তাঁহার অবয়ব নাই, এরূপ নির্বিশেষ
শ্রুতিবাক্য অনেক আছে বটে, কিন্তু, শ্রীকবি-কর্ণপূরকৃত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-
ধ্বজ শ্রীমৎ প্রভুপাদ বাক্য দৃষ্টি করিলে ঐ তর্কের সম্পূর্ণ নিরসন হয়।—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষঃ সা সাবিশেষে সবিশেষমেব।

বিচারযোগে সতি হৃদ্য তা সাং প্রাপ্নো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥

যে যে শ্রুতিবাক্যে নির্বিশেষ তত্ত্বের জল্পনা করে, সেই সেই শ্রুতিবাক্যেই
সবিশেষ তত্ত্বের উল্লেখ আছে। ভাল্লরূপে শ্রুতিসমূহের সমন্বয় করিতে পারিলে
সবিশেষ তত্ত্বের তত্ত্বই বলবান্ হইয়া পড়ে। যথা,—কোন স্থলে শ্রুতি বলিলেন
যে, তাঁহার কর, চরণ, শ্রোত্র নাই, কিন্তু তাহাতে দৃষ্টি হইবে যে, তিনি সকলই
করেন, সর্বত্র গমন করেন এবং সমস্ত বিষয় শ্রবণ করেন। ইহার শুদ্ধ মীমাংসা
এই যে, বন্ধজীবগণের গায় তাঁহার প্রকৃত কর-চরণাদি নাই, তাঁহার যে
নিত্য বিগ্রহ আছে, তাহা বিশুদ্ধ চিন্ময় প্রকৃতির চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতীত।

ফলতঃ কেবল জ্ঞানমার্গে আলোচনা করিতে গেলে নিরাকার ব্রহ্মকেই
চরম বলিয়া প্রতীত হয়। ইহার মধ্যে সুস্থ এই যে, কেবল-জ্ঞান প্রাকৃত বস্তু
অর্থাৎ প্রাকৃত জগৎ হইতে আমরা যে বোধ লাভ করি, তাহাতে যে সিদ্ধান্তই
করা যাইবে, তাহা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে অর্থাৎ হয় জড়ীয় সিদ্ধান্ত
হইবে, নতুবা ব্যতিরেক সিদ্ধান্ত দ্বারা জড়ের একটা বিপরীত তত্ত্ব গঠিত হইবে।
চিন্ময় পরমতত্ত্ব তাহাতে দুর্লভ। শ্রীজীব গোষামী ভক্তিসন্দর্ভে অধ্যাত্মিক
জ্ঞান-বাদীদিগের প্রাপ্য-তত্ত্ব এইরূপে নিরূপণ করিয়াছেন,—

“প্রথমতঃ শ্রোতৃ নামেব বিবেকস্তাবানেব যাবতা জগদতিরিক্তং চিন্মাত্রং
বস্তুপুস্তিতং ভগবতি। তস্মিংশ্চিন্মাত্রোপি বস্তুনি যে বিশেষাঃ স্বরূপভূতশক্তি
সিদ্ধাঃ ভগবত্ত্বাদিরূপা বর্তন্তে তাংস্ত তে বিবেক্তাঃ ন ক্ষমন্তে। যথা রজনী-
খণ্ডিনী জ্যোতির্মাত্রোপি যে মণ্ডলান্তর্বহিষ্ঠ দিবা-বিমানাদি-পরস্পর-
পৃথগ্-ভূত-রশ্মি-পরমাণুরূপা বিশেষা স্তাংস্চর্শ-চক্ষুষ স্তদং। পূর্ববচ্চ যদি
মহতঃ রূপা-বিশেষেণ দিবা-দৃষ্টিতা ভবতি তদা বিশেষোপলব্ধিষ্ঠ ভবেৎ, ন চ
নির্কেশেষ্চিন্মাত্র-ব্রহ্মভবেন তল্লীন এব ভবতি। ইদমেব স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে
ইতানেন শ্রীগতাস্তং। স্বয়ং শুদ্ধম্ আয়নো ভাবো ভাবনা আয়নাদিকৃত্য
বর্জমানত্বাৎ অধ্যাত্ম-শব্দেনোচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥”

শ্রীজীব গোয়ামীর বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, ‘অতন্নিবসন’-বৃত্তি-দ্বারা যখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয়, তখন মায়াতিরিক্ত চিন্ময় বস্তুর দিগ্‌দর্শন হয় মাত্র। কিন্তু তদন্তে যে, চিদ্বিশেষ আছে, তাহার দর্শন হয় না। তৎকালে যদি বিশেষ-তত্ত্ববিদ বৈষ্ণব গুরু লাভ হয় তবেই ব্রহ্ম-লক্ষ্যরূপ-অনর্থ হইতে রক্ষা হয়।

কেবল যোগমার্গে ঈহারা তত্ত্বানুশীলন করেন তাঁহারা অবশেষে বিশ্বব্যাপী পরমাত্মতত্ত্বে বিরাম লাভ করেন, শুদ্ধ ভগবত্তত্ত্ব লাভ করিতে পারেন না। পরমাত্মা, ঈশ্বর, সত্ত্ব বিষ্ণু প্রভৃতি যে-সকল বাক্য শ্রুত হওয়া যায়, সে সমুদয়ই যোগ-মার্গের অনুসন্ধান। এই মার্গে কিছু কিছু ভক্তির লক্ষণ আছে, কিন্তু শুদ্ধ-ভক্তি নাই। ভাগবত-ধর্ম্মের অন্যতম যত ধর্ম্ম জগতে আছে সে সমুদয়ই এই পরমাত্মানুসন্ধানরূপ যোগ-বিশেষ। চরম ফল যে ঈহারা সকলেই ভাগবতধর্ম্মে বিশ্রাম করিবেন—এরূপ আশা করা যায় না। কেননা যোগ-মার্গের যে-সকল সোপান আছে, তাহাতে অনেক বাধাত ও অবশেষে অহংগ্রহোপাসনা দ্বারা কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞান-গর্ভের মধ্যে পতনের অত্যন্ত সম্ভাবনা। এই মার্গে পরমেশ্বরের নিত্য বিগ্রহ দর্শন ও চিন্তনের বিশেষ-ধর্ম্মের লাভ নাই। উপাসনাকালে যে-বিগ্রহ কল্পনা করা যায়, তাহা হয় বিরাট-মূর্ত্তি অথবা হৃদয়ান্তর্বর্ত্তী হিরণ্য-গর্ভ-মূর্ত্তি। বস্তুতঃ ঐ ঐ মূর্ত্তির নিত্যতা নাই। ইহাকে পরমাত্ম-দর্শন বলে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান অপেক্ষা এই মার্গ শ্রেষ্ঠ হইলেও ইহা সম্যক্ সিদ্ধমার্গে নয়। অষ্টাঙ্গযোগ, ইষ্টযোগ, কর্ম্মযোগ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার যোগই ইহার অন্তর্গত। রাজযোগ বা অধ্যাত্ম-যোগ কতকটা এই মার্গে স্থিত হইলেও অনেক স্থলে জ্ঞান-মার্গের অন্তর্গত। সিদ্ধান্ত এই যে, পরমাত্ম-দর্শনকে শুদ্ধভক্তি বলা যায় না; এই বিষয়ে ‘ভক্তিসন্দর্ভে’ কথিত হইয়াছে, “অন্তর্য্যামিত্তময়-মায়া-শক্তি প্রচুর-চিহ্ন-অংশ-বিশিষ্ট পরমাত্মেতি।” অন্তর্য্যামিত্তময় মায়া-শক্তি প্রচুর চিহ্ন-অংশ-বিশিষ্ট তত্ত্বের নাম পরমাত্মা।

জগত সৃষ্টি হইলে পর ভগবানের যে-অংশ মায়া-শক্তির অধীশ্বররূপে জগতে প্রবেশ করত এই জগতের নিয়ামকরূপে-অধিষ্ঠিত, তিনিই জগদীশ্বর বা বিশ্বব্যাপী পুরুষ বিষ্ণু। এইজন্য পরম নিত্য ভগবত্তত্ত্ব হইতে এই তত্ত্বের নূনতা স্বতঃসিদ্ধ।

কেবল-ভক্তিমার্গে যে, তত্ত্ব লক্ষিত হয়, তাহার নাম ভগবান্। ‘ভক্তিসন্দর্ভে’ ভগবত্তত্ত্বের এইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়,—

পরিপূর্ণ-সর্ব্বশক্তি-বিশিষ্টং ভগবানিতি।

ভগবান্ সম্পূর্ণ চিন্ময় সৰ্ব্বশক্তি-বিশিষ্ট। জগৎ সৃষ্টি হইলে তিনি পরমাত্মারূপ অংশ-বিশেষরূপে জগতে অঙ্গপ্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত বিরাড়ান্তর্যামী-রূপে এবং জীবের অন্তর্ভূত হইয়া ক্ষিরোদক-শায়ী ও গর্ভোদক-শায়ীরূপে বিরাজমান। পুনশ্চ সমস্ত মায়িক জগতের ব্যতিরেক তত্ত্বরূপ নির্কিংশেয় আবির্ভাব দ্বারা ব্রহ্ম-রূপে প্রকাশিত হন। অতএব ভগবান্ই মূল তত্ত্ব ও পরিপূর্ণ বস্তু-বিশেষ। তাঁহার রূপ-বিগ্রহ চিন্ময়। সমস্ত আনন্দই তাঁহাতে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। তাঁহার শক্তি অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য, কখনই কোন জীব-জ্ঞান-গত বিধির বশীভূত নয়। সেই অবিচিন্ত্য শক্তির বিবিধ প্রভাবক্রমে সমস্ত বিশ্বের ও বিশ্বস্থ জীবসমূহের বিধান হইয়াছে। জীব-শক্তি-নিঃসৃত জীবসমূহ তাঁহার একান্ত আনুগত্য-ধর্ম্য ভঞ্জন করিয়া চরিতার্থ হয়। সেই আনুগত্য-ধর্ম্মের নাম ভক্তি। ভক্তি কেবল দ্বায় চিন্ময় চক্ষে তাঁহার অসমোক্ষ সৌন্দর্য্য দর্শন করে। জ্ঞান ও যোগ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জ্ঞানকে আনিয়া যদি ভগবন্তে যোজন্য করা যায়, তবে ঐ তত্ত্ব বস্তুহীনপ্রায় বস্তুর অভাব স্বরূপ হইয়া পরিবে। যোগকে যদি তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত করা যায়, তবে ঐ অপরিমিত পরমতত্ত্ব অতি সত্ত্বর জড়-জগতে লুপ্তায়িত পরমাত্মা-রূপে প্রতীয়মান হইবে। ভক্তি অতি পবিত্র বস্তু। ভক্তি কখনই ভগবানের ভগবত্তার হানি দেখিতে পায় না। যদিও কোন স্থানে দেখে, তাহা সহ্য করিতে পারে না।

পরমতত্ত্বের এবজ্জুত ত্রিবিদ্যাবিভাবের মধ্যে ভগবন্ত্ত্বরূপ আবির্ভাবই ভক্তির বিষয়। কিন্তু ভগবদবিভাবেও একটী তাত্ত্বিক ভেদ আছে। স্বরূপ-শক্তির পূর্ণৈশ্বর্য্য-প্রকাশস্থলে ভগবদবিভাবটী পরব্যোম নাথ দেবদেব নারায়ণ-রূপে ভাস-মান হন। স্বরূপ-শক্তির পূর্ণমাধুর্য্য প্রকাশস্থলে ভগবদ-আবির্ভাবটী শ্রীকৃষ্ণ-রূপে ভাসমান হন। ঐশ্বর্য্য সর্বত্র বলবান হইলেও মাধুর্য্যের প্রভাবে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। জড় জগতে এই কথাটির তুলনা নাই, উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। জড় জগতে মাধুর্য্য অপেক্ষা ঐশ্বর্য্য বলবান্। কিন্তু চিজ্জগতে ইহার বিপরীত। চিজ্জগতে ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্য উচ্চ ও শক্তিম্যান্। হে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ! আপনারা একবার ঐশ্বর্য্য ধ্যান করত মাধুর্য্য-তত্ত্বকে হৃদয়ে প্রেমের সহিত আনিয়া দেখুন, তাহা হইলেই এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। জড়ে যেরূপ সূর্যালোকে চন্দ্রলোক লীন হয়, মাধুর্য্য-স্বাদ হৃদয়ে উদিত হইলে ঐশ্বর্য্যের অস্বাদ আর সুখকর বোধ হইবে না।

এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন যে,—

সিদ্ধান্ততত্ত্বভেদেহপি শ্রীশ-কৃষ্ণ-স্বরূপয়োঃ ।

রসেনোৎকৃষ্টতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥

নারায়ণ ও কৃষ্ণ-স্বরূপ সিদ্ধান্তক্রমে অভেদ হইলেও বলাধিকাক্রমে কৃষ্ণরূপটী উৎকৃষ্ট হয়। বেহেতু রসতত্ত্বের এইরূপ অবস্থান। এই সকল তত্ত্ব ক্রমশঃ অধিকতর স্পষ্ট হইয়া পড়িবে। এইস্থলে এই মাত্র জ্ঞাতব্য যে, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আনুকূল্যময় অনুশীলনই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। যাহা মূলে কথিত হইয়াছে তাহা সিক্ত হইল। (ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

দীক্ষায় উপবীতের আবশ্যকতা

সদগুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির উপনয়ন-সংস্কার প্রদানের প্রথা আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। ভারতের পারমার্থিক ইতিহাসে এসম্বন্ধে ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে।

শ্রীমদাত্ম গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাশক্তি লাভ করিয়া যে-বৈষ্ণব-স্মৃতি সঙ্কলন করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টভাবে এই তত্ত্বসার-বচনটি উল্লেখ করিয়াছেন,—

যথা কাঞ্চনতাং যতি কাংশ্চং রসবিধানতঃ ।

তথা দীক্ষাবিধানেন বিজ্ঞত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

বিজ্ঞত্বং অর্থে দীক্ষায় লিখিয়াছেন—বিপ্রতঃ। যেমন রসবিধানে অর্থাৎ রাসায়নিক-প্রক্রিয়া দ্বারা কানা স্বর্ণরূপ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেয়ই বিপ্রতঃ সাধিত হয়।

শ্রীনারদ-পঞ্চরাत्रে উক্ত হইয়াছে যে আচার্য্যগুরু স্বয়ং পাক্ষরাত্তিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্র প্রভাবে শিষ্যের পুনর্জন্ম হয়। বিনীত পুত্র-শিষ্যাদিকে বৈদিক-দশমংস্কারে সংস্কৃত করিয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন।

তৎপ্রমাণ—স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ ।

বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ ॥

(ভঃ সংহিতা ২।৩৪)

শ্রীমহাভারতে—এতৈঃ কৰ্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ ।

শূদ্রোহিপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ ॥

(মঃ ভাঃ অনুশাঃ পঃ ১৪৩।৪৬)

হে দেবি, নিম্নকুলোদ্ভূত শূদ্রও এই সকল কৰ্ম্মদ্বারা আগমসম্পন্ন অর্থাৎ পাক্ষরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া দ্বিজত্ব সংস্কার লাভ করিয়া দ্বিজ হন ।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু বৈষ্ণবের দশবিধ সংস্কার বিষয়ক ‘সংক্রিয়ামার-দীপিকা’-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । তাহাতে উপনয়ন-সংস্কারেরও পদ্ধতি আছে ।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্দুতে পূর্ব-লহরী ১।১৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

“ব্রাহ্মণকুমারাণাং শৌক্রে জন্মানি দুর্জ্জাতিত্বাভাবেহপি সর্বনযোগ্যত্বায় পুণ্য-বিশেষময় সাবিত্র্য-জন্মাপেক্ষত্বাৎ । ততশ্চ অদীক্ষিতস্ত্র্য ঋদশ্চ সর্বন-যোগ্যত্ব-প্রতিকূলদুর্জ্জাত্যারম্ভকঃ প্রারম্ভমপি গতমেব, কিন্তু শিষ্টাচার-ভাবাৎ অদীক্ষিতস্ত্র্য ঋদশ্চ দীক্ষাং বিনা সাবিত্র্যং জন্ম নাস্তীতি ব্রাহ্মণ-কুমারাণাং সর্বনযোগ্যত্বা-ভাবাবচ্ছেদকপুণ্যবিশেষময়-সাবিত্র্যজন্মাপেক্ষাবদস্ত্র্য অদীক্ষিতস্ত্র্য ঋদশ্চ সাবিত্র্য-জন্মাস্তরাপেক্ষা বর্জিত ইতি ভাবঃ ।” অর্থাৎ প্রকৃত ব্রাহ্মণকুমারগণের শৌক্রে-জন্মে দুর্জ্জাতিত্বের অভাব থাকিলেও সর্বনযজ্ঞে যোগ্যতা অর্জন করিবার জন্ত পুণ্যবিশেষময় সাবিত্র্য-জন্মের অপেক্ষা করে (ব্রাহ্মণপুত্রের উপনয়ন-সংস্কার না হইলে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ায় অধিকার হয় না), তদ্রূপ চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত অদীক্ষিত ব্যক্তির সর্বনযজ্ঞে যোগ্যতাপ্রাপ্তির প্রতিকূলদুর্জ্জাতিত্বাবস্থা দীক্ষা ব্যতীত নাশ হয় না বলিয়া তাহারও ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তির স্থায় সাবিত্র্য-জন্মের অপেক্ষা আছে অর্থাৎ উপনয়ন-সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত না হইলে ব্রাহ্মণের কুলে জন্মগ্রহণকারীর অর্চন-যজ্ঞাদিতে অধিকার হয় না ।

অধিক কথা কি, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও শ্রীভগবানের নিকট সংস্কৃত হইয়া দ্বিজ হইয়াছিলেন, ইহা ব্রহ্ম-সংহিতা গ্রন্থে উল্লিখিত আছে—

গায়ত্রীং গায়তস্তস্মাদধিগত্য সরোজজঃ ।

সংস্কৃতশ্চাদিগুরুণা দ্বিজতামগন্ততঃ ॥

পর্যায়নি ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বেণুনিবাদ-দ্বারা গীতি-গায়ত্রী প্রাপ্ত হইয়া আদিগুরু ভগবানের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইলেন ।

জড়বদ্ধ জীবদিগের মায়িক-সংসারে বংশ অনুসারে যে অথবা দ্বিজত্ব পরিচয়, তাহা অপেক্ষা অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশরূপ এই দ্বিজত্ব-লাভ কোটিগুণে উৎকৃষ্ট ।

শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী প্রভু বৃহদ্রাগবতায়ুত গ্রন্থের ২য় খণ্ড ৪র্থ অঃ ৭ম শ্লোকের “দীক্ষা-লক্ষণধারিণঃ পদের স্বলিখিত টীকায় দীক্ষিত মাত্রেরই যজ্ঞোপবীত ধারণের কর্তব্যতা জানাইয়াছেন—“দীক্ষায়াঃ সাবিত্রাদিবিষয়কায়া ভগবন্ত-বিষয়কাস্ত যানি লক্ষণানি ক্রমেণ যজ্ঞোপবীত-কমণ্ডলু-ধারণাদীনি ধর্তুং শীলমেঘাং ইতি তথা তে ।”

নির্বোধ লোকেরা বৈষ্ণবদিগকে অচ্যুতগোত্রীয়-ব্রাহ্মণ বলিয়া বুঝিতে পারে না, তজ্জন্ত শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর বংশে, শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ দাসের বংশে, শ্রীমবনী হোড়ের বংশে সাবিত্র-সংস্কার চলিয়া আসিতেছে । ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমঠাকুর ভক্তিবিনোদ জীবশিক্ষার্থে উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন ; আবার ঐকান্তিকের বিচারে বাহ্যে পরমহংস-বেশাগ্রয়-লীলাও প্রকাশ করিয়াছিলেন । বৃন্দাবনের স্বপ্রদিক্ত পণ্ডিতপ্রবর (পরলোকগত) মধুসূদন গোস্বামী সার্বভৌম মহাশয়ও পরলোকগত আশুতোষ ঘোষ বা প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারীকে উপনয়ন-সংস্কার প্রদান করিয়া-ছিলেন । কাশীর ভাস্করানন্দ স্বামী ঢাকার ডেপুটী চণ্ডীচরণ বহু মহাশয়কে উপনয়ন-সংস্কার প্রদান করিয়া তাঁহার পাচিৎ অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন । পাক্ষ্যাত্মিক-দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ শৌক্ৰ-ধারা-প্রচলিত সামাজিক দ্বিজগণের উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ অপেক্ষা অনেক-গুণে শ্রেষ্ঠ ও শাস্ত্রযুক্তি সম্মত । যাহারা উপনয়ন-সংস্কার প্রদানে বা গ্রহণে কুণ্ঠিত, তাঁহারা অবশ্যই কৰ্ম্মজড়স্মার্ত-পদাবলেহী অথবা জড়-অভিমান বজায় রাখিত ব্যস্ত । পারমার্থিক-পন্থায় চলিতে যাহারা একমাত্র বন্ধ পরিকর, তাঁহারা কখনও তাদৃশ সনাতনের ভয়ে ভীত নহেন । তাঁহাদের ইহাই মূলমন্ত্র—

ত্যজন্ত বান্ধবাঃ সর্বের নিন্দন্ত গুরবো জনাঃ ।

তথাপি পরমানন্দো গোবিন্দো মম জীবনম্ ॥

(শ্রীমুকুন্দ মালাস্তোত্রম্)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

ভব-বন্ধন ও ভব-ব্যাদি

শাস্ত্রে কোথায়ও ভব-বন্ধন আবার কোথায়ও বা ভব-ব্যাদি-দুইটি নামের উল্লেখ দেখা যায়। ঐ দুইটি নামের তাৎপর্য অন্বেষণ করিবার জন্য বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রথমে ‘ভব-বন্ধন’ শব্দের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাউক। ভবের অর্থাৎ সংসারের বন্ধন অথবা সংসাররূপ বন্ধন-এই দুই প্রকারে সমাসবদ্ধ করা যাইতে পারে।

পরম করুণাময় ভগবান্ তাঁহার বহিঃপ্রকাশিত মহিমায় দুর্গাদেবীর দুর্গে অর্থাৎ কারাগারে, সংসাররূপ মেধিকাঠে তাঁহার তটস্থাপিত হইতে জাত জীবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, — কৃষ্ণ ভুলি’ সেই জীব অনাদি বহিস্মৃৎ।

অতএব মায়া তা’রে দেয় সংসারাদি দুঃখ ॥

ইহা কারাগার নয়—শোধনাগার। কৃষ্ণনিস্মৃতির ফলে যে অপরাধ হইয়াছে, তাহার শোধনের নিমিত্ত কারাগার স্থাপিত করিয়া মায়াদেবীর হস্তে জীবকে সমর্পণ করিয়াছেন। তিনিও নানাপ্রকারে শোধন করিয়া চলিতেছেন। সেকারণে জীবের কর্মখিপাকে নানাবোনিতে পরিভ্রমণ অবশ্যজ্ঞাবী। শ্রীপদ্মপুরাণে ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

যথা,—জলজা নবলক্ষ্মণি স্থাবরা লক্ষবিশ্ণুতিঃ।

ক্রিময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্ ॥

ত্রিশলক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ।

অর্থাৎ নয় লক্ষবার জলচর, বিশ লক্ষবার স্থাবর, এগার লক্ষবার ক্রিমি-কীট ও দশ লক্ষবার পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া শেষে ত্রিশ লক্ষ-বার পশু ও চারি লক্ষবার মনুষ্যরূপে জীব জন্ম গ্রহণ করে।

দেহধারণ করিলে তাহার একটি আধারের প্রয়োজন। উহাই তাহার সংসার। ক্রিমি-কীট হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেরই নিজ নিজ সংসার প্রাপ্তি হয় ও তাহাতে আবদ্ধ থাকে। এই ভব-বন্ধন হইতে মুক্তির উপায় করুণাসাগর কৃষ্ণচন্দ্র গীতার মাধ্যমে আমাদের কাছে উপদেশ করিয়াছেন; যথা, (গীতা ১৫:৩-৪) —

ন রূপমন্তেহ তথোপলভ্যতে, নাস্তো ন চাদি ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।

অস্বর্থমেনং সুবিক্রতুল্যমঙ্গলশ্রেণ দৃঢ়েন ছিদ্ভা ॥ ৩ ॥

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং, যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূরঃ ।

তমেব চাত্তং পুরুষং প্রাপত্তে, যতঃ প্রবৃতিঃ প্রসূতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

অর্থাৎ এই নরলোকে সংসার-বৃক্ষের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। ইহার আদি, শেষ ও স্থিতি লক্ষিত হয় না।

ঈশবৈমুখ্যরূপ বদ্ধমূল এই সংসাররূপ অশ্বখ বৃক্ষকে সাধুসঙ্গ ও কঠোর বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া তাহার পর ভগবান্ বিষ্ণুর পরম পদ অন্বেষণ করিতে হইবে। যে-পদ প্রাপ্ত হইলে কেহই পুনরায় প্রত্যাধর্তন করে না। যাহা হইতে চিরন্তন সংসার-প্রবাহ প্রবাহিতা হইয়াছে, আমি সেই আদি পুরুষেরই শরণাপন্ন হইতেছি।

মনুষ্যলোকে এই সংসার-বৃক্ষের স্বরূপ অবগত হওয়া কঠিন; যেহেতু ইহার আদি, অন্ত ও আশ্রয় লক্ষিত হয় না। এই বিনশ্বর দৃঢ়মূল অশ্বখরূপ সংসার অমঙ্গ বা অনাসক্তিরূপ শস্ত্রদ্বারা ছিন্ন করিয়া সত্য-বস্তুর অন্বেষণ কর্তব্য। এই সত্যতত্ত্বে অবস্থিত হইতে পারিলে তাহা হইতে জীব আর নিবৃত্ত হয় না। সেই আদি পুরুষ কৃষ্ণ হইতেই চিরন্তনই সংসার-প্রবৃতি প্রসূতা হইয়াছে। যদি প্রবৃতির নিবৃতি অনুসন্ধান হৃদয়ে জাগে, তবে সেই আদি পুরুষের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

ইহার প্রমাণ-স্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দেখা যায়—

দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যা ।

মামেব যে প্রপত্তন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ (গীঃ ৭।১৪)

অর্থাৎ এই মায়া আমারই শক্তি, অতএব দুর্বল জীবের পক্ষে স্বভাবতঃ দুরত্যা অর্থাৎ দূরতীকরণ। যাহারা আমার ভগবৎ স্বরূপের প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই সমুদ্র পার হইতে পারেন অর্থাৎ কর্ম-জ্ঞানদ্বারা বা অন্ত্যদেব-প্রপত্তিদ্বারা পার হইতে পারেন না।

শ্রীমহাদেব যষ্টাকর্গকে বলিয়াছিলেন, —‘মুক্তিপ্রদাতা সর্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ ।’ অর্থাৎ বিষ্ণু ভগবান্ই সকলের একমাত্র মুক্তিদাতা, ইহাতে কোন সংশয় বা সন্দেহ নাই।

বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণকে লাভ করিতে হইলে আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদ-পদ অর্থাৎ যিনি সাধুবৈষ্ঠ, তাঁহার একমাত্র শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্ ।

ভব-ব্যাদি

এ মরজগতে দুই প্রকার পীড়া দেখা যায়, যথা,—আধি অর্থাৎ মনের পীড়া ও ব্যাদি অর্থাৎ দেহের পীড়া। শোক-তাপ, মানসিক অশান্তি প্রভৃতি মনঃপীড়া এবং স্কুলদেহের যান্ত্রিক রোগ, যথা,—নিউমোনিয়া টাইফয়েড্ কলেরা, হৃদয় ও চক্ষু প্রভৃতির পীড়াই দৈহিক ব্যাদি বলিয়া জগতে খ্যাত।

উপরোক্ত দুই প্রকার হইতে বিলক্ষণ আর একটি জগৎ প্রসিদ্ধ আময় আছে—যাহার নাম ‘ভব-ব্যাদি’।

জাগতিক দৈহিক ব্যাদি চিকিৎসা করিতে হইলে চিকিৎসকের পক্ষে যেমন রোগের লক্ষণানুসন্ধানের প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ এই ব্যাদিরও লক্ষণ নির্ণয় একান্ত আবশ্যিক। ম্যালেরিয়া রোগীতে যেরূপ শীত, কম্পন ও উত্তাপ (Temperature) দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ভব-ব্যাদিরও লক্ষণ অবগত হইতে হইবে।

ভব-ব্যাদির লক্ষণ

ত্রিতাপই এই রোগের একমাত্র লক্ষণ। ১। আধিদৈবিক, ২। আধিভৌতিক, ৩। আধ্যাত্মিক। দেবতা হইতে তাপ উৎপন্ন হয়, যথা,—অতিবাত, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও বজ্রপাতাদি দ্বারা যে-দুঃখ জন্মে তাহাকে আধিদৈবিক তাপ বলে। ভূত অর্থাৎ ভূ (পৃথিবী) হইতে জাত, সেই ভূত বা প্রাণী হইতে যে-তাপ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম আধিভৌতিক তাপ, যথা,—দংশ-মশক ও ব্যাঘ্র-সর্পাদি দ্বারা দংশন এবং মনুষ্যকর্তৃক আঘাত, হননাদি। আধ্যাত্মিক তাপ অর্থাৎ মানসিক দুঃখ, যথা,—শোক-মোহ, গঞ্জনা-লাঞ্ছনা ইত্যাদি।

বহু ডিগ্রীধারী ডাক্তার বা বৈজ্ঞানিক এই চিকিৎসা অসম্ভব। কোন কোন মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা কাহারও উপর ‘ভর’ বা আবিষ্ট হইলে যেমন রোজার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ এই মায়া-পিপাটীগ্রস্ত রোগীর পক্ষে সাধু ‘রোজা’ অথবা ভব-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে সাধুবৈद्यের একান্ত আবশ্যিক।

এখন প্রধান সমস্যা হইতেছে—এই সাধু-বৈद्यের সন্ধান কোথায় मिलিবে।

মহাজন পদাবলীতে দেখিতে পাই—

‘হৃদয় পীড়িত যার, কৃষ্ণ চিকিৎসক তার,

ভবরোগ নাশিতে চতুর।

অবয়-জ্ঞানতত্ত্ব ভ্রজে ভ্রজেঙ্গমন্দন মূলতঃ প্রধান বৈষ্ণু হইলেও
সরাসরি তাঁহার দর্শন অসম্ভব। অতএব আশ্রয়-বিগ্রহ ও সাধুবৈষ্ণু যে-
শ্রীগুরুপাদ-পদ, সর্ববাগ্রে তাঁহার আশ্রয় লইতে হইবে।

শাস্ত্রে আছে,—আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ভ্যজে,
আর সব মরে অকারণ।’

অন্যত্র দেখিতে পাই—

‘কিবা বিপ্র, কিবা গ্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।

যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥’

গুরুকরণ-বিষয়ে শাস্ত্রে সতর্কবাণী উপদেশ করিয়াছেন—

তস্মাৎ গুরুং প্রপद्यেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।

শাব্দে পরে চ নিম্নোক্তং ব্রহ্মণ্যপশমাস্রমম্ ॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

অর্থাৎ কর্তব্যাকর্তব্যজিজ্ঞাসু পুরুষ শ্রেয় অবগত হইবার জন্য সাধু-বৈষ্ণু
বা সৎগুরুকে আশ্রয় করিবেন। যিনি শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্র-
সিদ্ধান্তে নিপুণ, পরব্রহ্মে নিম্নোক্ত অর্থাৎ, যিনি অধোক্ষজ-অনুভূতি লাভ
করিয়াছেন এবং তজ্জন্ম যিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নহেন,
তিনিই সৎগুরু বা সাধু-বৈষ্ণু।

ভব-ব্যাধির ঔষধ

সংসার-সর্পদর্শনাং মুচ্ছিতানাং কলৌ যুগে।

ঔষধং ভগবন্মাম শ্রীমদ্বৈষ্ণবসেবনম্ ॥ (শ্রীচৈতন্য-শতকম্)

অর্থাৎ, কলিযুগে সংসাররূপ-সর্পদংশনে মুচ্ছিত ব্যক্তিগণের পক্ষে
শ্রীভগবানের নাম ও বৈষ্ণবসেবাই একমাত্র ঔষধ।

অতএব এই প্রবন্ধের সংক্ষেপতঃ সারমর্ম এই যে, শাস্ত্র-কথিত
ভব-বন্ধনই বলুন বা ভব-ব্যাধিই বলুন, উভয়ের কবল হইতে মুক্তির ইচ্ছা
থাকিলে যুক্তিদাতা মুকুন্দ কৃষ্ণের কার্যমনোবাক্যে শরণ-গ্রহণ একান্ত
কর্তব্য। তাহা হইলে আমরা ভব-বন্ধন বা ভব-ব্যাধির হস্ত হইতে সম্পূর্ণ-
রূপে মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইব।

—ত্রিদিগ্বামী শ্রীমুক্তিবেদান্ত উল্লম্বী মহারাজ

পরমাধ্যাতম নিত্যলীলাপ্রবিশিষ্ট ঐ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলতিলক অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের
৮৫তম বর্ষপূর্তি আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে
ভক্তি-কুমুদাঞ্জলি

তুমি গুরুদেব, আমি তব শিষ্য,—তুমি প্রভু, আমি দাস ;
তব সাথে মোর সম্বন্ধ নিত্য,—এ' সম্বন্ধের নাই নাশ ।

পিতা নাই ত্যজে অন্ধ সন্তানে,
তেমতি তুমিও ত্যজনি এ দীনে,

আজো মোর শিরে, তব রূপারশি ঝরে বৃষ্টি বারমাস !
তুমি প্রভু, আমি দাস ॥

তুমিই আমার সম্বন্ধতত্ত্ব,—আমি তব পদাগ্রিত,
আজি তব পদে প্রকট-তিথিতে, পূজি তোমার অবিরত ।

গন্ধ-পুষ্প মাল্য করি' নিবেদন,
প্রেমানন্দভরে গাহি তব গুণ,

লহ প্রভু মোর প্রাণের অঞ্জলি, ব্যাসাসনে বসি' আজ !
তুমি প্রভু, আমি দাস ॥

গুরুদ্বন্দ্বদেবত হ'য়ে যেই জন, তব অনদ্বর্তন করে,
তোমারি রূপার গোঁরের বিচার সেই তো বৃষ্টিতে পারে ।

শ্রীহরিতোষণ ও শ্রীনামভজনে,
প্রেরণা দিয়াছো প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,

শক্তি দাও যেন তোমার বাণীতে থাকে দৃঢ় বিশ্বাস !
তুমি প্রভু, আমি দাস ॥

তোমার স্বরূপ যে' দেখেছে, তারে কেহ না টলাতে পারে,
তুমি ষা'র গুরু, তার কি কখনও ভয় থাকে অন্তরে ?

তোমারি মাধ্যমে শ্রীগৌরসুন্দর,
মোদের করুণা কবে নিরন্তর,

তুমি শ্রীগৌরের প্রকাশ-বিগ্রহ, তুমি অভিন্নব্যাস !
তুমি প্রভু, আমি দাস ॥

তব নাম-গুণ-লীলার স্মরণে, জড়-প্রীতির হয় নাশ,
তোমার চরণে দাস অভিমানই ভঙ্কির অভিলাষ ।

দানি' প্রভু মোরে ভক্তিভজ্ঞান,
অনর্থরাশির কর অবসান,

মোর জন্মে জন্মে গুরুরূপে থাকি' পুরাও মনোভিলাষ ।

তুমি প্রভু, আমি দাস ॥

এ শব্দ বাসরে, তোমার চরণে, করি কোটি প্রণিপাত ;
কৃপা করি' প্রভু, জ্ঞানে-অজ্ঞানে ক্ষমিও মোর অপরাধ ।

মানে-অপমানে তোমার করুণা,
দেখি' যেন মনে পাই সান্ত্বনা,

এ সংসার হ'তে তরাইয়া মোরে লহ তব নিজ-পাশ ।

তুমি প্রভু, আমি দাস ॥

শ্রী শ্রীব্যাসপূজা-বাসর
৩রা গোবিন্দ, ৪৯৬ শ্রীগৌরানন্দ

শ্রীগুরু-দাসাভিমानी—
শ্রী চিত্তরঞ্জন মণ্ডল,
গ্রাম—বড়বহরকুলি (বর্ধমান) ।

শ্রীগীতোপনিষদে আত্মনিবেদন

আর্য্য ঋষিগণ শ্রীমদ্ভগবদগীতাকে উপনিষৎ-চূড়ামণি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন । কারণ অচ্যুত উপনিষৎ অপেক্ষা শ্রীগীতার লীলাময়ের লীলাময়ত্ব বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে । গীতার মাহাত্ম্যলোকে ইহা উপনিষদের সার বলিয়া কথিত হইয়াছে ।

“সর্বোপনিষদো যাব দোন্ধা গোপালনন্দনঃ ।

পার্থো বৎসঃ সুধীভোক্তা দুগ্ধং গীতানুভং মহৎ ।

সমস্ত উপনিষদগুলি গান্ধীভুল্য, গোপরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই ইহাদের দোহনকারী, অর্জুন বৎস, সুধিগণ ভোক্তা, গীতরূপ অমৃতই দুগ্ধ ।

মহাভারতের অন্তর্গত গীতার বক্তা দেবকীনন্দন শ্রীবাসুদেব । কিন্তু উক্ত শ্লোক “দোন্ধা গোপালনন্দন” ইহাই উক্ত হইয়াছে । ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়—ব্রজেন্দ্রনন্দন বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণই গীতার বক্তা । তিনি

বাসুদেববিগ্রহে শ্রীগীতা কীর্তন করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহার উক্তিই রসময় স্বরূপ প্রকট করিয়াছে। গোস্বামিপাদগণ বিভিন্নস্থানে মা যশোদার অপর নাম দেবকী, দেবকীপুর যশোদাপুত্রেরই নামান্তর ইহা দেখাইয়াছেন। অতএব শ্রীগীতার বক্তা বাহিরে দেবকীপুত্র বাসুদেব হইলেও অন্তরবক্তা শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই। শ্রীগীতার উপক্রম-উপসংহারাদি আলোচনা করিলে বুঝা যায়,—শ্রীকৃষ্ণই পরমদেব, চরম উপাস্ত, ভক্তিই তাঁহার উপাসনা, প্রেমভক্তিই সেই উপাসনার চরম কাষ্ঠা।

এখন শ্রীগীতার আত্মনিবেদন কি ধরণের—তাহা পর্য্যায়ভুক্ত, ইহা আলোচিত হইতেছে। বাহ্যতঃ শ্রীগীতার উপদেশ সার্বভৌম। ইহাতে কৰ্ম্মার্পণ ইহাতে আরম্ভ করিয়া শরণাগতি ও আত্মনিবেদন পর্য্যন্ত ভক্তির যাবতীয় কথা সূত্রাকারে গীত হইয়াছে। শ্রীগীতার আত্মনিবেদন ব্যাপারটীও সার্বভৌমিক। ইহাতে কৰ্ম্মার্পণকাব্যী ইহাতে আরম্ভ করিয়া আত্মনিবেদনের চরম কাষ্ঠা-প্রাপ্তগণের প্রতি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

গীতায় কথিত আত্মনিবেদন সাধারণ ও অসাধারণ-ভেদে দ্বিবিধ শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে সাধারণ আত্মনিবেদনকে “ভাবং বিনা” এবং অসাধারণ আত্মনিবেদনকে “ভাববৈশিষ্ট্যেন চ” এইভাবে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন। “তদেতদাত্মনিবেদন ভাবং বিনা ভাববৈশিষ্ট্যেন চ দৃশ্যতে” (ভক্তিসন্দর্ভ ৩০৯ অনু)। শ্রীল জীবপাদ “ভাবং বিনা” আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের “মন্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকৰ্ম্মা নিবেদিতাত্মা” এই শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন; আর ভাববিশিষ্ট আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ “তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়ামাত্মার্পিতশ্চ ভবতোহত্র” শ্রীকৃষ্ণগীতাবীর এই শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াছেন। “পূর্বং যথা—“মন্ত্যো যদা” ইত্যাদি উত্তরং যথৈকাদশ এব (ভাঃ ১১।১১।৩৫)—“দাস্তেনাত্মনিবেদনম্” ইতি। যথা চ কৃষ্ণগীতাক্যো (ভাঃ ১০।৫২।৩৯) ‘আত্মার্পিতশ্চ ভবতঃ’ ইতি”। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩০৯ অনুচ্ছেদ)।

ভাব অর্থে সম্বন্ধ—রাগানুগ দাস্ত-সখ্যাদিময়। দাস্তভাব, সখ্যভাব, বাৎসল্যভাব ও মধুরভাব—এই চারিটীই ‘ভাববৈশিষ্ট্যেন’ এই পদে উদ্দিষ্ট। ভগবৎপাদপক্ষে এই চারিটীর যে-কোন একটী ভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইরা যে আত্মনিবেদন, তাহাই ভাবযুক্ত আত্মনিবেদন; আর এই চারিটীর কোন ভাবেরই উদয়ের পূর্বে ভগবৎপাদপক্ষ যে আত্মসমর্পণ,

তাহাই ভাবহীন আত্মনিবেদন। ভাবহীন আত্মনিবেদন শ্রীবলি-মহারাজের চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে—ইহা শ্রীল জীবপাদ সন্দর্ভে অন্যত্র দেখাইয়াছে। শ্রীবলি-মহারাজের দাস্ত—ভাবহীন দাস্ত, উহা রাগানুগ-দাস্ত নহে। গীতার সর্ববৃহত্তম অর্থাৎ চরম উপদেশ—“সর্ববর্ষ্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥” —ইহা ভাবহীন আত্মনিবেদনেরই দৃষ্টান্ত। শ্রীল জীবগোস্বামী-কর্তৃক ভাব-হীন আত্মনিবেদনের উদাহরণ-স্বরূপ ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের (ভাঃ ১১।২৯।৩৪) “মর্ন্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ষ্মা, নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে” শ্লোকটি ও গীতার চরম উপদেশ-স্বরূপ “সর্ববর্ষ্মান্ পরিত্যজ্য” শ্লোকটি এক তাৎপর্য্যাপর। শ্রীমদ্ভাগবতের “মর্ন্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ষ্মা নিবেদিতাত্মা” আর গীতার “সর্ববর্ষ্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ”—শ্লোকাংশ একার্থবাচক। আবার “অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি” শ্লোকাংশ “বিচিকীর্ষিতো মে” কথারই ব্যাখ্যাবিশেষ। গীতার এই “সর্ববর্ষ্মান্ পরিত্যজ্য” শ্লোকটি সর্বসাধারণের প্রতি স্পষ্ট উপকারী।—ভাবহীন আত্মনিবেদনের কথা।

এখন বিচার্য্য, ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনের ইঙ্গিত গীতার প্রদত্ত হইয়াছে কি না? কোন বিদ্বৎ প্রেমিক ব্যক্তি যখন সাধারণকে নিজের স্নেহসেবার উপদেশ দেন, তখন তাহা একরূপ ভাষার বলেন। সাধারণের মধ্যে নিজের প্রিয়তম ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিলে সেই সাধারণ কথার মধ্যেও ইঙ্গিতে তিনি প্রিয়তম ব্যক্তিগণের প্রতি নিজের বিশেষ সুখবিধানের কথা গূঢ়ভাবে অথচ প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া যান। তাহা সাধারণ ধরিতে না পারিলেও যাঁহারা তাঁহার অসাধারণ প্রিয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই সেই ইঙ্গিত বুঝিয়া থাকেন। সেইরূপ বিদ্বৎ-চুড়ামণি “গোপালনন্দন” শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তথা সাধারণকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার অসাধারণ সেবাভিলাষি-গণের জন্ত অসাধারণ সেবা বা অসাধারণ আত্মনিবেদন অর্থাৎ ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনের কথা ইঙ্গিতে কীর্তন করিয়াছেন। সেই ইঙ্গিত কর্ম্মী, জ্ঞানী, কর্ম্মার্পণকারী, কর্ম্মজ্ঞানমিশ্র, এমন কি জ্ঞানমিশ্র ভক্তগণ ধরিতে না পারিলেও, তাঁহার অত্যন্ত মর্ম্মী রাগানুগ ভাবাভিলাষী ভক্তগণ গীতায় শ্রীকৃষ্ণের ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনের শুধু ইঙ্গিত কেন, স্পষ্ট উপদেশও অনুভব করিয়া থাকেন।

দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণগীদেবী পত্রে শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—
 “তন্মে ভবান্ খলু রতঃ পতিঃ,” অর্থাৎ আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ
 করিয়া আপনার শ্রীচরণ-কমলে আত্মনিবেদন করিতেছি। এখানে কান্তাভাব
 বা সম্বন্ধ হ্রদয়ে ধারণপূর্বক আত্মনিবেদন হইয়াছে। গীতার ভাবযুক্ত
 আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত ১০ম অধ্যায় ৯-১০ শ্লোকে এবং ১১শ অধ্যায়ের
 ৪৪ শ্লোকে পরিস্ফুট হইয়াছে। ১০ম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

“মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তুঃ পরস্পরম্ ।

কথয়ন্তুশ্চ মাং নিত্য তুষ্ণাস্তি চ রমস্তি চ ॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাযুপযাস্তি তে ॥ (গীঃ ১০।৯-১০)

অর্থাৎ যাহাদের চিত্ত ও প্রাণ আমাতে সমাপিত এবং আমার বিষয়ে
 মননশীল, কথা কখনশীল, আমাতেই যাহারা তুষ্ট এবং আমাকে চিন্তা
 করিয়াই যাহাদের চিত্তের আরাম, নেইসকল সততযুক্ত বা সতত সংযোগ
 আকাঙ্ক্ষী (শ্রীল বিষ্ণুনাথ ও শ্রীল বিজ্ঞানভূষণ) ভক্তদিগকে আমি এমন
 বুদ্ধিযোগ প্রদান করি যে, সেই বুদ্ধিযোগ দ্বারা তাহারা আমার লাভ
 করিতে পারেন।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপদে পর্য্যন্ত অগ্ৰ্যন্ত সমস্ত টীকাকারগণ এই শ্লোক-
 দ্বয়ের সর্বসামান্যরূপে অর্থই করিয়াছেন। বিদগ্ধশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ
 যেখানে-যেখানে তাঁহার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেখানে সেখানেই
 তাঁহার সাধারণ উপদেশের মধ্যেও তাঁহার মর্ম্যকথা—বিশ্রান্ত-সেবার কথা
 না বলিয়া পারেন নাই। “তুষ্ণাস্তি চ রমস্তি চ” এই কথায় “তুষ্ণাস্তি চ”
 এইটুকুতেই সাধারণ অর্থের পরি সমাপ্তি হয়, “রমস্তি চ” এর যে ব্যাখ্যা
 সাধারণ টীকাকারগণ করিয়াছেন, তাহা “তুষ্ণাস্তি চ” কথাই পাওয়া যায়,
 “রমস্তি” কথার কোন বিশেষ অর্থ থাকে না; বিশেষ অর্থ অনুসন্ধান না
 করিলে উক্ত শব্দ প্রয়োগেরও সার্থকতা থাকে না। এইজন্য শ্রীল বলদেব
 বিজ্ঞানভূষণ প্রভু ও শ্রীল বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর “রমস্তি” কথার সাধারণ
 অর্থবাদ দিয়া প্রকৃতি-প্রত্যয়গত বিশেষ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। ‘রম’
 ধাতুর অর্থ ক্রীড়া রতি প্রভৃতি বুঝায়। ‘রম্’ ধাতু প্রয়োগদ্বারা কেবল
 ভাবযুক্ত আত্মনিবেদন সূচিত হয় নাই, ভাবের মধ্যে সর্ববিশ্রেষ্ঠ মধুর
 ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনও সূচিত হইয়াছে। শ্রীল বিজ্ঞানভূষণ প্রভু টীকায়

বলিয়াছেন “রমন্তি চ যুবতিস্মিত-কটাকাদিষু এব যুবানঃ” অর্থাৎ স্মিত কটাকাদি লক্ষ্য কাস্তাভাবোচিত মধুর প্রীতির বিষয়রূপে শ্রীভগবানকে বরণপূর্বক আত্মনিবেদনই এখানে উদ্দিষ্ট। শ্রীল জীবপাদ-কর্তৃক ভাব-যুক্ত আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্তরূপে প্রদত্ত শ্রীরুক্মিণীদেবীর “তন্মো ভবান্ খলু বৃতঃ পতিঃ” পত্রাংশ ও গীতার “রমন্তি চ” শ্লোকাংশের ভাবার্থ একতাৎপর্যাপন্ন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও “রমন্তি চ” কথায় ঐরূপ অর্থই করিয়াছেন। শ্রীঅৰ্জুনের ভাষায় “পিতের পুত্রস্ত সখ্যেব সখ্যঃ প্রিয়ঃ শিয়ায়হঁসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ (গীঃ ১১।৪৪)—এই ভাষায় সখ্য-বাৎসল্য-মধুরাদি ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনের কথা পরস্ফুট হইয়াছে।

“দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে”

এখানে শ্রীল বিষ্ণুভূষণ প্রভু ও চক্রবর্তিপাদ প্রমুখ মহাজনগণ “বুদ্ধিযোগ” শব্দের অর্থ ভাবযুক্ত সাধনের ইঙ্গিতই প্রকাশ করিয়াছেন।

ভগবান্ কি নাই ?

আমার পাঠদশায় যখন আমি দর্শনের ছাত্র ছিলাম, তখন থেকে এ’পর্যন্ত একটা কথা বার বার মনের মাঝে উকি-বুকি মারে। কথাটা খুব গুরুতর। মাঝে মাঝে ভগবানের কোনও অস্তিত্ব আছে কিনা, অথবা ধর্মের কোনও অস্তিত্ব বা প্রয়োজন আছে কিনা, ভগবান্কে মান্লেই বা কি, আর না মান্লেই বা কি ?—এই ধরনের নানা প্রশ্ন মনে জাগে, আর মনকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। সাধারণতঃ ‘ধর্ম’ বলে আমরা যে শব্দ প্রয়োগ করি, অনেকেই তা’র ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ উপলব্ধি করতে পারেননা। আবার এও ঠিক, সব সময় সব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়েও চলা যায় না। তবে সাধারণতঃ যে শব্দটা আমরা ব্যবহার করি, তা’র একটা অন্তর্নিহিত অর্থবোধ থাকা উচিত। মানুষ যখন তা’র নিজের চাইতে আরও বড় শক্তিশালী কোনও বস্তুতে বিশ্বাস করে, তখন সেই বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হ’য়ে সে যে কাজ করে, তার হয় তা’র কাছে ধর্ম। এ’সম্বন্ধে Dr. Flint বলেছেন —“Religion may be defined as man’s belief in a being or beings mightier than himself and inaccessible to his senses, but not different to his sentiments and actions, with the feelings and practices which flow from such belief.”

যখনই মানুষ তা'র এই বিশ্বাসের অনুবর্তী হ'য়ে যথারীতি কাজ আরম্ভ করে, তখনই তা'র মধ্যে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর রূপ প্রকাশিত হয় এবং ইহ জগতের বাহিরে ভগবান্ ব'লে যে একটা বস্তু আছেন, তা'র প্রতীয়মান হয়।

আজকাল বিজ্ঞানের যুগে অনেকেই বিশ্বাস করেন না—'ধর্ম' বা 'ভগবান্' ব'লে কোনও কিছু আছে। বিজ্ঞান আধুনিক সমাজের উপর এতখানি প্রভাব বিস্তার ক'রেছে, যা'র জন্মে আমরা দিনের পর দিন ধর্মের চিন্তা কাটিয়ে এগিকে চলেছি। অনেকে ধারণা করেন ঈ'দের কোন কাজ নাই, ঈ'রা ধন-সম্পত্তিহীন এবং ঈ'রা বার্ককো প'ছচ্ছেছেন। তাঁরাই কেবল ধর্ম-ধর্ম করেন। আধুনিক সমাজ আরও মনে করেন, ধর্মটা বিলাস মাত্র। আজকালের আমরা সবাই 'বিত্তের' উপাসক। বর্তমান যুগের ভগবান্ যেন 'অর্থের' মনো রূপ নিয়েছেন। অর্থই ধর্ম আর অর্থই ভগবান্ ! যদি কখনও সারাদেশব্যাপী দারিদ্র্য আসে, তা' হ'লে তা' দূর করবার জন্মে সে-স্থানে বিজ্ঞানের সাহায্যে উৎপন্ন বেশী করা যে'তে পারে এবং সমান বস্তুনের ব্যবস্থা ক'রে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে—তা'র জন্মে ভগবানের আশ্রয় নিতে হয় না। অনেকে বলেন,—মন্দিরই হ'উক বা গির্জাই হ'উক বা মসজিদই হ'উক, এ'গুলো করবার অর্থ হ'চ্ছে নায়ে নায়ে সবাই মিলিত হ'য়ে আমাদের স্থাপত্য শিল্পের উন্নতি দেখে আনন্দ করা। এ'ছাড়া আর কিছুই নয়। ধর্ম কিছুই নয়, এটা একটা অন্ধ-বিশ্বাসমাত্র। বেশ কিছুদিন আগে আমরা দে'খেছি—সোভিয়েট রাশিয়া তাঁ'দের দেশে বড় বড় সভা ক'রে ভগবান্ বা ধর্ম যে নিছক মিথ্যা এবং তা'র জন্মে যে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নাই—এটা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

ডারউইন্ থেকে আইন্সটাইন্ পর্য্যন্ত সবাই বুঝিয়ে দিয়েছেন—এই জগৎটা শুধু একটা Evolution মাত্র। এতে 'Superior than any animate objects' এর কোন হাত নেই—ওটা নিছক কল্পনা মাত্র। ভগবান্ আমাদের আলো দিচ্ছেন না,—দিচ্ছে সূর্য। পৃথিবীতে আফ্রিক গতির ফলে দিন-রাত্রি হ'চ্ছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, কোন দেশ যদি বিজ্ঞানে উন্নতি করতে পারে, আর Socialist-Economy adopt করে, তা'হলে তা'দের আর কোনও অভাব থাকতে পারে না। রাশিয়া, জার্মানী, চীন প্রভৃতি দেশ তা'র উচ্চতম নিদর্শন। উক্ত নাস্তিকা চিন্তার এবং পূর্বে ভারতীয় দার্শনিকদের

মধ্যে চার্কাক্ যা' ব'লেছেন—তা' পাশ্চাত্য-ভাষায় এইরূপ—“The world is made by the automatic combination of the material elements and not by God. It is foolish therefore to perform any religious rite either for enjoying happiness after this life in heaven or for pleasing God.”

চার্কাকের মতে ভগবান্ ব'লে কোন বস্তুই নাই। ধর্ম করার কোনও প্রয়োজন নাই। খা'রা করে তা'রা বোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁ'র মতের মূল-সূত্রই হচ্ছে—Eat, drink and be merry.”—ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভালভাবে পান করা এবং আনন্দ করাই জীবনের মূল উদ্দেশ্য। এ'ছাড়া আর কোনও মুখ্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। অতএব ভগবান্ এ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা—এ'ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এবং এ'জগৎ মানুষের পক্ষে কোনও কিছু করণীয় আছে তা' ধারণা করা অন্যায়।

‘জৈন’-ধর্মের মতে—ভগবান্ ব'লে কোনও বস্তু নাই, কারণ ভগবান্ প্রত্যক্ষ বস্তু ন'ন। যাঁকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় না, তাঁ'র কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। বৌদ্ধধর্মের মতে প্রত্যেকটি জিনিষই পরিবর্তনশীল। অতএব চিরস্থায়ী কোন বস্তু থাকতে পারে—এ বিশ্বাস তাঁ'দের নাই, “All things are conditional; there is nothing that exists by itself. All things are therefore subject to change; owing to the change of the conditions on which they depend, nothing is permanent. There is, therefore, neither any Soul nor any God, nor any other permanent substance,” কর্মই সমস্ত, মানুষ তা'র নিজ-কর্মফলের জন্য জন্ম লাভ করে। তা'র কোন সৃষ্টিকর্তা নাই। বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমিকদের মতে এ'জগৎ সমস্তই অসার। অতএব ভগবান্ ব'লে কোনও বস্তু যদি আছেন—মনে করা যায়, সেটা ভ্রম। সাংখ্য-দর্শনেও দেখি, অনেকে বলেন ভগবান্ আছেন। আবার অনেকে বলেন, ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন নাই। পূর্বমীমাংসা-দর্শনের মত—জৈনদের মত প্রায়।

এই ধরনের বিভিন্ন সমস্যা'র সম্মুখীন হ'য়ে মানুষকে ভাবতে হয়—সত্যিকার ধর্ম বা ভগবান্কে বাদ দিয়ে কি মানুষ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? যদিও ধর্ম বা ভগবানের দ্বারা বাহ্যিক জগতে কোনও কাজ হয় না, তাই ব'লে এই ভাবনাকে মানুষ বন হ'তে নাস্তিকের ন্যায় ত্যাগিলাভের উড়িয়ে দিতে পারে

না—মানুষ ভগবান্কে বাদ দিয়ে বাঁচতে পারে না এবং এ'জগৎ একটা "Internal moral order"—এ চ'লছে—এ' বিশ্বাস করতেই হ'বে। পাশ্চাত্য দার্শনিক উইলিয়াম্ জেম্‌স্ বলেছেন, "Spiritualism means the affirmation of an eternal moral order... ." "The need of an eternal moral order is one of the deepest needs of our breast. And those poets like Dante and Wordsworth who live on the conviction of such an order, owe to that fact the extraordinary tonic and consoling power of their verse." ভারতীয়দের দৈনন্দিন কৃত্যকর্মসমূহ ধর্মের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে একমাত্র চার্বাক্ ছাড়া আর সকলেই প্রায় অল্পবিস্তর ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

ন্যায়-দর্শনের মধ্যে আমরা ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বহু উদাহরণ পাই। সবচেয়ে পেরা কথাটা—এ'জগতে যা'কিছু হ'চ্ছে সেগুলি সমস্তই Effect. এই Effect-এর Cause আছেই। মানুষ জগতের "কারণ" হতে পারে না, কেননা, মানুষের জ্ঞান বা শক্তি সীমাবদ্ধ। অতএব পৃথিবী মানুষের চাফেতে বুদ্ধিমান কোনও শক্তিদ্বারা গঠিত। মানুষ যদি নিজের ইচ্ছার দ্বারা সব কিছু করতে যায়—তাকে যদি কেউ না সাহায্য করে, তবে সে নিশ্চয়ই ভাল-মন্দ স্থির করতে না পেরে নিজের ক্ষতি ক'রে ফেলবে। এইভাবে তা'র মুক্তিও অসম্ভব হ'বে। ভগবান্‌ই সর্বনিয়ন্তা যিনি মানুষকে এই বিচার-বুদ্ধি দেন। মানুষের শক্তি যখন সীমাবদ্ধ, তখন 'অসীম বস্তু'-শক্তির প্রভাবেই এ'পৃথিবী সৃষ্ট এবং ন্যায়শাস্ত্র সেই অসীম বস্তুকেই ভগবানের রূপ দিয়েছেন।

যোগ-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা পাতঞ্জল বলেন,—কর্মের মধ্য দিয়ে ধর্ম এবং ধর্মের মধ্য দিয়ে ভগবান্কে পাওয়া যায়। ভগবান্‌ই হ'চ্ছেন শ্রেষ্ঠ বস্তু, সেই শ্রেষ্ঠ বস্তুতে মনকে নিযুক্ত করলে মানুষ মুক্ত হ'তে পারে। অনেক দার্শনিকই বলেন,—প্রকৃতি-পুরুষের সংযোজনে পার্থিব সমস্ত কিছুই উৎপত্তি; কিন্তু যোগদর্শনের সত্যাবলম্বীরা বলেন—সংযোজনের জন্য সংযোজক দরকার। এই সংযোজকই ভগবান্ ছাড়া কেউ হ'তে পারেন না। বেদান্ত-দর্শনে আমাদের অনেক কিছুই ব'লেছেন। বেদান্ত-দর্শনের বহু ভাষ্যকারের মধ্যে এতুলে শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজের কথা বলছি। শঙ্করাচার্য্য 'ভগবান্‌ আছেন' মৌখিক স্বীকার করলেও 'মায়া' কথাটির উপর জোর দিয়েছেন। ভগবান্‌ যত্নকর ছাড়া

অন্য কিছু ন'ন, মায়া'র দ্বারা তিনি পৃথিবী পরিচালন করেন। ভগবান্ সন্তান
কি নিষ্ঠুর ব্রহ্ম—তা' আমরা অবিচার জন্য বুঝতে পারি না। কিন্তু রামানুজ
বলেছেন—“God is the only reality”—ভগবান্ নিজেই এ'জগৎ সৃষ্টি
ক'রেছেন। এই জগৎ তাঁর বাহ্য-শরীর। ‘মুক্তি’ অর্থে ভগবানের-সাক্ষাৎ
সেবা লাভ। মায়া'র বশে মানুষ অন্ধ হয় এবং এই অন্ধ-ভাবে'র জন্য ও কৃত-
কর্মের জন্যই মানুষকে পুনর্জন্ম লাভ করতে হয়। ভগবানকে ভক্তি দিয়েই
পাওয়া যায়। ভক্তিই হ'চ্ছে আসল জিনিষ। এই ভক্তিই একমাত্র ধর্ম
এবং এই ধর্মের বিশেষ প্রয়োজন।

ভক্ত রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভক্ত মধ্বাচার্যের শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ, ভক্ত
নিম্বার্কাচার্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং ভক্ত বিষ্ণুধামার শুদ্ধাদ্বৈতবাদের মিলন
করেন ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীচৈতন্যদেব শিক্ষা দিলেন—ভক্তি বা প্রেমের
দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যায়। দার্শনিক জগতে চৈতন্যদেব এক বিরাট
পরিবর্তন এনে দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন ‘অচিন্ত্যভেদাভেদ’-এর উপর
প্রতিষ্ঠিত। ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রদ্বার দ্বারাই ভক্তি, প্রেম ও ভগবানকে
লাভ করা যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিক Kant, Flint, Martine প্রভৃতিও
ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্ধিহান।

St. Paul বলেছেন,—“Through faith we understand that
the heaven and the earth were made by God.” শ্রীচৈতন্যদেব
বলেছেন—God can be known through faith. শাস্ত্রে ও মহাজন-
বাক্যেও আমরা জানিতে পারি—“বিধানে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর”।

বিজ্ঞান মানুষেরই সৃষ্টি, কিন্তু মানুষকে বিজ্ঞান সৃষ্টি করতে
পারে না। জন্ম-মৃত্যুর সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কোন হাতই নাই। মানুষ যখন
তা'র উন্নতির চরম সীমায়, তখনও দেখা যায়—সে অসুখী। কেন এমন হয় ?
কেউ উত্তর দিতে পারে না। তাই আমরা দেখি, আমেরিকানরা বেদান্তকে
খুব শ্রদ্ধা করে। বেদান্তের আলোচনা ক'রে তা'রা আনন্দ পায়। প্রসিদ্ধ
কবি Goeth বলেন,—‘The soul of man is like water, from
heaven it cometh, to heaven it riseth’ Wordsworth তাঁর
‘Immortality ode’এ একথা স্বীকার ক'রেছেন।

মানুষ তাঁর দৈনন্দিন জীবনে খাওয়া-পরা'র চিন্তা নিয়েই থাকতে পারে না।
Struggle for existence is the rule of life—সত্যিই কিন্তু ইহা

মানুষের 'বাহির'কে আশ্রয় ক'রে। কিন্তু 'বাহির' ছাড়াও মানুষের আর একটা বস্তু আছে, তা' তার 'অন্তর'। ভগবানের সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অবশ্যই বর্তমান।

যাঁরা যোগী তাঁদের আমরা বেশ প্রশান্ত দেখি। তাঁরা শুধু খাওয়া-পরা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন না। তাঁরা শুধু ক্ষুদ্র গুণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ থাকলে সুখী হ'তে পারেন না। তাঁরা বিরাট অনন্তের সন্ধান লইবার সুযোগ গ্রহণ করেন। অস্থির চিত্তকে শান্তি দিতে হ'লে স্থির বস্তুর প্রার্থনা দরকার। সেই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মানুষ ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করতে পারে। আধুনিক সমাজ ভগবান বা ধর্মকে বাহ্যিকভাবে এড়াইলেও অন্তর থেকে মুছে ফেলতে পারে না। বাঁচার জন্য যেমন বাহ্যিকভাবে খাওয়া-পরার প্রয়োজন, তেমনই অন্যদিকে পরমাত্মার সঙ্গে জীবন্মুখের সম্বন্ধের দরকার। আধুনিক সমাজ যাই করুন না কেন, ধর্মের যে একটা বিশিষ্ট প্রভাব আছে, তাঁকে যৌথিক স্বীকার না করলেও প্রকারান্তরে স্বীকার করতে বাধ্য হ'ন।

অনাদি কাল হ'তে যেমন কেউ ভগবানের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে পারেন নাই, অনন্ত কাল পর্যন্ত তা' কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। জাগতিক মনুষ্যসকলের আত্মাসমূহের সঙ্গে পরমাখ্যার যে সূক্ষ্ম সম্বন্ধ আছে, তা' সর্বতোভাবে স্বীকার্য। (ক্রমশঃ)

—শ্রীকৃষ্ণদাস রায়

শ্রীগুরুসেবা

অনাদি কাল হইতে ভগবদ্বহির্মুখ জীব পূর্বজন্ম বা বর্তমান জন্মের সৌভাগ্যবশতঃ ভগবৎসেবায় উন্মুখ হইতে ইচ্ছা করেন; তখন তাঁহার পরিপূর্ণ উন্মুক্ততা-বিশিষ্ট সাধু-গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়। কারণ গুরু ব্যতীত কোন কাৰ্য্যই শিক্ষা করা যায় না। অনিত্য সাময়িক প্রাকৃত কার্য্যও যখন গুরুর প্রয়োজন হয়, তখন অনাদি কাল হইতে যাহার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক হয় নাই এবং নিত্যকাল একমাত্র যাহার সঙ্গেই আমার সম্পর্ক সেই ব্রহ্মাদি দেবতাদেরও হুল্লভ বস্তুকে লাভ করিতে হইলে তদভিজ্ঞ গুরুর আশ্রয় অবশ্যই প্রয়োজন। জীবের স্বতঃসিদ্ধ ভগবজ্জ্ঞান নাই। তাই পরম-করুণাময় ভগবান্ নিজ সন্তানগণের হৃদয়ে হুঃখী হইয়া সাধু, গুরু, শাস্ত্ররূপে ইহ জগতে প্রকটিত হ'ন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন,—

মানুষ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান ।

জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥

শাস্ত্র-গুরু-আশ্র-রূপে আপনারে জানান । (টৈঃ চঃ মঃ ২০।১২২-১২৩)

জীব মান্বামুখ হইয়া কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইল দেখিয়া অপার করুণাময় কৃষ্ণ দেব-পুরাণ-শাস্ত্র করিয়া সেই শাস্ত্ররূপে ও শাস্ত্রার্থ-প্রদর্শক গুরু ও অন্তর্যামী আশ্র-রূপে জীবকে নিজ-তত্ত্ব অবগত করান । কারণ বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র থাকিলেও নিজে নিজে তাহা হইতে জ্ঞান লাভ করিবার মত সামর্থ্য জীবের নাই । তাই ভগবান্ শাস্ত্র-প্রদর্শন গুরুরূপে এবং অন্তর্যামীরূপে জগতে প্রকটিত হ'ন ।

যাঁহার পরম মঙ্গলদায়ক একমাত্র অকৃতভয় পথ শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম যাজন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীগুরুর পাদপদ্ম অবশ্যই আশ্রয় করিবেন । শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, — “আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ ।” প্রথমেই গুরু-পাদাশ্রয় । শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রোত-পারম্পর্য্যে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতেই শ্রীভাগবত-ধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যায় । শরণাগতি-দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তি হইলেও যাঁহারা বৈশিষ্ট্য লাভেচ্ছ, তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের সেবা অবশ্যই করিবেন । এদ্বন্দ্বেরে শ্রীল জীবগোস্বামী-প্রভু তাঁহার শ্রীভক্তি-সদর্ভে এইরূপ বলিয়াছেন—

শরণাপত্তৌব সর্ব্বং সিদ্ধতি—“শরণং তং প্রপন্না য়ে ধ্যানযোগ-বিবর্জিতাঃ ।
তে বৈ মৃত্যুমতিক্রম্য যান্তি তদ্বৈষ্ণবং পদম্ ॥” ইতি গারুড়ায়, তথাপি
বৈশিষ্ট্যালিপ্সুঃ শক্তশ্চেৎ ততঃ ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেক্ষু নাং ভগবন্মন্ত্রোপদেক্ষু নাং বা
শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যম্বেব বিশেষতঃ সেবাং কুৰ্য্যাৎ । তৎপ্রসাদো ধ্বংস নানা-
প্রতীকারহুন্ত্যজানর্থহানৌ পরমভগবৎপ্রসাদসিকৌ চ মূলম্ । পূর্ব্বত্র যথা সপ্তমে
শ্রীনারদবাক্যম্ (ভাঃ ৭।১৫।২২-২৫)—

অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামঃ, ক্রোধং কামবিবর্জনাৎ ।

অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং, ভয়ং তদ্ভাবমর্শনাৎ ॥

আহিংসিক্যা শোকমোহৌ, দম্ভং মহদ্ভূতপাসয়া ।

গোপান্তরায়ান্ মোদেন হিংসার কামাত্তনৌহয়া ॥

রক্তস্তম্ভশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বকোপশমেন চ ।

এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হৃজসা জয়েৎ ॥

“যাঁহারা ধ্যানযোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা মৃত্যু অতিক্রমপূর্ব্বক ‘বৈষ্ণবপদ’ লাভ করিয়া থাকেন ।” এই গারুড়পুরাণ-

বাঁকানুসারে শরণাগতিদ্বারাই সমস্ত সিদ্ধ হয়, তথাপি বৈশিষ্ট্যলাভেচ্ছ পুরুষ সমর্থ হইলে সর্বদাই বিশেষভাবে ভগচ্ছান্দ্রোপদেশক বা ভগবান্দ্রোপদেশক শ্রীগুরুর সেবা করিবেন। যেহেতু তাঁহার অনুগ্রহই নিজের বিবিধ প্রতিকার-দ্বারা ভূম্পরিহার্য্য অনর্থসমূহের নিবৃত্তি এবং ভগবানের পরমাত্মগ্রহ-বিষয়ে মূলস্বরূপ।

শ্রীগুরুকৃপা দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি-বিষয়ে সপ্তম দ্বন্দ্ব শ্রীনারদ-বাক্যও এইরূপ, যথা—“অসঙ্কল্পদ্বারা কামের জয় করিবে। এইরূপ কাম-পরিত্যাগদ্বারা ক্রোধ, অর্থনির্ধ-বিচারদ্বারা লোভ, তত্ত্ববিচার দ্বারা ভয়, আত্মানন্দ-বিবেকজ্ঞান দ্বারা শোকমোহ, মহাপুরুষ-সেবাদ্বারা দম্ভ, মৌনদ্বারা যোগের অন্তরায়সমূহ, কামাদি-চেষ্টা-রাহিত্যদ্বারা ঈর্ষা, কৃপাদ্বারা ভূতজন্য হুঃখ, সমাধিদ্বারা দৈব-হুঃখ, যোগবলদ্বারা আধ্যাত্মিক হুঃখ, সত্ত্বগুণের সেবাদ্বারা নিদ্রা, সত্ত্বগুণদ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণ এবং উপশমদ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করিবে। পরন্তু পুরুষ একমাত্র গুরুভক্তিদ্বারা পূর্বোক্ত সমস্তকেই সহস্র জয় করিতে সমর্থ হ'ন।”

এখানে দুইটি বিষয়ে বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য—একটি ‘দুস্ত্যজানর্থহানৌ,’ অপরটি ‘পরমভগবৎপ্রসাদসিদ্ধৌ চ মূলম্’। যে-সব অনর্থ নিজের শত শত চেষ্টায়ও দূর করা যায় না, তাহা কেবল শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাদ্বারাই অনায়াসে এবং নিজের অজ্ঞাতসারে দূর হইয়া যায়। ভগবানের পরম অনুগ্রহের মূল-স্বরূপ হইল ‘শ্রীগুরুসেবা’। যাহারা শ্রীভগবানের কেবল কৃপা নয় বিশেষ কৃপা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীগুরুসেবাদ্বারাই তাহা লাভ করিতে পারিবেন; অন্য উপায়ে নহে। আর শ্রীভগবানের কৃপা সাধু-গুরুর আকারেই এজগতে আসেন। ভগবান্ সাধারণতঃ নিজে কাহাকেও কৃপা করেন না, সাধু-গুরুরূপ নথৈই তাঁহার কৃপা ইজগতে বর্ষিত হয়। তাই তাঁহার একটী নাম ‘সদানুগ্রহ’। যাহারা ভগবান্কে অহৈতুকভাবে প্রীতি করিতে ইচ্ছা করেন এবং নিজেও তাঁহার প্রীতি বা মেহ কামনা করেন, তাঁহারা অনায়াসে শ্রীগুরুসেবা-দ্বারাই তাহা অনায়াসে লাভ করিতে পারিবেন। যাহারা সাধুসঙ্গ-প্রভাবে ভজনে প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই শ্রীগুরুপাদপদ্মাত্ম্য করিবেন। (ক্রমশঃ)

গৌড়ীয়ের পঞ্চত্রিংশ বর্ষ

রাজনীতি ও স্বাধীনতার পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা পঞ্চত্রিংশ-বর্ষে শুভ পদার্পণ করিলেন। সুদীর্ঘ এক বর্ষের মধ্যে ভারত, তথা সমগ্র পৃথিবীর ঘটনাবলি বহু পরিবর্তন-পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইয়াছে। বিগত বর্ষ “রাজনৈতিক-জটিলতাময় দুর্যোগপূর্ণ বৎসর” বলিয়া ভারতের চিন্তাশীল মনীষী ও সুবীসমাজ উল্লেখ করিয়াছেন, দেখিতে পাই। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান কোনদেশে আংশিকভাবে সফল হইলেও, ভারতের পক্ষে তাহার সফলতা সুদূরপরাহত। আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা, একদেশ-দর্শী নীতি, দলীয় সুবিধাবাদ, মতানৈক্য, ক্ষমতাবিকারের প্রতিযোগিতা কখনই সুফল প্রসব করে না। ব্যাপক বিশৃঙ্খলতা ও নৈরাজ্যের মধ্যে দেশের নানা পরিকল্পনা ব্যাহত হয়। আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, জনবিক্ষোভ জটিলতার সৃষ্টি করে। বহিঃশত্রুর আক্রমণাত্মক দৃষ্টি দেশে-বিদেশে আশঙ্কা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৈদেশিক অর্থনীতি ও বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। স্বার্থপরতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, আত্মঘাতী-নীতি, প্রতিহিংসা, বিবেক-বুদ্ধিহীনতা মানুষকে বিভ্রান্ত ও অধোগামী করে। রাজনৈতিক দল্যদলি, সহাবস্থাননীতি ও বস্তুবিধির দোষত্রুটি সাধারণ শান্তিপ্ৰিয় মানুষকে সাম্য-স্বাধীনতা-মৈত্রীভাব হইতে দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক এক অস্বস্তিকর অনিশ্চয়তার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। জাগতিক সকল প্রচেষ্টাই দোষ-ত্রুটিযুক্ত ও তাহাতে বিবিধ সমস্যার সমাধান ও শান্তিলাভ সম্ভবপর নহে, ইহা জানাইবার জন্তই পরচুঃখচুঃখী শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা জীবকল্যাণের নিমিত্ত সর্বদা চেষ্টা-বিশিষ্ট।

পারমার্থিক শ্রীপত্রিকার নীতি ও আদর্শ

শ্রীপত্রিকা নিত্যলীলাপ্রবিশিষ্ট ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ-প্রবর্তিত ও আশীর্ব্বাদপুষ্ট হইয়া শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ কর্তৃক সম্পাদিত এবং শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকেন। দেবীধামে মায়াবদ্ধ জীবগণের আকাঙ্ক্ষিত জড় বিষয়কথা-পরিপূর্ণ পত্র-পত্রিকার হস্ত হইতে

পরিব্রাণের জগুই পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ এই পারমাথিক পত্রিকা প্রবর্তন করিয়াছেন। শ্রীপত্রিকার সম্পাদক ও লেখকগণ বেতনভুক্ত ও আচারহীন প্রচারক নহেন; শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবায় সমর্পিতা একনিষ্ঠ সেবকগণের দ্বারাই ইহা পরিচালিত। জগদগুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের সময় বাংলা ভাষায় দৈনিক নদীয়া প্রকাশ, সাপ্তাহিক-পার্বক্ষিক “গোড়ীয়-পত্র”, হিন্দী-মাসিক “ভাগবত”, উৎকল ভাষায় মাসিক “পরমার্গী”, অসমীয়া ভাষায় মাসিক “কীর্ত্তন” প্রভৃতি সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের দ্বারে দ্বারে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমের বাণী বিতরিত হইয়াছে। অচৈতন্য বিশ্বে শ্রীচৈতন্যশিক্ষাগৃহ বিতরণের দ্বারা মায়াবাদ-নাস্তিক্যবাদ বিদূরিত করিয়া পরমার্থের সেবানুকূলে ঐজ্ঞান-শিল্প-কলা-সাহিত্যের সদ-ব্যবহারের বিষয় জানাইয়াছেন।

জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের মনোহরীষ্ট পুরণে বিশ্রান্তসেবা

প্রেমাবতারা শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাভূমি বোলক্রেণ্ড শ্রীনবদ্বীপধাম-নবধা ভক্তির পীঠস্থান। অষ্টদল পদের ন্যায় কণিকার আত্মনিবেদনাখ্য অন্তরীপ শ্রীমায়াপুর, তাহার চতুষ্পার্শ্বে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির পীঠস্থান-স্বরূপ অপর ৮টী দ্বীপ অবস্থিত। তন্মধ্যে পাদসেবনাখ্য অপরাধভঞ্জনর পাট কোলদ্বীপ বা কুলিয়ায় শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি অবস্থিত। জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের মনোহরীষ্ট ছিল—১টী দ্বীপেই শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্র—মঠ-মন্দিরাদি স্থাপিত হইয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ববিবকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা-পূজা প্রচলিত হউক। তাঁহার অতীট বাস্তবে রূপায়িত করিবার জগুই অসমদীয় শ্রীগুরুপাদপদ পাবণ্ড-গজৈকসিংহ আচার্য্য-কেশরী নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ বিশুদ্ধ-গোড়ীয়-বিরোধী মহাজিয়া গৌরনাগরী, স্মার্ত্তকুল-অধ্যুষিত এই নবদ্বীপ-সহরে মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন করেন। শ্রীধামে অপ্রাকৃত ধামবাসিগণই অবস্থান-পূর্বক তাঁহার সেবার অধিকারী, তথায় ধামাপরাধী দুর্জ্জনগণের কোন স্থান নাই বা থাকিতে পারে না। শ্রীধামের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যরাশি উল্লুকের আয় তাঁহাদের কখনই দর্শনের বিষয়ীভূত বস্তু নহে। “দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উল্লুকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥”, আবার “অতাপিহ সেই লীলা করে গোরাবায়। কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥”—আলো-অন্ধকার, সজ্জন দুর্জ্জন চিরদিনই পাশাপাশি অবস্থিত।

প্রেমাবতারীর দেশে হিংসা-মাৎসর্য্য-হিংসা কেন ?

প্রেমাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হিংসা-মাৎসর্য্য-নিপীড়িত জনসমাজকে অখিল লোকশিক্ষারূপে শ্রীনাম-প্রেম বিতরণোদ্দেশ্যে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুদেহ পরমদুর্ম্মতি জগাই-মাধাইকে উদ্ধারপূর্ব্বক তাহাদিগকে ‘পতিতপাবন’ করিয়াছিলেন।—“পরম দুর্ম্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল, তারা হইল পতিতপাবন।” এবে তান্ন না ধরিল, প্রাণে কারো না মারিল, চিত্তশুদ্ধি করিল সবার।” সেই প্রেমের ঠাকুর শ্রীগোরার দেশে আজ মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি লক্ষ্য করিয়া স্বদেশে-বিদেশে বহুপ্রকার সমালোচনা হইতেছে শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ প্রচারক্ষেত্রেই তবাক হইয়া এসম্বন্ধে বহুবিধ প্রশ্ন করিয়া বসেন ও ইহার মীমাংসা প্রার্থনা করেন। আমরা প্রবন্ধের প্রথমেই আলোচনা করিয়াছি যে, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি পরস্পর বিরুদ্ধবাদী। সার্থক রাজনীতিদ্বারা সমাজ ও প্রজাবর্গের কল্যাণ সম্ভব। দলীয় বা গোষ্ঠীভুক্ত রাজনীতিদ্বারা কোন বিশেষ দল কথঞ্চিৎ উপকৃত হইতে পারে কিন্তু তাহা কখনই বৃহত্তর সমাজগোষ্ঠীর পক্ষে কোন দিনই মঙ্গলদায়ক নহে। স্নেহ-মমতার দ্বারা বনের হিংস্র প্রাণিগণকেও বশীভূত করা যায়, কিন্তু মানুষ কি এমনই পশু বা পশুাধম যে, হিংস্রাশ্রয়ী হইয়া বন্দুকের নলের দ্বারা তাহাকে বশে আনিতে হইবে। কূটনীতি বা রাজনীতিতে শেষ সম্বল বা উপায় হিংস্রভাব, কিন্তু “অর্থশাস্ত্রাস্তু বলবত্তরং ধর্ম্মশাস্ত্রম্”—“মা হিংসাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি” ইহাই ধর্ম্মনীতির আদর্শ ও লক্ষ্য। তথাপি “নুনং নানামদোরদ্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ” অর্থাৎ ধনগর্ব্বোন্মত্ত দুর্জ্জনগণ কখনও শান্তি কামনা করে না, লণ্ডভেদ দ্বারা পশুগণকে সংযত করিবার ল্যায় দণ্ডই অসামুগ্ধের শাস্ত ভাব আনয়ন করিয়া থাকে—এইরূপ উল্লি উভয়ক্ষেত্রে প্রযুক্ত কিনা, তাহাও বিচার্য্য; অবশ্য সাম, দাম, ভেদ, বিগ্রহ—রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয়।

জনকল্যাণমূলক সরকারী অনুষ্ঠানে ধার্ম্মিকগণের ভূমিকা

গত ২রা মাঘ ১৩৮৯, ১৬ই জানুয়ারী ১৯৮৩, রবিবার—নবদ্বীপ-সহরের দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার “গৌরান্ধসেতু” উদ্বোধন করেন। ইহার কিছুকাল-পূর্ব্ব “চৈতন্যসেতু”ও চালু হইয়াছে। মাননীয় সরকার বাহাদুর “গৌরান্ধ সেতু” জন্মসাধারণের জন্ত উন্মুক্ত করিয়া দেওয়ায় ভারতের অগ্রাগ্র

প্রদেশের সহিত কৃষ্ণনগর হইয়া কলিকাতার সোজাসুজি সংযোগ রক্ষিত হইল। সেতু উদ্বোধনের পরই এইদিনে কৃষ্ণনগর হইতে সর্বপ্রথম একখানি ‘মোটরকার’ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাজ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর দর্শনান্তে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন। মাননীয় পূর্তমন্ত্রী মহাশয় বলেন,—‘এই সেতুর দুইদিকে শ্রীগৌর ও নিত্যানন্দপ্রভু অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রোতৃবৃন্দের নিকট বিনোদ নিবেদন, তাঁহারা যেন শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের আদর্শ অনুসরণ করেন, পূর্ব জীবনের উচ্ছৃঙ্খল জগাই-মাধাইএর অনুকরণ করিলে দেশের সকল উন্নয়ন অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। আমাদের এতৎপ্রসঙ্গে প্রশ্ন ও বক্তব্য এই যে, স্থানীয় বিশিষ্ট ধর্ম প্রতিষ্ঠানের সুধী-সজ্জনগণকে এব্যাপারে আহ্বান না করা কি যুক্তিযুক্ত হইয়াছে? অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিন্দ ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তক্লিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ, ব্রহ্মচারি-অবস্থায় শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের নিকট মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থানকালে বহু জনহিতকর সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। তিনি জেলা বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড, স্যানিটারী হেলথ-বোর্ড প্রভৃতির সদস্য ও সভাপতি ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছা—‘প্রশাসন ও বিচারবিভাগে নিঃপার্থ ত্যাগী সাধুগণ থাকিলে দেশের কল্যাণ ইহা তিনি বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছিলেন। “Sadhus are the parasites of the Society”—কেন্দ্রীয় সরকারের সাধু-সন্ন্যাসি-নিয়ন্ত্রণ আইনের অবিবেচনা প্রসূত হস্ত-ক্ষেপের কঠোর প্রতিবাদ, সমালোচনাদ্বারা তিনি উহা বন্ধ করেন। আত্মবলে বলীয়ান সাধু-সন্ন্যাসিগণই বাস্তবসত্য প্রচার ও নীতি আদর্শ সংরক্ষণে সমর্থবান্; তাঁহাদিগকে বাদ দিলে নিরীশ্বর নৈনৈতিক সমাজের অস্তিত্ব ও মঙ্গল কোথায়?’

বল্লাল-ডিপি খননে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের প্রাচীন

ঐতিহাসিক আবিষ্কার

মাননীয় সরকার বাহাদুরের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ (Archaeological Department) পুনরায় বল্লাল ডিপি খনন-কার্যে অগ্রসর হইরাছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত ও উৎসাহিত হইতেছি। ইহা দ্বারা প্রাচীন স্থাপত্য-শিল্পকলা-সাহিত্য-সভ্যতা সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত বিষয় আবিষ্কৃত হইবে।

নবদ্বীপ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেন-বংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। এখনও এখানে বল্লালসেনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ‘বল্লালদীঘি’ ও ইহার উত্তরে ‘বল্লাল টিপি’ নামে বল্লালসেন রাজার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। মালদহের প্রাচীন ‘গোড়’ হইতে উক্ত রাজগণ নবদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করায় এখানেও ‘গোড়ভূমি’ নামে পরিচিত। কিছুদিন পূর্বের এই ধ্বংসস্তূপের মধ্য ইহতে কাষ্ঠনির্মিত দ্রব্যাদি, ভগ্নসিন্দুক, জীর্ণশাল পশমী-পোষাকের ছিন্নাংশ ও কিছু রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায়। এইস্থান বর্তমানে সরকার বাহাদুর কর্তৃক রক্ষিত। ‘আইন-ই-আকবরী’তে লিখিত আছে— প্রাচীননগর নবদ্বীপ ১০৬, খৃষ্টাব্দে সেনবংশীয় নৃপতিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় ও লক্ষ্মণ সেনের সময়নবদ্বীপ-নদীয়া বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। সেন-বংশীয় প্রথম রাজা বিজয়সেন দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া গোড়াধিপতি হন। বিজয়ের পুত্র বল্লাল সেন, বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন।

সেনবংশীয় রাজগণের মধ্যে বল্লালসেনই প্রসিদ্ধ। আদিশূর যেরূপ কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনাইয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, বল্লাল সেনও সেইরূপ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, বৈজ্ঞ ও কারস্থদিগের মধ্যে কোলীজ্ঞপ্রথার সৃষ্টি করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন; ‘দান সাগর’ ও ‘অদ্বুত সাগর’ নামক দুইখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইহারই রচনা। লক্ষ্মণ সেনও সুধী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বহু খ্যাতানামা পণ্ডিত ইহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন। ইহারই সভাকবি থাকিয়া সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীজয়দেব শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক সুস্নিগ্ধ গীতিকাব্য “শ্রীগীতগোবিন্দম্” রচনা করেন। মহাভাববর্ণন শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপ-রামানন্দাদি-সঙ্গে এই শ্রীগীতগোবিন্দাদি প্রত্যহ শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে আশ্বাদন করিতেন,—“চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়েব নাটক-গীতি, কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ। স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে, গায় শুনে—পরম আনন্দ ॥”

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাক্ষণতবার্ষিকী সম্মেলনের বাস্তব

সফলতা লাভের উপায়

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাক্ষণতবার্ষিকী সম্মেলনের উদ্যোগ বহুস্থানে লক্ষ্য করা যাইতেছে। অনেকে ইহা অপরের দেখাদেখি অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। কেহ ইহাকে ব্যক্তি-সমষ্টিগত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার হাতিয়াররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অথিল লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু ও

তৎসঙ্গী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি সত্যই কাহার কত শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে, বর্তমান অনুষ্ঠানে তাহার বাস্তব পরীক্ষা সমুপস্থিত। রবীন্দ্র-জয়ন্তী, গান্ধী-জয়ন্তী, নেতাজী সুভাষ-জয়ন্তী (?) লইয়া আজ কন্মি-জ্ঞানি-যোগিগণ খুব ঘাতামাতি করিয়া থাকেন, পাশ্চাত্যেও উহার আনুকরণিক ভাব-তরঙ্গ উথিত হয়। আজকাল ইহা একটা ফটাইল বা ফ্যাশানে দাঁড়াইয়াছে। “সংসারের পার হই” ভক্তির সাগরে। যে ডুবিলে, সে ভজুক নিতাইটাদেবের ॥ আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥” “এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুই জন। দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥” প্রভৃতি পরারের তত্ত্ব-সিদ্ধান্তপর মর্মানুবাদ কি আমাদের আলোচ্য-বিষয় নহে? সিদ্ধ তোতারাম বাবাজী মহারাজের ভবিষ্যদ্বাণী—“আউল, বাউল, কর্তাভজা, সহজিয়া, সখিভেকী, স্মার্ত্ত, জাতি-গোস্বামী, অতিবাড়ী, চুড়া-ধারী, গৌরান্দ্রনাগরী” প্রভৃতিকে আনুকরণিক দুঃসঙ্গ জানিয়া পরিত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন। “গোরার আমি, গোরার আমি—মুখে বলিলে নাহি চলে। গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল ফলে ॥” —শ্রীল জগদানন্দ প্রভুর “প্রেমবিবর্ত্তে”র এই বচনানুসারে সাধন-ভজন ক্ষেত্রে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের বাস্তবকল্যাণ ও লোকশিক্ষণমূলক সদাচার পালন ও অপ্রাকৃত শিক্ষাসমূহ বাস্তব জীবনে রূপায়িত করাই সকল সভা-সমিতি-সম্মেলনের মূল লক্ষ্য। তবেই শ্রীকৃপানুগ-গোড়ী-বৈষ্ণবগণের সকল উद्यোগ সফলতা লাভ করেও আমরা তাঁহাদের অকুণ্ঠ স্নেহাশীর্ব্বাদ-লাভে ধন্য হইতে পারি।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের কৃপাশীল প্রার্থনা

বর্তমান ৩৫শ বর্ষের শ্রীপত্রিকা তাঁহার প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক-ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী পরমহংস পরিব্রাজকচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্বক্তাপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজকে বক্ষে ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব পূর্ব শ্রীশ্রীগুরুবর্গের লেখনী-নিঃসৃত দার্শনিক প্রবন্ধাবলী শ্রীপত্রিকার গৌরব-বৃদ্ধি করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-স্মৃতি, সাধন-ভজন, আত্মনিবেদন, জড়বাদ-নিরাসপর, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবামূলক প্রবন্ধাদি-দ্বারা শ্রীপত্রিকার অপ্রাকৃত কলেবর পুষ্টিলাভ করিয়াছেন। পরিশেষে আমরা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরান্দ্র-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ ও শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের কৃপা প্রার্থনা করিয়া আমাদের বক্তব্য সমাপন করিতেছি।

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND
PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER
“SHRI GOUDIYA-PATRIKA”

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers
(Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every
Bengali month ie. once in month.
3. Printer's Name—Shri Nabajogendra Brahmachari,
Bhakti-Bandhav.

Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnava.

Address—Shri Devananda Goudiya Math,

Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia). W. B.

4. Publisher's Name—Do
Nationality—Do
Address—Do
5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti
Vedanta Trivikram Maharaj.

Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnava.

Address—Shri Devananda Goudiya Math,

Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

6. Name and address of individuals who won the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the total capital.—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Nabajogendra Brahmachari*, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd./-Nabajogendra Brahmachari,

Dated—29.11.82

Signature of Publisher.

❀	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো বতো ভক্তিরধোকজে ।	❀
ধর্মঃ বিনুষ্টিতঃ পুংসাং বিধক্সেন-কথাষু যঃ	 <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">০ গোঁড়ীয়-পট্টিকা</p>	নোংপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্
❀	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥	❀

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিরশূত ।

অত্ম ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩৫শ বর্ষ	১৭ বিষ্ণু, কারণোদশায়ী, ৪৯৭ গৌরাব্দ ৩০ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৪৪৮/১৯৮৩	২য় সংখ্যা
----------	---	------------

সামুদ্রান্তঃ

শ্রীচৈতন্যশতকম্

[শ্রীমৎ নার্কভৈরব-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতম্]

কনক-মুকুর-কাস্তিঃ চারু-বস্ত্র-রবিন্দঃ
 মধুর-মধুর-হাস্যং পকবিস্বাধরৌষ্ঠম্ ।
 সুবলিত-ললিতাঙ্গং কস্মুকণ্ঠং নটেন্দ্রং
 ত্রিভুবন-কমনীয়ং গৌরচন্দ্রং প্রপদ্যে ॥১৯॥

বাহার অঙ্গ দর্পণের চাখ উজ্জ্বল কাস্তি, মধুর হাস্তযুক্ত মনোহর মুখ-পদ্ম,
 পকবিস্বফলমদূশ নিম্নোষ্ঠ, কোমলাঙ্গ ও শ্যামতুল্য কণ্ঠ, সেই ত্রিভুবন-সুন্দর
 নটরাজ গৌরচন্দ্রের শরণাগত হইতেছি ॥১৯॥

সুদীর্ঘ-সুমনোহরং মধুর-কার্ত্তি-চন্দ্রাননং

প্রফুল্লকমলেক্ষণং দশনপঙ্ক্তি-মুক্তাফলম্

সপুষ্প-নবমঞ্জরী শ্রবণযুগ্ম-সদুষণং

প্রদাপ্ত-মনি-কঙ্কণং কষিত হেম গৌরং ভজে ॥২০॥

বাঁহার সুদীর্ঘ দেহ, সুমনোহর মধুর কার্ত্তি, চন্দ্রবদন, প্রফুল্ল কমলের
ছায় দৃষ্টি, মুক্তাফল তুলা দন্তরাজি ও সপুষ্প নবমঞ্জরীসদৃশ কর্ণযুগল, সেই
মণিকঙ্কণোদ্ভাসিত, সদলঙ্কারযুক্ত, কষিত স্বর্ণকার্ত্তিবিশিষ্ট গৌরকে আমি
ভজন করি ॥২০॥

অখিল-ভুবনবন্ধো প্রেমসিক্কো জনেহস্মিন্

সকল-কপটপূর্ণে জ্ঞানহীনে প্রপন্নৈ ।

তব চরণসরোজে দেহি দাস্যং প্রভো ত্বং

পতিত-তরণ-নাম প্রাচুরাসীদ যতন্তে ॥২১॥

হে অখিল ভুবনের বন্ধো, হে প্রেমের সাগর, হে প্রভো ! এই কপটতাপূর্ণ
জ্ঞানহীন শরণাগত জনে তোমার পাদপদ্মের দাস্য প্রদান কর; যেহেতু
তোমার পতিত-তরণ নাম জগতে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে ॥২১॥

উর্দ্ধকৃত্য ভুজদ্বয়ং করুণয়া সর্বান্ জনানাদিশেৎ

রে রে ভাগবত্যা হরিং বদ বদ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ স্বয়ম্ ।

প্রেম্না নৃত্যতি হস্ততিং বিকুরুতে হা হা রবৈর্ব্যাকুলো

ভূমৌ লুপ্ততি মূর্ছতি অহুদয়ে হস্তৌ বিনিক্ৰিপ্যতি ॥২২॥

শ্রীগৌরচন্দ্র করুণাবশতঃ উর্দ্ধে হস্তদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক, আদেশ
করিতেছেন,—হে ভাগবতগণ ! ‘হরি বল’, ‘হরি বল’। তিনি প্রেমেভরে নৃত্য
করিতেছেন, কখনও বা হা-হা-রবে ব্যাকুলভাবে হুকার করিতে করিতে
ভূমিতে লুপ্তিত হইতেছেন, আবার কখনও নিজ বক্ষে করাঘাত করিয়া
মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছেন ॥২২॥

হরেকৃষ্ণ-রামনাম-গান-দানকারিণীং

শোক-মোহ-লোভ তাপ-সর্ববিশ্বনাশিনীম্ ।

পাদপদ্ম-লুপ্ত-ভক্তবৃন্দ-ভক্তিদায়িনীং

গৌরমুক্তিমাণ্ড নৌমি নাম-সুত্রধারিণীম্ ॥২৩॥

হরেকৃষ্ণ ও রামনাম গান ও দানকারিণী, শোক-মোহ-লোভ-তাপ ও
সর্বব্যাধিনির্দাহিনী, পাদপদ্মধূলোভী ভক্তবৃন্দে ভক্তিদায়িনী ও নাম-
সুধাদায়িনী শ্রীগৌরমূর্তির আমি জ্ঞতি করিতেছি ॥২৩॥

মালতী-মল্লিকা-দামবদ্ধ কুঞ্চিত-কুন্তলম্ ।

ভালোদ্ধান্তলকং গগনত-কুণ্ডল-মণ্ডিতম্ ॥২৪॥

শ্রীখণ্ডাশুকলিপ্তাঙ্গং কনকাস্ত-ভূষিতম্ ।

কামজীর-চরণম্ গৌরচন্দ্রমহং ভজে ॥২৫॥

মালতী-মল্লিকা-মাল্যবদ্ধ কুঞ্চিত বেশদামযুক্ত, ললাটে তিলকাঙ্কিত,
গগনত-কুণ্ডলে বিভূষিত, অশ্রুচন্দ্রনে লিপ্তাঙ্গ, সূৰ্য্য অঙ্গদে অলঙ্কৃত
ও নুপুরাঞ্জিতচরণ শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি ভজন করি ॥২৪-২৫॥

মধুরং মধুরং কনকাভিতনুমরুণাস্বর সংপ্ররিধেয়মহো ।

জগদেকস্তভং সকলৈক পরং করুণাপ্রবণং ভজত পরমম্ ॥২৬॥

মধুর-মধুর সূৰ্য্যসদৃশ দেহ, পবিত্র অকণ্ঠস্বসনধারী, অহো! জগতের
একমাত্র মঙ্গল বিধায়ক ও সর্বশ্রেষ্ঠ করুণার প্রতিমূর্তি শ্রীগৌরচন্দ্রকে ভজন
করি ॥২৬॥

কৃষ্ণরূপং পরিত্যজ্য কলৌ গৌরো বভূব সঃ ।

তং বন্দে পরমানন্দং শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুম্ ॥২৭॥

যিনি কলিযুগে কৃষ্ণরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক গৌরবর্ণ ধারণ করিয়াছেন,
সেই পরমানন্দ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি ॥২৭॥

পীতাংগুলাং পরিত্যজ্য শোণাস্বরধরোহপি যঃ ।

তং গৌরং করুণাসিন্ধুমাশ্রয়ে ভুবনাত্ময়ম্ ॥২৮॥

যিনি পীতবস্ত্র ত্যাগ করতঃ গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছিলেন,
জগতের একমাত্র আশ্রয়রূপ সেই করুণাসাগর গৌরকে আমি আশ্রয়
করি ॥২৮॥

অবতীর্ণঃ পুনঃ কৃষ্ণো গৌরচন্দ্রঃ সনাতনঃ ।

মগ্ন-স্তম্ভভাগ-পাপেহাস্মিন্ তেষাং ত্রিাশ্চ হেতবে ॥২৯॥

যাহারা ত্রিভাগ-পাপে মগ্ন তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণই
পুনরায় সনাতন গৌরচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥২৯॥

অবতীর্ণঃ কলৌ গোরে চাণ্ডালাচ্চাঃ কুজাতয়ঃ ।

যাবন্তঃ পান্নিনচ্চাপি প্রারম্ভো বৈষ্ণবা অমী ॥৩০॥

কলিযুগে শ্রীগৌরহরি আবির্ভূত হইয়া চণ্ডালাদি কুজাতিসমূহ ও
পানিষ্ঠগণ প্রায় সকলেই বৈষ্ণবে পরিণত হইল ॥৩০॥

পতিতং দুর্গতং দৃষ্ট্বা বৈষ্ণবা লোকপাবনাঃ ।

করৌ ধৃষ্টা হরেন্নাম যাচন্তি কুপয়া কলৌ ॥৩১॥

কলিযুগে কৃপাপূর্ব্বক লোক-পাবন বৈষ্ণবগণ পতিত ও দুর্গত জনকে দেখি
তাঁহাদের হস্ত ধারণ করতঃ হরিনাম যাক্রা অর্থাৎ ভিক্ষা করিতেছেন ॥৩১॥

সংকীর্ণনারস্তুকুতেহপি গোরে ধাবন্তি জীবঃ শ্রবণে গুণানি ।

অশুদ্ধচিত্তাঃ কিমু শুদ্ধচিত্তাঃ শ্রদ্ধা প্রমত্তাঃ খলু তে মনর্ত্তঃ ॥৩২॥

শ্রীগৌরহরি সংকীর্ণন আরম্ভ করিলে হরিনামের গুণ শ্রবণ করিয়া অশুদ্ধ-
চিত্ত বাজিগণ এমন হইয়া মৃত্যু করিতে লাগিল, পরন্তু শুদ্ধচিত্ত জনগণের
কথা আর কি বলিব, তাঁহারা ত প্রেমে আত্মহারা হইলেন ॥৩২॥

কিমাশ্চর্য্যং কিমাশ্চর্য্যং কলৌ জাতে শচীসুতে ।

স্ত্রী-বালক-জড়-মূর্খাচ্চাঃ সর্বের নামপরায়ণাঃ ॥৩৩॥

কি আশ্চর্য্য ! কি আশ্চর্য্য ! কলিকালে শচীনন্দনের আবির্ভাবের পর
স্ত্রী-বালক-জড়-মূর্খাদি সকলেই নামপরায়ণ হইল ॥৩৩॥

চণ্ডাল-যবনা-মূর্খাঃ সর্বের কুবর্ত্তন্তি কীর্ত্তনম্ ।

হরেন্নাম্নাং গুণানাক্ষ গোরে জাতে কলৌযুগে ॥৩৪॥

কলিযুগে শ্রীগৌরহরের আবির্ভাব হইলে চণ্ডাল-যবন-মূর্খসকল শ্রীহরির
নাম ও গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল ॥৩৪॥

কিমদ্রুৎ গোঁরহরেশ্চরিত্রং ততোহধিকং তৎপ্রিয়সেবকানাম্ ।

সংকীর্ণনামোদ-জনাস্থরাগ-প্রেমপ্রদানং বিতনোতি লোকৈ ॥৩৫॥

কি অদ্ভুত গোঁরহরির চরিত্র ! তাঁহার প্রিয় সেবকগণের চরিত্র ততো-
হধিক অদ্ভুত ; কারণ তাঁহারা জগতে সংকীর্ণনের আমোদ, লোকের প্রতি
অস্থরাগ ও প্রেমদান বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

(ক্রমশঃ)

সঙ্কলন—সম (৪)

সমতা কাকে বলে? শক্তি-পরিণত নম্বর বস্তুগুলি বিষয়

দুইটি বস্তু এক প্রকারের হইলে তাহাদিগকে সম বলা হয়। দুইটি বস্তুর পার্থক্য থাকিলে তাহাদিগকে সম বলিবার পরিবর্তে বিষম বলা হয়। ক্রমোত্তর জড়ীয় প্রতীতিতে সংজ্ঞার ভেদ হইলে, স্বরূপে ভেদ হইলে, গুণের ভেদ হইলে এবং ক্রিয়ার ভেদ হইলে বস্তুগুলিকে সম বলা হয় না। সেজন্য জড় জগতে পৃচ্ছমান বস্তু বা জ্ঞানাদিকৃত বিষয়-সঙ্কল বিষয় বা উচ্চাবচ গুণবিশিষ্ট। বিষয়-বস্তুর মধ্যে পরস্পর ভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু স্বরূপে বস্তুর একত্ব-নিবন্ধন সজ্জন পাত্তগণ বহিরঙ্গা শক্তি-পরিণত জড়ীয় বিষয় বস্তুগুলিকেও সমদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন অর্থাৎ বহিরঙ্গ শক্তিজাত সমবস্তু জ্ঞানেন। আবার বহিরঙ্গা শক্তিজাত প্রতীতি না থাকিলে, স্বরূপ-শক্তির সহ অভিন্ন প্রতীতি হইলে, তাদৃশ বিচিত্রতাকে অপ্রাকৃত সাম্য বা অম্বয় জ্ঞান করেন। তজ্জন্তু অভেদবাদগণ জড়ীয় ভেদের হস্ত হইতে উন্মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে বিচিত্রতা শক্তি লোপ করাইয়া বস্তুর অদ্বয়তার ভুরি গুণাহুবাদ করেন। সজ্জনগণ অভেদবাদী না হইলেও বস্তুর একত্ব-বিনাশী বিরোধী-বাদকে কোনদিনই আবাহন করেন না। সজ্জনগণ শক্তি-পরিণাম ধারণাই বিশ্বাস করেন। সুতরাং শক্তি-পরিণত নম্বর বস্তুগুলি গুণদ্বারা পরিচিত ও ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি দ্বারা পরস্পর বিষম বা বিচ্ছিন্ন।

বৈষম্যই একমাত্র সমদর্শী; কারণ তাঁহাদের বস্তুর

স্বরূপগত সাম্যে বিরোধ নাই

প্রাকৃত স্বকীয় মধ্যে বস্তুসমূহে-ভেদে-প্রতীতি প্রবল হইলেও সজ্জনগণ বিকারের পশবন্তী হইয়া তাহাদিগের বস্তু-স্বরূপগত সাম্যে বিরোধ করেন না। বিচিত্রতা বা বিলাস ভেদের একমাত্র সম্পত্তি, এই প্রকার বিচিত্রতা বা বিলাস জডাতীত নিত্য অপ্রাকৃত বাজো থাকিতে পারে না, এরূপ মায়াবাদ কল্পনারূপ পক্ষপাত-দোষে সজ্জন কখনই কলুষিত হন না। যেকালে, নিত্য-জগতে নিত্য শক্তি-বৈচিত্র্য নিশ্চয় আছে বলিয়া অপ্রাকৃত মহাজ্ঞানগণ বলেন, তৎকালে সজ্জন বা সাধু তাঁহার সহিত বৈষম্য বা ভেদ স্থাপন করেন না। অপ্রাকৃত মহাজ্ঞানের সহিত সজ্জনের সমতা আছে, সুতরাং বৈষম্যই একমাত্র সমদর্শী।

বিষয় ও আশ্রয়গত সত্তাভেদ-বিশিষ্ট হইয়াও

শক্তি ও শক্তিমান এক বা সম

বিষয়দর্শী মায়াবাদী বলেন, শক্তি-পরিণত ভগৎ মিথ্যা। শক্তি-পরিণাম বা মায়া শব্দে ভেদ নাই। ভগবানের স্বরূপ-শক্তি ও ভগবান, পরস্পরের পরিচয়গত ভেদ মিথ্যা। শক্তি ও শক্তিমানে পরিচয়গত পার্থক্য থাকিলেই বস্তুর বৈতন্ধ্য উৎপন্ন করে; তখন সমদর্শনভাব ধ্বংস হয়। সজ্জনগণ বলেন,—শক্তি শক্তিমান অবিচ্ছিন্ন বস্তু হইলেও বিষয় ও আশ্রয়গত সত্তাভেদ বিশিষ্ট হইয়াও এক বা সম। শক্তিমান একবস্তু, তাহার নিত্য শক্তিসমূহে সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত শক্তিভেদ আছে। বস্তু অতির হইলেও তিনি শক্তিমান, নিঃশক্তিক নহেন, তিনি পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তির আশ্রয়।

প্রাকৃত আসক্তিশূন্য সজ্জনের হরিনামস্বকী বস্তুজ্ঞানে জগতের

সকলকেই ভগবৎসেবায় নিয়োগ

বাহরঙ্গা মায়াশক্তি জাত বস্তুগুলি, তাহার তটস্থ বহির্জগতে স্থিত জীব-শক্তির বিচারে ভিন্ন প্রতীত হইলেও সেবোন্মুখ শুদ্ধ জীবের নিকট হরিসেবার সহায়; সুতরাং সজ্জনগণ তাহাকেও বিষয় জ্ঞান করেন না। সেবোন্মুখ শুদ্ধজীব নিন্দা ও প্রতিষ্ঠায় সম, প্রসন্নাত্মা হইয়া অতাবজ্ঞ শোকাভিভূত হন না। আকাজ্জ্ব করেন না এবং সকল প্রাণীতে সমদর্শী হইয়া পরাভক্তি লাভ করেন। সেবোন্মুখ সজ্জনগণ পরের স্বভাব ও কর্মের প্রশংসা ও নন্দাবাদ করেন না। সজ্জন শীত, উষ্ণের তীব্রতা সহ্য করিয়া সমদর্শী। সজ্জনগণ বীজা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ও অবর চণ্ডালে সমদৃষ্টি-বিশিষ্ট, পরম-পবিত্র ধেনুতে ও অস্পৃশ্য সারমেয়ে সমদর্শী; ক্ষুদ্রকায় সারমেয় সহ বৃহৎকায় কুঞ্জরে সমদর্শন তাহার ধর্ম। শক্তির তারতম্যবশতঃ বস্তুস্বরূপে বৈষম্য দর্শনের আবশ্যিকতা থাকে না। ব্রাহ্মণ চণ্ডালে, কুকুর, গাভীতে, গাভী হস্তীতে মায়িক ভেদ থাকিলেও সকলকেই স্বরূপতঃ হরিদাস জানেন। প্রাকৃত আসক্তি সধুর উপর কার্য্য করে না। তিনি অনাসক্তভাবে হরিনামস্বকী বস্তুজ্ঞানে ঐ সকল দ্রব্যে বৈষম্য দ্রোণ করেন না। সকলই তাহার কৃৎসেবনের সহায় জানেন।

কৃষ্ণোন্মুখ জীবে দয়া ও হরি-বিরোধি-জনের

দুঃসঙ্গ ত্যাগই সমদর্শন

মায়াদাস্য কিয়ৎ পরিমাণ বিস্মৃত হইয়া বে কালে জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন তিনি হরিতে প্রেয়, হরিদাসে বজুতা, কৃষ্ণোন্মুখে দয়া, এবং হরি-বিরোধী

জনের দুঃসজ্জা ত্যাগ করিয়াই সমদর্শী হন। এই মধ্যমাধিকারে তিনি কপটতা করিয়া তাহার সমদর্শন দেখাইতে গিয়া যদি বালিশে দয়ার পরিবর্তে সমবুদ্ধি করেন, তাহা হইলে সাধুর সমদর্শন বিচারে কলঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হয়; যদি কৃষ্ণবেশজনে ভক্তজন সহ সমজ্ঞান করেন, তাহা হইলে তাহার বিমুখতা বৃদ্ধি হয়।

হরি-সেবামুকুল বস্তুকে বিষয়জ্ঞানে ত্যাগ করিয়া

কঙ্কুবৈরাগী মুনুক্ষুর বিষম দর্শন

হরিসম্বন্ধী বস্তুগুলিকে যদি প্রণয়জাত মনে করিয়া বৈষম্য আশ্রয়ে তাহাদের সজ্জা ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাদৃশ মুমুক্ষু তাহার সমতাকে বিনাশ করিবে। সমতা-বিচারে অধিকার অতিক্রম করিলে কোন সুফল পাওয়া যায় না, পরন্তু কঙ্কুবৈরাগ্যরূপ প্রতিষ্ঠা আসিয়া তাহার সমতার হানি করে।

সমদর্শী সাধু ব্রহ্ম-রুদ্রাদি আধিকারিক দেবগণসহ বিষ্ণুর

সাম্যস্থাপন করিয়া নামাপরাধ-সঞ্চয় করেন না।

সমতা-বিচারে অসাধুগণ যেরূপ ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণ সহ বিষ্ণুর তুল্য কল্পনা করেন, সমদর্শী বৈষম্যগণ তাহা কখনই অনুমোদন করেন না। প্রাকৃত জগতের অনিত্য কালোৎপন্ন উচ্চাৎচ অবস্থাসমূহ কখনই নিত্যের সহ সম নহে, পরন্তু কৃষ্ণার্থে অধিল-চেষ্টাময় সাধু, জড়ীয় বস্তুর প্রাকৃত সাম্য ছাড়িয়া তাহাতে ভগবন্তাব দর্শন করেন এবং সমগ্র বস্তুকে নিজভোগ্য জামিন্য প্রাপ্তিফল কৃষ্ণ-সেবোপকরণ অপ্রাকৃত বলিধা জানেন।

বিজিত-ষড়্গুণ বৈষম্যগণের আচার-ব্যবহারে

রিপুগত বৈষম্য নাই

কাম-ক্রোধাদি জড় জগতের নিত্য সহচরগণ বস্তুতে বৈষম্য বিচার করিতে গিয়া তাহাদের স্বরূপ দর্শন না করিয়া নানাপ্রকার অনর্থ সৃষ্টি করেন, কিন্তু পারমাধিক সজ্জন কামকে কৃষ্ণ-কর্মার্পণে, ক্রোধকে ভক্ত-ষেষিজনে, লোভকে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথায়, মত্ততাকে হরিগুণ-গানে, মূঢ়তাকে ইষ্টলাভের প্রভৃতি চেষ্টায় নিয়োগ করেন। বিষমদর্শী হরি-বিমুখ এই সকল বৈষম্য-সমদর্শিতার বিরোধী মনে করিয়া নিজেরই সর্বনাশ করেন। সজ্জনের রিপুগত বৈষম্য নাই, তিনি নিরন্তর সমতায়ুক্ত।

—জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমন্নরস্বতী ঠাকুর

ভক্তিতত্ত্ব-বিবেক — প্রথম প্রবন্ধ (২)

(পূর্বপ্রকাশিত ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৪ পৃষ্ঠার পর)

অন্যাত্মাভিলাষিতাশূন্যতা ও জ্ঞান-কর্মাদি দ্বারা অনাবৃত্ততা—এই ভক্তির তটস্থ লক্ষণ। “বিষ্ণুভক্তিং সবন্ধামি যযাঃ সর্বযনাপাতে”—এই শ্লোকটির দ্বারা ‘ভক্তিসন্দর্ভে’ ভক্তির তটস্থ-লক্ষণ বিচারিত হইয়াছে। শ্লোকটির অর্থ এই যে, আমি যে বিষ্ণু-ভক্তির কথা বলিতেছি, সেই ভক্তি-দ্বারা জীব সকলই প্রাপ্ত হয়। প্রাপ্তির যে স্বার্থ তাহাষ্ট নাম অন্তিলাষিতা। অন্যাত্মাভিলাষিতা শব্দে একপাশু বুঝিতে হইবে না যে, ভক্তির স্বীয় উন্নতি ও উৎকর্ষ প্রাপ্তির যে অন্তিলাষ, তাহা পরিত্যাগ। সাধন ভক্তি ভাবস্বরূপতা লাভ করিবার যে অন্তিলাষ করে তাহা উত্তম, কিন্তু তদিতর সমস্ত অন্তিলাষই পরিত্যাগ। অত্যা অন্তিলাষ দুই প্রকার অর্থাৎ ভক্তি ও মুক্তি-প্রাপ্তির অন্তিলাষ। এই স্থলে শ্রীকৃষ্ণ গোদামী লিখিয়াছেন,—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।

‘তাবভক্তিসুখস্তত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥’

যে-পর্যন্ত ভুক্তি ও মুক্তি-বাঞ্ছাৰূপ দুইটি পিশাচী হৃদয়ে বর্তমান আছে, সে-পর্যন্ত সন্ন্যাসিনী ভক্তির যে পবিত্র সুখ তাহার কিছুমাত্র উদয় হয় না। কায়িক ও মানসিক ভোগ-মায়াই ভুক্তিশব্দান্তর্গত। ইহজন্মে আবেগ্য, সুখাত্ম-প্রাপ্তি, বলবীৰ্য্যাদি-লাভ ধনলাভ, গৃহলাভ, স্ত্রীলাভ, জয়লাভ, সন্তান-প্রাপ্তি, যশ ও প্রতিষ্ঠা-লাভ, উচ্চপদ-লাভ ইত্যাদি যত প্রকার সুখ-ভোগ আছে, সকলই ভুক্তির অন্তর্গত। মরণান্তে ব্রাহ্মণ-জন্ম, রাজকুলে জন্ম, স্বর্গলাভ ব্রহ্ম-লোকাদি-লাভ প্রভৃতি যত প্রকার পারলৌকিক সুখ আছে, সে সমুদয়ও ভুক্তি। অষ্টাঙ্গ যোগাদি দ্বারা যে অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধি ও অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্য আশা করা যায়, সে-সমুদয়ও ভুক্তি। ভুক্তি পিপাসাতে মনুষ্য চালিত হইলেই কামবশ হইয়া কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌বর্গের বশীভূত। মাৎসর্য্য সজ্জেই হৃদয়কে অসিকার করিয়া লয়। অতএব শুদ্ধা ভক্তি লাভ করিতে হইলে ভুক্তিবাঞ্ছা একবারেই দূর করা উচিত। ভুক্তিবাঞ্ছা দূর হইলেই যে বজ্রতীরের বিষয় ছাড়াই বনে যাউতে হয়, একজন নয়। বনে গেলে বা জল্লাসী হইলেই বা ভুক্তিবাঞ্ছা কিরূপে ছাড়ে? বিষয়ে অবস্থিত হইয়া বিষয়াগ্রহ পরিভ্যাগপূর্ব্বক ভক্তিসম্বন্ধে আগ্রহ করিলেই ভুক্তিবাঞ্ছা দূর হয়।

অতএব শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

রুচিমুখ্যহতস্তত্র জনস্ত ভজনে হরেঃ ।

বিষয়েষু গরিষ্ঠোপি রাগঃ প্রায়ো বিলীয়তে ॥

অনাসক্তস্ত বিষয়ান্ যথার্থমুণযুক্ততঃ ।

নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তনঃ ।

মুমুক্তিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফলমুচ্যতে ॥

যে-সময়ে কৃষ্ণ-ভজনে জীবের রুচি হয়, তখন জীবের রাগ বিষয়ে গরিষ্ঠ-রূপে থাকিলেও তাহা ক্রমশঃ লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। তখন অনাসক্তভাবে বিষয়সলক আবশ্যক-মতে স্বীকার করতঃ এই সকল বিষয়কে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ করিয়া যে আচরণ করেন, তাহাকে যুক্ত-বৈরাগ্য বলে। এই অবস্থায় হরিসম্বন্ধী বস্তুরসকলকে প্রাপঞ্চিক জ্ঞান করিয়া জড়-মুক্তিবাঞ্ছা-ক্রমে যাঁহার তাগ করিয়া যান, তাঁহাদের বৈরাগ্য ফল বা তুচ্ছ। শরীরী জীবের পক্ষে জীবের তাগ সম্ভব নয়। কিন্তু বিষয়ের যে বহির্নির্মূল-প্রবৃত্তি তাহা দূর করত সমস্ত বিষয়ট ভগবদ্ভাবকে মিশ্রিত করিয়া বিষয় স্বীকার করিলে আর বৈষয়িক হইতে হয় না। ক্রপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই কয়টি বিষয়। সংসারকে এক্রপ ব্যবস্থাপিত করা উচিত যে, সমস্ত রূপেই কৃষ্ণ-সম্বন্ধ দেখা যায় অর্থাৎ চয় শ্রীবিগ্রহ, নয় ভাগবতরূপ রুণের উদ্ভাবন-বাটীকা, নদী, পথ প্রভৃতি দেখা যায়। সমস্ত রসে কৃষ্ণপ্রসাদ পাওয়া যায়; সমস্ত গন্ধে প্রসাদী গন্ধ উপলব্ধ হয়; সমস্ত স্পৃষ্টে দ্রব্যই যেন কৃষ্ণসম্বন্ধী দ্রব্য বলিয়া জ্ঞান থাকে; এবং হরি-কথা (শব্দ) বা কৃষ্ণদাসদিগের কথা শ্রবণ করা যায়। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে বিষয়ে আর ভগবৎচিন্তা-নির্মূলতা থাকে না। ভোগের যে পুথ, তাহা আত্মসাৎ করিলেই ভুক্তি সঙ্কেত হৃদয়কে আক্রমণ করে। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত বিষয় গ্রহণরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে ভুক্তি-বাঞ্ছা দূর হয় এবং শুদ্ধা ভক্তির অভ্যুদয় হয়।

যেহত ভুক্তিবাঞ্ছা দূর করা কর্তব্য, তক্রপ মুক্তিবাঞ্ছাও দূর করা সর্বতোভাবে উচিত। মুক্তি সম্বন্ধে একটু নিগূঢ় বিচার আছে। শাস্ত্রে পঞ্চবিধ মুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা,—

সালোকা-মাষ্টি-সাক্ষ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যত ।

দীর্ঘমানং ন গুহুস্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

কপিলদেব কহিলেন,—হে মাভাঃ! যাহারা আমার নিম্নজন অর্থাৎ
 উন্নতভক্ত, তাঁহাদিগকে সালোক্য, সাষ্টি, সাক্ষ্য সামীপ্য ও একত্বরূপ পঞ্চবিধ-
 মুক্তি প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা গ্রহণ করেন না। কেবল সেবাকে গ্রহণ করেন।
 সালোক্য-মুক্তিতে ভগবন্তোক-প্রাপ্তি। ভগবানের সঙ্গিত সমান ঐশ্বর্য্য-
 প্রাপ্তির নাম সাষ্টি। ভগবৎ-সামীপ্য লাভের নাম সামীপ্য। চতুর্ভুজ
 আকার প্রাপ্তির নাম সাক্ষ্য। সায়ুজ্য-লাভের নাম একত্ব। সায়ুজ্য
 দুই প্রকার, ব্রহ্ম সায়ুজ্য ও ঈশ্বর-সায়ুজ্য। ব্রহ্মজ্ঞান চরমে জীবকে
 ব্রহ্ম-সায়ুজ্য প্রদান করে। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রানুসারে আচরণ করিলে ব্রহ্ম-
 সায়ুজ্য হয়। পাতঞ্জলীয় যোগানুষ্ঠানটী সুন্দররূপে করিতে পারিলে ঈশ্বর-
 রূপে ঈশ্বর-সায়ুজ্য লাভ হয়। ভক্তের পক্ষেই উভয় সায়ুজ্যই অত্যন্ত
 গণিত। যাহাদের চরমে সায়ুজ্য লাভের আশা থাকে, তাহারা যে ভক্তির
 আচরণ করে, তাহা সতৈত্তব অর্থাৎ অনিত্য ও ধূর্ততা-পরিপূর্ণ। তাহারা
 ভক্তিকে নিতাদর্শ বলিয়া স্বীকার করিতে সক্ষম হয় না। ভক্তি তাহাদের
 নিকট কেবল ব্রহ্ম-লয়ের উপায় স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হয়। অতএব আধ্যাত্মিক
 চেষ্টাবান্ পুরুষদিগের নিকট ভক্তির নিতান্ত দুর্দিনা। সায়ুজ্য মুক্তিকে যাহারা
 শেষ ফল বলিয়া জানেন, তাহাদের হৃদয়ে কখনই শুদ্ধা ভক্তি উদ্ভিত হইতে
 পারে না। অস্তান্ত প্রকার মুক্তি সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-গোস্বামী বলিয়াছেন, যথা—

অত্র ভ্যাভ্যন্তরৈবোক্তা মুক্তিঃ পঞ্চবিধাপি চেৎ।

সালোক্যাদিস্তথাপ্যত্র উক্ত্যা নাতি বিরুদ্ধান্তে ॥

সুতৈশ্চৈশ্বর্য্যান্তরা মেঘং প্রেম-সেবোত্তরৈতাপি।

সালোক্যাদি বিধা তত্র নাস্তা নৈবাজুবাৎ মতা ॥

কিন্তু শ্রেমৈক-সায়ুজ্যভুক্ত একান্তিনো হবৌ।

নৈবাজী কুর্কণ্ডে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি ॥

পূর্বেক্ত পঞ্চবিধ মুক্তিই ভক্তের পরিত্যাজ্য বলিয়া উক্ত হইলেও সালোক্য
 সামীপ্য, সাক্ষ্য ও সাষ্টি—এই চারিপ্রকার মুক্তি ভক্তির অত্যন্ত বিরোধী
 নয় উক্ত চারি প্রকার মুক্তি পাত্র বিশেষে সুতৈশ্চৈশ্বর্য্যান্তরা এবং প্রেম-
 সেবোত্তরাক্রপ হই প্রকার জাকার ধারণ করে। যাহারা অহংপ্রচোদনা
 প্রভৃতি উপায় দ্বারা বৈকুণ্ঠ লাভ করেন, তাহারা ঐ মুক্তিক্রমে সুখ ও ঐশ্বর্য্য-
 রূপ ফল প্রাপ্ত হন। সেবকগণ ঐ প্রকার মুক্তি কোনক্রমেই স্বীকার করেন
 না। কিন্তু একান্তী প্রেমসায়ুজ্য-মুক্ত হরিভক্তগণ উক্ত পঞ্চ প্রকার মুক্তির

কোনটিকেই অঙ্গীকার করেন না। অতএব শুদ্ধভক্তিদিগের মুক্তিবাঞ্ছা কদাপি থাকে না। এই প্রকার বিচার দ্বারা ভক্তির অনন্তাভিলাষিতা সিদ্ধ হয়। ইহাই ভক্তির একটী তটস্থ লক্ষণ।

জ্ঞান-কর্মাদিদ্বারা অনাবৃত থাক। ভক্তির আর একটী তটস্থ লক্ষণ আছে। জ্ঞানকর্মাদি শব্দে যে 'আদি' পদ আছে, তাহা-দ্বারা অষ্টাঙ্গযোগ, বৈরাগ্য সাংখ্যাভ্যাস, শুদ্ধচেতনের জ্ঞাত-জ্ঞেয়াদি আশ্রয় ইত্যাদি উপাধিক ধর্ম-লক্ষণকে বুঝিতে হইবে। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, ভক্তি জীবের আহুত-ময় কৃষ্ণানুশীলন। জীব চিন্ময়, কৃষ্ণও চিন্ময় এবং ভক্তিবৃত্তি দ্বারা জীব কৃষ্ণের সহিত নিত্য সম্বন্ধ। স্থাপন করেন, তাহাও বিশুদ্ধ-চিন্ময়ী। জীব শুদ্ধ-অবস্থায় থাকিলে ভক্তিবৃত্তির স্বরূপ লক্ষণই একা কার্য্য করে। তখন তটস্থ লক্ষণের অবসর থাকে না। জীব বদ্ধ হইলে জড় জগতে আবদ্ধিত হইয়া ভক্তির স্বরূপ-পরিচয়ের সহিত দুইটী তটস্থ পরিচয় উপস্থিত হয়। স্মরণে জড় জগতে জীবের অত্যাভিলাষ আছে বলিয়া শুদ্ধভক্তির পরিচয়-স্থলে অন্যাভিলাষিতা-শূন্যতার পরিচয় দিতে হয়। চিহ্নজগতে সে পরিচয়ের আবশ্যক থাকে না। সংসার-কূপে পতিত হইয়া নানা প্রকার বহির্মুখ কার্য্যে জীবের অত্যন্ত কৃষ্ণ-বিশ্বাসিতরূপ একটী রোগ তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। সেই রোগের বিষদাহে প্রলীড়িত হইয়া যে-সময় কূপ হইতে উদ্ধার হইবার বাসনা জন্মে, তখনই জীব চিন্তা করিতে থাকেন—“অহো! আমি অত্যন্ত দুর্ভাগ্য। আমি এই হরন্তু ভগ্ন-সাগরে পতিত হইয়া অপার বাসনাক্রপ উন্মি দ্বারা ইতস্ততঃ নীত হইতেছি। সময়ে সময়ে কাম-ক্রোধাদি-কপ নরকগন-দ্বারা আক্রান্ত হইয়া প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, করিতেছি। আমার ত' আশা-স্বর্ঘ্য আর আমাকে দেখা নেন না। আমি কি করি? আমার কি ভেদ বন্ধু নাই! আমার কি আর রক্ষার উপায় নাই! আমি কি করিলে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার হই, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না! ভায় আমি অত্যন্ত দুর্ভাগ্য।” এতরূপ বলিতে বলিতে জীব নিরন্তর হইয়া পড়েন।

তখন পরম কারুণিক কৃষ্ণচন্দ্র কৃপাপূর্ব্বক তাহার হৃদয়ে পবিত্র ভক্তি-দাতার বীজ-বরূপ শ্রদ্ধা নামক একটী অসম্পূর্ণ ভাব নিগ্গেণ করেন। সেই বীজ সাধন-পর্ব্বের অনুশীলন দ্বারা পুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হয়। অবশেষে জীবের সৌভাগ্যোদয় হইলে ভক্তিলতার প্রেমরূপ ফলের উৎপত্তি করে। শ্রদ্ধা-বীজের পুষ্টিক্রম আমি ক্রমশঃ দেখাইতে থাকিব। কিন্তু এখন ঐ পর্য্যন্ত জানা উচিত

যে, যে-দিবস ঐ শ্রদ্ধা-বীজের জাত হয়, সেই দিন হইতে জীব-হৃদয়ে ভক্তি-দেবীর উদয়। শ্রদ্ধা রূপা ভক্তি একটি সুকুমারী বালিকা। জীবের হৃদয়ে তাঁহার অবস্থিতি হইলে সেই সময় হইতে বিশেষ সতর্কতার সহিত তাঁহাকে নিরোগ অবস্থায় রাখা কর্তব্য। যেমত সুকুমার বালিকাকে গৃহস্থ অতি যত্নে রোদ্র, শীত, দুষ্ট কীট, ক্ষুধা, পিপাসা হইতে সর্বদা রক্ষা করেন, জীবও তদ্রূপ নবপ্রসূতা শ্রদ্ধাদেবীকে সমস্ত অশুভ হইতে অনাবৃত রাখিবেন; নতুবা জ্ঞান, কর্ম, যোগ, জড়াসক্তি, শুদ্ধ বৈরাগ্যাদির অনিষ্টকর সংসর্গ-বশতঃ শ্রদ্ধা ক্রমশঃ উত্তমা ভক্তিরূপে পরিণ্যস্ত হইতে পারে না। অনর্থমিশ্র হইয়া ক্রমশঃ অজ্ঞাকার ধারণ করিতে থাকেন। ক্রমশঃ ঐ শ্রদ্ধাদেবী ভক্তিরূপা না হইয়া অনর্থরূপা হইয়া পড়েন। যে-পর্যন্ত প্রকৃত সাধুসঙ্গরূপ ধাত্রীদ্বারা সেবিত চইয়া এবং ভজনরূপ ঔষধ-পথ্যাদিক্রমে অনর্থ-শূন্য হইয়া শ্রদ্ধাদেবী নিষ্ঠারূপে উন্নতা না হন, সে-পর্যন্ত তাঁহার পতাকাগিষ্ঠ দূর হয় না। নিষ্ঠা হইলে আর কোন অনর্থই তাঁহাকে সহজে পরাজয় করিতে পারেন না। শ্রদ্ধাদেবীকে যত্নে পুষ্ট না করিলে জ্ঞান, বৈরাগ্য, আধ্যাত্মিক বিচার, সাংখ্যাদি অভ্যাস প্রভৃতি কীট, মশক ও মন্দ বায়ু-দ্বারা তিনি দূষিতা হইয়া পড়েন। বন্ধাবস্থায় জীবের জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি অনিবার্য্য; কিন্তু এসকল জ্ঞানাদি ভাব যদি বিরুদ্ধ তত্ত্বের হয়, তবে তাহারা ভক্তিকে নষ্ট করে। অতএব জীব গোঁস্বামী এস্থলে জ্ঞান শব্দে নির্ভেদ ব্রহ্মহুসন্ধানকে বলেন। নির্ভেদ ব্রহ্মহুসন্ধান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান নিতান্ত দুরীকরণীয়। তখনীব্রহ্মহুসন্ধানজ্ঞান-রূপ ভগবজ্জ্ঞান ভক্তি-চেষ্টার সহায়। এই স্থলে বিবেচ্য এই যে, যখন জ্ঞান অগ্রে উপস্থিত হইয়া ভক্তিকে উৎপন্ন করিতে হস্তাবনা করে, তখন সেই জ্ঞান দুষ্ট, কিন্তু শ্রদ্ধার অনুশীলন করিতে করিতে জীব, মায়ী ও ঈশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধ-নিরূপক যে জ্ঞানোদয় হয় তাহা ভক্তির সহকারী, তাহার নাম অহৈতুক জ্ঞান। এই জ্ঞানই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশ্রুত মহাশয় বলিয়াছেন,—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিব্যোগঃ প্রযোজিতঃ।

জনন্যত্যাগ্য বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥

এক্ষণে পূর্বোক্ত সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া দেখুন যে, জ্ঞান-কর্মাদি দ্বারা অনাবৃত না হইয়া অর্থাৎ ঐ সকল ভাবকে স্বীয় পরিচালকরূপে রাখিয়া, অজ্ঞাভিলাষ-শূন্যতা-সহকারে আনুকূল্যময় কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তি। ভক্তিই জীবের একমাত্র আনন্দময়ী প্রবৃত্তি, আর সমস্ত প্রবৃত্তিই বহির্মুখ।

ভক্তির সাহায্য পাইলে কখন কখন আরোপ-সিদ্ধা ভক্তিরূপে পরিচিত হন। ভক্তির সাহায্য পাইলে জ্ঞান কখন কখন সঙ্গ-সিদ্ধা ভক্তিরূপে পরিচিত হন। কিন্তু কোন সময়েই উহার স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি হইতে পারেন না! স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি কৈতবশূণ্য। অমিশ্রানন্দ-স্বরূপ। * আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি সন্ধৈতবা, মিশ্রভাব-প্রকাশিনী। হে অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবগণ! আপনাদের সম্ভাবতঃ স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তিতেই রুচি হয়। আরোপ-সিদ্ধা বা সঙ্গ-সিদ্ধা ভক্তিতে রুচি হয় না। যেহেতু উহার স্বরূপতঃ ভক্তি নয়। ভক্তি নামটী অন্তরঙ্গ দ্বারা তত্ত্বভাবে অর্পিত হইয়াছে; তাহাদিগকে ভক্তি নয়, ভক্ত্যাভাস বলা যায়। যদি সৌভাগ্যক্রমে ভক্ত্যাভাস দ্বারা ভক্তির স্বরূপের প্রতি শ্রদ্ধা হয়, তবেই উহার চরমে ভক্তিরূপে পরিণত হয়। কিন্তু তাহা সহজে নয়। তাহাতে প্রায়ই শুদ্ধভক্তি হইতে জীবের চ্যুতি হয় বলিয়া স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তিকে বরণ করিবার ভূরি ভূরি উপদেশ।

হে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ! আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অল্প শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ বর্ণন করিলাম। পূর্বাচার্য্য মহোদয়গণের পূর্বাণর বাক্য সমুদয় অনুশীলন-পূর্বক তাঁহাদের মনোভাব স্বল্লাফরে লিপিবদ্ধ করিবার অভিপ্রায় আমি এই নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করিলাম,—

পূর্ণচিদাত্মকে ক্রমে জীবন্তানু-চিদাত্মনঃ।

উপাধিরহিতা চেষ্টা ভক্তিঃ স্বাভাবিকী মতা।

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দকৈতন্ত্য সর্বদা পূর্ণশক্তিসম্পন্ন, সূর্যাস্থানীয় তত্ত্ববিশেষ, জীব তাঁহার কীরণস্থানীয় অণুচৈতন্ত্য-স্বরূপ তত্ত্ববিশেষ। পূর্ণচৈতন্ত্যের প্রতি অণুচৈতন্ত্যের স্বাভাবিকী উপাধিরহিতা যে চেষ্টা, তাহাই ভক্তি। অত্যাভিলাষ জ্ঞান ও কণ্ঠাদির প্রতি আগ্রহ ইত্যাদি উপাধি। স্বাভাবিকী চেষ্টা বলিলে আহুকলাময় অনুশীলনকেই বুঝিতে হইবে।

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্বপ্রচলিত ৩৪শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪২৪ পৃষ্ঠার পর)

ঋতুপূর্ণিমা ত্রয়োদশী-সংবাদেও দেখা যায়—বর্ণাপ্রদী মাত্রেয়ই বিষ্ণুর অর্চনা বাতীত অষ্টদেবতার অর্চন মহাদেবেরই কারণ হইয়া থাকে। যথা—
বাহুদেবং পরিত্যজ্য যোহষ্টদেবমুপাসতে।

ত্যাক্ত্বামৃতং স মৃচাত্মা ভুঙ্ক্তে হলাহলং বিষম্ ॥

ত্রয়োদশী নারদকে বলিলেন—যে ব্যক্তি মোক্ষ-স্বরূপ বাহুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া নানা ভোগবাসনায় অষ্ট দেবতার উপাসনা করে, সেই মৃচাত্মা অমৃত ত্যাগপূরক হলাহল বিষ পান করে। অর্থাৎ নিজের সংসার বন্ধন দূরন করিয়া পুনঃ পুনঃ চোরালীলক্ষ-যোনি ভ্রমণরূপ যাতনাগর্ভে নিপতিত হয়।

মানবেন হরি বিমুখতার কারণ

পূর্ব পূর্ব সংখ্যায় নানাদেবদেবীর পূজায় বিবিধ বিপত্তি ও ভগবদ্ অর্চনাদির দ্বারা পরমার্থ লাভ শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ-বচন দ্বারা নিরূপিত করিলেও কন্মাসক্তি-চালিত, বিষয়-ভোগে প্রমত্ত জনগণ এই সকল শাস্ত্রীয় উপদেশবাণী গ্রহণে স্বতঃই পরাভূত হইয়া থাকে। ইহার কারণ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়,—

আগমৈঃ কল্পিতৈশ্চ হি জনান্ মধিমুখান্ কুরু।

মাঞ্চ গোপায় যেন স্ত্রাং সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরাঃ।

(পদ্মপুরাণ ও নারদ পঃ রাঃ ৪২:৩০)

অর্থাৎ হে শিব! তুমি কল্পিত আগম (তন্ত্র) শাস্ত্র-রচনার দ্বারা মানবগণকে আমার প্রতি বিশ্বাস করিয়া আমাকে গোপন কর। ইহাতে আমার সৃষ্টি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ শিবকে বলিতেছেন, “তুমি কল্পিত তন্ত্র শাস্ত্র দ্বারা তোমার এবং অষ্টদেবতার ঈশ্বরত্ব ও কলদাতৃত্ব বর্ণনা কর, তাহা হইলেই মূঢ় লোকগণ আমার ভক্তন পরিত্যাগপূরক তাহাতে আসক্ত হইবে। তাহার ফলে এ সংসারে তাহারা নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিবে। তাহাতেই লীলাপুষ্টির জন্য আমার বিশ্বসৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।” ভগবানের এই নির্দেশে মহাদেব মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে নিজের ঈশ্বরত্ব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি নিজ শক্তিগণের ঈশ্বরীত্ব জগৎকর্তৃত্ব, প্রভৃতি প্রকৃষ্টরূপে বর্ণনার দ্বারা বাস্তব সত্য-স্বরূপ সর্ব-নিয়ন্তা ভগবানকে গোপন করিয়াছেন। তাহার ফলেই শাস্ত্র-শৈবগণ বিষ্ণুর

সর্বৈশ্বরক ভূমিয়ার নানা দেবতার সজনে রত হইয়া বিপথগামী হইয়াছেন। দেব-পুরাণাদি শাস্ত্র-ভাষ্যার্থ বা মহাজনগণের প্রত্যক্ষানুভব ও তাঁহার মানিতে চাছেন না।

ভক্ত-চুড়ামণি প্রহ্লাদ

মহাজনগণের অনুভবের একটী দৃষ্টান্ত এখানে আলোচিত হইতেছে। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নিজের পুত্র প্রহ্লাদ কৃষ্ণভক্ত হইয়াছে দেখিয়া প্রথমতঃ তাহাকে বধেচ্ছায় নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া যখন বিফল-মনোরথ হইলেন, তখন অগত্যা প্রহ্লাদের মতি পরিবর্তনের জন্য তাঁহাকে স্তম্ভাচার্যের যশ ও অমরক নামক পুত্রদ্বয়ের হস্তে পুনরায় সমর্পণ করিলেন। উদ্দেশ্য, তাহাদের শিক্ষায় যদি পুত্রের বিষুভক্তির পরিবর্তিত হয়। কিন্তু তাহা কি কখনও সম্ভব? প্রহ্লাদ যাতৃগর্ভে বাস-কালীন দেবর্ষি নারদের নিকট যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাহাই তাহার মজ্জায় মজ্জায় বিরাজিত রহিয়াছে। যশোমর্কের ধর্ম্ম-অর্থ-কামরূপ ত্রিবর্গলাভের উপায় বা রাজনীতির সাম, দাম, ভেদ, দণ্ড ইত্যাদির কথা প্রহ্লাদের কাণে পৌঁছায় না। তিনি নারদের উপদেশ অনুযায়ী সর্বদা কৃষ্ণ-চিন্তায় তন্ময়। রাজোচিত আহার-বিহার, বেষ-ভূষা বিষয়ে তিনি উদাসীন ছিলেন। সহাধ্যায়ী অপর দৈত্যবালকগণও প্রহ্লাদের সহিত গুরুগৃহে একত্রে বাস করেন। তাহারাও তৎসঙ্গতঃ ক্রমে ক্রমে অনুরোচিত অ'হার-বিহার, বেষ-ভূষা, খেলা-ধূলা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া প্রহ্লাদকে ধরিয়া বসিয়া থাকিত এবং তাঁহার উপদেশ-মত চলিত। প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে ঐরূপ অহুগত দেখিয়া তাহাদের শিক্ষার্থ উপদেশ করিতে লাগিলেন—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।

হ্রলভং মানুষং জন্ম তদপ্যক্রমর্থদম্ ॥ (ভাঃ ৭।৬।১)

অর্থাৎ পণ্ডিত ব্যক্তি কৌমার-কাল হইতেই ভাগবত-ধর্ম্ম আচরণ করিবেন। এই জগতে মানুষ-জন্ম হ্রলভ, অর্থাৎ মৃত্যুকাল অনিশ্চিত। তথাপি মানুষ-জন্মই পরম-পুরুষার্থ লাভের একমাত্র কারণ হইয়া থাকে।

কুমার-কাল কতদূর পর্য্যন্ত, জানা আবশ্যক। শাস্ত্র এ সম্বন্ধে বাহা বলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধার করিলাম—

কৌমারং পঞ্চমাসান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।

কৈশোরমাপঞ্চদশাদু যৌবনন্ত ততঃ পরম্ ॥

পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কৌমার কাল, দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পৌগণ্ড-কাল, পনের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কৈশোরকাল এবং তৎপরে যৌবন-কাল।

মামুষ-জন্মের স্তূলভূত।

প্রজ্ঞাদি পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই ভাগবত-বর্ষ আচরণের উপদেশ করিলেন, যেহেতু মৃত্যুকাল অনিশ্চিত, তত্‌পরি মামুষ-জন্ম অত্যন্ত দুর্গভ। সেই স্তূলভূত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—

প্রাপ্যাপি স্তূলভূতরং মামুষ্যং বিবুষেপ্তিতম্।

বৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দৈস্ত্যাক্সা বঞ্চিতশিরম্ ॥

দেবাদি জন্মে মহাবিশয়ভোগেই আবেশ হয় এবং পশ্বাদি জন্মে বিবেক-বাকি থাকে না। সুতরাং সমস্ত শাস্ত্র প্রধানতঃ মামুষকে লক্ষ্য করিয়াই কথিত হয়। ভোগপ্রবণ দেবদেহে হরিতজন স্তূলভ বলিয়া দেবতাগণও ভারতবর্ষে মামুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া হরিতজন করিতে ইচ্ছা করেন। সেই দেবতাগণেরও প্রার্থিত মামুষ-দেহ লাভ করিয়া যাহারা শ্রীগোবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ না করে, তাহারা নিজ জীবাত্মাকে চিরতরে বঞ্চিত করিয়া থাকে; অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-প্রবাহে নিমজ্জিত হইয়া থাকে। ঐ জন্ম-মরণ প্রবাহটী আবার নিরূপাবদ্ধ। মামুষ দেহ-প্রাপ্ত জীব যে স্বেচ্ছাধীন সর্বদা মামুষই হইবে এবং পশু-পক্ষী ও ক্রিমি প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ সেই সেই পশু-পক্ষী ও ক্রিমি-জন্মই লাভ করিবে, তাহা নহে। পর্য্যায়-ক্রমে হটুক ও বিপর্যায়-ক্রমে হটুক, জীবাত্মাই কর্তৃফলাত্মরূপ সমস্ত দেহই ধারণ করিয়া থাকে।

যথা—অশীতি-চতুর্দশৈব লক্ষ্যংস্তান্ জীবজাতিত্।

অমৃতিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্য মামুষ্যং জন্ম-পর্য্যায়ং ॥

তদপ্যকলতা জাতং তেষামাত্মাভিমানিনাম্।

বাক্যকামাশ্রত্য গোবিন্দং-চরণদ্বয়ম্ ॥

অর্থাৎ জীবাত্মা জীবজাতিতে সাধারণতঃ পর্য্যায়ক্রমে চৌরান্টি লক্ষ যোনিতেই পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ঐ ভ্রমণের ক্রমাত্মসারে মামুষ-দেহ লাভের সময় আসিলে-পরই, মামুষ-দেহ প্রাপ্ত হয়। স্বেচ্ছাধীন কেবল মামুষ-দেহই লাভ হয় না—পর্য্যায়ক্রমে লাভ হয়। সুতরাং দেব-স্তূলভ মামুষ-দেহ লাভ করিয়া যাহারা শ্রীগোবিন্দের ভজনা না করে, সেইসকল দেহাভিমানী পশুপক্ষী মানবের ঐ মামুষ-দেহ ধারণ বিফল হইয়া থাকে।

জীবের মানুষ-দেহ প্রাপ্তির ক্রম ও তালিকা

বহুজীবের চৌরাশীলক্ষ জন্মের তালিকা ও পর্যায় সম্বন্ধে বৃহদ্বিশু-
পুরাণ বলেন,—জলজা নবজলজাণি, স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ ।

কুমারো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাঃ দশলক্ষকম্ ।

ত্রিংশলক্ষাণি পদ্মবঃ, চতুলক্ষাণি মানুষাঃ ।

জলস্থ নানাবিধ মৎস্যজলৌকাদিতে নয় লক্ষবার, নানাবিধ তৃণ-প্রস্তর-
বৃক্ষাদিতে বিশ লক্ষবার, কুমি-কীটাদিতে এগার লক্ষবার, পক্ষীতে দশ লক্ষ
বার, নানাবিধ পশুতে ত্রিশ লক্ষবার এবং তৎপর সর্বশেষ মানুষের মধ্যেও
চারি লক্ষবার জীবাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । চারিলক্ষ মানুষের মধ্যেও
বনমানুষ, পার্শ্বতা জাতি, অঙ্গহীন, নাস্তিক, ত্রেজ, অস্ত্রাজ, শূদ্র, বৈশ্য,
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণাদি নানা প্রকার উচ্চনীচ কুলে জন্ম হইয়া থাকে । এই মানুষ-
দেহেই হরিভজন করিয়া মুক্ত হওয়া যায় । হরিভজন না করিলে ব্রাহ্মণ-জন্মের
পরও পুনর্বার অধঃপতিত হইয়া জলজাদি জন্ম লাভ করিতে হয় ।

কর্মানুসারে জন্ম-ক্রমের বিপর্যায়

আবার একটি কথা এ স্থলে বিচার্য্য যে, এইরূপ মানুষ-জন্মের ক্রমটীও
স্বতঃসিদ্ধ নহে । নিজকর্মানুযায়ী তাহার ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে । কেহ
বিতলের ছাদে উঠিতে যাইয়া পদজ্বলনে যেমন তুই চারি ধাপ নীচে পতিত
হন, সেইরূপ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মটী যথাযথ আচরিত হইলেই ক্রমোন্নতি ঘটে এবং
বিপরীত আচরণে অধঃপতিত হইতে হয়, এমন কি, মানুষ-দেহ হইতে পশু-
প্রস্তবাদি যে-কোনও দেহ লাভ হইয়া থাকে ।

শ্রীরাজর্ষি ভরত রাজর্ষির্ষ্য জ্ঞী-পুত্রাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া হরিভজনের
জন্ম বনে গমন করিয়াছিলেন । তথায় একটী হরিণ-শিশুর জীবন রক্ষা করিতে
গিয়া তাহার মাঠাতে মুগ্ধ হওয়ায় মৃত্যু-সময়েও হরিণ শিশুর চিন্তায় নিমগ্ন
থাকার পরভ্রমে নিজে হরিণ দেহ লাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু হরিভজনের ফলে
তিনি জাতিশ্রমের থাকায় হরিণ-জন্ম লাভ করিয়াও পূর্বজন্ম-বৃত্তান্ত তাহার স্মরণে
জাগরুক ছিল । তখন নিজের হরিণ-শিশুতে অসংজ্ঞরূপ ভ্রমধারণা তিরোহিত
হইল । জীব-রক্ষা বা জীব-সেবাই মানব-জন্মের চরম কর্তব্য নহে, ইহা তিনি
বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিলেন । তিনি পূর্বজন্মের ভজন-স্থানেই হরিণ-
দেহ অবস্থান ও হরি-চিন্তায় দিন অতিবাহিত করিয়া সেই হরিণ দেহান্তেই
ব্রাহ্মণ-পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া হরিভজন করেন এবং দেহান্তে হরিকে প্রাপ্ত

হন। এই জড় ভরতের দৃষ্টান্তে দেখা যায়, মানুষের জন্মের পর্যায় বা ক্রম সর্বত্র একভাবেই রক্ষিত হয় নাই। শ্রীভরত হরিণ-জন্মের পরই ব্রাহ্মণ-জন্ম লাভ করিলেন। অতঃপর গৌতম-শাণে প্রসূত হইয়াছিলেন এবং পরে শ্রীযামচন্দ্রের পাদস্পর্শে প্রসূত-জন্ম হইতে পুনরায় মানুষ জন্ম পাইলেন। সুতরাং মানুষ হইতে পশু ও পশু হইতে মানুষ এবং মানুষ হইতে প্রসূত ও প্রসূত হইতে মানুষ-জন্মের ক্রম বিপর্যয় দৃষ্টান্তের অর্থাৎ নাই।

মানুষ-দেহ অস্থির বা অস্থায়ী

মানুষ-জন্ম সুদুল্লভ হইলেও নৌতাগাক্রমে যখন প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন ইন্দ্রিয়-সুখ-উপভোগ করত বার্কিক্য-কালে হরিভজন করিলে ক্ষতি কি? কৌমার-কাল হইতেই হরিভজন করিবার কি প্রয়োজন? দৈত্য-বালকগণের এইরূপ প্রশ্ন হইবে মনে করিয়াই শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন—“তদপ্য-জ্ঞবন্”। হে দৈত্যবালকগণ! এই মানুষ-দেহ কতদিন থাকিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই—মৃত্যুকাল কাহারও কখন উপস্থিত হইবে, কেহ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। অল্প বয়সেই বহু লোককে মরিতে দেখা যায়। বার্কিক্যে ভ্রজন করিব বলিয়া বলিয়া থাকার পর কৌমারাদি বয়সে মৃত্যু হইলে আর তাগা তোষাদেব ভাগ্যে বটবে না। বিশেষতঃ এই বয়সই ভ্রজনের প্রকৃত সময়। যৌবনাদিতে বিষয়াসক্ত হইলে পর সে-তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া বার্কিক্যে কেহই ভ্রজনে প্রবৃত্ত হইতে পারে না।

কৌমার-কাল হইতে ভ্রজনের উপদেশের আর একটী কারণ দেখা যায়। কুস্তকাবের কাচা গাটীর হাড়িতে যে রেখাদি অঙ্কন করে, ঐ হাড়ি অগ্নিতে দক্ষীভূত হইলে তাহা উজ্জল হইয়া উঠে, কিছুতেই লুপ্ত হয় না, এবং দক্ষীভূত হাড়িতে আর কিছু অঙ্কন করা যায় না। মানুষের বেলায় সেইরূপ, বাল্যকালে বাহা শিক্ষা বা আচরণ করা যার অন্তরে তাহার একটী কঠোর দাগ পড়িয়া থাকে। কিছুতেই সে-দাগ অর্থাৎ সেই চিন্তা বা বিচার একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং বাল্যকালে আচরিত ভাগবত-ধর্ম যৌবনে বিষয়-আসক্তি বশে আবৃত হইলেও ভ্রমাজ্জাদিত বহির জ্ঞান সামান্য কারণ হইতেই জাগিয়া উঠিবে। কিন্তু বাল্যে অনাচরিত বিষয় বার্কিক্যে কখনও আচরণ করিতে সক্ষম হয় না; এমন কি, তাহা সম্ভবও হয় না। সেই জন্যই প্রহ্লাদ মহারাজ কৌমার-কাল হইতেই ভ্রজনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশীতার অমরবাণী

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪২৭ পৃষ্ঠার পর)

অষ্টম অধ্যায়

[অক্ষর ব্রহ্মযোগ]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—৪)

বিকার নাহিক যাহে

না হয় বিকাশ ।

তাহাই অক্ষর ব্রহ্ম

অনন্ত প্রকাশ ॥১॥

কহয়ে স্বভাব তাহে

যাহা মূলভাব ।

বুনিয়াদ আধ্যাত্মিক

ধরে নানা সাজ ॥২॥

জানিবে তাহাই ব্রহ্ম

যজ্ঞ হোম আদি ।

দেবতা হয়েক তুষ্ট

শুদ্ধশাস্ত্র বিধি ॥৩॥

অধিভূতক্ষর যাহা

ঘটে রূপান্তর ।

বিনাশন হয় তাহে

নিত্য নিরন্তর ॥৪॥

প্রকৃতির নানা খেলা

নানান বিকাশ ।

ইহাই অধিদৈবত

প্রাণীতে প্রকাশ ॥৫॥

অধিযজ্ঞ বাসুদেব

পুরুষ উত্তম ।

কেহ বলে ভগবান্

কৃষ্ণ জনার্দিন ॥৬॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৫—৭)

ডাকিলে শ্রীভগবানে

দিয়া প্রাণমন ।

দেখা যায় নিত্যজ্যোতি

পবিত্র পরম ॥৭॥

অস্তিম কালেতে লোক

যেই নাগ ডাকে ।

মরণের পরে তাহা

সঙ্গে সঙ্গে থাকে ॥৮॥

অতএব মন বুদ্ধি

করিয়া অর্পণ ।

যুক কর পার্থ তুমি

শুনহ বচন ॥৯॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৮—১৩)

পরমাত্মসাথে যোগ

জানিবে চূর্ণভ ।

যোগযুক্ত অভ্যাসেতে

হয়েক সম্ভব ॥১০॥

জ্যোতিস্বরূপ সর্বজ্ঞ

তিনি সূক্ষ্মতম ।

মন বুদ্ধির অগম্য

পুরুষ উত্তম ॥১১॥

রাখিয়া ইন্দ্রিয় বশে

ভজে ঐ চরণ ।

যোগ অস্ত্রে তনু ত্যজে

সাধু সুধীজন ॥১২॥

ব্রহ্মচারী বেদাশ্রয়ী

আর ভক্তগণ ।

এক মনে এক ধ্যানে

করয়ে বন্দন ॥১৩॥

রাখয়েক প্রাণবায়ু

ক্রয়ুগল মাঝে ।

এক অক্ষর শুঁ মন্ত্র

বলে নির্বিবাদে ॥১৪॥

করয়ে প্রভুর চিন্তা

তাহারি চিন্তন ।

এইরূপে প্রাণবায়ু

হয় নিঃসরণ ॥১৫॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৪—১৯)

ব্রহ্মার দিনের সাথে

জীবের জীবন ।

হইলে ব্রহ্মার রাত্রি

জীবের মরণ ॥১৬॥

এক মনে করে যেবা

প্রভুকে স্মরণ ।

সদাই পবিত্র মনে

তাহারি বন্দন ॥১৭॥

পুনর্জন্ম নাহি হয়

ধূলির ধরাতে ।

মৃত্যু হেথা সুনিশ্চিত

ঘাত প্রতিঘাতে ॥১৮॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২০—২২)

চরাচর ভূতগ্রাম

হয় বিনাশন ।

অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্ম

নিত্য সনাতন ॥১৯॥

তাহাই পরম ব্রহ্ম

অব্যক্ত অক্ষর ।

সেই স্থানে যায় যোগী

রহে অতঃপর ॥২০॥

চিন্তা যেথা অকপট

আছে শুদ্ধা ভক্তি ।

দিবা নিশি করে স্তুতি

মোক্ষের প্রস্তুতি ॥২১॥

ব্রহ্মবিদ ত্যজি দেহ

করে ব্রহ্মলাভ ।

কর্মযোগী যায় স্বর্গে

তথায় নিবাস ॥২২॥

উত্তরায়নের যাত্রী

করে ব্রহ্মলাভ ।

দক্ষিণায়নে গমন

মর্ত্যে আবির্ভাব ॥২৩॥

অচ্চিলোকে শুক্লগতি

লভে মোক্ষ পুণ্য ।

ধুমলোকে হ'লে গতি

লয় পুনর্জন্ম ॥২৪॥

জানিয়া উভয় পথ

যোগী মোক্ষকামী ।

ধরাধামে নাহি আসে

ধরা নিম্নগামী ॥২৫॥

বেদযজ্ঞ তপস্যাতে

আছে পুণ্যফল ।

যোগীজন ফলভাগী

প্রভুই সম্বল ॥২৬॥

শুন পার্থ, কহি এই

হও যোগে যুক্ত ।

করহ ঈশ্বর চিন্তা

অন্য চিন্তা ত্যাজ ॥২৭॥

নবম অধ্যায়

[রাজবিজ্ঞা রাজগুহযোগ]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—৩)

ভাবিয়া পার্থকে ভক্ত

অতি গুণবান ।

কহিলেন রাজবিজ্ঞা

কৃষ্ণ ভগবান্ ॥১॥

অতিগুহ্য ব্রহ্মজ্ঞান

এই রাজযোগ ।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানযুক্ত

দিবা দিবালোক ॥২॥

রাজবিজ্ঞা সুখসাধা

পবিত্র উত্তম ।

সকলে বুঝিতে পারে

তয়েক সক্ষম ॥৩॥

কানাদর কবে যেন

এ রাজ বিজ্ঞায় ।

ধরনীতে আসে যায়

করে হায় হায় ॥৪॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৪—৬)

প্রভুকে আশ্রয় করি

বাচে সব জীব ।

তিনিই মূলধার

তিনি সত্য শিব ॥৫॥

চবাচরে জীবকুলে

না করি নির্ভর ।

প্রকাশেন নিজ সত্তা

দয়াল ঈশ্বর ॥৬॥

বায়ু যথা না মিশিয়া

রহয়ে আকাশে ।

সেইরূপে সূক্ষ্ম বিশ্ব

প্রভুতে প্রকাশে ॥৭॥

ইন্দ্রিয়ের অগোচর

ব্যক্ত চরাচরে ।

নীরবে রহে প্রভু

জীবের অন্তরে ॥৮॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৭—১১)

রাখিয়া প্রকৃতি বশে

জগৎপালক ।

করয়েন জীবসৃষ্টি

জীবের ধারক ॥৯॥

বিলীন হয়েক জীব

ঘটিল প্রলয় ।

অব্যক্ত রহয়ে তাহা

ব্যক্ত নাহি হয় ॥১০॥

সৃষ্টি হয় নব ধরা

প্রভু উদাসীন ।

কিছু মধো না আবদ্ধে

নহে পরাধীন ॥১১॥

প্রকৃতি রচিছে বিশ্ব

স্বাবর জন্ম ।

অধ্যক্ষ রহেন প্রভু

চলে কার্যক্রম ॥১২॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১২—১৫)

নগদেহী মহেশ্বরে

করে অসম্মান ।

বিবেক বিগীন জন

ভামস প্রদান ॥১৩॥

তাহাদের কর্মরাজি

সবই নিহুলা ।

আশা বুঝা জ্ঞান মিছা

অশুরের দল ॥১৪॥

অব্যয় স্বরূপ জানি

যতেক মহাত্মা ।

পূজা করে ভগবানে

হইয়া একাত্মা ॥১৫॥

প্রণমীয়া ভক্তিভরে

গাহে জয়গান ।

দৃঢ়ব্রত যত্নশীল

ভক্তিভরা প্রাণ ॥১৬॥

কেহ পূজে বিশ্বরূপে

কেহ পৃথকত্বে ।

কেহ পূজে একত্বেতে

জানী জ্ঞানতত্ত্বে ॥১৭॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৬—১৯)

হোম তিনি যজ্ঞ তিনি

রোগের ঔষধ ।

অগ্নি তিনি মন্ত্র তিনি

তিনিই রক্ষক ॥১৮॥

পিতামাতা পিতামহ

তিনি গুণময় ।

ঋক-সাম-যজু তিনি

সৃষ্টি ও প্রাণয় ॥১৯॥

তিনি গতি, তিনি মুক্তি

তিনিই ওঁ-কার ।

অবিনাশী বীজ তিনি

বন্ধু সগাকার ॥২০॥

সূর্য্যরূপে প্রদানেন

ধরাতে উত্তাপ ।

আকর্ষণে বারিবিন্দু

হয় একসাথ ॥২১॥

তারপর সেইবারি

করেন প্রেরণ ।

বাঁচাতে জীবকুল

প্রভু সচেতন ॥২২॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২০—২৫)

ভূতলোক পিতৃলোক

আর দেবলোক ।

সবার উপরে রহে

পরম আলোক ॥২৩॥

পুণ্য রহে যতকাল

করে স্বর্গভোগ ।

পুণ্য যবে ক্ষীণতর

মর্তের দুর্ভোগ ॥২৪॥

পরম প্রভুকে ছাড়ি

অন্যকে ভজিলে ।

অন্যজন মিলে ভাগ্যে

প্রভু নাহি মিলে ॥২৫॥

একমনে যেবা ডাকে

সদা নিরন্তর ।

তাহার সকল ভার

লয়েন ঈশ্বর ॥১৬॥

যাহা রহিয়াছে সাথে

আসিবেক পরে ।

সবষ্ট সঁপিযা দিও

প্রভু বিশ্বস্তরে ॥১৭॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৬—২৭)

প্রদানিলে ফল ফল

সাথে পত্র-পুষ্প ।

গ্রহণ করেন প্রভু

হইয়া সন্তুষ্ট ॥১৮॥

অল্পতেই তুষ্ট তিনি

যদি বহে ভক্তি ।

ভক্তিয়ুক্ত চিত্তমাঝে

প্রভুর বসতি ॥১৯॥

খাতিয়া যাহা কিছু

করিবে গ্রহণ ।

প্রভুকে প্রথমে দিবে

করিবে অর্পণ ॥২০॥

তপ কর হোম কর

যাহা কর দর্শন ।

করিবে সকল কর্ম

বল ভগবান্ ॥২১॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৮—২৯)

সুভাস্ত ইষ্টানিষ্ট

কর্মের বোঝাটি ।

রাখিলে প্রভুর পায়ে

পাইবে সোয়াস্তি ॥২২॥

করেন গ্রহণ তিনি

ভক্ত কর্মভার ।

ভক্তের সুহৃদ তিনি

করুণা অপার ॥২৩॥

জগতের বন্ধু তিনি

কেহ নহে পর ।

সমভাবে দেখেন

তিনি যে ঈশ্বর ॥২৪॥

যে জন ভজনা করে

কৃষ্ণ ভগবান্ ।

প্রয়াণের পরে পায়

এচরণে স্থান ॥২৫॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৩০—৩১)

হইলেও ছরাচারী

বলে যদি হরি ।

পবিত্র নামের গুণ

লয় পাপ হরি ॥২৬॥

পাপ নাহি রহে কিছু

সিলাইয়া যায় ।

মুক্তি পায় পাণ্ডিজন

হরির কুপায় ॥২৭॥

ছরাচারিগণ শীঘ্র

হয় সদাচারী ।

নিত্যশাস্তি লভে চিন্তে

ঐ নাম উচ্চারী ॥২৮॥

নাহি হয় কদাচন

ভক্তের বিনাশ ।

প্রতিজ্ঞা করেন প্রভু

পার্থে রাখি পাশ ॥৩৯॥

(স্লোক-সংখ্যা : ৩২—৩৪)

শূত্র বৈশ্য নারীকুল

লয় কৃষ্ণনাম ।

ইহলোক করে জয়

রহি ইহধাম ॥৪০॥

সহজেই লভ্য প্রভু

পার্থ ধনঞ্জয়ে ।

পার্থ অতি পুণ্যবান

পুণ্যের আশয়ে ॥৪১॥

প্রভুতে রাখহ মন

হও প্রভু-ভক্ত ।

প্রভু নামে কর যজ্ঞ

কর আত্মা যুক্ত ॥৪২॥

ভজ কৃষ্ণ নারায়ণে

কর নমস্কার ।

করিবেন কৃপা ভিঁমি

ঘুচিবে আঁধার ॥৪৩॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল,

কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্ত-বিভাগের পদস্থ অফিসার,
নিউদিল্লী ।

উদ্ধারের পথ

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৩২ পৃষ্ঠার পর)

ভগবৎ পীঠাবরণ-দেবতা মন্ডো ভূতাদির অবস্থান নাই, সুতরাং ভূতাদির পূজা করবে না । মত-মাংস দ্বারা পূজা করবে না—

যক্ষাশাঞ্চ পিশাচানাং মতুমাংসভূজাং তথা ।

দিবৌকসাং পূজনন্তু অরাণাম-সমং স্মৃতম্ ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উত্তরখণ্ড)

এমতাবস্থায় ভগবানের পীঠাবরণ পূজায় যে দেবতাগণ আছেন, তাঁদের পূজাই বিহিত, কিন্তু পক্ষাতরে প্রাপ্ত ভগতে দেবতাগণের সত্ত্ব ইচ্ছাজ্ঞানে পূজা বিহিত নহে ।

শারীরিক, সামাজিক প্রভৃতির পবিত্রতা রক্ষা করা, কুজ্ঞতা স্বীকার করা, রোগীকে ঔষধ বিতরণ প্রভৃতি কার্যসকল জীবের দেহ-মনোধর্ম নষ্টকর এবং বদ্ধ-দশাকে কেন্দ্র করে উদ্ভিত হওয়ায় উক্ত কার্যাদির নিত্যত্ব নাই, বরং ঐ কার্য-গুলিকে ব্যবহারিক বা ঔপচারিকরূপে স্বীকার করা যায় । শ্রীশ্রীল ভক্তি-

বিনোদ ঠাকুর মহাশয় “ঐক্য-ধর্ম” গ্রন্থে তথাকথিত কর্মকাণ্ডের নিত্য-নৈমিত্তিক বিভাগ-সম্পর্কে তাৎপর্য বিচার করে লিখিয়াছেন,—“নিত্যধর্ম,” ‘নিত্যকর্ম’, ‘নিত্যতত্ত্ব’, ‘নিত্যসত্য’ প্রভৃতি শব্দগুলি কেবল জীবের নিত্যক চিন্ময় অবস্থা ব্যতীত আর কিছুতেই ব্যবহৃত হ’তে পারে না। তবে যে উপায়-বিচারে কর্মকে লক্ষ্য করে ‘নিত্য’ শব্দ প্রয়োগ করা হয়, সে কেবল সংসারে নিত্য-তত্ত্বের দূর উদ্দেশ্য ব’লে ঔপচারিক-ভাবে কর্মকে নিত্য বলা যায়। কর্ম কখনই নিত্য নয়। কর্ম যখন কর্মযোগ দ্বারা জ্ঞানকে অহুমত্বান করে এবং জ্ঞান ভক্তিকে উদ্দেশ্য করে, তখনই কর্ম ও জ্ঞান ঔপচারিক-ভাবে নিত্য বলে অভিহিত হয়। ব্রাহ্মণের শব্দ্য-বন্দনাকে ‘নিত্যকর্ম’ বললে এইমাত্র বুঝায় যে, পারীৱিক-ভৌতিক-ক্রিয়ার মধ্যে দূর হ’তে উদ্দেশ্য করবার য-পন্থা করা হয়েছে, তাহা নিত্য সাধক বলে নিত্য, বস্তুতঃ নিত্য নয়। ঈহার নাম উপচার।

বস্তুতঃ বিচার করুণে জীবের পক্ষে কৃষ্ণ-প্রেমই একমাত্র নিত্যকর্ম। ঈহার তাত্ত্বিক নাম বিত্তক চিদমুখীপন। সেই কার্য সাধবার জন্ত যে জড়ীর কার্য অবলম্বন করা যায়, তাহা নিত্যকর্মের সহায়, অতএব নিত্য বলে যে অভিধান হয়েছে, তাহাতে দোষ নেই। তাত্ত্বিকভাবে দেখলে ‘নিত্য’ না বপে ‘নৈমিত্তিক’ বলাই ভাল। কর্ম-ব্যাপারে যে নিত্য-নৈমিত্তিক-বিভাগ, তাহা ব্যবহারিক মাত্র,—তাত্ত্বিক নয়।”

সদ্বা-বন্দনাদি নিত্যকর্ম, গিত-তর্পণাদি নৈমিত্তিক কর্ম এবং কাম্য কর্ম সকল অবশ্যই প্রাকৃত। কাম্য কর্মের যতই নিত্যকর্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম প্রকৃত প্রস্তাবে সকাম; কেননা কর্মাদির অভিমানে চতুর্দশ ভুবনের আশ্রিত বা দেহের অভিনিবেশ বিস্তমান।

যখন কর্মে ভক্তির প্রাধান্য থাকে না, তখন তাহাকেই সাধারণতঃ কর্ম বলা হয়। সকাম কর্মমাত্রই অনিত্য সুখকামী। রজোগুণাধীন বাস্তবিকাই সকাম কর্মসম্পন্ন হয়। সকাম কর্মীগণ ভগবানের কাছে কিছু আদায়ের জন্ত মন্ত্রের দ্বারা প্রার্থনা জানান,—“ধনং দেহি, জয়ং দেহিং, দ্রিষো জহি, মনোরমাং ভাৰ্য্যাং দেহি”। এইরূপ ‘দেহি’ ‘দেহি’ প্রার্থনার মাধ্যমে আশু ভোগ-সুখ পা'বার চেষ্টা ও সুখ বিনাশের জন্ম মেষ্ঠ। কর্মী-সম্প্রদায়ের দীর্ঘর-বিমুখতার নিদর্শন। সকাম কর্মের অনুষ্ঠানে কর্মের বন্ধন আছে। সকাম কর্মীগণ কর্মের বন্ধনে জড়িত হ’য়ে পাল-পুণ্য মিশ্রিতফল ভোগ করেন। আর কর্মের

ফল পা'বার জন্ত প্রাকৃত কামনা বর্জন করে ভগবানের সন্তুষ্টির জন্ত কৰ্ম কর্ণে সেই নিষ্কাম কৰ্মের বন্ধন হয় না। গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন,—

“যজ্ঞার্থং কৰ্মণোহুত্ব লোকোহয়ং কৰ্মবন্ধনঃ।

তদর্থং কৰ্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।” (গীতা ৩।৯)

অর্থঃ—“হে কৌন্তেয়! যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণুর্নিত কৰ্ম ভিন্ন অন্য কৰ্মের দ্বারা এই মনুগ্রলোক কৰ্মবন্ধন প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বিষ্ণুদ্দেশেই ফলাকাজ্জা রহিত হ'য়ে কৰ্মের সম্যক আচরণ কর।”

ভগবানের সন্তোষ বিধান বাতিরেকে আমরা যতই নিঃস্বার্থপর হই না কেন, তা'তে কর্তৃত্বাভিমান প্রভৃতি মায়িক বন্ধন থেকেই যায়। মায়িক-বন্ধন মুক্ত হ'য়ে ভগবৎপাদপদ্ম লাভ না হওয়া পর্যন্ত জীবের কল্যাণ নেই। ভগবৎপাদপদ্ম পা'বার উদ্দেশ্য থাকলে ভগবানের সেবানুকূল নিষ্কাম কৰ্ম করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইতর কামনা ত্যাগ করে ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে কৰ্ম করাই নিষ্কাম কৰ্ম। ভগবানের সেবা বাতিরেকে কৰ্ম্মানুষ্ঠান আদৌ কর্তব্য নয়। শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা দিতেছেন,—

“অকামঃ সৰ্বকামো বা মোক্ষকাম উদ্বারদীঃ।

তীব্রো ভক্তিবোগেন যজ্ঞেত পুরুষঃ পরম্ ॥ (ভাঃ ২।৩।১০)

অর্থঃ—“যে কৰ্মই করুন অর্থাৎ মোক্ষকাম, অকাম বা সৰ্বকাম হ'য়ে যে অহুষ্ঠানই করুন তাহাতে পরমপুরুষ পরমেশ্বরের যজ্ঞ তীব্র ভক্তিবোগের দ্বারা করবেন।”

এ জগতে বা' কিছু আছে, সবই ভগবানের সেবার উপকরণ, কাজেই তাঁর বস্তু তাঁকে না দিয়ে আমরা গ্রহণ করি বা ভোগ করি, তা'হলে আমরা চোরের ন্যায় অপরাধী বা পাপী হ'য়ে যাবো। রাজার দ্রব্য কেহ চুরি করলে রাজার লোক যেমন সেই চোরকে কারাগারে বদ্ধ রেখে সাজা দেয়, তেমনি আমরা ভগবানের দ্রব্য চুরি ক'রে নিজেরা ভোগ করার জন্ত ভগবানের বহিঃস্বাশক্তি ভব-কারাগারের রক্ষয়িত্রী মায়াব দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে এই ভব-কারাগারের ত্রিতাপ-যন্ত্রণা ভোগ করছি। অতএব ত্রিতাপ-জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পা'বার জন্য কেনই বা ভগবানের সেবা করব না? কেনই বা সমস্ত কৰ্ম তাঁকে অর্পণ করব না? ভগবানের পাদপদ্মে কৰ্ম্মর্পণ কি ভক্তি ছাড়া হ'তে পারে? তাই ভগবানের অপিত নিষ্কাম কৰ্মকে অভিধেয় বা কৰ্ম-মিশ্রা ভক্তির পর্যায়ে গণ্য করা হয়; কিন্তু কৰ্ম্মর্পণে

দেহের আবেশ থাকায় শুদ্ধজ্ঞের সঙ্গ ব্যতীত সাক্ষাৎভক্তি হয় না। গীতায় শ্রীভগবান্ আরও বলেছেন,—

“যং করোষি যদশ্বাসি যজ্জুগোষি দদাসি যং।

যত্তপন্তসি কোন্তেষ তৎকুরুষ মদর্পণম্ ॥ (গীতা ৯।২৭)

অর্থাৎ—“হে কোন্তেষ! তুমি যে কিছু কর্ম কর, যে কিছু দ্রব্য ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যে কিছু তপস্তা কর, সে সকলই আমাতে সমর্পণ কর।” বাব্তীয় কর্ম সমর্পণের জন্য ভগবানের উক্ত প্রকার বাক্য শোক-শিকার নিমিত্তই উপদিষ্ট। ভগবানের উক্ত উপদেশকেও ভক্তি-যোগ বলা যায় না। উহা কর্মযোগ মাত্র। শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের কথিত “পুংসাপিত বিষ্ণো ভক্তিশেষবলক্ষণা—“শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামিপাদ বলেছেন,—কষ্ণেরই জন্ত—তাহারই সুখের জন্ত এইরূপ ভাবনা অর্থাৎ ধ্যান বা আবেশযুক্ত যে ভক্তি তাহা যদি পূর্বে অর্পিত হ’য়ে কৃত হয়, তবেই তাহা “সাক্ষাৎভক্তি”। আর অস্থানসমূহ কৃত হ’য়ে পরে অর্পিত হ’লে তাহা সাক্ষাৎ ভক্তি নহে, তাহা কৰ্ম্যার্পণ।” সাক্ষাৎ ভক্তিতে ফলভোগ ও ফলত্যাগ কামনা থাকে না। এক কথায় ভগবানের জন্য কর্মই ভক্তি। কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ভগবৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুবিচার-পূর্ণ সিদ্ধান্তের কিয়দংশ উল্লেখ কর্ত্তি,—“কায়-মনো-বাক্য এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত প্রভৃতি সর্বইন্দ্রিয়ের দ্বারা সকল কার্য্য ভগবানের সেবার উদ্দেশে অর্পিত হ’লে উচ্চাঙ্গিকে কৰ্ম্মীর সাধারণ ভোগপর ‘ধর্ম্ম’ বলে জানতে হবে না। ভগবানের প্রতি সেই সকল কৰ্ম্মের ফল সমর্পিত হ’লে জীবের ভগবৎ বিমুখতা-ক্রমে কৰ্ম্ম-প্রহিতা-জনিত অমঙ্গলসমূহ বন্ধরীষকে স্পর্শ করিতে পারে না। স্বরূপাবস্থিত জীবসকল কার্য্যই ভগবৎ-সেবনোদ্দেশে ক’রে থাকেন এবং তাহার আদর্শানুসরণ-ক্রমে উন্নত হ’বার চেষ্টায় স্কৃতিমন্ত কন্মি-সম্প্রদায় কর্ম্ম-জন্ম ফলসমূহ ভগবৎপাদপদ্মে সমর্পণ করেন। যদিও ইহা কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তি পর্য্যায়ের গণিত, তথাপি ক্রমোন্নত-বশতঃ শুদ্ধভক্তিতে পর্য্যবসিত করা’বে। কর্ম্মকাণ্ডের ফল ভোগবাদ হ’তে ক্রমপন্থায় অনর্থসমূহ নিবৃত্ত হ’লে কেবলাভক্তি সর্বতোভাবে মঙ্গল বিধায় কর্বে।

নিষ্কাম-কৰ্ম্মীগণ ইন্দ্রিয়-তর্পণ অধিক্রম ক’বে নিত্যানন্দ লাভের জন্য ভক্তিপথাক্রম হন বলে তাঁদের জ্ঞানী ও যোগীর জ্ঞায় যোগী বলা হয়। সাকাম কৰ্ম্মীগণ ইন্দ্রিয়-তর্পণ অতিক্রম করতে অসমর্থ হয়,—তাই তাঁদের

যোগী বলা হয় না। সকাম কর্মীদের আত্মস্থ ত্যাগ সম্পর্কিত কৃচ্ছসাধন কর্মীজুষ্ঠান তপস্যা মধ্যে পরিগণিত। অহরগণ সকাম কর্মী,—তারা তপস্যা দ্বারা সংসারের সুখভোগ ও স্বর্গসুখভোগ-বাঞ্ছা পোষণ করতেন। কর্মের ত্রিবিধ প্রসঙ্গে ভগবান বলেছেন,—

“মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম তৎ।

রাজসং ফলমক্ষলং হিংসা-প্রায়াদি ভায়সম্।”

(ভাঃ ১১।২।২৩)

অর্থাৎ—“আমাতে অর্পিত নিষ্কাম নিত্যকর্মই সাত্ত্বিক। ফল সঙ্কলয়িত্ব কর্মই রাজস এবং হিংসা ও দস্ত-মাৎসর্যাদি মূঢ়ে কৃত কর্ম ভায়স। কর্ম করার প্রবণতা, কর্মের অহুষ্ঠান, কর্মের ফলফল প্রভৃতি সত্ত্ব-রজঃ-তম—এই প্রাকৃত গুণত্রয়ের অন্তর্গত।”

নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয়। তৎপরে চিত্ত শুদ্ধিতা নির্ভেদ-ব্রহ্মসদ্ব্যন জ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞানালোচনা কর্তে কর্তে ধ্যানযোগ অতিক্রম করে নির্বিশেষ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। এতদ্বিষয়ে গীতার বাক্য প্রশংসন-যোগ্য। যথা—“যোগযুক্তো যুনিঃস্বপ্নং চিৎপাদিগচ্ছতি”—অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মীবান্ ব্যক্তি জ্ঞানী হ'য়ে ব্রহ্মকে নীহ্ন লাভ করেন। এইভাবে সাত্ত্বিক নিষ্কাম-কর্মী জ্ঞানযোগের মাধ্যমে ভগবানের অঙ্গকান্তি নির্বিশেষ ব্রহ্মকে লাভ করেন। কিন্তু ব্রহ্মের আশ্রয় স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে লাভ কর্তে সমর্থ হন না। গীতার ‘ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্’—শ্লোকে ভগবান্ নিজেকে ব্রহ্মের (নির্বিশেষ) প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় এবং মোক্ষের ও একমাত্র আশ্রয় বলে ব্যক্ত করেছেন। নির্বিশেষ চিন্তায় চিন্তাব জড়ে আবর্তিত হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব। নিষ্কাম-কর্মী জ্ঞানপ্রায়ে ক্রম-পন্থায় ত্রিগুণের সানাবস্থা কারণ সমুদ্র অতিক্রম করে নির্বিশেষ ব্রহ্মলোকে গেলেও, সেই ব্রহ্মলোকে চিদ-বৈশিষ্ট্য নেই এবং ভক্তিরও স্থান নেই। ব্রহ্মলোকেরও উর্দ্ধে অপ্রাকৃত নিগুণ স্থান বৈকুণ্ঠ-গোলোকধাম। শুদ্ধভক্তির আশ্রয় ব্যতীত নির্বিশেষতা বিদূরিত হ'য়ে নিগুণ বৈকুণ্ঠ-গোলোকধামে যাওয়া যায় না। অতএব সকাম কর্মের দ্বারা স্বর্গলাভ এবং নিষ্কাম কর্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। ভগবৎ সেবা ছেড়ে কর্মকে বড় মনে করে দৌড়ালে অমঙ্গল অনিবার্য।

ইষ্টাপূর্ত, দান প্রভৃতি পুণ্যকর্মকারী কর্মীগণ মৃত্যুর পর দুঃখান বা পিতৃদান-দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে রবি, কৃষ্ণগণ, নৃসিংহারন ছয়মাস, পিতৃলোক,

আকাশ, চন্দ্রমা ও তরুণলক্ষিত স্বর্গলোক ক্রমপথে প্রাপ্ত হয় এবং পুণ্য-অবসানে পুনরায় ক্রমপথে আবর্তন করে। প্রমাণ, যথা—

“ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ সন্মাসা দক্ষিণায়নম্।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ (গীতা ৮।২৫)

অর্থাৎ—“ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ছয়মাসরূপ দক্ষিণায়ন-কালে তরুণলক্ষিত দেবতার মার্গে গমনশীল কৰ্ম্মযোগিগণ চন্দ্র-জ্যোতিঃরূপ স্বর্গলোক লাভ ক’রে উপভোগান্তে সংসারে পুনরাবর্ত্তন করে।

আবার ‘ছান্দোগ্য’ প্রভৃতি শাস্ত্র-মতে, পুণ্যকর্ম্মের ফলে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণ, বৈবরিক উন্নতি এবং পাপ কর্ম্মের ফলে শূণাল. কুতুরাদি ইতর প্রাণী-রূপেও জন্ম. দারিদ্র্যতা প্রভৃতি হ’য়ে থাকে। কর্ম্মাগণের কর্ম্মমার্গের অবলম্বনে অনিত্যলোকে যাওয়াত, অনিত্য বিষয়-স্বখভোগ অথবা অনিত্য জন্ম-পরিগ্রহ বা অনিত্য হুঃখাদি পে’তে হয়। জীব মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পিতৃধান মার্গ ও জন্ম-মৃত্যু চক্রমার্গের মাধ্যমে এই সংসায়ে যাতায়াত করতে হয়। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিত্বষণ

স্বধামগত শ্রী শ্রীমদ্ রাসবিহারীদাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব

মেদিনীপুর জেলাস্বর্গত পিছলদাগ্রাম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে ধস্তা হইয়াছেন। কালপ্রভাবে সে-স্থানের জনগণের মুখে মুখে মহাপ্রভুর পাদ-স্পর্শের কথা শুনা যাইত কিন্তু গোরার আচার-বিচারহীন হইয়া প্রভুব সেবা-যত্ন ভুলিয়া গিয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য নিত্যানীলাশ্রমি শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ পিছলদায় শ্রীমদ্মহাপ্রভুর সেবাপ্রকাশ-তানসে একটি শ্রীগৌড়ীয় মঠ স্থাপন করেন। শ্রীশ্রী মহারাজের প্রচারের ফলে পিছলদা ও আরও অন্যান্য গ্রাম হইতে বহু ছেলে শ্রীনাম সঙ্কীর্ণনে আকৃষ্ট হইয়া মঠবাসী হইবার সৌভাগ্য ও সুযোগ লাভ করিয়াছেন। অনেকে শ্রীল মহারাজের কাছে শ্রীনাম ও দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আদর্শ গৃহস্থ জীবন যাপন করিতেছেন। সকলেরই শ্রীভক্তিলভ্যস্থল এই শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ।

বিগত ২রা কার্তিক (ইংরাজী ২০।১০।৮২) বুধবার রাত্রি ১১ ঘটিকায় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত শ্রীপিছলদা গোড়ীয় মঠের মঠ-রক্ষক পূজ্যপাদ শ্রীমৎ রাসবিহারীদাস বাবাজী মহারাজ প্রায় ৭২ বৎসর বয়ঃক্রমে তিরোহিত হন। তাঁহার বিরহে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির একজন প্রবীণ ও বিচক্ষণ নিরুপকট সেবককে হারাইয়াছেন।

মঠস্থ সেবকবৃন্দ ও গ্রামবাসী ভক্তবৃন্দের উত্তোগে শ্রীপিছলদা শাদপীঠের পার্শ্ববর্তী স্থানে তাঁহার অপ্রাকৃত দেহ সমাধিস্থ করা হয় এবং যথাসময়ে তাঁহার বিরহ-মহোৎসবও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে বিপুল-ভাবে ঐ স্মৃতি-মহোৎসব করিবার জন্ত শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির কর্তৃপক্ষ-বৃন্দ উত্তোগ করেন। তাই গত ২২শে চৈত্র (ইং ১৩।৪।৮৩) বুধবার দিবসে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত উক্ত বিরহ-স্মৃতি-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনেক সেবকই এই মঠের পর্যায়-ক্রমে সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ সর্বাপেক্ষা অধিক দিন সেবার দায়িত্ব লাভ করিয়া কায়-মন-বাক্যে সে-সুযোগের সদ-ব্যবহার করিয়াছেন। “যোগাত্মা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা সার।” শ্রীগুরু প্রতি যে আশ্রিত্তি নিবেদন, বাবাজী মহারাজের সেবা-প্রবণতা তাহারই উজ্জ্বল উদাহরণ। কাহারও অধিক যোগাত্মা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা যদি গুরুবৈষ্ণব-সেবায় নিয়োজিত না হয় তবে উহা নিতান্ত অকারণ। আবার যার যতটুকু যোগাত্মা আছে তাহা দিয়াই যদি তিনি মনে প্রাণে সেবা করেন তবে অল্পেতেই ধন্ত—কৃতার্থ।

সমিতির বর্ত্তমান উপ-সভাপতি, সম্পাদক ও অন্যান্য সদস্যগণ বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব পালনের জন্য ২২শে চৈত্র, ১৩৮৯ ; ১৩ই এপ্রিল, ১৯৮৩, বুধবার দিন নির্ধারিত করিয়াছেন। কারণ পিছলদা গ্রামবাসী-গণ এখনও অমাবস্তা, পুণিমা, একাদশী ও শ্রীহরি-গুরুর আবির্ভাব-তিথিতে তলকর্ষণ করেন না। যাহূশ যেমন ছুটির দিন প্রার্থনা করেন ; আত্মকণ বিচার-ধারায় উক্ত তিথিগুলিতে বঙ্গদেশের ছুটি ও নিজেদেরও ইষ্টগোষ্ঠীর সুযোগ হয়। এইদিন স্থানীয় জনগণ সকল হইতেই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার সুযোগ পান। গ্রামবাসীর উত্তোগে ও সম্পাদক শ্রীজ নারায়ণ মহারাজের ইচ্ছায় শ্রীপিছলদা গোড়ীয় মঠের আরও উন্নতিকল্পে একটি কার্য্যকরী সভার আয়োজন হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত নারায়ণ মহারাজ

সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া সভার কার্য পরিচালনা করেন। শ্রীমন্দির-নিৰ্মাণ, নিত্যসেবার অর্হু পরিচালনা, বাবাজী মহারাজের স্থানে উপযুক্ত সেবক নিয়োগকরণ প্রভৃতি আলোচ্য-বিষয় ছিল। পরিশেষে সর্বসম্মতি ক্রমে শ্রীপাদ গোরাচরণ ব্রহ্মচারী প্রভু ভবায় মুখ্য সেবকরূপে নিযুক্ত হন। সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত সমাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক; শ্রী কানাইলাল ব্রহ্মচারী, রাগালঙ্কার; শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিবিকাশ; ও শ্রীমঠের শুভানুধ্যায়ী গৃহস্বামী বহু ভক্তগণ।

মধ্যাহ্নে একটি বিরহ-সভার আয়োজন হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পূজ্যপাদ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত নারায়ণ মহারাজজী, সভাপতি মহারাজের নির্দেশক্রমে প্রথমে শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত সমাসী মহারাজ, শ্রীল বাবাজী মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহার গুরুবৈষ্ণব-সেবা-প্রণবতা বর্ণনমুখে—“যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা সার।” বাক্যটি মৰ্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। মাঝখানে শ্রীল নারায়ণ মহারাজের শিলায় শিখিত শ্রীপাদ শুভানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতার মুখবন্ধন করেন। পশ্চাৎ শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত আচার্য্য মহারাজ ও পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী প্রভু বাবাজী মহারাজের ভক্তনাদর্শ এবং বিরহ-শব্দের ব্যাখ্যা করেন। পরিশেষে সভাপতি-মহারাজ বিরহে যে-ক্রন্দন—উহা আনন্দেরই হেতু; তাহা একটি যাত্রাভিনয়ের করুণ দৃশ্যের উদাহরণ-দ্বারা বুঝাইয়া দেন। সভার শেষে বিশেষ ভোগরাগে শ্রীবিগ্রহগণের ভোগারতি হয়। সমাগত সকলের নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রদান বিতরণ করিয়া শ্রীমদ্ বাবাজী মহারাজের জয়ধ্বনি কীৰ্ত্তিত হয়।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

বিরহ-বার্তা

নিগত ৯ই চৈত্র (ইং ২৫শে মার্চ) বুধস্পতিবার রাত্রি ১টা ১০ মিঃ এ শ্রীমতী সুশীলা বালা দেবী কলিকতায় (টেংগায়) সজ্জানে ১০৫ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়া সাধনোচিত-ধামে গমন করিয়াছেন। তিনি প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে পতিহীনা হইয়া অগণগুরু শ্রীল প্রভুপাদের নিকট

শ্রীনাথ ও দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিষ্ঠার সহিত ৬৫-বৎসর যাবত হরিতত্ত্বজন করিতে করিতে হরিবাসর-দিবসে ইহলোক ত্যাগ করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করেন।

বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত যশোহর জেলার দেয়াড়াগ্রামে বসু-পরিবারে শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুব জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীল হরিশদ দাসাধিকারী প্রভুর সহিত বৈবাহিক সূত্র আবদ্ধ হন। তাঁর পিতৃকুল ডায়মণ্ডহার-বারের অন্তর্গত সরিষাগ্রামের জমিদার বংশ ছিলেন। পিতার নাম শ্রীকেশদার নাথ মিত্র। পরবর্ত্তীকালে তাহারা সকলেই এমন কি তাহাদের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীল গোবিন্দপ্রভু ও শ্রীমতী রাধারানীও শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রিত হইয়া ত্রৈকান্তিকভাবে নিষ্ঠার সহিত সাধন-ভজন করিতে করিতে মধ্যম কণ্ঠা ছাড়া সকলেই বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিয়াছেন। তাঁর চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল বসু পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের 'নরহরি-তোষণ' ও আনন্দপাড়া (বনগ্রামের নিকট) 'নরহরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়' স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত মঠে বহু অর্থ সাহায্যাদিও করিতেন।

বর্তমানে শ্রীমতী সুশীলা বাল্য দেবীর পুত্রদম (দ্বিতীয় ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ) শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র বসু ও নিতাই বসু (দাসাধিকারী) জীবিত আছেন। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীনিতাই দাসাধিকারী শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ-এর চরণাশ্রিত হইয়া শ্রীনাথ ও দীক্ষাদি গ্রহণ করিয়াছেন। উহার মাতার পারলৌকিক কার্য্যাদি বৈষ্ণবমতে সুসম্পন্ন করেন। গত ১৯শে চৈত্র (ইং ৩রা এপ্রিল) রবিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান আচার্য্যদের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ ; ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, তাহাজাড়া জারও কয়েক মহারাজ এবং ব্রহ্মচারিবৃন্দ ও বিশিষ্ট ভক্তগণ তথা অতিথিবৃন্দ উক্ত অলুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া তাঁর পারলৌকিক-কার্য্য সুসম্পন্ন করায়। উক্ত দিবসে সকল ভক্তগণ ও আগত সকলকে মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করেন।

—বিশেষ সংবাদদাতা

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও অংগোচনা—গত ১৫ই পৌষ ১৩৮৯, ইং ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮২ শুক্রবার, বৈকাল সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় “বঙ্গীয় ভাগবত সমাজ” গৌরীবাড়ী, সি, আই, টি, পার্ক, কলিকাতা-৪ তাঁহাদের ষড়বিংশতি-তম অধিবেশনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণের ক্ষুদ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্য-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবাদেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজকে বিশেষ আমন্ত্রণ করেন। তাঁহাদের আহ্বানে তথায় উপস্থিত হইয়া স্বামীজী ভাগবতপাঠের মুখবন্ধ বা সূচনা-অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রোতৃগুলীকে ভাগবত সমাজের নামকরণ “বঙ্গীয়” রাখা হইয়াছে কেন এবং এই নামকরণকে আমরা কোন্ বিচারে গ্রহণ করিতে পারি তাহা বর্ণন করেন। ভাগবত কোন দেশ-কাল-ভাষায় সীমিত-বিষয় নহে। ‘বঙ্গীয়’ ভাগবত বলিলে যেন বাংলার ভাগবত বা বঙ্গভাষীর ভাগবত এইরূপ ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে ভাগবতকে আমরা বিচার না করি। ভাগবত নিখিল বিশ্বের সমাক কণাশংকারী শ্রীভাগবত বিশ্বদ্রোহীকেও পরমপবিত্র করিয়া পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি দান করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তি সর্বদ্বীবেই হিতৈষী বান্ধব। শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষায় বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা প্রাচ্য, পাশ্চাত্য কোন স্থান বা জনগত ভেদ নাই। তবে গুণ ও কর্ম্মানুসারে মনুষ্যসমাজকে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম যথাযথ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীল ব্যাসদেবের মহাভাষ্যতে বলিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভাগবতে বিশেষরূপে নির্ণিত হইয়া তত্পরি বর্ণাশ্রমের স্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তদেরই শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শিত হইয়াছে। গীতোকৃত—“স্ত্রীয়া বৈশ্ণ তথা শূদ্রা ত্রেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ভগবদ্ বাক্য ভাগবতে ভক্ত ভগবানের ভাববিনিময়ে উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। গীতার ভক্ত ভগবানে পরিপ্রপন্ন ও উপদেশ ভাগবতে আচরিত হইয়া মহাভাগবত শ্রীকৃষ্ণদেব কর্তৃক ভক্তভাগবত শ্রীপরীক্ষিত মহারাজকে পণ্ডিতপুত্র করিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় “সেই ভাগবত হয় দুই ভ প্রকার। এক গ্রন্থ ভাগবত, ভক্ত ভাগবত আর ॥” সুতরাং “বঙ্গীয় ভাগবত সমাজের” প্রতিষ্ঠাতাগণের যদি উদ্দেশ্য হয় নিখিল বিশ্ববরেণ্য শ্রীমদ্ভাগবতের আদর-পরায়ণ বাংলার বঙ্গভাষী ভক্তসমাজ—তবেই এ অনুষ্ঠান সার্থক ও কৃতকৃতার্থ।

স্বামীজীর শ্রীমদ্ ভাগবতের মর্ম্মস্পর্শী ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ভাগবত সমাজ তাঁহাকে প্রদ্বার্ষ্য নিবেদনপুষ্পক পুংঃ শ্রবণের আশা পোষণ করিয়াছেন। ১লা মাঘ, ১৩৮৯, ১৭ই জ্যৈষ্ঠারী ১৯৮৩, সোমবার বেলঘরিয়ার শরৎপল্লী হরি-

সভায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ বৈকাল ৫ ঘটিকায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ঐ দিন গৌরপার্বদ শ্রীল জীবগোস্বামী ও শ্রীজগদীশ পণ্ডিত মহাশয়ের তিরোভাব-
তিথি ছিল। কথা-প্রসঙ্গে স্বামীজী বর্তমান শিক্ষা ও শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতির
শিক্ষা সংস্কৃতি এবং গুরুবর্গের ঘরানার রক্ষণে অমানি মানদ তৃণাদপি শ্লোকের
ব্যাখ্যা করেন।

১৪ই মাঘ, ২৮শে জামুয়ারী ১৯৮৩, শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীধাম নবদ্বীপ শহরে
শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যভিষেক যাত্রা উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা মহাশয়ের বাস-
ভবনে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে ১০ম
স্কন্ধান্তর্গত ৮ম অঃ গর্গাচার্য্য কর্তৃক শ্রীরাম-কৃষ্ণের নামকরণ-বিষয় শ্রীগৌড়ীয়
বেদান্ত সমিতির আচার্য্য মহারাজ ব্যাখ্যা করেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর পুরোভাগে
উপবিষ্ট গৃহকর্তা মহাশয়ের কুলগুরু ভাগবত পাঠক মহাশয় স্বামীজীর পাঠের
যথাযথ বর্ণনা শব্দবিজ্ঞাস প্রভৃতি প্রশংসা করিয়া বৈষ্ণবোচিত ধন্যবাদ
জ্ঞাপনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

১৫ই মাঘ, ১৩৮৯ সাল, ইং ২৯শে জামুয়ারী ১৯৮৩, শনিবার সন্ধ্যা
৬ ঘটিকায় ৩৭ এর পল্লী পাটোয়ার বাগান বৈঠকখানা রোড, সম্মিলিত
হরিনাম সঙ্কীর্্তন সম্প্রদায় আয়োজিত ২৩তম বার্ষিক অনুষ্ঠানের উত্ত-
উদ্বোধনীতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্
ভক্তিবাদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজকে সভাপতিরূপে বরণ করেন। ঐদিন
ভাষ্যদেয় প্রধান অতিথি ছিলেন বনৌজ ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন
উপাচার্য্য ডঃ রমা চৌধুরী ও অন্যান্য অতিথির মধ্যে ডাঃ কে, পি, ঘোষ ও
শ্রীজগদীশ সাহা ভক্তিবৃষণ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য সঙ্কল্পবৃন্দ।

ঐ দিন অপরারে কলিকাতাস্থ শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ হইতে
শ্রীল গুরুমহারাজের সাথে আমরা অনেকে প্রথমে শ্রীসারদাপ্রসাদ সাহা
মহাশয়ের বাসভবনে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে প্রথমে ব্রহ্মচারীবৃন্দ অনুষ্ঠান
জ্ঞাপকের উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাজ-রাধাবিনোদবিহারীজীউ ও গুরু-
বৈষ্ণবগণের জয়ধ্বনি দিয়া গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতন্ত্র ও নাম-মহিমা কীর্তন
করেন। কীর্তনান্তে শ্রোতৃমণ্ডলী জয়ধ্বনী ও উল্লুধ্বনির মধ্যে স্বামীজী সভা-
নঞ্জে প্রবেশ করতঃ উদ্বোধন বিষয় বর্ণনা করিয়া শ্রীভাগবতান্তার শ্রীল
বাসদেবের নিমিত্ত বিশ্বের জীবকল্যাণ চিন্তা, বেদ-বিজ্ঞান, ব্রহ্মসূত্র বা
বেদান্তসূত্রের অবতারণা, মহাভারত পুরাণাদি বর্ণন করিয়াও আত্মশান্তির

অভাববোধে বিষয়বোধে বদরিকাশ্রমের সমাপ্রাপ্তি অবস্থান। তথায় দেবর্ষি নারদের স্তভাগমন। সমাগত শ্রীগুরুদেব নারদ ঠাকুরকে শ্রীবালি কর্তৃক সাদর অভ্যর্থনা ও স্বীয় আল্পশক্তির অভাবহেতু জিজ্ঞাসায় শ্রীনারদ কর্তৃক ব্যাসের বহুমুখী প্রচেষ্টা এবং শাস্ত্রে একদেশিক দ্রষ্টাংগণের পরস্পর মতাবিরোধে ‘যত মত তত পথ’ জীবের ভুল ধ্যান-ধারণাই অশক্তির হেতু। সর্ব্বাধ্য শ্রীকৃষ্ণ-শক্তির মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিষ্ট জীবের বাস্তব শাস্তি লাভের একমাত্র উপায়। বিশেষতঃ যুগানুপাতে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরে শ্রীভগবানকে লাভ করিবার যে ধ্যান, যজ্ঞ, পরিচর্যা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে এবং নানা দোষের আকর কলিহত জীবকল্যাণের একমাত্র উপায় শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই সুনির্দিষ্ট হইয়াছে। তৎবর্ণন প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন,—আধুনিক শিক্ষিত সমাজ ভারতের ঐতিহ্য ও প্রাচীন ঋষিগণের সমাজ কল্যাণ চিন্তা যেনব্য ভারত আদর্শ বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন না উহা তাঁহাদের মূর্থতা ছাড়া আর কিছুই নহে। বর্ত্তমান সমাজ খবর রাখে না যে, বিশ্ববাসী ভারতের প্রতি কতটুকু বিশ্বাস ও আস্থা রাখেন। পাশ্চাত্য দেশের মণিষিগণ বলেন—কলহ-বিবাদময় এই পৃথিবীর মোড় একমাত্র ভারতই তাঁহার আধ্যাত্মিক চিন্তা শ্রোত দ্বারা মহামিলনের-ধারা রচনা করিতে পারেন।

এই ভাবে ২৯—৩১শে জাহুয়ারী দিবসত্রয় শ্রীমদ্ভাগবতের সহস্র-অভিধেয় ও প্রযোজন তত্ত্ব বর্ণন করেন। তাঁহাদের অহুষ্ঠান-স্মৃতিতে আরও ২ দিন স্বামীজীর পাঠ-বক্তৃতার কথা থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম সেবক জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবৈদ্য সর্বস্বতী ঠাকুরের প্রিয়পার্বদ নিত্য-লীলা প্রতিষ্ঠা শ্রীশ্রীনরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে ঠাকুরনগর স্টেশনের সন্নিগটে আনন্দপাড়ায় প্রতিবৎসর অনুষ্ঠিত বিরাট ধর্ম্ম-সভায় সভাপতিরূপে যোগদান করিবার আস্থানে ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩ কলিকাতা রহিতে শুভযাত্রা করেন।

১৮ই মাঘ ১৩৮৯ (১লা ফেব্রুয়ারী), মঙ্গলবার শ্রীল আচার্যদেব সপার্বদ ঠাকুরনগর স্টেশনে উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত নিতাইচন্দ্র বসু মহাশয় ও তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র শ্রীমদনবাবু শ্রীল গুরু মহারাজ ও বৈষ্ণববৃন্দকে পুষ্পমালা দ্বারা স্বাগত অভিনন্দন জানান। সন্ধ্যায় কীর্ত্তনান্তে শ্রীল মহারাজশ্রী শ্রীশ্রীনরহরি সেবাবিগ্রহপ্রভুর তিরোস্তাবোপলক্ষে অধিবাস-স্মৃচক পাঠ, বক্তৃতা করেন। পরদিন প্রভাতে নগর-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা স্থানীয় জনগণকে প্রভুবাবের উৎসবে যোগদানের আহ্বান জানান হয়। মধ্যাহ্নে একটি মহতী সভায় গুরুপরিবারের

ইচ্ছানুসারে শ্রীল গুরুমহারাজ সভাপতির আসন অনকৃত করেন। সভাপতি মহারাজ প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারীকে শ্রীল নরহরি প্রভুর জীৱনাদর্শ কীর্তন করিতে বলেন। তদনন্তর শ্রীল গুরুমহারাজের আদেশে আমিও তাঁহার অতিমহত্ত্ব চরিত্রের স্বলোচন কীর্তন করিবার সৌভাগ্য লাভ করি। পরে শ্রীমদ্ গোবিন্দ মহারাজ তাঁহার সেৱানিষ্ঠার কথা বলেন, শেষে শ্রীযুক্ত নিতাইচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার ভ্রাতৃ-সৌহার্দ, গুরুনিষ্ঠা প্রভৃতি বর্ণনা করিলে শ্রীল স্বামীজী পরিশেষে দীর্ঘদিন তাঁহার সঙ্গসান্নিধ্যে থাকিয়া যে চিরবাহিত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহাই বর্ণনা করেন। তিনি আরও বলেন যে, “মানুষ একত্র থাকিলে পরস্পর পরস্পরকে অনেক সময়ে ভুল বুঝাবুঝি করিয়া বসেন কিন্তু তাঁহার লাগে আমি এতদিন অতি নিকটে থাকিয়াও যে তদ্রূপ ঘটে নাই, ইহা আমার প্রতি তাঁহার অশেষ রূপা।” মধ্যাহ্নে বিচিত্র অন্ন-ব্যাঞ্জনাদিতে ঠাকুরের ভোগরাগ হয়। সমাগত আখাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই পরিতৃপ্ত-সহকারে মহাপ্রসাদ সেবা করেন। সন্ধ্যায় মহারাজজী শ্রীমন্তাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

১০ই ফাল্গুন ১৩৮৯, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩, বুধবার কলিকাতায় দেশপ্রিয় নগরে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্তন ও শ্রীমন্তাগবত পাঠের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজ পরপর ২ দিন শ্রীমন্তাগবতের ১০ম স্কন্ধ ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গ অধ্যায় পাঠ করেন। তৎবর্ণন প্রসঙ্গে ধন ও পদমর্যাদার অভিযানে দাস্তিক ইন্দ্রের যজ্ঞভঙ্গ-লীলার ব্যাখ্যায় ভক্ত-ভগ্নবানের বিদ্রোহীজনের অধঃপাতের কথা বুঝাইয়া দেন। ইন্দ্রের মত বাজিরও দর্পচূর্ণ করিয়া রূপাময় শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রিদাসবর্ষা গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা প্রবর্তন করেন। ইন্দ্র তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত ব্রজজনের কিছুই ক্ষতি করিতে পারেন নাই। ইন্দ্র-চেষ্টা প্রতিহত করা বালগোপালের বামহস্তের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের ব্যাঘাত, অতিতুচ্ছ। সাতদিন একপায়ে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন—আমি আমার ভক্তরক্ষার দায়িত্ব হইতে একপাও পশ্চাদাপসারণ করিব না। ঈর্ষ্যেতত্ত্বচরিতামৃতের ভাষায়—“ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদাগ্র। হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অস্ত্র ॥” এ অধ্যায়ের সার শিক্ষা।

১৩ই ফাল্গুন ১৩৮৯, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩, শনিবার মধ্যাহ্নে শ্রীবিনোদবিহারী গোড়ীয় গঠ হইতে সপার্বদে ১টার সময় হাওডাং বার-হাওড়া পাসেঞ্জারে ত্রিবেণী যাত্রা করেন শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির

আচার্যদেব। ত্রিবেণী কোচাটি ফুটবল খেলার মাঠে স্থানীয় জনগণের উত্তোঙ্গে শ্রীহরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের অনুষ্ঠানে শ্রীল গুরু মহারাজ ১০ম স্কন্ধের ২৪শ অধ্যায় পাঠ করেন। প্রসঙ্গক্রমে উচ্চবিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাদাতা ও বহুগণ্যমাত্র শ্রোতাদের সম্মুখে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার সাথে প্রাচীন-সমাজকল্যানকারীগণের তুলনামূলক পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন। স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের ভারতীয় শিক্ষা সভ্যতার গভীর আলোচনার বিষয় উদ্ঘাটন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অনুরোধ করেন। শ্রীবিগ্রহ অর্চন ও অর্চকের অধিকার নির্ণয়-বিষয় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও পারমাণবিক আলোক বিকিরণ করেন। শ্রীহরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তনই কলিকৃত জীবের শাস্তি শান্তির একমাত্র হেতু ও সামাজিক একতা বজায় রাখার যুগপে'যোগী শ্রীগৌরমন্ত্রণা। জন্মাদিষ্টারা বর্ণ নিরূপণ নিরর্থক ও উৎপাতের বিষয়—গুণকর্ম্যানুসারেই মনুষ্য-দেবতা-দানবে উচ্চাচল শাস্ত্রীয় ভাব। একই মানুষ তাহার ব্যবহার দ্বারাষ্ট দেবতাক্রমে পুত্র্য ও পশুধন-বিচারে ধূণ্য, অস্পৃশ্য হইতে পারে। মানুষ মাত্রই আদরণীয় বা পরিত্যাজ্য নহে। শ্রীচরিত-ভজনেই মানব-জীবনের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বা বাঁচার সার্থকতা। প্রায় ২ ঘণ্টা তিনি বর্ণ্যস্পর্শী ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে শিক্ষকমণ্ডলীর জনৈক শিক্ষক মহাশয় স্বামীজীর পাঠ-ব্যাখ্যাকে অশ্রুতপূর্ব ও ইতিপূর্বে তাঁহানের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে অভূতপূর্ব বর্ণনভঙ্গিমা বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহারা যাহাতে শ্রুত বিষয় আচরণ করিতে পারেন তজ্জন্ত মহারাজের হৃদয়ঙ্গম প্রার্থনা করেন। অনুষ্ঠানের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দাস মহাশয় সপরিবারে-শ্রীল আচার্য্য-দেবের সেবাযত্নে অযোগ্য পাইয়া ধন্য হন।

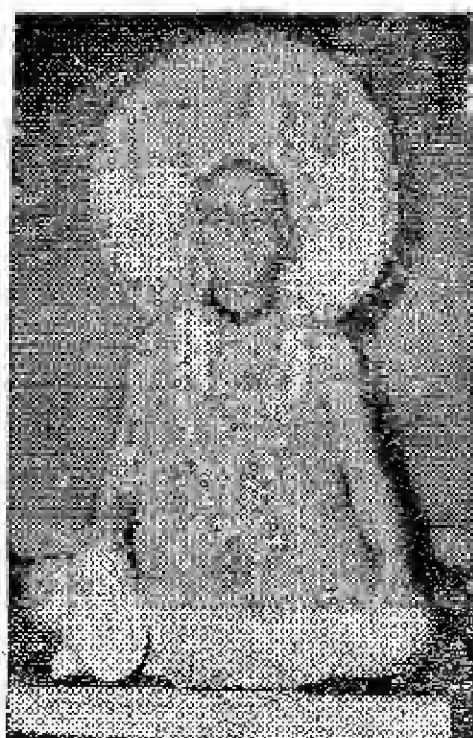
৩০শে ফাল্গুন ১৩৮৯, ইং ১৫ই মার্চ ১৯৮৩, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ১৪নং জি, টি, রোড, সাউথ কাওড়া নিবাসী পরলোকগত কানাইলাল দে মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত গৌরমোহন দে মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ হইতে যাজ্ঞিক নিপ্রণত্তীগণের উপাখ্যান পাঠ করিয়া শুদ্ধিমূলক ব্যাখ্যা করেন। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের সভায় গৃহস্বামী মহাশয়ের গুরুদেব উপস্থিত ছিলেন। তাহার গুরুদেব শ্রীভাগবত শ্রবণ করিবার জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। পাঠের আসরে গণ্যমাত্র অনেক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গো জয়তঃ ॥

শ্রীগোলোকগঙ্গ গোড়ীয়া মঠে
শ্রীমদুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ-মহোৎসব

বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিভম্



শ্রীঅর্চাবিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত
শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম

শ্রীগোলোকগঙ্গ গোড়ীয়া মঠ,
পোঃ গোলকগঙ্গ, জিলা—গোয়ালপাড়া (আসাম)।

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাদ্ধৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ,
(রেজিষ্টার্ড) পোঃ গোলকগঞ্জ;

জিলা—গোয়ালপাড়া (আসাম)।

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

শ্রীব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক শ্রীচৈতন্যম্ভায় দশমাধস্তন
স্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি
আচার্য্যাকেশরী অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্য নিত্যলীলাপ্রবিন্দ ও বিষ্ণুপাদ
১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত
উক্ত মঠের নবনির্মীয়মান শ্রীমন্দিরে তদীয় বিগ্রহ-প্রকাশ-মহোৎসব
আগামী ৩১শে বৈশাখ, ১৯২০ (ইং ১৯৫৫।৮৩), রবিবার অক্ষয়-তৃতীয়া
দিবসে অনুষ্ঠিত হইবে ও শ্রীমঠের নিত্য-সেবিত শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদ-
বিহারীজীউ বিগ্রহগণও উক্ত মন্দিরে ঐ দিবসে শুভবিজয় করিবেন।

এতদুপলক্ষে ৩০শে বৈশাখ (ইং ১৯৫৫।৮৩), শনিবার হইতে
১লা জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৯৫৫।৮৩), সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী নগর-
সকীর্্তন, অধিবাস-উদ্ঘাপন, শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ,
অভিষেক, বৈষ্ণব-হোম, ধর্ম্মসভা ও ছায়াচিত্র প্রদর্শন প্রভৃতি সমিতির
সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিন্দ্রাণী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন
মহারাজের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত হইবে। সমিতির ও বিভিন্ন মঠের
বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ তথা স্ত্রী-সজ্জনমণ্ডলী শ্রীগুরু-
তত্ত্ব, শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব এবং শ্রীমদ্ব্যাহারপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল
প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন দিবসে ভাষণ প্রদান করিবেন।

জ্যৈষ্ঠ্য—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠ্যহইতে
হইলে ত্রিদণ্ডিন্দ্রাণী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজের নিকট
উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

ଆତଏବ, ଧର୍ମପ୍ରାଣ ମଞ୍ଜୁନ ମାହୋଦୟଗଣ ସବାନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ଥାକିয়া ବିବିଧ
 ସହାନୁଭୂତି-ଦ୍ଵାରା ଉକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧଭକ୍ତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକେ ସାଫଲ୍ୟାମ୍ବିତ କରତ ସମିତିର
 ନିଦମ୍ବରୁଦକେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ । ଏହି ମହାନୁଷ୍ଠାନେ ଯୋଗଦାନ କରିତେ
 ଅସମର୍ଥ ହିଲେ ପ୍ରାଣ, ଅର୍ଥ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ବାକ୍ୟଦ୍ଵାରା ସମିତିର ସେବାକାର୍ଯ୍ୟେ
 ସହାୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଲେ ଓ ଭଗବତ୍-ସେବାଗୁଣୀ ସ୍ମୃତି ଅର୍ଜିତ ହିବେ ।
 ବିଶେଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ-ସୂଚୀ ନିମ୍ନେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହିଲ ।

ଶୁଦ୍ଧଭକ୍ତ-କମ୍ପାଳେଶପ୍ରାର୍ଥୀ—

ସନ୍ତ୍ୟବନ୍ଧ,

ଶ୍ରୀଗୌଡ଼ୀୟ ବେଦାନ୍ତ ସମିତି

ଃ ଅନୁଷ୍ଠାନ-ସୂଚୀ :

୩୦ଶେ ବୈଶାଖ (ଇଂ ୧୫୫୫), ଶନିବାର—

ବ୍ରାହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତେ—ମଞ୍ଜୁଲାର୍ଚ୍ଚିତ, ତଦନନ୍ତର ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନମୁଖେ ନଗର-ପରିକ୍ରମା ;
 ପୂର୍ବହାଲେ—ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ପାଠ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର-ପ୍ରତିଷ୍ଠା ;
 ମଧ୍ୟାହ୍ନେ—ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନଯୋଗେ ଭୋଗ-ଆରତି ;
 ଅପରାହ୍ନେ—କୀର୍ତ୍ତନ-ମହୋତ୍ସବ ଓ ଅଧିବାସ-ଅନୁଷ୍ଠାନ ;
 ସନ୍ଧ୍ୟାୟ—ଆରତି ଅନ୍ତେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଚରିତାମୃତ ପାଠ ଓ ଛାୟାଚିତ୍ରେ
 ଶ୍ରୀଗୌର-ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ।

୩୧ଶେ ବୈଶାଖ (ଇଂ ୧୫୫୫), ରବିବାର—

ବ୍ରାହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତେ—ମଞ୍ଜୁଲାର୍ଚ୍ଚିତ ଅନ୍ତେ ଶ୍ରୀବିଘ୍ନ-ବିଘ୍ନହ ସହଯୋଗେ
 କୀର୍ତ୍ତନମୁଖେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ;
 ପୂର୍ବହାଲେ—ପ୍ରସ୍ଥାନପଥ ପାଠ, ବୈଷ୍ଣବ-ହୋମ, ଶ୍ରୀବିଘ୍ନ-ପ୍ରକାଶାନୁଷ୍ଠାନ ;
 ମଧ୍ୟାହ୍ନେ—ଭୋଗ-ଆରତି ଅନ୍ତେ ଜନସାଧାରଣକେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିତରଣ ;
 ସନ୍ଧ୍ୟାୟ—ଆରତି ଅନ୍ତେ ଶ୍ରୀବିଘ୍ନ-ତତ୍ତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କେ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ ।

୧ଶା ଜ୍ୟୈଷ୍ଠ (ଇଂ ୧୫୫୫), ସୋମବାର—

ବ୍ରାହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତେ—ମଞ୍ଜୁଲାର୍ଚ୍ଚିତ ଅନ୍ତେ ନଗର-ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନ ;
 ପୂର୍ବହାଲେ—ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ପାଠ ଓ କୀର୍ତ୍ତନ ;
 ମଧ୍ୟାହ୍ନେ—ଭୋଗ ଓ ଆରତି-କୀର୍ତ୍ତନ ;
 ସନ୍ଧ୍ୟାୟ—ଆରତି ଅନ୍ତେ ସନାତନଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କେ ବକ୍ତୃତା, ତତ୍ତ୍ଵପଞ୍ଚାଙ୍ଗ
 ଛାୟାଚିତ୍ରଯୋଗେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা স্প্রশসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিষম্মত ।

অন্য ধর্ম সৃষ্টরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কণার রতি নৈলে পণ্ড সেই ভ্রম ।

৩৫শ বর্ষ } ১৮ মধুসূদন, বাসুদেব, ৪৯৭ গৌরাক্ষ
৩১ বৈশাখ, রবিবার, ১৩৯০ ; ইং ১৮৭১।১৯৮০ { ৩য় সংখ্যা

সান্নিধ্যাদি

শ্রীচৈতন্যশতকম্

[শ্রীমৎ সার্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতম্]

সুবলিত-মণিমাণির্বন্ধচূড়ং মনোজ্ঞং-

সুপলিত-মুহুভালে চন্দনেনানুচিত্রম্ ।

অবণযুগল-রক্তে কুণ্ডলৌ যস্য ভাভৌ

হৃদি বিনিহিত-হারং নৌসি তং গৌরচন্দ্রম্ ॥৩৬॥

যিনি মণিমালাদ্বারা বন্ধচূড় হইয়া মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছেন ;
ধাহার সুকোমল রমণীয় ললাট চন্দনলিপ্ত ; কর্ণধর কুণ্ডলে সুশোভিত ও
বক্ষে 'হার' বিমণ্ডিত, আদি সেই গৌরচন্দ্রকে স্তুতি করি ॥৩৬॥

চৈতন্যরূপ-গুণ-কর্ম-মনোজ্ঞবেশঃ

যঃ সর্বদা স্মরতি দেহ-মনোবচোভিঃ ।

তস্তৈব পাদতলপদ্মরজোহভিলাষী

সেবাং করোমি শত জন্মানি বন্ধু-পুত্রৈঃ ॥৩৭॥

যিনি সর্বদা কাহ্নমুনাবাক্যে শ্রীচৈতন্যদেবের রূপ, গুণ, কর্ম ও মনোহর
বেশ স্মরণ করেন, আমি তাঁহারই পাদপদ্মধূলীর অভিলাষী হইয়া বন্ধু ও
পুত্রাদি সহ শত জন্ম তাঁহার সেবা করি ॥৩৭॥

ইহং রসজ্ঞা তব নাম-কীর্তনে

শ্রোত্রো মনো মে শ্রবণে হু চিন্তনে ।

নেত্রৈশ্চ তে রূপনিরীক্ষণে সদা

শিরস্ত চৈতন্যপদাভিবন্দনে ॥৩৮॥

এই জিহ্বা শ্রীচৈতন্যের নাম-কীর্তনে, কর্ণ ও মন তাঁহার রূপ-গুণ-
লীলাদি শ্রবণ-চিন্তনে, নেত্র তদ্রূপদর্শনে ও মস্তক তাঁহার চরণ-বন্দনে
সর্বদাই নিযুক্ত ॥৩৮॥

সঙ্কীর্ণানন্দ-রসস্বরূপা-

শ্রেমপ্রদানৈঃ খলু শুদ্ধচিত্তাঃ ।

সর্বৈ মহান্তঃ কিম কৃষ্ণতুল্যাঃ

সাংসারলোকান্ পরিত্যায়ন্তি ॥৩৯॥

কীর্ত্তনানন্দ-রসস্বরূপ শুদ্ধচিত্ত মহাত্মারূপে কৃষ্ণতুল্য হইয়া শ্রেমদানে
সাংসারিক জীবগণকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করিতেছেন ॥৩৯॥

যস্মিন্ দেশে কুলাচারো ধর্ম্মাচারশ্চ নাস্তি বৈ ।

তথাপি ধম্ম শুদ্দেশো নাম-সঙ্কীর্ণানন্দরেঃ ॥৪০॥

যে-দেশে কুলাচার ও ধর্ম্মাচার নাই, তবুও সেই দেশ শ্রীহরির নাম-
কীর্ত্তনদ্বারা ধম্ম হইয়াছে ॥৪০॥

যাবতঃ কুতস্ত্রাণাং সমুদ্ধারস্ত্য হেতবে ।

অবতীর্ণঃ কলৌ কৃষ্ণচৈতন্যো জগতাং পতিঃ ॥৪১॥

যে-সমস্ত লোকের কোন প্রকার ত্রাণ নাই, তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত
কলিযুগে জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার গ্রহণ করিয়াছেন ॥৪১॥

সর্বাবতার ভক্ততাং জনানাং

সমর্থাঃ কিম সাধুবার্তা ।

ভক্তানভক্তানপি গৌরচন্দ্র-

স্তুতার কৃষ্ণামৃতনামদানৈঃ ॥৪২॥

সাধুগণের এই উক্তি যে, সর্বাবতার ভক্তগণকে উদ্ধার করিতে সমর্থ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কৃষ্ণামৃত নাম প্রদানে ভক্ত ও অভক্ত সকলকেই পরিদ্রাণ
করিয়াছেন ॥৪২॥

চৈতন্য-প্রেমদাতাখিল-ভুবন-

জনান্ ভাবহৃদ্ধার-নাদৈঃ

গোবিন্দাকুণ্ডচিহ্নান্ কুবিষয়-

বিরতান্ কারয়ামাস শীঘ্রম্ ।

এবং শ্রীগৌরচন্দ্রে জগতি চ

জমিতে বঞ্চিতো যোহি মূর্থঃ

তাপী-পাপী-মুরাপী হরি-গুরু-

বিমুখঃ সর্বদা বঞ্চিতঃ সঃ ॥৪৩॥

প্রেমদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বীয় ভাবরূপ হৃদ্ধার-ধ্বনিদ্বারা অখিল জগজ্জীব-
গণকে কুবিষয় হইতে নিবৃত্ত করতঃ শ্রীগোবিন্দের প্রতি তাহাদের চিত্তকে
শীঘ্রই আকৃষ্ট করিয়াছিলেন । এইরূপে গৌরচন্দ্রের আবির্ভাবের পর
যাহারা বঞ্চিত মূর্থ ছিল, তাহারা সর্বদা পাপী, তাপী, দেবদ্রোহী ও
হরি-গুরুবিমুখ হইয়া রহিল ॥৪৩॥

ত্রিভুবন-কমনীয়ে গৌরচন্দ্রেবতীর্ণে

পতিত-যবন-মূর্খাঃ সর্বথা স্ফেটয়ন্তঃ ।

ইহ জগতি সমস্তা নামসঙ্কীর্ণনার্তা

বয়মপি চ কৃতার্থাঃ কৃষ্ণনামাশ্রয়াং ॥৪৪॥

ত্রিজগন্মোহর গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইলে পতিত, অধম, যবন-মূর্খাদি
পর্যন্ত সকলে সর্বভাবে আনন্দিত হইয়াছিল এবং জগতের সমস্ত লোক
হরিনাম-সঙ্কীর্ণনে মগ্ন ও বিগলিত হইয়াছিল । পরন্তু কৃষ্ণনামাশ্রয়ে
আমরাও ধন্য হইয়াছিলাম ॥৪৪॥

ମଧୁର-ମଧୁରମେତଦୈବବାନାଂ ଚରିତ୍ରଂ
 କଲିମଳ-କୃତହୀନାନ୍ ଦୋଷବୃଦ୍ଧା ନ ଜଗ୍ୟୁଃ ।
 ସକଳ-ନିଗମସାରଂ ନାମ ଦାତୁଂ ଚ ତତ୍ର
 ପ୍ରବକ୍ତୂ-କରୁଣୟା ଶ୍ରୀଗୌରଚନ୍ଦ୍ରୋତ୍ସବତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣଃ ॥୫୩॥

ଏହି ସକଳ ଗୌରଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବଡ଼ ଇ ମଧୁର । ତାହାରା କଲିହତ
 ନାମକଲିମଳ-ମନ୍ଥ, ଶୁଦ୍ଧ ଓ ମଲିନ ଜୀବସମୂହର ଦୋଷ ବା ଅପରାଧ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି
 ନା । ସେତେତୁ ସକଳ-ନିଗମସାର ହରିନାମ-ସୁଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଜନ୍ମ କରୁଣା-
 ସାଗର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ନବଦ୍ବୀପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହଟିଯାଇଥିଲେ ॥୫୩॥

ଲୋକାନ୍ ସମସ୍ତାନ୍ କଲିତୁର୍ଗୁଣାଦିଧେଃ
 ନାମ୍ନା ସମୁଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟା ସ୍ବତଃ ସମର୍ପିତମ୍ ।
 ଶ୍ରୀଗୌରଚନ୍ଦ୍ରୋତ୍ସବତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ-ବୈଷ୍ଣବବାନାଂ
 ନାମସ୍ତ ଚ ତତ୍ତ୍ବଂ କଥିତଂ ଜନେ ଜନେ ॥୫୪॥

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଅତି ଭୀଷଣ ତରଙ୍ଗାକୂଳ ଭବସାଗର-ନିମନ୍ଥ କଲିହତ ଜୀବସକଳଙ୍କ
 ସେବାରୁ ହରିନାମାୟୁତ ପ୍ରଦାନପୂର୍ବକ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତେ; ତାହାଦିଗର ଅତ୍ୟେକକେ
 ନାମ-ସାହାୟା ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବତତ୍ତ୍ବ ଅତି ସୁନ୍ଦରରୂପେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଦିଆଛନ୍ତି ॥୫୪॥

ସାବତ୍ତୋ ବୈଷ୍ଣବା ଲୋକେ ପରିଜ୍ଞାନସ୍ତ ହେତୁବେ ।
 ଚଟୁଷ୍ଟି ପ୍ରାଭୁନାଦିଷ୍ଠା ଦେଶେ ଦେଶେ ଗୃହେ ଗୃହେ ॥୫୫॥

ସେ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଜଗତେ ବିରାଜିତ ଥିଲେ, ଜୀବମାନଙ୍କର ପରିଜ୍ଞାନର
 ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ମହାପ୍ରଭୁର ଆଦିଷ୍ଠ ନାମ ତାହାରା ଘରେ ଘରେ ଚଟୁଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚାର
 କରିଯାଇଥିଲେ ॥୫୫॥

ଜଗଦ୍ବନ୍ଧୋ ଜଗତ୍ କର୍ତ୍ତା ଜଗତାଂ ତ୍ରାଣହେତବେ ।

ସତ୍ର ତତ୍ର ହରେଃ ସେବା-କୀର୍ତ୍ତନେ ସ୍ଥାପିତେ ସୁଖେ ॥୫୬॥

ହେ ଜଗତର ବନ୍ଧେ ! ତୁ ଜଗତ୍ କର୍ତ୍ତା ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ! ଆମ୍ଭେ ଏହି ଭାରତବର୍ଷେ
 ସେଠାରେ ସେଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରାର୍ଥେ ସୁଖେ ହରିସେବା ଏବଂ ସକୀର୍ତ୍ତନ-ସଞ୍ଚାର
 ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ॥୫୬॥ (କ୍ରମଶଃ)

সজ্জন—নির্দোষ (৫)

মানবগণের কাম-ক্রোধাদি দ্বাদশটি দোষ

সর্বদা পরিত্যাজ্য

শ্রীমহাভারতে সনৎকুমার ভলিয়াছেন :—

ক্রোধকামৌ লোভমোহৌ বিধিৎসা কুপাস্থে মানশোকৌ স্পৃহা চ ।

ঈর্ষা জুগুপ্সা চ মনুষ্যদোষা বর্জ্যাঃ সাদা দ্বাদশৈতে নরাণাম্ ॥

মানবগণের এই বারটি দোষ সর্বদা পরিত্যাগ করিতে হইবে ।

দ্বাদশ-প্রকার দোষের তালিকা

১। ক্রোধ—ইচ্ছা বাধা প্রাপ্ত হইলে তজ্জন্য আক্রোশ ও তাড়নাদি হেতু মনস্তাপ । ২। কাম—স্রীমদ-বাসনা । ৩। লোভ—ধন-বায় কাতরতা । ৪। মোহ—কর্তব্য ও অকর্তব্য বুদ্ধিহীনতা । ৫। বিধিৎসা—উত্তরোত্তর লভ্যাংশ পাইয়াও পিপাসার অভূষ্টি । ৬। অকুপা—নির্দিয়তা । ৭। অসূয়া—পর-গুণসমূহে দোষ দর্শন । ৮। মান—আপনাতে পূজ্য বুদ্ধি । ৯। শোক—স্বার্থনাশে মনস্তাপ । ১০। স্পৃহা—ভোগ্যবর্গে আদর । ১১। ঈর্ষা—পরস্রী-কাতরতা । ১২। জুগুপ্সা—পরনিন্দা । এই দ্বাদশ প্রকার দোষের যে-কোন একটি মনুষ্যের সর্বনাশ করিতে পারে । দ্বাদশটির একত্র সমাবেশে মনুষ্যের যে কি ভীষণ পরিণাম হয়, তাহা বর্ণনাতীত । সজ্জনগণ মানবের এই দ্বাদশ প্রকার কোন দোষকেই অবাহন করেন না ।

মহাভারতে আরও বত্রিশপ্রকার দোষের উল্লেখ ;

সজ্জন উক্ত দোষসমূহ ও মায়াবাদীর কৃষ্ণসেবা

বৈমুখ্যাদি দোষ-পরিমুক্ত

পূর্ব-কথিত বারটি দোষ ব্যতীত অদান্ত পুরুষের আরও আঠার প্রকার দোষ আছে । মত্ত-জনের আঠার প্রকার-দোষ ও ছয় প্রকার ত্যাগ-রাহিত্য একত্রে চব্বিশ প্রকার দোষ এবং প্রমাদের আট প্রকার দোষ সনৎকুমার ভলিয়াছেন । বৈষ্ণব সাধু এই সকল দোষ হইতে সর্বদা মুক্ত । মায়াবাদী হরিপাদপদে অপরাধী এবং কৃষ্ণসেবা-বৈমুখ্যগণের অগ্রণী । তাহার দোষ-সমূহও সজ্জনকে স্পর্শ করে না ।

দৈন্যের স্বরূপোপলব্ধি না হওয়ায়
ভগবদ্-বিষয়ের সহজিয়ার সঙ্গ-বর্জনকারী
সজ্জন-চরিত্রে মিছান্তির দোষারোপ-চেষ্টা

নির্কোষ মিছান্তি আপনাকে ভক্তাভিমান না করিয়া নানা প্রকার দোষে পতিত হয়। তন্মধ্যে দৈন্যের স্বরূপ না বুঝিতে পারিয়া সুনির্মল সজ্জন-চরিত্রে দৈন্যভাব হিঙ্গু দর্শন করিয়া সজ্জনের চরণে অপরাধী হয়। কঠিন ভাগবতের তাদৃশ চেষ্ঠা তাহার অধিকারে উন্নতির ব্যাঘাত করে। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের ভগবদ্-বিষয়ের প্রতি তীব্র উল্লিঙ্গমুহুনিয়া তাহাতে দৈন্যের অভাব দৃষ্টি করে। সহজিয়াদিগের পাণ-চরিত্রের বর্জ্য-প্রণাসীকে বা নদীয়া-নাগরীদিগের বিষয়াশ্রয়ত-বোধরাহিত্য প্রদর্শনকারীকে দৈন্যরহিত মনে করিলে নিজের ক্ষতি বাতীত অন্য কিছু লাভ হইবে না। কোমলশ্রদ্ধ-দিগের বিচার অসম্যক ও একদেশ-দৃষ্টিময়। তাহারা নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিয়া হিতাকাঙ্ক্ষীকে শত্রুজ্ঞান করে এবং শুভানুধ্যায়ীগণের হিঙ্গুদেষণ করিয়া নিজ দৈন্য সমূলে উৎপাটন করে।

সজ্জন 'তৃণাদপি স্নীচ' দৈন্যের স্বরূপান্তিষ্ঠ,

অতএব নির্দোষ

সজ্জন দৈন্যের স্বরূপ বুঝিয়া নির্কোষগণের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভের যত্ন করেন না। যেহেতু তিনি নির্দোষ। শ্রীদামোদর-স্বরূপ মিষ্ট কথায় কোমল-বাক্যে বঙ্গদেশীয় মায়াবাদীকে উৎসাহ দিবার পরিবর্তে কপট দৈন্য পরিহারপূর্বক তাহার মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভট্টের মঙ্গলের জন্ত, শ্রীকৃষ্ণাক্ষরদাসকে ভট্টধারীদিগের নিকট হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া 'তৃণাদপি স্নীচ' এট ম হাস্য-শিক্ষক কিছু দোষ করেন নাট, লক্ষ্যস্বরূপ কোমল-প্রক অন্তিষ্ঠ শুদ্ধবৈষ্ণবে 'তৃণাদপি স্নীচ' স্বভাব দেখিতে না পাটয়া তাহাকে শত্রুজ্ঞানে নিন্দা করিবার অভিপ্রায়ে বৈষ্ণবের দীনতার অভাব আছে জানিলে তাঁহার কোমলশ্রদ্ধ-দোষ স্পর্শ করিবে। সজ্জনকে নির্দোষ জানিলে তাঁহার সত্য সত্য অমানী ধর্ম ও দৈন্য উপলব্ধি হইবে। এইরূপ সৌভাগ্য হইলে বালিশগণের দোষ অপসারিত হইয়া সজ্জনের ত্রাণ নির্দোষ হইতে পারিবেন।

—জগদগুরু ও বিজুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

ভক্তিতত্ত্ববিবেক—দ্বিতীয় প্রবন্ধ

ভক্ত্যাভাস-বিবেক

বহুভক্ত্যাভাস-লেশোহপি দদাতি ফলমুত্তমম্ ।

তমানন্দ-নিধিং কৃষ্ণচৈতন্যং মমুপাস্মহে ॥

হে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ !

পূর্ব প্রবন্ধে শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ বিচার করিয়াছি। এই প্রবন্ধে 'ভক্ত্যাভাস' বিষয়ের বিচার করিব। ভক্তির তটস্থ-লক্ষণেই ভক্ত্যাভাসের কথকিং বিচার হইয়াছে। 'ভক্ত্যাভাস' ভক্তির তটস্থ-লক্ষণের অন্তর্গত তত্ত্ব। কিন্তু যাহাতে ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণের নিরূপিত হয়, তাহাতে ভক্ত্যাভাসের বিশেষ বিচার হয় না; এইজন্য ভক্ত্যাভাস-বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রস্তুত করিলাম। বোধ করি, এই প্রবন্ধ দ্বারা পূর্ব-প্রবন্ধের বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, অণু-চৈতন্য জীবের পূর্ণ-চৈতন্য কৃষ্ণের উপাধি-রহিত স্বাভাবিক চেষ্টার নাম ভক্তি। জীবের দুইটি অবস্থা—মুক্তাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা। মুক্তাবস্থায় জীব সমস্ত জড়-সম্বন্ধ ছইতে মুক্ত হইয়া স্ব-স্বরূপ অর্থাৎ শুদ্ধ-চিৎস্বরূপে অবস্থিত। তখন উপাধি নাই। অতএব, সে-অবস্থায় ভক্তির তটস্থ লক্ষণের প্রয়োজন নাই। বদ্ধাবস্থায় জীব স্বীয় চিৎস্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছেন। জড়দেহে ও লিঙ্গদেহে আবদ্ধ-অভিমান করত একটি নূতন ও বিকৃত-স্বরূপকে বরণ করিয়াছেন। এই অবস্থাতেই জীবের উপাধি। স্বচ্ছ কাচ মলশূন্য থাকিলে তাহার ভিতর দিয়া সমস্ত বস্তু দৃষ্ট হয়; কিন্তু তাহা মগ্ন-সংযুক্ত হইলে তাহার আর স্বচ্ছতা থাকে না, তাহার স্বাভাবিক গুণ ধূলিতে আবৃত হইয়া থাকে। তখন ঐ কাচের একটি উপাধি ঘটয়াছে বলিতে হইবে। যখন অল্প কোন পদ্য আসিয়া এক বস্তুর স্বভাবকে আচ্ছাদন করে, তখন সেই আচ্ছাদনকেই ঐ বস্তুর উপাধি বলি। জড়-স্বভাব আসিয়া জীবের বিশুদ্ধ চিৎ-স্বভাবকে আচ্ছাদন করে। সেই আচ্ছাদনই জীবের উপাধি। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৭) কথিত হইয়াছে—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্তাদীশাদপেতস্ত বিপর্যয়োৎসৃতিঃ ।

তন্ময়হাতো বুদ্ধ অভ্যজ্ঞেভ্যং ভক্ত্যাক্রেশং গুরুদেবতাজ্জা ॥

পূর্ণ-চৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জীবের ভক্তিবৃত্তি-স্বত্ব স্বাভাবিক অভিনিবেশই জীবের নিত্যধর্ম্য। কিন্তু জীব সেই দীপতত্ত্ব হইতে বাহির্গত হওয়ায়

তাঁহার ভয় ও বিপর্যয়ানুভূতি ঘটয়াছে। ভগবানের যে একটি মায়া-শক্তি বলিয়া অগণ্য শক্তি আছে, সেই শক্তি হইতে নিঃসৃত এই জড় জগৎকে ভগবান্ হইতে একটি বস্তু তত্ত্ব-জ্ঞান করিয়া দুর্দশাক্রমে জীবের সংসার ঘটয়াছে। পণ্ডিতগণ শ্রীগুরু-চরণাশ্রয় করত সেই ঈশ্বরূপ পরমদেবতাকে অনন্ত-ভক্তি-দ্বারা ভজন করেন। এই শ্লোকদ্বারা ইহাই স্থির হইল যে, মায়াভিনিবেশ অর্থাৎ জড়াসক্তিই জীবের উপাধি। উপাধি-যুক্ত অবস্থায় জীবের ভক্তি সহজেই বিকৃত হইয়া ভক্ত্যাভাসরূপে পরিণত হয়। বাহারা ভক্তভক্তির অন্ত একান্ত লালসিত, তাঁহারা সমাগ্ররূপে ভক্ত্যাভাসকে অতিক্রম করত কেবল ভক্তির আশ্রয় লটবেন। এট কারণেই ভক্ত্যাভাস-বর্ণনে আমাদের উপস্থিত প্রবৃত্তি। ‘ভক্ত্যাভাস’-বর্ণন-কার্য্যটী অত্যন্ত গুরু, কেবল অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের এই প্রবন্ধটী শুনিতে অধিকার আছে। যেহেতু বাহারা ভক্ত্যাভাসকে ভক্তি বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে যদি ভাগ্যোদয় না হইয়া থাকে, তবে কখনই স্বখী হইবেন না। অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের নিকট এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমি অঙ্গশ গুণ লাভ করিতেছি।

শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী তৎকৃত ‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু’-গ্রন্থে ভক্ত্যাভাস-বিচার সম্বন্ধে কোন পৃথক্ আলোচনা করেন নাই। “অন্যাভিপাষিতা-শূন্য জ্ঞান-কণ্ঠাজনাবৃতমি”তি শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে বাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে নিহিতভাবে ভক্ত্যাভাসের সমস্ত বিচার আছে। তিনি রতি-তত্ত্বের আলোচনায় রত্যাভাস-বর্ণনরূপে ‘ভক্ত্যাভাস’ বিচারটী ক্ষুদ্ররূপে বলিয়াছেন। আমি উক্ত রসাতীর্থা মহাদেবের ঐ বিচার অঙ্গস্বন করিয়া ‘ভক্ত্যাভাস’-বিবেক সম্বন্ধে এই প্রবন্ধটী রচনা করিলাম। একটু উচ্চ অবস্থার ভক্তিই রত্নরূপে লক্ষিত হন, তৎকালে যে ভক্ত্যাভাস, তাহাই ভক্তির প্রাগবস্থায় আছে বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবে।

শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

প্রতিবিশ্বস্তথা ছায়া রত্যাভাসো দ্বিধা মতঃ ॥

অতএব ভক্ত্যাভাস দুই প্রকার—প্রতিবিশ্ব-ভক্ত্যাভাস ও ছায়া-ভক্ত্যাভাস। প্রতিবিশ্ব ও ছায়ার ভাস্বিক ভেদ এই যে, ‘প্রতিবিশ্ব’—বস্তু হইতে অত্যন্ত পৃথক্ হইয়া বস্তুস্তরে কল্পিত হইয়া যায়। ‘ছায়া’—বস্তুকে আশ্রয় করিয়া তল্লিকটে তাহার স্বরূপকে কথঞ্চিৎ প্রকাশ করে। একটি বৃক্ষ ভগ্নে প্রতিভাত হইলে সেই প্রতিভাকে প্রতিবিশ্ব বলে। তাহা ঐ বস্তুতে সংলগ্ন থাকে না। বস্তু

সত্যায় তাহার সত্তা হইলেও তাহা বস্তুস্তর বলিয়া প্রতীতি হয়। ঐ বস্তুস্তর অঙ্গ-সংলগ্নে ছায়ায় প্রতিচ্ছবির অবস্থিতি, অতএব ছায়া বস্তুর নিকান্ত আশ্রিত-রূপে পরিচয় দেয়। শ্রীল জীবগোবিন্দমী বলিয়াছেন যে,—“তস্মারিরূপাধি-ভূমিব ইতৈর্মুখাস্বরূপত্বং সোপাধিত্বমাত্মনত্বং তচ্চ গোপীয়া বৃত্তা। প্রবর্তমানত্ব-মিতি।” অর্থাৎ নিক্সপাধিত্বই ভক্তির মুখ্য স্বরূপত্ব এবং উপাধিযুক্তত্বই ভক্তির আস্তানত্ব। এই আস্তানত্ব গোপী বৃত্তি-দ্বারাই প্রবর্তমান। সাক্ষাৎ বৃত্তিকে মুখাবৃত্তি ও বাবধানযুক্তা বৃত্তিকে গোপীবৃত্তি বলে। প্রতিবিম্ব ও ছায়া উভয়ই গোপীবৃত্তি-দ্বারা বর্তমান। ভক্তি যখন মুখাবৃত্তি-দ্বারা পরিচিত হন, তখন আর ‘প্রতিবিম্ব’ বা ‘ছায়া’ কিছুই থাকে না। তখন বস্তুই স্বাং প্রকাশ হয়।

প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যান্ভাস

প্রথমে প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যান্ভাসের বিচার করা যাউক। প্রতিবিম্ব ভক্ত্যা-ন্ভাস তিন প্রকার, যথা—

- ১। নির্বিশেষ-জ্ঞানাবৃত্ত ভক্ত্যান্ভাস।
- ২। বহির্মুখ কর্মাবৃত্ত ভক্ত্যান্ভাস।
- ৩। বিপরীত-তত্ত্বে ভক্তিবুদ্ধি জনিত ভক্ত্যান্ভাস।

(১) নির্বিশেষ-জ্ঞানাবৃত্ত ভক্ত্যান্ভাসে নির্বিশেষ জ্ঞানাবরণই ভক্তির গোপী-বৃত্তিক্রমে বাবধান ক্রমে লক্ষিত হয়। যিনি ভক্তিকে আত্মাদান করিবেন, তাহার ও স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তির মধ্যে নির্বিশেষ জ্ঞানরূপ একটী বাবধান পড়িল। সেখানে আর সাক্ষাৎ বা মুখাবৃত্তিদ্বারা ভক্তি দর্শন সম্ভব হয় না। “চিত্তত্বে বিশেষ নাই, কেবল জড়তত্ত্ব বিশেষ আছে; জীব জড়যুক্ত হইলে এক নির্বিশেষ-ব্রহ্মে লয় হয়,”—এইরূপ জ্ঞানকে নির্বিশেষ-জ্ঞান বলে। যেখানে নির্বিশেষ জ্ঞান, সেখানে শুদ্ধা ভক্তির অভাব। কৃষ্ণানুশীলনই যখন শুদ্ধা ভক্তি বলিয়া জানা গিয়াছে, তখন শুদ্ধা ভক্তির ক্রিয়া নির্বিশেষ অবস্থায় অসম্ভব। নির্বিশেষ-অবস্থা যদি সিদ্ধ হয়, তবে সস্বেত্ত, সস্বেদক ও সস্বেদনের ভেদাভাবে কৃষ্ণই বা কোথায়, কৃষ্ণদাস জীবই বা কোথায় এবং ভক্তিরূপা চেষ্টাই বা কোথায়? যদি বল, চরমে ভক্তি না থাকুক, কিন্তু এখন কৃষ্ণানুশীলন-রূপ ভক্তি আমি আচরণ করি, তবে তোমার যে ক্রমের প্রতি ভক্তি, তাহা কখনই সরল ও নিত্য হয় না; তোমার মনে মনে আছে যে, তুমি

কৃষ্ণকে সম্ভাষণ করিয়া অবশেষে তাঁহার সন্তা লোপ করিবে।
তোমার যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা ধূর্ততায় পরিপূর্ণ ও সর্বদা কুটিল। অতএব
নিবাসিকা ভক্তি যে কি বস্তু, তাহা তুমি জান না। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ গোদামী
(ক্রিষ্ণসামুদ্রসিকুতে) তোমার ভক্তির এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, যথা—

অশ্রমাভীষ্ট-নির্বাহী রতি-লক্ষণ-লক্ষিতঃ ।

ভোগাপবর্ণ-সৌখ্যংশ-বাজকঃ প্রতিবিশ্বকঃ ।

সম্প্রতি তোমার পুলকাক্ষ প্রভৃতি দুই একটি লক্ষণ যাহা দেখিতেছি,
তাহাতে বোধ হয়, তোমার কৃষ্ণরতি হইয়াছে।—

কিন্তু বাল-চমৎকার-কারী তচ্ছিন্ন বীকৃষা ।

অভিজ্ঞেন সুবোধোহয়ং রত্যাভাসঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

তোমার যে রতি হইয়াছে, তাহা কেবল চিহ্ন-দর্শনে নির্বোধ
লোকেরাই প্রশংসা করে, কিন্তু অভিজ্ঞ লোকগণ তাহাকে রত্যাভাসই
বলেন। তোমার যে পুলকাক্ষ, তাহা দুই কারণে হয়। তাহার এক কারণ
এই যে, নির্বিশেষ-গতিক্রম অপবর্ণ ভাণবাস।। সেই অপবর্ণের একমাত্র
দাতৃরূপ শ্রীকৃষ্ণকে অগণ করিয়া তোমার অহ্লাদ হইতেছে, তাহা হইতেই
তোমার পুলকাক্ষ,—স্বাভাবিকী কৃষ্ণপ্রীতি হইতে নয়। তোমার ভক্তি কেবল
অপবর্ণের সৌখ্যংশ-প্রকাশক প্রতিবিশ্ব-রূপ। যাহা হউক, এইরূপ ভক্ত্যা-
ভাসে তোমার বিনা শ্রমে অভীষ্ট নির্বাহ হইবে,—এই চিন্তাতেই তোমার
সুখোদয় হইতেছে। ইহাই তোমার রতি-লক্ষণের দ্বিতীয় কারণ। যথা—

বারাণসী-নিবাসী কচ্ছিদয়ং ব্যাহরন্ হরেশ্চরিতম্ ।

যতি-গোষ্ঠ্যানুগপলকঃ সিদ্ধতি গণদ্বয়ীমশ্রেঃ ।

এই দেখ, একটা বারাণসী-নিবাসী নির্বিশেষবাদী সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীদিগের
গোষ্ঠী-মধ্যে বলিয়া হরি-চরিত্র বর্ণন করিতে পরিতে পুলকিত হইতেছে এবং
নিজ গণ্ডবদ্য অশ্রুদ্বারা সিঞ্জন করিতেছে। হরি-চরিত্র-বর্ণন-সময়ে সন্ন্যাসী
ইহাই মনে করিতেছে যে, আহা! কত সহজ উপায়ে আমি নির্বিশেষ
গতিটী হস্তগত করিতেছি।

এরূপ অবস্থার কারণ শ্রীকৃষ্ণ গোদামী নির্দিষ্ট করিয়াছেন যথা,—

দৈবাং সঙ্কল্প-সঙ্গেন কীৰ্ত্তনামুদারিণাম্ ।

প্রাঃ প্রসন্ন-মনসাং ভোগ-মোক্ষাদি-দ্রাবিণাম্ ।

কেশাধিষ্ঠাদি ভাবেন্দ্রোঃ প্রতিবিম্ব উদয়তি ।

‘ভক্ত-হৃদয়ঃ-সুস্থ তৎ-সংসর্গ-প্রভাবতঃ ॥

এক্ষণে পূজকাক্ষ হওনাও নির্বিশেষবাদীর পক্ষে সহজ নয় ; যেহেতু, জ্ঞান ও বৈরাগ্য উভয় চিত্তকে কঠিন করে এবং হৃদয়গার স্বভাবা ভক্তির সমস্ত লক্ষণকে দূর করে। কিন্তু নির্বিশেষবাদীদিগের শ্রবণ-কীর্তনাদি-কার্য্যে ভোগ-মোক্ষাদি-বাগরূপ বাধি থাকিলেও শ্রবণ-কীর্তনাদি ফলক্রমে চিত্ত কিছু প্রশস্ত হয়। তৎকালে দৈবাৎ সম্ভূতের সজ্জক্রমে তাঁহাদের হৃদয়াকাশে উদিত ‘ভাব’-চন্দ্রের প্রতিবিম্ব-স্বরূপ নির্বিশেষভাব-দূষিত হৃদয়েও একটী দশা হয়, যাঁহা হইতে কিছু কিছু পূজকাক্ষ হইতে থাকে। যখন সং-সান্নিধ্য অভাব হয়, তখন আবার নিজ শিষ্যাগণের পূজকাক্ষকে ভাবকালি বলিয়া বিন্দা করিয়া থাকেন। অতএব নির্বিশেষ জ্ঞানাবৃত-চিন্তে কখনই ভক্তির উদয় হয় না। কিন্তু কখন কখন ভক্তাকাস উদয় হয়।

(২) বহির্মুখ কর্মাবৃত ভক্তাভাসে বহির্মুখ কর্মাবরণই ভক্তির গোপী বৃত্তিরা বাবধানরূপে স্থাপিত হয়। আশ্বাদক ও আশ্বাদন এতদুভয়ের মধ্যে বহির্মুখ কর্মরূপে একটী আবরণ আসিয়া পড়ে এবং ভক্তির মুখ্য-স্বরূপকে দূরে নিক্ষেপ করে। বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম ও অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি কর্ম্ম। কথ্য—‘নিত্য’ ও ‘নৈমিত্তিক’-রূপে দ্বিবিধ। সমস্ত পুণ্যজনক কর্ম্মই কর্ম্ম। কর্ম্মকে বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে পুস্তক অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়ে। অতএব ইহাদের কর্ম্মকৃত্ত বিশেষরূপে বুঝিতে ইচ্ছা আছে, তাঁহারা সংস্কৃত ‘শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত’-এ প্রথমাংশের কএক পৃষ্ঠা পাঠ করিলে সমস্ত বিষয় অগত হইবেন। স্মার্ত্তদিগের শাস্ত্র সমস্ত কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সেই সমস্ত কর্ম্মই বহির্মুখ। কর্ম্মাঙ্গে যে নিভাকর্ম্মরূপ বর্ণাশ্রমোচিত সঙ্ক্যা-বন্দনাদির ব্যবস্থা আছে, তাঁহাই কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি বলিয়া স্মার্ত্তেরা মনে করেন। গাঢ়রূপে বিবেচনা করিলে সে-কর্ম্মও বহির্মুখ কর্ম্ম। তাঁহাতে যে ভক্তি-লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাঁহাও প্রতিবিম্ব-স্বরূপ ভক্ত্যা-ভাসমাত্র। যেহেতু ঐসমস্ত কর্ম্মের ফল হয় অপবর্গ অর্থাৎ নির্বিশেষ-মুক্তি, নয় ভোগ অর্থাৎ ইহ-লৌকিক বা পারলৌকিক সুখলাভ। অনেকে মনে করেন যে, ভক্তিতত্ত্বে যে শ্রবণ-কীর্তনাদি অঙ্গসকল ব্যবস্থাপিত আছে, সে-সকলও কর্ম্ম এবং কর্ম্মজ যে শ্রবণ-কীর্তনাদির ব্যবস্থা, সে-সকলও ভক্তি। তত্ত্বের অনভিজ্ঞতাই একপ অত্যাচার-সিদ্ধান্তের একমাত্র জননী। কর্ম্ম ও

সাধন-ভক্তিতে বাহ্য-বিষয়ে অনেকটা মৌলান্দুশ্য থাকিলেও মূলে একটি প্রকাণ্ড ভেদ আছে। তাহাকেই কর্ম বলি, যাহা কৃত হইলে মল্লুগের ঐহিক ও পারত্রিকের কোন প্রকার জ্বল লাভ আছে। সেই লাভ, হয় ভোগরূপে লক্ষিত হইবে, নয় নির্বিশেষ মোক্ষরূপে লক্ষিত হইবে।

তাহাকেই ভক্তি বলি, যাহা কৃত হইলে কিছুমাত্র লাভ হইবে না, কেবল স্বাভাবিকী কৃষ্ণ-রতিই সমৃদ্ধ হইবে। অবান্তর ফল লব্ধ হইলেও তাহা তুচ্ছ ফল বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। যৎ-কার্য্য দ্বারা শুদ্ধভক্তি-চেষ্টার পোষক হয়, তাহা সহজেই ভক্তি, যেহেতু ভক্তিই ভক্তির জননী। জ্ঞান বা কর্ম কখনই ভক্তিকে জন্ম দিতে সক্ষম হয় না। হে অন্তরঙ্গ ভক্ত মহোদয়গণ! কর্মরূপ ব্যক্তিগণকে এই স্মরণ প্রভেদ দেখাইয়া আপনারা কখনই সন্তোষ লাভ করিতে পারিবেন না। কর্মীদের যখন পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য-ফলে ও সং-সঙ্গলেশ-ক্রমে কর্মশ্রদ্ধা-জ্ঞানশ্রদ্ধা দূরীভূত হয়, তখনই ভক্তির প্রাগ্ভাব-রূপ ভক্তি-বীজরূপা শ্রদ্ধা উদ্ভিত হয়। সে শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই কর্ম ও ভক্তির প্রভেদ বুঝিতে পারিবেন না। যাহার দৃষ্টিতে এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, ভক্তিও কর্মরূপা, তিনি শুদ্ধভক্তির চিন্ময় ভাব কখনও হৃদয়ে আশ্বাদন করেন নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। তিরু ও মিঠের প্রভেদ কেবল আশ্বাদন দ্বারাই জানা যায়, বিচার দ্বারা জানা যায় না। কিন্তু আশ্বাদন-অন্তে বিচার করিলে তাহা অতি উত্তমরূপে জানা যায়। কর্মপ্রাধিকরণ যে হরিনামাদি করিয়া নৃতা করেন, সে-সমুদয়ই পূর্বোক্ত দৈবাৎ “সংভক্তসঞ্জন” ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা যে প্রতিবিম্ব ভক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই যাত্র, শুদ্ধভক্তি নয়। তাহাদের পুলকান্ত কেবল “ভোগ-সৌখ্যংশ-বাজক” প্রতি-বিম্ব-যাত্র। তৎকালে তাহারা হয় স্বর্গাদি সুখের চিন্তা, নয় মোক্ষাভিনন্দি করিয়া থাকেন। ইহা প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস।

(৩) বিপরীত তত্ত্বে ভক্তিবুদ্ধি-জন্মিত ভক্ত্যাভাস আমরা সহজে আজকাল প্রচলিত পঞ্চোপাসনা ও যোগ-মার্গের ঈশ্বর-প্রতিধানে লক্ষ্য করি। আজকাল যাহাকে পঞ্চোপাসনা বলে, তাহাতে পাঁচটী উপাসনা-সম্প্রদায় কল্পিত হইয়াছে। পাঁচটীই নির্বিশেষ জ্ঞানের অঙ্গগত। ঐ পাঁচটী উপাসনার নাম—শৈব, শাক্ত, গানপত্য, সৌর ও বৈষ্ণব। এই পঞ্চোপাসনার মধ্যে যে একটি বৈষ্ণব-শ্রেণী আছে, তাহা ভক্তিভক্ত-সম্মত বৈষ্ণব-

সম্প্রদায় নয়। ভক্তিতত্ত্ব-সম্মত যে চারিটি বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আছে, তাহা পঞ্চোপাসকদিগের অন্তর্গত নয়। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণু-স্বামী ও শ্রীনিব্বাদিত্য—এই চারিজন চারিটি শুদ্ধভক্তি-সম্প্রদায়ের আচার্য্য। তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্র-বাক্য, যথা—

শ্রী-ব্রহ্ম-রাজ-সনকাস্তোত্রঃ সম্প্রদায়িনঃ ।

এই সম্প্রদায়-চতুষ্টয়কে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—

সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ ॥

পঞ্চোপাসনান্তর্গত বৈষ্ণবগণ বস্তুতঃ নির্বিশেষবাদী। তাঁহারা শুদ্ধভক্ত নহেন। পাঁচটি উপাস্ত দেবতারই যে কল্লিত-মুত্তি, তাহা পঞ্চোপাসকগণ সকলেই স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে উপাসনা সিদ্ধ হইলে চরম নির্বিশেষ ব্রহ্মই লভ্য হইবে। সেই সেই কল্লিত-মুত্তিকে ইশ্বর বলিয়া নির্দেশ করত তাহাতে যে ভক্তি করা যায়, সে-ভক্তি নিত্য নয়। বস্তুতঃ তাহা জ্ঞানাবৃত ভক্ত্যাভাস মাত্র। জ্ঞানাবৃত ভক্ত্যাভাসে ভক্তিবৃদ্ধি করিলে কখনও ভক্তির কার্য্য হয় না। তাহাতে যদি কাহারও ভক্তি-লক্ষণ পুলকাক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, সে কেবল 'ভোগাপবর্ণ-সৌখ্যাংশব্যঞ্জক প্রতিবিম্ব' মাত্র। পঞ্চোপাসক-দিগের সেরূপ কল্লিত দেব-মুত্তিতে ভক্ত্যাভাস-মাত্র হইয়া থাকে, যোগিদিগেরও বিবাড়-বা হিরণ্য-গর্ভরূপ কল্লিত-মুত্তি অলঙ্ঘন-পূর্ব্বক সেইরূপ পুলকাক্ষ হয়। সে সমুদায়ই প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস। প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস উন্নত হইয়া যে কখনও শুদ্ধভক্তি-স্বরূপ লাভ করিবে, তাহা মনে করা যাউতে পারে না ; যেহেতু তন্মধ্যে যে কর্ম্ম-জড়তা ও নির্বিশেষ চিন্তা আছে, তাহা পরিত্যাগ করিলে ঐ তত্ত্বের সত্তা লোপ হয়। নূতন করিয়া চিন্তবৃত্তির সম্পূর্ণ সংস্কার না করিলে আর তাহাদের মঙ্গল নাই। সনক, সনাতন প্রভৃতি নির্বিশেষ-বাদিগণ এবং পরমজ্ঞানী শুকদেব যখন পূর্ব্বধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করত ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিলেন, তখনই তাঁহাদের নূতন জীবন উপস্থিত হইল। সেই নবজীবন-বলে আমাদের আচার্য্য-পদ লাভ করিয়াছেন। প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস-সম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

বিমুক্তাখিল-তর্কৈর্ধা মুক্তৈরপি বিমুগ্ধাতঃ ।

যা কৃষ্ণেনাভিগোপ্যাস্ত ভক্তস্তোখপি ন দীযতে ॥

স্না ভুক্তি-মুক্তি-কামত্বাচ্ছূদ্ধাং ভুক্তিমকুর্ষ্বতাম্ ।

হৃদয়ে সংভবতোবাং কথং ভাগবতী রতিঃ ॥

অখিল-তৃষ্ণাশূণ্য মুক্ত জীবসকল যাহা অন্বেষণ করেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভজনশীল ব্যক্তিগণকে যাহা সহজে দেন না, সেই ভাগবতী-রতি ভুক্তি ও মুক্তিকামী শুদ্ধা ভক্তি বাহারা আবাদন করেন না, তাঁহাদের হৃদয়ে কিরূপে সম্ভব হয় ? এস্থলে উপলক্ষণে ইহাও নিশ্চিত হয় যে, যোষিৎসঙ্গ ও মাদক-সেবনের দ্বারা যে ঔপাধিক পুথ লাভ হয়, তাহাকে ভাগবতী রতি বলিয়া যাহারা মনে করে, তাহারা স্বয়ং ভ্রষ্ট হইয়াছে ও জগৎকে ভ্রষ্ট করিতেছে । (ক্রমশঃ)

— জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্বক্তাপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের

চতুর্দশ-বর্ষপূর্তি বার্ষিক-বিরহ-মহোৎসবে

বিরহাতি কুমুমাঞ্জলি

পরমরাধাতম শ্রীল গুরুদেব ! গিয়াছ যে দূরে চলে,

তাই বিরহাগ্নি মোদের অন্তর দহিতেছে পলে পলে ।

চৌদ্দবছর গত হ'ল আজ, এলে না এখনও ফিরে ;

তোমাতে আর কি পা'ব না জীবনে ? কাঁদিব জীবন-ভরে ।

তোমার বিহনে পথে গাঠে-ঘাটে কারো মুখে নাহি হাসি,

তৃণ-তরু-লতা রয়ে অধোমুখে, নীরব আজি দশ-দিশি ।

ময়ূর-ময়ূরী পাখা ছুলাইয়া নাচে না তেমন আর,

দোয়েল, কোয়েল মধুমাখা-স্বরে ডাকে না'ক বার বার ।

আজি এ' ত্রিথিতে তোমার বিরহে মোরা ক্রমে নিমগন,
 কেহ খুঁজে নাহি পায় সাহসনা, কেঁদে ফিরি অলুক্ষণ।
 আমাদের পোড়াপাল বলি' কি চলে গেছো ভাড়াভাড়ি ?
 বিপ্রলভ ভক্তের ইচ্ছিত দিলে অপ্রকট-লীলা ধরি'।
 হেন ত্রিথিবোগে শ্রীরাধার ডাকে পশিয়াছ ব্রজধামে,
 সেখা' রাসমঞ্চেতে হরি-প্রিয়া হ'য়ে খেলিছ প্রাণের টানে।
 আমরা হেথায় তোমার ধ্যানে সতত তন্ময় আছি,
 তোমার মহিমা গাহি' মোরা এবে তব সেবা-সঙ্গ যাচি।
 শ্রীপ্রভুপাদের অপ্রকট 'পরে তুমি এলে গুরুরূপে,
 নিজ গুরু-ধারা সারা ভূ-ভারতে বহাইলে তীব্রভাবে।
 শ্রীহরি-গুরু-সেবা ব্যতীত তোমার কৃত্য ছিল না আর,
 তুমি নিত্যসিদ্ধা ব্রজের মঞ্জরী,—নিজজন শ্রীরাধার।
 স'পেছিলে তুমি নিজ দেহ-মন শ্রীগুরুর সেবা-ব্রতে,
 ভক্ত-মানসে, তব পরিচয় প্রভুপাদের প্রেষ্ঠরূপে।
 তোমার শ্রীগুরুর চিন্তন কেই বা করিতে পারে ?
 নয়নে তোমার গুরুময় রূপ, মুখে গুরুনাম স্মুরে।
 বেদান্তসূত্রে ভক্তিবাদ স্থাপনে তব নিজ অবদান,
 শত শতাব্দীতে র'বে এই জগতে ভাস্বর অগ্নান।
 গোড়ীয় বিরোধী মতবাদগুলি যখনি দেখেছো চোখে,
 তখনি সে'গুলি চূর্ণ করেছো বিচারি' কঠোর ভাবে।
 মায়াবাদ-তমঃ দূর করি' তুমি, পুরিলে গুরুর সাধ,
 'বৈষ্ণব-বিজয়'—গ্রন্থাদি রচিয়া খণ্ডিয়াছ মায়াবাদ।
 পাষণ্ড-দলনে তোমার বিক্রম ছিল শ্রীজীবের মতো,
 'পাষণ্ড-গজৈক-সিংহ' নামে তাই হ'লে এ ভুবনে খ্যাত।
 মোদের নিত্যমঙ্গলের তরে উপদেশ দিয়েছ কত,—
 শ্রবণ-কীৰ্ত্তনরূপ ভক্ত্যনুষ্ঠান,—সাধনের জ্ঞেয়পথ।

সদগুরু পদাশ্রয়ে সাধন-ভজনে উদিলে তত্ত্বজ্ঞান,—

তবেই বিস্কন্ধ প্রেমভক্তিযোগে মিশিবেন ভগবান !

শ্রীগুরু-কৃপা ছাড়া তত্ত্ব-বিজ্ঞান কেহ না জানিতে পারে,

গুরুর উপদেশে ভক্তাঙ্গ যাজনে ক্রমশঃ ভক্তি বাড়ে ।

ভক্তিযাতীত কোন সাধনেই সুফল দিতে নাহি পারে,

‘ভক্ত্যা পশ্যন্তি’—এ’হেন বচনে শাস্ত্র তাহা প্রমাণ করে ।

আহা’এর প্রতিগ্রাসে গ্রাসে যেমন শরীরে শক্তি আসে,

ভক্তি-যাজনে হরি-প্রতি তেমন প্রীতি বাড়ে অনায়াসে ।

তত্ত্বশ্রুতি ছাড়ি’ মীলা-কীৰ্ত্তনে যাহারা মজিয়া থাকে,

প্রাকৃত সহজিয়া হ’য়ে ওঠে তারা, আসে না ভক্তি-পথে ।

ঐকান্তিকভাবে নামাশ্রয়েই শ্রীনামতত্ত্ব বুঝা যায়,

অতি মূর্খ বিস্কন্ধ নামোচ্চারে শ্রীহরির দেখা পায় ।

তোমার এহেন কণামৃত আজি জাগে মোর স্মৃতিপটে,

তোমা’ লাগি’ এবে কঁাদি হাহাকারে, করাঘাত হানি মাথে ।

মাদৃশ দুর্গত জীবের প্রতি সদা কৃপা-বারি সিকিতে,

রেখে গেছে তব আশীর্বাদী ফুপ শ্রীল আচার্যদেবে ।

আচার্যদেবের আলুগতো এবে তব সেবায় আছি রত,

তঁাহার মাঝারে তোমারি প্রকাশ হয় আজি অলুভত ।

তব কথা আজি কহিতে সতত চোখে আসে জল ভরে,

বিসংপেষ সুব ফোটে না ভাষায়, অন্তর ভেঙে পড়ে ।

এ’বিলাপ-অঞ্জলি নিবেদি’ তোমারে শ্রণমি’ প্রার্থনা করি,—

মিত্য তোমার চরণতলে যেন অন্তিম-আশ্রয় বরি ।

শ্রীগুরু-বিরহ-বাগর

৩০ পদনাভ, ৪৯৬ গৌরাঙ্গ

ইং ১ নভেম্বর, ১৯৮২

ভবদীয় শ্রীপাদপদ্মের কৃপাস্নেহপ্রার্থী—

দাসাধম শ্রীচিন্তরঞ্জন মণ্ডল

গ্রাম - বড়বহরকুলি (বর্ধমান) ।

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৮ পৃষ্ঠার পর)

হরিভক্তির ফল অবিনাশী

যদি প্রশ্ন হয়,—অল্প বয়সে ভজন আরম্ভ করিয়া ২৪ দিন ভজনের পর মৃত্যু হইলে ভজনকারীর এই অল্প ভজনের কি সার্থকতা হইবে; সুতরাং বাহারা অজ্ঞায়, তাহাদের পক্ষে এই অল্প বয়স হইতে ভজন আরম্ভ করা বা না করা উভয়ই সমান। যেহেতু সিদ্ধিলাভের পূর্বে মৃত্যুগ্রস্ত হওয়া ভজনফল লাভ করা সম্ভব হইল না। ইতার সমাবানার্থ প্রহ্লাদ মহারাজ বলিলেন,—‘তদপি অর্থদম্’ অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞাদি বা অন্য দেবতার অর্চনাদি সমুদয় কার্যাই সর্বাস্থের সহিত সম্পূর্ণ করিলে তাহার ফলাফল হয়, অতথা ফল লাভ হয় না। বরং কোন কোন কার্যের বিপরীত ফলও হইয়া থাকে; কিন্তু শিহরিব ভজন-কার্যের সে-সকলের সহিত তুলনা হয় না। কারণ ভজন-ক্রিয়া আরম্ভ করিলেই সফল বা মচল লাভ হয়, সম্পূর্ণতার কোন অপেক্ষা নাই। ভজনের তীব্রত্ব ও মুহূর্ত্ত-ভেদে শীঘ্র ও কিছু বিলম্বে ফল লাভ হয় মাত্র। তাহা ছাড়া ভজন-কার্যের এক বিন্দুও বিফলে যায় না। ‘কৌশ্লেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি’—বাক্যে স্বয়ং ভগবানু তাহা স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছেন। গত ৩৪শ বর্ষের ১০ম সংখ্যার তাহা বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

জড়-ভরত ভজন-মধ্যে মৈথিলা অবলম্বন করায় তিনজন্মে ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরীক্ষিত-মহারাজ মাত্র সপ্তাহকাল তীব্র ঐকান্তিকতার সহিত শ্রবণাদি ভক্তিধারা ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন। খট্টাজ নামে কোন রাজর্ষিপ্রণব বিশেষ যোদ্ধা ছিলেন। এক সময়ে অসুর-পীড়িত দেবগণ অসুরগণকে জয় করিবার জন্ত তাহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে-মতে খট্টাজরাজা স্বর্গে গমন করিয়া বহুদিন অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করত তাহা-দিগকে নিধন ও বর্গ হইতে বিতাড়িত করিলে সমস্ত দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে বর দিতে চাহিলেন। তবে মুক্তিদানে একমাত্র বিষ্ণুই অধিকার, সেহেতু মুক্তি দিয়া যে-কোন বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন রাজা জ্ঞািলেন—কাজেখ্যাতি তাঁহার নিজের রহিয়াছে; তাহাতে আর প্রয়োজন কি? আবার বর প্রার্থনা না করিলেও দেবতাগণের জয়মাননা হইবে। একরূপ চিন্তা করিয়া রাজা মৃত্যু-সময়টী জানিতে ইচ্ছা করিলেন। উদ্দেশ্য—শেষ বয়সে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিবেন।

তদন্তরে দেবতাগণ জানাইলেন—“আপনার মৃত্যু-সময়ের মাত্র এক মুহূর্ত (২ দণ্ড) অবশেষ আছে।” ইহা শুনিয়া খট্টাঙ্গ রাজা দেবদানে তৎক্ষণাৎ নিজ রাজ্যে আসিলেন এবং অবিলম্বে দেব-মন্দিরে প্রবেশপূর্বক ভগবানে মনোনিবেশ করিলেন। দেব-নির্দিষ্ট ২ দণ্ড সময় পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মৃত্যু হইল। কিন্তু অল্প সময়ের ক্ষণ অল্প সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগপূর্বক তদায়ত্তাবে ভগবৎ-চিন্তাফলে বিমুগ্ধপ্রতি বিমানে বৈকুণ্ঠ গমন করিলেন এবং ভগবৎ-পার্বদস্ত পর্য্যন্ত লাভ করিলেন।

এই ক্ষণভরত, পরীক্ষিত মহাশক্তি ও খট্টাঙ্গ রাজার-দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, ভগবদ্ ভজন যাহাই যে-পরিমাণে করা যায়, তাহা মৃত্যুতেও নষ্ট হয় না; সাধারণ অসম্পূর্ণ কর্মফলের মত উহা বিনাশশীল নহে।

অজ্ঞান ও শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজনে বিমুগ্ধকরের অবিনাশিত্ব স্থাপন

শ্রীমন্তগবদগীতায় অজ্ঞান শ্রীভগবানকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

অযতিঃ শঙ্কযোগেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ ।

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ (গীঃ ৬।৩৭)

‘হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার ভজনে প্রবৃত্ত শঙ্কানীল ব্যক্তি যদি দিক্খিলাভের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা কুসঙ্গ-বশে শিথিলতা অবলম্বন করে বা সম্পূর্ণ ভজন হইতে বিরত হয়, তবে তাহার কি গতি হইবে?—অর্থাৎ মৃত্যুতে পূর্বভজন-ফলের নাশ বা স্বর্গাদি প্রাপ্তি এবং কুসঙ্গে বিপথগামী হওয়ার জন্য নরকপ্রাপ্তি—ইহাঃর মধ্যে কোনটী তাহার লাভ হয়? তদন্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্ত বিদ্বতে ।

ন হি কল্যাণকৃত কশ্চিদুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুযিদ্ধা শাস্বতীঃ সমাঃ ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগশ্চৌহিভিজ্ঞায়তে ॥

অথবা যোগিনীমেব কূলে ভবতি ধীমতাম্ ।

এতন্নি হুর্জস্তরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌরুষদেহিকম্ ।

যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন । (গীঃ ৬।৪০-৪৩)

অর্থাৎ—হে অর্জুন ! আমার ভজনে প্রবৃত্ত মানবের ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও বিনাশ নাই। যে-হেতু আমার ভজনরূপ শুভকার্য্য-অনুষ্ঠানকারী যে-কোন ব্যক্তি কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হব না। তবে কি প্রাপ্ত হন ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন,—আমার ভজন আশ্রয় করিয়া শীঘ্র মৃত্যু হইলে বা কুসংসর্গে নিপথগামী হইয়া ভজন পরিত্যাগ করিলেও, সর্ব্বাবস্থায় সে মৃত্যুর পর অশ্বমেধাদি যজ্ঞ-সম্পাদনকারী পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণের প্রাপ্য লোকসমূহ লাভ করিয়া তথায় বহুবর্ষকাল বাসের পর সদাচার-পরায়ণ ধর্ম্মীর গৃহে জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ আমার ভজন-নিষ্ঠ ভক্তগৃহে জন্মগ্রহণ করে। এরূপ জন্ম সাধারনের পক্ষে দুর্লভ জানিবে। হে কুরুনন্দন ! আমার ভজন-ভ্রষ্ট ব্যক্তি যেখানেই জাত হউক না কেন, পূর্ব্বেদহজাত ভজন-ক্রিয়াটী সে স্বতঃই আমার কৃপায় লাভ করিয়া থাকে। তখন সে পুনরায় তৎপরবর্ত্তী ভজনের দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্ত সচেষ্ট হইয়া থাকে। সেই চেষ্টার ঔত্তরায় সে-জন্মে এবং মৃত্যুর পরবর্ত্তী জন্মে আমাকে লাভ করে। কোন প্রকারেই সে বঞ্চিত হয় না—জানিবে। ভগবান্ ক্রীকৃষ্ণের এই উক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই প্রহ্লাদ বলিলেন—‘তদপি অর্থদম্’। এই ক্ষণভঙ্গুর মানব-জন্মই একমাত্র পুরুষার্থ-দানে সমর্থ। অজ্ঞ জন্মে কখনও হ্রিঃভজন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না।

‘ভাগবত’-ধর্ম্মাচরণের উপদেশ-তাৎপর্য্য

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ দৈত্য-বালকগণকে “কোমার আচরণে প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ” বলিয়া ‘ভাগবত-ধর্ম্ম’ আচরণ করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন ইহা আমরা পূর্বে সংখ্যায় ৫৫ পৃষ্ঠায় জানাইয়াছি। ‘একশ্রে জিজ্ঞাস্তা—এরূপ উপদেশ করিলেন কেন ? ‘ধর্ম্মান্ আচরণে’ বলিলেই ত চলিত ?—যাহার যে ধর্ম্মে রুচি আছে, সে তাহাই আচরণ করিতে পারিত ? বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর ও গাণপত্যগণ কুমার-বরস হইতেই নিজ নিজ ধর্ম্ম যাজন বিষয়ে তৎপর হইতে পারিত। এক্ষণে ধর্ম্মের বিশেষণরূপে ‘ভাগবত’ কথাটির কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। ইহার সমাধানার্থ প্রহ্লাদ মহারাজ পরবর্ত্তী দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বারা অন্য ধর্ম্মাপেক্ষা ভাগবত-ধর্ম্মাচরণের প্রয়োজনীয়তা জানাইয়া দিতেছেন, যথা—

যথা হি পুরুষজ্ঞেহ বিধোঃ পাদোপসর্পণম্।

যদেষ সর্কভূতানাম্ ‘প্রিয়’ ‘আত্মে’ ‘স্বঃ’ ‘সুহৃদ’ ॥ (ভাঃ ৭।৬.২)

অর্থাৎ, হে দৈত্য-বালকগণ ! এ-ভগতে মানব-দেহধারী সকলের পক্ষেই ভগবান্ বিষ্ণুর চরণসেবা নিতান্ত প্রয়োজন। যেহেতু ভগবান্ বিষ্ণু জীব-মাত্রেরই আত্মনিক ‘প্রিয়’, ‘আত্মা’, ‘ঈশ্বর’ ও ‘স্বকৃৎ’; অন্য কোনও দেবতা সেরূপ নহেন। এক্ষণে এই বিষ্ণু ভগবানের উক্ত চারিটি বিশেষত্ব বিশদভাবে পর্যালোচনা করা আবশ্যিক।

প্রথমতঃ—তিনি জীবের ‘প্রিয়ঃ’ এবং জীবও ভগবানের প্রিয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ; অর্থাৎ ইহা কাহারও উপদেশাদি-সাপেক্ষ নহে। তবে জীবগণ মায়ার কবলে পতিত হইয়া দেহ, স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য, ঐশ্বর্যা প্রভৃতি মায়াব প্রদত্ত বস্তুতে প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ায় সেই চিরসত্য ভগবৎপ্রিয়তা-বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছে। ভগবদ্-বৈমুখ্য-বশে জীব বহুদূরে সরিয়া গেলেও যদি কোনও সৌভাগ্যক্রমে সৎগুরুর কৃপা লাভ করিতে পারে, তবে সেই জীবের আপনা হইতেই ভগবানে প্রিয়তা-বুদ্ধি জাগিয়া উঠে। তখন আর কাহাকেও উহা বলিয়া বা শিখাইয়া দিতে হয় না।

ভক্তপ্রবর শ্রব, শ্রীনারদের কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার উপদেশানুযায়ী মন্ত্র জপের দ্বারা অল্প দিন-মধ্যেই ভগবানের প্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্য-স্বথের বশবর্তী হইয়া ভগবৎ আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেও ভগবান্ তাঁহাকে দর্শন দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সেই তুচ্ছ-হেয় জাগতিক বিষয়-সুখ তিরোহিত হইয়া গেল; এবং ভগবানে প্রিয়তা-বুদ্ধি জাগিয়া উঠিল। সেজন্য তখন তিনি শুধু ভগবানের সেবা-প্রার্থনাই করিয়াছিলেন, অল্প কিছু প্রার্থনা করেন নাই। উহা পূর্ববর্তী ৩৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যায় বিশদভাবে বর্ণন করা হইয়াছে। সুতরাং আগরা ভগবানকে সাঙ্গাতে দেখিতে পাই না বলিয়াই তৎপ্রিয়ত্ব বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে ঐ বুদ্ধি স্বতঃই জাগিয়া উঠিবে। অগ্নির দাতিকা শক্তির প্রভাব জানিয়া বা না জানিয়া তাহাতে হস্ত দিলে যেমন সে-হস্ত দগ্ধ হইবেই, সেটরূপ ভগবানকে নিকটে প্রাপ্ত হইলেই তাঁহার প্রতি প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি জাগিয়া উঠিবে। ক্রবের যেমন ভগবানকে ভগবান্‌রূপে প্রাপ্ত হওয়ায় প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি জাগিয়াছিল, সেইরূপ ভগবানকে ‘ভগবান্’রূপে না জানিয়াও তাঁহাকে অল্প যেন-কোনও রূপে নিকটে প্রাপ্ত হইলেই প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি স্বতঃই জাগিয়া উঠে। ইহারও উদাহরণ শাস্ত্র-আদিতে বহু পাওয়া যায়, প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কিছু আলোচনা করিতেছি। (ক্রমশঃ)

কুরুক্ষেত্র, গীতা ও মহাভারত

[পৌরাণিক কাহিনী]

নারায়ণঃ নমস্কৃত্য নরৈষ্কেব নরোত্তমম্।

দেবীঃ সরস্বতী ব্যাসঃ ততো জয় মুদীরয়েৎ ॥

জাজিও সমস্তপঞ্চক মহাতীর্থে বহুলোক নিত্য জ্ঞান করেন। কুরুক্ষেত্রে সমস্তপঞ্চক-তীর্থ। উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃশদ্বতী; কুরুক্ষেত্র এই উভয় নদীর মধ্যবর্তী। ধানেশ্বর হইয়া কুরুক্ষেত্রে যাইতে হয়।

ত্রৈতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিক্ষণে জামদগ্ন্য পরশুরাম পিতৃবধ কর্তা শ্রবণে পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষেত্রিয় করিয়া ক্ষত্রিয়-রূপে শোণিতময় পঞ্চহুদ প্রস্তুত করেন। সেই শোণিতময় পঞ্চহুদের সন্ধিধানে যে-সকল প্রদেশ আছে তাহারই নাম পরম পণ্ডিত সমস্তপঞ্চক তীর্থ।

কলি ও দ্বাপরের সন্ধিকালে এই সমস্তপঞ্চক তীর্থে কুরু ও পাণ্ডবদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যাহার নাম হইতে কোরব বংশের উৎপত্তি তাহারই নামানুসারে সমস্তপঞ্চকের নাম কুরুক্ষেত্র। রাজা কুরু আপন রাজধানী প্রবাগ পরিভ্যাগ করিয়া এই স্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম কুরুক্ষেত্র। কালক্রমে কুরুক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র হইয়া উঠে। এখনও কুরুক্ষেত্রে ভারত-মহাসমরের স্মারক অনেক চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

দীর্ঘ প্রস্থে দশ যোজন ব্যাপীয়া লৈল্য সজ্জিত হইয়াছে। বিস্তীর্ণ কুরুক্ষেত্রে স্থান নাই। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী লৈল্য যুদ্ধার্থে এখানে সমবেত। প্রতি বীরসদয়ে অগ্নি জ্বলিতেছে—কিন্তু সে অগ্নি-উৎপত্তিধান ভিন্ন কিছুই দগ্ধ করিতেছে না। অচিরে একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটবে। যে অগ্নি ব্যাপার অষ্টাদশ দিবস ব্যাপীয়া সংঘটিত হইয়াছিল, যে-অগ্নিকাণ্ডে কুরুকুল ভস্মীভূত হইয়াছিল, যে-মহাসমরান্তে একপক্ষে তিনটি ও অন্যপক্ষে সাতটি ভিন্ন সমুদয় অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট হইয়াছিল, যে-অগ্নিকাণ্ডে আবহমান কাল হটতে ভগ্নতবে দগ্ধ করিতেছে, সেই অগ্নিকাণ্ডের অব্যবহিত পূর্বে মুহূর্তে গীতা উপদিষ্ট হইয়াছিল।

যেদিক দিয়াই দেখ ব্যাষ্টি বা সমষ্টি, যে ভাবেই বল, ধর্ম্মার্থের যুদ্ধ লইয়া এই মায়িক সংসারাত্মক। এই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের জ্ঞান ও অজ্ঞানের মায়িক বিস্বাদ মিটিগেই প্রকৃতি ক্ষোভশূন্য। তখন যে অনন্ত জলধিকে

এই পরিদৃষ্টমান জল বুদ্ধবুদ্ধ ভাদিরাছিল জ্বাৰ তাহাতেই ইহা বিলীন হইল, ইহাই প্রকৃতির সাম্যাবস্থা; এখনও তাহা সৃষ্টি হয় নাই। ইহাই মহাপ্রলয়। যে ধারা-সাহায্যে “এক” “বহু” হইয়াছিল, মায়া আছে ‘এক’ একই রহিয়াছেন। ভেদাভেদ সমস্তই মায়া-জন্ম। যুদ্ধও ভেদ-জন্ম। প্রকৃতি হইতে এই ধর্মার্থের যুদ্ধ দূর হইলেই প্রকৃতির বিরাম ও লয়। জীব ও নিজ স্বদয়ে যে-মুহূর্তে এই বিবাদ মিটাইল, যে-মুহূর্তে ধর্মের দ্বারা অধর্ম পরাজিত হইল, জ্ঞান প্রকাশে অজ্ঞান দূর হইল, জীব সেই মুহূর্ত হইতে ভগবৎলাগরে সমাধিস্থ হইল। কিন্তু যতদিন অধর্মের জয় ততদিন প্রকৃতির দারুণ বৈষম্য—ততদিন সৃষ্টি-বিস্তার। অধর্মের জয়ে সৃষ্টি-বিস্তার সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন, অধর্ম জয়ের ব্যাপার এখানে উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

ধর্মার্থের যুদ্ধ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। সত্যযুগে দেবাসুরের যুদ্ধ, ত্রেতায় রাম-রাবণের, দ্বাপরে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ এবং কলিযুগে প্রাণ জীবদ্বয়ে ধর্মের সহিত অধর্মের ঘোরতর বিবাদ। যে অধর্ম-প্রবাহ আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সকল জাতির ধর্মশাস্ত্র ও ইতিহাসাদিতে ইহার এক একটা নাম আছে; আর্য্য জাতি এই অধর্মকে পাপ, অজ্ঞান, অবিজ্ঞা, মায়া, প্রকৃতি, শক্তি, জড়, তম; ইত্যাদি বহু নাম দিয়াছেন।

জিন্দাভেক্তায় ইহার নাম আত্মরিমান বা অন্ধকার; বাইবেলে ইহার নাম শয়তান। এই অধর্মকে পরাজয়ের জন্য নানা জাতির মধ্যে নানাপ্রকার উপদেশ আছে। অর্থাৎ (ARTIUR) ইহার উচ্ছেদ সাধনার্থ “নাইটহুড্” সৃষ্টি করেন। আর্য্য জাতির সমাজ, ধর্ম, আচার-ব্যবহার সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত-অনুষ্ঠান এই অধর্ম অজ্ঞান বা মায়াব হস্ত হইতে মুক্তি লাভের জন্ত। এই অধর্ম কিরূপে জয় করিতে হইবে তজ্জন্য তাহারা মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করেন। ধন-শক্তি, জ্ঞানশক্তি, দেবশক্তির শব্দতলে পশু-শক্তির একত্র সমাবেশ প্রয়োজন। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে সিদ্ধির জন্ত শুভেচ্ছা আবশ্যিক। পরে কর্ম্ম করিলেই এই অশুর জয় হয়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধও এই আবহমান কাল প্রধাবিত ধর্মার্থ যুদ্ধের অঙ্গ। যুদ্ধটি ঐতিহাসিক হইলেও ব্যাসদেব দেখাইয়াছেন অন্তর্নিহিত যুদ্ধই বাহিরে আকার গ্রহণ করে মাত্র। মানুষ কিছুই নহে, অন্তর্নিহিত স্বভাবের মুক্তিমাত্র।

বকামান মহাভারতের তুর্ঘ্যোধন ক্রোধময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার ফল শকুনি শাখা, হুঃশাসন ফল ও পুষ্প, মনসী রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল।

অতঃদিকে যুধিষ্ঠির ধর্মময় মহাবৃক্ষ। অর্জুন স্বক, ভীমসেন শাখা, মাদ্রীপুত্র নকুল-সহদেব তাহার পুষ্প ও ফল এবং কৃষ্ণ, বৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল।

মূল শ্লোক এই—

“তুর্ঘ্যোধনো মহাময়ো মহাক্রমঃ স্বককর্ণঃ শকুনিপুস্ত্র শাখা,
হুঃশাসনঃ পুষ্প-ফলে সমুদ্রে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রো মনীষী।

• যুধিষ্ঠিরো বর্মময়ো মহাক্রমঃ স্বদ্বৈহর্জুনো ভীমসেনোহস্ত্র শাখা।
মাদ্রীপুত্রো পুষ্পফলে সমুদ্রে মূলং কৃষ্ণে ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণশ্চ ॥”

কেহ কেহ এই দেখিয়া মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব উড়াইয়া দিতে চান—
“মহাভারত কণকমাজ”। “কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা আঁটিতে পারেন না” ইত্যাদি মতগুলি বড়ই ভ্রমাত্মক। কর্ণাল, আমিষ, বাণগজা, ভীষ্ম-শরশয্যার স্থান, গীতা-উপদেশ প্রভৃতির স্থান এবং কুরুক্ষেত্রের আধুনিক অবস্থা যদি স্বচক্ষে ইহারা দর্শন করেন, তবে এই ভ্রমাত্মক মত দিয়া সাধারণের বিশ্বাস নষ্ট করিবার প্রয়াস চইতে তাহারা নিশ্চয় বিরত হইবেন।

কিন্তু বলিতেছিলাম—অগণিত কুরুদৈন্য অহুত্তরঙ্গ সমুদ্রের জায় এখনও স্থির হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এখনও কুরুবংশ ধ্বংসকারী অনলগানি বিগলিত ছড়াইয়া পড়ে নাই।

কখনও জলভরা মেঘ দেখিয়াছেন? যে-মেঘমালা দেখিতে দেখিতে দিগমের আলোকবাশি ডুবাছয়া স্পর্শকাল মধ্যে দশদিক অন্ধকারে ছাইয়া ফেলে; মেঘ জলপূরিণ অথচ বৃষ্টি হইতেছেনা। অচিরে প্রবল ঝঞ্ঝাতে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবে কিন্তু এখনও প্রকৃতি নিস্তব্ধ। যেন বৃহদ্রথ-প্রস্থান পর্যন্ত অবরুদ্ধ, অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য এখনও স্থির। এই সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতা উপদেশ করিয়াছিলেন।

—শ্রীমহাদেব দত্তশর্মা (H. G. T.)

সাহিত্য-সরস্বতী, পুরাণ-শাস্ত্রী (সুবর্ণপদক প্রাপ্ত)

চিনপাই (বীরভূম)।

পরমাত্মাধ্যাতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম চিহ্নিলাস
 নিত্যলীলা-প্রতিষ্টে ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
 শ্রী শ্রীমন্ত্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
 চতুর্দশ-বার্ষিক বিব্রহ-বাসনের
 এ-দীনের প্রহ্লাজলি

(পুষ্কপ্রকাশিত ৩৪ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৫৭ পৃষ্ঠার পর)

মদীয় পবন গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-প্রতিষ্টে ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্ত্তি-
 সিদ্ধান্ত সংস্কৃতী ঠাকুর যখন বিপুলভাবে স্তম্ভস্তম্ভিত্বাণী প্রচার করিতে আরম্ভ
 করিয়াছিলেন, সেই সময় নবদ্বীপ শহর আউল, পাউল, কর্তাভজা মেড,
 দণ্ডেশ, সাঁটে-সহজিয়া, সক্তিভেটী, স্মার্ত, জাত-গোসাটে, চুঁড়াধারী ও
 গোরাজ-নাগরী প্রভৃতি অপরিস্রবাহের ব্যক্তির দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল। শ্রীল
 সরস্বতী ঠাকুরের বক্তৃতিমাধ্যম প্রচারে জনসম্প্রদায়ী লোকসকল কিছুটা
 দমিত হইলেও তাহাদের ইচ্ছিত তর্পণে বাধা পড়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করিতে
 লাগিল। সেই অসন্তোষ ক্রমশঃ ধূমায়িত হইয়া প্রবলকার ধারণা করেছিল।

পরে একসময় শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে
 তদীয় শ্রীবিগ্রহ সঙ্গে লইয়া ভক্ত ও শিষ্ণুগণসহ বিপুল সমারোহের সহিত
 শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমায় বহিগত হইয়াছিলেন। উক্ত পরিক্রমার শোভা
 যাত্রায় মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্মও শ্রীল প্রভুপাদের অহুগমন করিতেছিলেন।
 পরিক্রমা পার্টি যখন মিকোলদ্বীপ পরিক্রমামুখে শহর নবদ্বীপে আসিয়া
 উপস্থিত হয়, তখন পূর্বোক্ত সকল অপরিস্রবাহের পাষণ্ডি ব্যক্তিগণ শ্রীল
 সরস্বতী ঠাকুরের প্রাণ বিনাশের জন্য হেঁচক ও অন্তর-খণ্ড শোভাযাত্রার উপর
 নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন প্রাণভয়ে ভক্তবৃন্দ যিনি যদিকে পারিলেন
 পলাইয়া গেলেন। এইরূপে সঙ্কট অবসায় হইয়া শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও বিষ্ণুপাদ
 শ্রীমন্ত্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তদীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদ
 সরস্বতী ঠাকুরের বক্তৃতা শ্রাণ বক্ষার জন্য তাঁহাকে লইয়া নিকটস্থ জৈনিক
 গৃহস্থ বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। তখন চতুর্দিক মারমুখী জনতা শ্রীল
 প্রভুপাদের অহুগমনের জন্য চৈতন্য করিতেছিল। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীল
 প্রভুপাদকে বলিলেন,—প্রভো! এইরূপ বিপদাবস্থায় এই বেশে আপনার
 মায়াপুর যাওয়া সম্ভবপর নহে, কাবন আপনার অকণবর্ণের সন্মাসবেশ পাষণ্ডীরা
 দেখিলে চিন্তা করিবে। অতএব আমার একে স্বৈরবৃত্ত আপনি পরিধান
 করিয়া ব্রহ্মচারী সাজুন ও আমি আপনার সন্মাসবেশ ধারণ করিয়া ছদ্মবেশে

এইস্থান হইতে চলিয়া যাই। প্রথমে শ্রীল প্রভুপাদ ইহাতে অতিষ্ঠা প্রকাশ করিলেও শ্রীল গুরুপাদপদের একান্ত উচ্ছ্বাস উক্ত শেষ পরিবর্তনে সম্মত হন। তখন শ্রীল গুরুপাদপদ দুইজ প্রাণ সংশয় করিয়া ও চতুর্বেশে প্রভুপাদকে লইয়া নির্বিকল্পে মায়াপুরে উপস্থিত হন। সেই সময় মায়াপুরস্থ বৈষ্ণবগণ শ্রীল গুরুপাদপদের এই অসাধারণ সেনার জন্ত ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

পূর্বে পরমপূজ্যপাদ মহামতি কুরেশ তদীয় গুরুপাদপদ বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর শ্রীশ্রীল রামানুজ স্বামীকে বৈষ্ণব নিজপ্রাণ সংশয় করিয়াও পাশ্চাত্য প্রধান চোলরাজ ক্রিমিচের্ণের চাত হইতে বন্ধা করিয়াছিলেন, মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদও সেইরূপ জলন্ত গুরুসেনার আদর্শস্থাপন করিলেন।

শ্রীচৈতন্য মঠের উন্নতি স্থান

শ্রীচৈতন্য মঠের কিছু ভূসম্পত্তি তদন্ত মূল্যমানগণ দখল করিয়া রাখিয়াছিলেন, এমন কি বর্তমানে যেখানে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির তাহাও তাহারাই বোম্বাইনি ভাবে দখলে রাখিয়া সেখানে মতবর্মের তাজিয়া ফেলিও। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ তখন শ্রীচৈতন্য মঠের প্রধান দেবকসূত্রে অস্থান করতা অসাধারণ কোশলে সমুহ বেদবলী সম্পত্তি-মঠের অধিকারে স্থানচয়ন করেন এবং পরিবর্তন-পরিবর্তনমুখে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আত্মগতো ঠাকুর শ্রীল শুক্লবিনোদ ইনস্টিটিউট নামে হাইস্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন ইহা পূর্বে আমি নিবেদন করিয়াছি।

শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ এক সময় কটক রেভেনসে কলেজে গিয়া বেদান্ত-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বিদ্বৎসমাজে এক অপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহাতে অধৈতন্যদ খণ্ডন-পূর্বক তক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন। তাঁহার এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিদ্বৎসমাজ তাঁতাকে “বৈদান্তিক পণ্ডিত” আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছিলেন। এইভাবে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ শ্রীমঠের সেবা-সৌষ্ঠব ও বাহিরে প্রচারনৌরত বিপুলভাবে বিস্তার করেন।

যখনই কোন বিষয়ে কোন কঠিন সমস্যা দেখা দিত সেই সময়ে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গুরুপাদপদকে উক্ত সমস্যা সমাধান করিবার জন্য প্রেরণ করিতেন। এক সময়েও একটি ঘটনা ঘাড়া আমি পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদের সতীর্থগণের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি তাহা নিয়ে বর্ণন করিতেছি।

পরমারাধ্যতম শ্রীল শুক্লবিনোদ ঠাকুরের অশ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের সমাদ্র প্রাপ্ত প্রাচী ও পাশ্চাত্যের ইতিকথা প্রচারক প্রপূজ্যচরণ শ্রীশ্রীমজ্জিত-

প্রদীপ তীর্থ মহারাজ এক সময় শ্রীবৃন্দাবনস্থ মঠে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন তত্রস্থ মঠের সেবক শ্রীপাদ দেবকীনন্দন প্রভু রঞ্জন করিয়া ঠাকুরের শোণের পর মধ্যাহ্নে উক্ত শ্রীল মহারাজকে প্রসাদ পরিবেশন করিতে-
ছিলেন, সেট দিন শাকপ্রসাদটি অতি উত্তম হইয়াছিল বলিয়া শ্রীল মহারাজ
আর একটু শাক দিবার জন্য অমরোধ করেন। তখন শ্রীপাদ দেবকীনন্দন প্রভু
একটু ক্রোধ করিয়া বলিলেন,—“সম্যাসী চাহিয়া খায়।” এবং অত্যন্ত
অসন্তুষ্ট হন। এই ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে বেশ একটু মনোমালিঙ্গ দেখা
দিলে তাহাতে মঠের সেবাকাহ্ন্য ব্যাহত হয়। প্রপূজ্যপাদ তীর্থ মহারাজের
Telegram-এ শ্রীল প্রভুপাদ সকল নিবরণ অবগত হইয়া উক্ত বিশৃঙ্খল
অবস্থা দূর করিবার জন্ত শ্রীল গুরুপাদপন্থকে শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন।
শ্রীশ্রীল গুরুপাদপন্থ শ্রীধাম বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীপাদ দেবকী-
নন্দন প্রভু জানিতেন যে বিনোদদা অত্যন্ত রাগভারী ও দুঃখে লোক। তিনি
মায়াপুরে বাসে বলদকে একঘাটে জল খাওয়াইতেছেন। তাহার শাসনে
মায়াপুরের অসংলোক শান্ত হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধে জীবন-যাপন করিতেছে।
(সতীর্থগণ শ্রীল গুরুপাদপন্থকে বিনোদ দা বলিয়া ডাকিতেন)।

শ্রীল গুরুপাদপন্থ সেখানে গিয়া দেবকীনন্দন প্রভুকে ডাকাইলেন এবং
বলিলেন যে,—“শ্রীল তীর্থ মহারাজ তোমার নিকট বে একটু শাক চাহিয়া-
ছিলেন সে তোমারই তো প্রাণেশ করিয়াছিলেন। তুমি এত স্নেহের
বাদিষ্টে রাগা করিয়াছ বাহ। শ্রীল মহারাজও আর একবার আবাদন
করিবার জন্ত চাহিয়াছিলেন। ইহাতে তোমারই মহিমা প্রকাশ করিয়া-
ছিলেন; তজ্জগ্য তোমার রাগ করার কি আছে? তোমার উদ্ধাতে আনন্দ
প্রকাশ করিয়া তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করাই উচিত ছিল। শ্রীশ্রীল
গুরুপাদপন্থের এইরূপ বুদ্ধিপূর্ণ স্মরণ বচনে শ্রীপাদ দেবকীনন্দন প্রভুর
মন দ্রবীত হইল ও নিজ-দোষ স্বীকার করিয়া লটলেন এবং শ্রীল মহারাজের
নিকটও কটুক্তি বচনের জন্ত ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। এইভাবে পরস্পরের
মনোমালিঙ্গ দূর করিয়া শ্রীবৃন্দাবন মঠের অচলাবস্থা সচল করতঃ শ্রীল
গুরুপাদপন্থ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ সম্মিথানে আসিয়া উপস্থিত হন।
এই ব্যাপারে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গুরুপাদপন্থের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া
আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। (ক্রেমশঃ)

ত্রিদিগ্ধিকু শ্রীভক্তিবৈদান্ত পর্যাটক

মেদিনীপুরের সংক্ষিপ্ত প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীশিখলদা গৌড়ীয় মঠে পূজাপাদ শ্রীল রাসবিহারীদাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব সমাপ্ত করিয়া পরমপূজাপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজ সদল-বলে (ত্রিদিগ্বিশ্বিনী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ দৈব-কাষ্যাপুরোষে নবদ্বীপ অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।) পরদিবস ইং ১৪৮৮ তাম্রিখে নরঘাট এবং নরঘাট হইতে কেল্লাখাই ও কপালেশ্বরীর সংযুক্তধারায় নৌকাযোগে বেশ কয়েক মাইল গমন করিয়া মোহাড় (কাটনা) স্থিত শ্রীজুবোৎসব দে মহোদয়ের বাড়ীতে পৌঁছান। উক্ত দিবসে মোহাড়ে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মিমি নবযোগেন্দ্র-সংবাদ পাঠ করেন শ্রীপাদ শুভানন্দ ব্রহ্মচারী এবং রামচন্দ্র পাঠ করেন শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ। প্রত্যহ সর্বত্রই পাঠ ও বক্তৃতার আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারিগণ শ্রীপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারীর সহিত জুলালিত কণ্ঠে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিতেন।

ইং ১৫২৮ তাম্রিখে প্রাতঃকালে মোহাড় হইতে পদব্রজে 'ভুটিচক-চড়'র অন্তর্গত 'মিলনতীর্থে' পৌঁছান। উক্তস্থানের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে গৌর-ভক্তবৃন্দ পনেরটি কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া খোল-করতাল-সহযোগে উচ্চস্বরে সঙ্কীৰ্ত্তন করিতে করিতে মিলনতীর্থে মিলিত হন। ঐদিন বেলা ১০টার সময় হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত এবং সন্ধ্যা ৬টা হইতে পুনঃ দর্শনভা অলুপ্তিত হয়। উক্ত সমায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় শ্রীগোষ্ঠবিহারী দাস মহাশয়। ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে প্রদান ছিলেন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীকৈদার-নাথ কুইল্যা। ভাষণ প্রদান করেন শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ শুভানন্দ ব্রহ্মচারী ও স্থানীয় শ্রীঅদ্বৈত দাস। শ্রীল নারায়ণ মহারাজজী মিলন শব্দের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেন,—মিলন শব্দের অর্থ জীবাত্মার সহিত কৃষের মিলন। মিলনের অর্থ একাকার হইয়া যাওয়া নয়। যেমন $(১ + ১) = ২$, ইহা কখনই 'এক' নহে। তদ্রূপ জীবাত্মা পরমাত্মার সাথে মিলিয়া কখনই এক হয়ে যাবে না। যেমন বিভিন্ন নদ-নদী প্রবাহিত হইতে হইতে সমুদ্রে মিলিত হয় সেইরূপ শাস্ত্র, দাস্ত্র, লখা, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটি ভাবরূপী নদী কৃষ্ণপ্রেমরূপ মহাসমুদ্রে মিলিত হয়। যাৎসর যে-রূপ ভাব সে সেই নদীর মাধ্যমে প্রেম-সমুদ্রে মিলিত হন। সেইরূপ কুরুক্ষেত্রে

কক্ষের সহিত নিশিত হয়েছিলেন—সখাগণ, যশোমতি, গোপীগণ। সভার শেষে শ্রীপাদ বিদ্যকেন্দ্র ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্রে ভারতের তীর্থসমূহ এবং গৌরীশীলা প্রদর্শন করান এবং বক্তৃতা প্রদান করেন শ্রীপাদ শচীনন্দন ব্রহ্মচারী। উক্ত সভায় প্রায় দশহাজার ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ইং ১৬/৪/৮৩ তারিখ সকালে শ্রীল মহারাজজীর সহিত বৈষ্ণববৃন্দ মহামদপুরে পৌঁছান। উক্ত তারিখ রাত্রিতে দেঁড়েদীঘিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গঠে ধর্মসভা হয়। উক্ত সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন শ্রীল নারায়ণ মহারাজজী, শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ, শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ শুভানন্দ ব্রহ্মচারী ও স্থানীয় শ্রীবাণেশ্বর ডায়া ও শ্রীবীরেন্দ্র গুপ্ত। উক্ত সভায় প্রায় পাঁচ হাজার শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সভার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারীর সহিত বৈষ্ণবগণ সুললিত-কণ্ঠে মঠাজন-পদাবলী কীর্তন করেন। উক্ত রাত্রিতেই প্রায় ৩টার সময় Speed-boat যোগে পাঁচ মাইল রাস্তা অতিক্রান্ত করিয়া ১৭/৪/৮৩ তারিখ সকাল ৫৩০ টায় শাবড়াবেড়ায় জলপাই-এর অন্তর্গত শ্রীরাধাকান্ত দাসাধিকারীর বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং রাত্রিতে শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাসাধিকারীর বাড়ীতে শ্রীল নারায়ণ মহারাজজী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দাম-বন্দনলীলা পাঠ করেন।

ইং ১৮/৪/৮৩ তারিখে বাসযোগে উত্তর সাউত'নচক নিবাসী শ্রীপতি মিথ্রা মহোদয়ের বাড়ীতে উপনিত হইলে সভায় ধর্মসভার আয়োজন হয়। তথায় বক্তৃতা প্রদান করেন শ্রীল নারায়ণ মহারাজজী, শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ, শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ ও শ্রীপাদ শুভানন্দ ব্রহ্মচারী। সভার পর্যাণ্ডেল প্রভৃতি ব্যবস্থা করেন স্থানীয় 'পোল টার ক্লাব'। পরের দিন সকালে ইং ১৯/৪/৮৩ তারিখে বৈষ্ণববৃন্দ নগরকীর্তন করেন এবং রাত্রিতে ধর্মসভায় বক্তৃতা প্রদান করেন শ্রীল নারায়ণ মহারাজজী, খ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির অজ্ঞান্য প্রচাবক শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ, শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ ও শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী। শ্রীল নারায়ণ মহারাজজী সভাপতির ভাষণে 'সামান্য' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি এবং বর্তমান সামান্য যে ভিন্নভাবে চলিতেছে তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণন করেন এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রত্যেকেই প্রকারান্তে ভগবানের রূপ স্বীকার করেন। ইংরেজি Bible উদ্ধৃত করে বলেন,—“God created man after his own image.” কোরাণ উদ্ধৃত করে বলেন,—“হন আজ্জাহা খালাকী মেন দুরাংহি।”

এই জুটি থাকাই “নদ এব নদা ইদম্ অগ্র অমীৎ”-এর সমর্থক। উক্ত সভাতে শ্রীল মহারাজজী কৃষ্ণ এং কৃষ্ণনামই শ্রেষ্ঠ ইহাও মত স্থাপন করেন। প্রত্যেক ভীষই স্বার্থপর, স্বার্থ শব্দেব প্রকৃত ‘অর্থ’ স্ব (আত্মার) অর্থ,— আত্মার অর্থ কি? ভগবৎসেবা—ইহা ব্যাখ্যা করেন। ইহু জু’দিনই সভার অষ্টে শ্রীপাদ বিদ্যকলেন ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্রযোগে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন করান এবং বক্তৃতা দেন শ্রীপাদ শচীনন্দন ব্রহ্মচারী।

দশম দিবস ২০/৪/৩০ তারিখে সাউত’ন চক হইতে মোটরযানে কল্যাণপুরে পৌঁছান। তথায় শ্রীগ.জ্ঞানমোচন প্রভু বৈষ্ণবগণকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত ‘আনন্দিত’ হন। পরমাধাখ্যাতম পদমগুরুদেবের সঙ্গিত তাঁর কিরণ প্রীতি ছিল কয়েক ঘণ্টা যাবৎ তিনি বর্ণন করেন। রাত্রিতে শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত পর্বাটক মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। পরদিন ২১/৪/৩০ তারিখে তথায় শ্রীরামনবমী ব্রত পালন করেন। সকালে শ্রীল নারায়ণ মহারাজজী শ্রীরামচন্দ্রের লীলাবিলাস সখন্ধে পাঠ করেন। মহর্ষি বাম্বিকী কিসাবে রামায়ণ লেখায় প্রবৃত্ত হন এবং সমাধিযোগে তিনি কিসাবে রামলীলা দর্শন করেন শ্রীল মহারাজজী তাহা বর্ণন করিতে গিয়া,—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং স্বয়ংমঃ শাস্ত্রতীঃ সমাঃ।

যং ক্রৌঞ্চমিধুনঃদেকমবধীঃ কাস্মেমোহিতম্॥

তিনি এই শ্লোকের বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রাজ্ঞল ভাষায় বর্ণন করেন। রাত্রিতে পুনঃপাঠ-প্রসঙ্গে ‘লব-কুশ’ নামের সার্থকতা ব্যাখ্যা করেন এবং সীতাদেবী যে যমজ সন্তান প্রসব করেছিলেন তাহাও বাম্বিকী রামায়ণের উদ্ধৃতি দ্বারা বর্ণন করেন। শ্রীরামচন্দ্রের লীলার সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাবৈশিষ্ট্যও তুলনামূলকভাবে আলোচনা করেন।

দ্বাদশ দিবস ২২/৪/৩০ তারিখে কল্যাণপুর হইতে দারিবেড়িয়া নিবাসী শ্রীহরময় দাঁসাদিকাবীর বাড়ীতে পৌঁছান। সম্পূর্ণদিন অস্বাস্থ্যের পর সন্ধ্যা ৬/৩০ হইতে আশ্রমমোড়ে ধর্মসভার ব্যবস্থা হয়। সভার ব্যবস্থা করেন স্থানীয় ‘যুবগোষ্ঠী ক্লাব’। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীল নারায়ণ মহারাজজী, শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত পর্বাটক মহারাজ, শ্রীপাদ শুভানন্দ ব্রহ্মচারী ও কল্যাণপুর নিবাসী শ্রীরাসবিহারী ভক্তিনাস্ত্রী মহোদয় প্রভৃতিও ভাষণ প্রদান করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীল মহারাজজী জীবের স্বরূপ-প্রসঙ্গে শ্রীসনাতন-শিক্ষা, যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রীয়া সংবাদ, রাজর্ষি জনক-অষ্টবক্র-সংবাদ, সুযোগ্য রাজার

উপাখ্যান এবং সর্বোপরি ক্রীষ্ণমহাপ্রভুর 'নাৎং বিপ্রো ন চ নরপতি' শ্লোকের বিষয়ভাবে ব্যাখ্যা করেন। উক্ত সভায় হাদিমা গ্রাম নিবাসী শ্রীগৌরসুন্দর দাম কয়েকটি প্রশ্ন করেন, যথা— (১) বৈষ্ণব কাহাকে বলে ? (২) বৈষ্ণবের লক্ষণ কি ? (৩) বৈষ্ণবের অশৌচ আছে কি ? (৪) নৈমিষারণ্য কি ? (৫) নৈমিষারণ্য শ্রাদ্ধ বিধিসম্মত কিনা ? (৬) ঐ শ্রাদ্ধের বিধি-ব্যবস্থা কিরূপ ? (৭) প্রকৃত গুরু কে এবং তাহাকে চৈমিবার উপায় কি ? (৮) শ্রাদ্ধ-দ্বারা বৈষ্ণবদের শ্রাদ্ধ করা বিধি-সম্মত কিনা ? ৯) বাহারা নিত্যপূজা-পদ্ধতিতে রত থাকেন তাহাদের অন্তি হয় কি ? (১০) ঐ গৃহে যে-সকল ব্যক্তি থাকেন তাহাদের কি নিয়ম পালন করা উচিত ? (১১) কাঁচা চাল, আলু দিয়ে কি বৈষ্ণবদের শ্রাদ্ধ করা উচিত ? (১২) অন্নপ্রসাদ দ্বারা শ্রাদ্ধ করা যায় কি ?

উক্ত প্রশ্নগুলির যথাযথ ব্যাখ্যাও শ্রীল মহারাজ্ঞী প্রদান করেন। সমযান্তরে তাহার বিষদ বর্ণনার আশা রাখিলাম। সভার শেষে ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীপাদ বিদ্যকসেন ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন করান এবং ছায়া-চিত্রে বক্তৃতা দেন শ্রীপাদ মদনমোহন ব্রহ্মচারী। (ক্রমশঃ)

—শ্রীলবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

নবদ্বীপ-শহরস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-পরিচালিত শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-ভ্রমোৎসব

শ্রুতি অর্থাৎ বেদের শিরোভাগ জাম্বোদ্য-উপনিষদে শ্রীনবদ্বীপধামের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন,—“অত্র ব্রহ্মপুং নাম পুণ্ডরীকং যদ্রূপং.....তত্র বৈষ্ণা ভগবত্ শৈচ্ছদন্ত পদবাক্যনঃ।” বাক্যে ‘ব্রহ্মপুং’-নামে অষ্টদল-বিশিষ্ট পদ্মের মধ্যবর্তী ‘দহর’-নামক স্থানই ‘মাধাপুর’ বলিয়া কথিত। ঐ স্থানই শ্রীচৈতন্য-স্বরূপ ভগবানের নিবাসক্ষেত্র এবং উহার অন্তরাকাশই অদ্বীপ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

গোকুল-মহাবনই চিদ্রাযের সর্কৌচপদ। শুদ্ধি-স্বরাই তথায় গমন করা যায়। অংগ-কীর্তনাদি নববিধ ভক্তিপীঠস্বরূপ নবদ্বীপ-অন্তরীক্শী মায়াপুরই সেই গোকুল-মহাবন। তথায় পৃথুকুণ্ড ও স্বর্ণদীকুণ্ড দুই অর্পণ। তদাধো

শ্রেমক্লপ আমরপূর্ণ সরোবর। যথায় শ্রীগৌরচন্দ্রের নামকীৰ্ত্তন যজ্ঞ, অম্বথ
মহাবক্ষ, কীৰ্ত্তনপীঠ ছায়াশঙ্কর, শ্রীবালাচল, পরব্রহ্মপুরাণ মহাযোগপীঠ।
সেই পবিত্রলোক নবদ্বীপগত, উহা প্রায়-কীৰ্ত্তনদ্বারাই লব্ধ হয়। তথায় পূর্ণ-
শক্তি শ্রীবাধা ও পূর্ণশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণই অপূৰ্ণভাবে শ্রীগৌরাক্রমে অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্য-উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে—“কলিযুগের পাণাচ্ছন্নমতি লোকসকল
কিরূপে মুক্তিকাত করিবে, কলিযুগে উপাস্য দেবতাট দা কে ও উপাসনা-
মন্ত্ৰই বা কি ?” তদুত্তরে জানাইলেন,—“গোতীরে গোলোক-সংস্রব নবদ্বীপ-
ধামে সৰ্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ দ্বিত্ব গৌরকান্তি, মহাত্মা-মহাযোগী
মায়িকগুণত্রয়-রহিত, শুদ্ধস্বাশ্রিত মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে
ভক্তিধর্ম প্রচার করিলেন। বেদান্তবেত্ত, পুরাণ পুরুষ, চৈতন্যবিগ্রহ,
বিশ্বকারণ, মহাত্মরূপ একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবকে জানিলে মৃত্যুর অতীত হওয়া
যায়। পরমেশ্বর তিনি স্বংই স্বীয় নাম-মূলমন্ত্র ‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।’ কীৰ্ত্তন করিয়া সকলকে
আনন্দ দান করেন। কলিতে জন্মেধারণ এই তারকব্রহ্মনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন যজ্ঞ-
ধারাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে উপাসনা করিয়া থাকেন।”

শ্রীনাম ও নামী অভিন্ন। কলিযুগাবসাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর
উপদিষ্ট নিখিল শাস্ত্রের দ্বারা এই ‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ...’ নামব্রহ্ম জপ্য ও
কীৰ্ত্তনীয়—হুটই। ঋণাণি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস
ঠাকুর মূলুৎপতি যবন-কর্তৃক হস্ত হইয়াও নামের সহিমা জানাইলেন।
“জপিতে” সে হরিনাম জপকর্তা তরে। উচ্চ সঙ্কীৰ্ত্তনে পর উপকার করে।
পশুপাখী বৃক্ষলতা বলিতে না পারে। শুনিলেই কৃষ্ণনাম তারা সব তরে।”
শ্রীহরিনাম কীৰ্ত্তনকারীর কিরূপ অধিকার বা সহিযুতা হওয়া প্রয়োজন ঠাকুর
শ্রীল হরিদাস তৎ বর্ণনে বলিলেন—“থও থও হই যদি যার দেহ প্রাণ।
তথাপি না ছাড়িব বদনে হরিনাম ॥”

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্কীৰ্ত্তন-যজ্ঞে যাহারা যোগদান করিয়াছেন শ্রীবাসাদি
ভক্তবৃন্দ ও শ্রীকৃষ্ণ সনাতন প্রমুখ গোস্বামিগণ শ্রীগৌরাজের নৃত্যলীলা-সহচর।
তাহাদের প্রতি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার, সদ্যন্ত্র প্রণয়ন, সদাচারযুক্ত আচার প্রচার ও
নাম সঙ্কীৰ্ত্তনের যে আদেশ হইয়াছে, তাহা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীজীব-
গোস্বামীর শ্রীধাম-পরিভ্রমণ কথ্য শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের শ্রীধাম-
মহিমায় জানিতে পারা যায়। পরে শ্রীল নরোত্তম-শ্যামানন্দ শ্রীনিবাস

প্রজন্ম ইহার ধারক ও বাহকরূপে বিভিন্ন স্থানে প্রচারিত করিয়া জীবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

শ্রীশ নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি ইহজগতে অতুর্কান হইলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত বিমল প্রেমধর্মের ভক্তিশ্রোত্র রুদ্ধ হইয়া যায়। মনুষ্য জাতির প্রথম ও প্রধান কর্তব্য যে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন, জীবদয়া, নামে কুচি, গুরুবৈষ্ণবের সেবা তাহা ভুলিয়া শ্রোতহীন নদীতে কুসংস্কাররূপ শৈবালের বৃত্তিতে জাতির আচার-আচরণ কদম্যরূপে হয়ে ওয়। সে-অবস্থায় আচার হীনের প্রচারে কাহারও কোনদিন কল্যাণ সাধন করিতে পারে না। নাম-প্রেম প্রচার-কারীর প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ—“আচার করেন কেহ না করে প্রচার। প্রচার করে কেহ না করে আচার। আচার-প্রচার নামের করহ দুই কার্য। তুমি জগদগুরু, তুমিই জগতের আর্ঘ্য।” “সাধারণ সমাজ ধর্মের কুসংস্কারকে বিচার করিতে না পারিয়া সনাতন ধর্মকে ভুল বুঝিয়া ভ্রান্ত পথে চালিত হয়। তখন আদর্শ ধার্মিককেও কুসংস্কারাজ্ঞের বলিয়া সমাজ সব সমান করিয়া ফেলে। ফলে প্রয়োজন হয় শ্রীভগবান্ বা তদ্রূপ শক্তিসম্পন্ন গুরু-বৈষ্ণব-ভক্তের আবির্ভাব। ঠাকুর শ্রীশ্রী ভক্তিবিনোদ জাতির এই হৃদ্দিনে একটি হইয়া শুদ্ধভক্তির আচার-প্রচার, গ্রন্থ-পণ্যন, লুপ্ত হীর্ষ উদ্ধারাদি তথা ধাম-পরিক্রমা পুনঃ প্রবর্তন করেন। জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদই তাঁহার মূল বাহক হইয়া শ্রীশ্রীগনদীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীনবদীপধাম-প্রচারিণী সম্ভার মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি প্রসূক করান। শ্রীশ্রীল সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের তিরোভবে শ্রীধাম-পরিক্রমা বন্ধ হইলে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীল ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ইহার পুনঃ প্রবর্তন করিয়াছেন ও অতাবধিও প্রতিবৎসর ফাল্গুনী দোল-পূর্ণিমায শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে প্রায় সপ্তাহকাল পূর্ব হইতে আধাম-পরিক্রমায় জাত-বর্ণ তুচ্ছ প্রাদেশিকতা ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ণনযজ্ঞে প্রেমমৈত্রী লাভে ঐক্য হন। গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের অধুষ্ঠিত শ্রীধাম নবদীপ-পরিক্রমার মধ্যে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির শ্রীধাম-পরিক্রমা অচুড়ানের বিষয়বস্তু পৃথিবীর যথার্থ শিক্ষিত সমাজের অনেকেই ইহা গ্রহণ করিতে না পারিলেও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হন। বিগত ১৩ই ও ১৪ই চৈত্র, ১৩৮৯ (ইং ২৮ ও ২৯শে মার্চ, ১৯৮০) পোস্কার ও মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বেতারযোগে কলিকাতা কেন্দ্র

হইতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শ্রীধাম-পরিক্রমার কৃতিত্ব ও জনপ্রিয়তা প্রচারিত হইয়াছে। সাত আট হাজার আশাল-বৃদ্ধবিনিতা-নির্বিশেষে পরিক্রমা ও মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া প্রায় এক সপ্তাহব্যাপী এই মহদভূতানে যোগ দেবার মৌভাগ্য লাভে আদর্শ নাগরিক জীবন ও পরমার্থের আলোক পাইয়া বহু হইয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল নষ্ঠ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে নিত্যলীলা-প্রসিদ্ধ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ কর্তৃক পুনঃ প্রদর্শিত ধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। আসাম, উরিষ্যা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশাদি বিভিন্ন প্রদেশ হইতেও আত্ম-কল্যাণার্থী নরনারীগণ এই পরিক্রমায় যোগদান করিয়া শ্রীধাম-পরিক্রমা চলাকালে সাধুমুখে চরিত্রা শ্রবণ-কীর্তন-স্বপ্নের সুযোগ লাভ করেন। সেই উপলক্ষে প্রতিদিন সন্ধ্যায় শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে সমিতির সদস্যগণ-কর্তৃক ধর্মসভা অয়োজিত হয়।

৮ই চৈত্র, ১৩৮৯ (২৩শে মার্চ) ১৯৮৩, বুধবার সন্ধ্যারাত্রির পর পরিক্রমার অধিবাস-তিথির আবেশনে সমিতির বর্তমান সভাপতি-অচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ সভাপতির আসনে উপবেশন করিলে সভার কার্য শুরু হয়। তিনি সভার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মুখবন্ধন বা ভূমিকা প্রদর্শন করিলে তাঁহার ইচ্ছায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ শ্রীবিগ্রহ-দর্শন ও ধাম পরিক্রমা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। চক্ষুর দ্বারা শ্রীধাম, শ্রীবিগ্রহ-দর্শন করা যায় না, কাণের দ্বারা শব্দরন্ধের সাচাযে তাহা সম্ভব। শ্রীল ভক্তপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বাণী উল্লেখ করে বলেন,—“চোখের দ্বারা ভগবৎ দর্শন হয় না, কাণ বাহীত।” তদনন্তর সমিতির সহকারী সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীধাম-পরিক্রমার প্রস্তুতি, আগামী দিনে গন্তব্য স্থানের পথে যাত্রীগণের প্রতি পথের দিগ্‌দর্শন, যাত্রীগণ পরস্পর অচেনা অজানা হইলেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির দ্বারা পরিচালিত পরিক্রমায় একে অপরের প্রতি সাহায্য মহাতৃপ্তি প্রদর্শনাদি করিবার উপদেশ ও নির্দেশ প্রদান করেন।

২৫ চৈত্র ১৮৮২ (২৪শে মার্চ, ১৯৮৩) বৃহস্পতিবার শ্রীধাম-পরিক্রমার প্রথম দিবস শ্রীদেবনান্দ গোড়ীয় মঠের সেবিত শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দ-রাধা-বিনোদ-বিশ্বানীজীন্দের মঙ্গলারতি দর্শন ও তদীয় জয়ধ্বনি, দণ্ডবৎপ্রণতি ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমা করিয়া ভক্তগণ সুসজ্জিত শিবিকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়-বিগ্রহ স্থাপনা করেন। আচার্যদেব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেন্দাস্ত বামন গোস্বামী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেন্দাস্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেন্দাস্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেন্দাস্ত পর্যটক মহারাজ প্রভৃতি সম্যাদীকৃত শিবিকা স্কন্ধে বহন করিয়া পরিক্রমায় স্তম্ভবিজয় করেন। হাজার হাজার যাত্রিগণের কীর্তন-জয়ধ্বনি, টুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও কঁাসর-বন্টা মৃদঙ্গ, বাজ-ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠে। অন্যত্র বৎসর শহর নবমীপের মাক-পথ দিয়া যাত্রা করিয়া বড়ালঘাটে উপস্থিত হইলে নৌকাঘাট ককনগর ঘাটে অবতরণ করিয়া তথা হইতে সীমায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া গোক্রম যাত্রা করা হইত। এ বৎসর ভাগীরথীর গৌরঙ্গসেতু দূরত্বে নিকট করিয়াছে। পরিক্রমাপাটী গৌরঙ্গসেতু অতিক্রম করিয়া ওপারে উপস্থিত হইয়া গোক্রমের দিকে নূতন পথে যাত্রা করেন। গোক্রমস্থ স্বানন্দ-স্বন্দ-কুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলি ও সমাদি-মন্দিরে সকাল ৭টায় ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ত্রিবিক্রম মহারাজ “গুরু ভকত চরণেণু ভজন অমূল্য”—কীর্তন করেন। ইতার একটি পদে আছে “গৌর আমার যে-সব স্থান করল ভ্রমণ রঞ্জে, সে-সব স্থান হেরব আমি প্রার্থী ভকত সঙ্গে।” শ্রীপাদ কানাইলাল ব্রজচারী ২য় কীর্তন করেন,—“গুরুদেব! কবে তব কল্যাণ প্রকাশে” এবং “হরি বলে যোদের গৌর এল।” ৩য় কীর্তনকারী শ্রীমদ্ ভক্তিবিক্রম আশ্রম মহারাজ “বড় সুখের খবর গাই।” ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ পর্যটক মহারাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য পাঠ করেন। তাহাতে ইন্দ্র সুরভির আনুগত্যে গৌরবের তপস্যা, মার্কণ্ডেয়-মুনির প্রলয় দর্শন লীলা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেন্দাস্ত বামন গোস্বামী মহারাজজী শ্রী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনী, আদর্শ, সাহিত্যিক বিকাশ, স্তম্ভভক্তির প্রবাহ প্রভৃতি ও তাঁহার স্বরূপের পরিচয় এবং শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সহিত তাঁহার অপ্রাকৃত সখ্যক, শ্রীধাম প্রকাশে যত ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এইস্থানে পূর্বে কয়েকজন বাবাজী জী-পুত্রাদি

লইয়া বাস করিত; ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নোটিশ টাঙ্গাইয়া দিলেন—“ঠাকুরের ইচ্ছা নহে শ্রী-পুতাদি লইয়া, কুঞ্জে করিবে বাস জড়ানন্দী হইয়া।” শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বয়ং আচার-প্রচারাদি দ্বারা জীবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় যথার্থ ধাম দর্শন সম্ভব, অতএব সকলেরই পক্ষে ঠাকুরের কৃপাশাসনাদ প্রার্থনীয়।

পূর্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় পরিক্রমাকারিগণ সুবর্ণবিহারে উপস্থিত হন। ত্রিদিগ্ভি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ বৈষ্ণব মহারাজ “গৌরাজের ছ’টিপদ বাঁধ ধন সম্পদ” কীর্তন করেন। কীর্তনান্তে শ্রীস নারায়ণ মহারাজ সুবর্ণসেনের মহিমা কীর্তন-কালে বলেন এখানে পূর্বকালে সুবর্ণসেন রাজা রাজকাৰ্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। একদা মহাশি নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া জীবনের অনিত্যতা, মনুষ্যজীবনের কর্তব্য প্রভৃতি বর্ণন করিলে তিনি রাজকাৰ্য্যাদির সাথে হরিভজনেও আত্ম-নিয়োগ করেন। একদা সুবর্ণসেন সুবর্ণরূপধারী শ্রীগৌরাজ মহাপ্রভুকে দর্শন করেন। ক্রমে তাঁহার বিষয়-বৈরাগ্য উদয় হয় ও তিনি হরি-ভজনে ব্রতী হন। শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী “জয় নন্দন-নন্দন গোপীজন-বল্লভ” কীর্তন করেন। এখান হইতে শ্রীনৃসিংহপল্লী যাত্রার পথে চিড়া প্রসাদ দেওয়া হয়। মাধ্যাহ্নে দেবপল্লীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীনৃসিংহের স্তব-স্ততি শ্রীমন্দির-পরিক্রমা ও তথাকার মাহাত্ম্যপাঠ-কীর্তন হয়। প্রতি বৎসর এখানে ভক্তগণের মাধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবার জন্য অন্নবাঞ্জন, পরমায়ের ব্যবস্থা হইত কিন্তু এ বৎসব জলাভাবে প্রসাদের ব্যবস্থা এখানে না হইয়া হরি-হরক্ষেত্রে হইয়াছিল। শ্রীহরির সদাশিব-তত্ত্ব হরি ও হর অভিন্ন শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব। শিব এখানে থাকিয়া ধামবাসিগণের প্রয়াণকালে কর্ণে শ্রীহরিহর নাম মন্ত্র প্রদান করেন। মাধ্যাহ্নে প্রসাদসেবা করিয়া হরিহরক্ষেত্রে হইতে পরিক্রমাপাটী শ্রীদেবানন্দ মঠের দিকে যাত্রা করেন। পথে বৈকাল ৪ ঘটিকায় মাজিরাগ্রামে হংসবাহন-ক্ষেত্রে পাঠ-কীর্তন হয়। প্রায় সায়াহ্নে শ্রীমহাপ্রভু ভক্তবৃন্দের সাথে শ্রীমঠে ফিরিয়া আসেন। সন্ধ্যায় আরতি, পরিক্রমাঞ্জে নাট্য-যন্দিরে কীর্তনকারিগণ গৌরবিহিত কীর্তন করেন। ত্রিদিগ্ভিস্থামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ত্রিবিক্রম মহারাজ স্নাত্রিতে পাঠ-বক্তৃতা করেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীসদাশিব দাস ব্রহ্মচারী

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরান্দো জয়তঃ ॥

শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ

শ্রীশ্রীমদ্বক্তাপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহাৰাজের

শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ-মহোৎসব

বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণ্যাবিধম্



শ্রীঅৰ্চাবিগ্রহৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম

শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ,

পোঃ বাগুগাঁও, জিলা-গোয়ালপাড়া (আসাম)।

। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরোদ্ধে জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ বাসুগাঁও;
জিলা—গোয়ালপাড়া (আসাম)।

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

শ্রীব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক শ্রীচৈতন্যান্নায় দশমাধস্তন স্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি আচার্য্যকেশরী অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রেজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত উক্ত মঠের নবনির্ম্মীয়মান শ্রীমন্দিরে তদীয় বিগ্রহ-প্রকাশ-মহোৎসব আগামী ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯০ (ইং ১৮।৫।৮৩), বুধবার দিনসে অনুষ্ঠিত হইবে ও শ্রীমঠের নিত্য-সেবিত শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ বিগ্রহগণও উক্ত মন্দিরে ঐ দিনসে শুভবিজয় করিবেন।

এতদুপলক্ষে ২রা জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৭।৫।৮৩), মঙ্গলবার হইতে ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৯।৫।৮৩), বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন, অধিবাস-উদযাপন, শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ, অভিষেক, বৈষ্ণব-হোম, ধর্ম্মসভা ও ছায়াচিত্র প্রদর্শন প্রভৃতি সমিতির সভাপতি পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত হইবে। সমিতির ও বিভিন্ন মঠের বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ তথা স্ত্রী-সজ্জনমণ্ডলী শ্রীগুরু-তত্ত্ব, শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন দিবসে ভাষণ প্রদান করিবেন।

জ্ঞেয়্য-কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা পাহাচ্যাদি পাঠাইতে হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজের নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

অতএব, ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ সর্বদ্বন্দ্ব উপস্থিত থাকিয়া বিবিধ সহানুভূতি-দ্বারা উক্ত শুদ্ধভক্ত্যানুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করত সমিতির সদস্যবৃন্দকে উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহায়তা প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী স্নকৃতি অর্জিত হইবে। বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—১লা বৈশাখ, '৯০

শুদ্ধভক্ত-রূপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

: অনুষ্ঠান-সূচী :

২রা জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৭৫৮৩), মঙ্গলবার—

ব্রাহ্মমূহুর্ত্তে—মঙ্গলারতি, তদনন্তর সঙ্কীর্ত্তনমুখে নগর-পরিভ্রমণ ;

পূর্ব্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা ;

মধ্যাহ্নে—সঙ্কীর্ত্তনযোগে ভোগ-আরতি ;

অপরাহ্নে—কীর্ত্তন-মহোৎসব ও অধিবাস-অনুষ্ঠান ;

সন্ধ্যায়—আরতি অন্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ছায়াচিত্রে

শ্রীগৌর-লীলা প্রদর্শন।

৩রা জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৮৫৮৩), বুধবার—

ব্রাহ্মমূহুর্ত্তে—মঙ্গলারতি অন্তে শ্রীবিজয়-বিগ্রহ সহযোগে

কীর্ত্তনমুখে শোভাযাত্রা ;

পূর্ব্বাহ্নে—প্রস্থানত্রয় পাঠ, বৈষ্ণব-হোম, শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশানুষ্ঠান ;

মধ্যাহ্নে—ভোগ-আরতি অন্তে জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ ;

সন্ধ্যায়—আরতি অন্তে শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব সম্পর্কে ভাষণ প্রদান।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৯৫৮৩), বৃহস্পতিবার—

ব্রাহ্মমূহুর্ত্তে—মঙ্গলারতি অন্তে নগর-সঙ্কীর্ত্তন ;

পূর্ব্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন ;

মধ্যাহ্নে—ভোগ ও আরতি-কীর্ত্তন ;

সন্ধ্যায়—আরতি অন্তে সনাতনধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা, তৎপশ্চাৎ

ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা প্রদর্শন।

কর্ম: স্তুতি: পুংসাং বিধকুসেন-কথায় যঃ ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরদোক্ষজে ।

০ গৌরীয়া-পট্টিকা

সাপাদয়েদ যদি মতি: শ্রম এব হি কেবলম্ ।

প্রতিহতা যয়াম্মা স্তুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরায়ণ ।
অদোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিদগ্ধন ।

অতঃ পরা হৃষ্টরূপে পালে দেউ জন ।
তবি-কথায় বাঁত নৈলো পঞ্চ সেউ দাম ।

৩৫শ বর্ষ	২০ ত্রিবিক্রম, অনিরুদ্ধ, ৪২৭ গৌরাঙ্গ ৩১ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৯০; ইং ১৫/৮/১৯৮০	৪র্থ সংখ্যা
----------	--	-------------

সান্নিধ্য

শ্রীচৈতন্যশতকম্

[শ্রীমৎ সার্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতম্]

গৌরাঙ্গ: প্রেমমুগ্ধি: জগতি যদবধি প্রেমদানং কৰোতি
পাপী-তাপী-শুরাপী নিখিল-জন-ধন-স্থাপ্যহারী কৃতদ্বঃ ।

সর্বদানু ধর্ম্মানু স্বকীয়ানু বিষগিন বিষয়ং সংপরিভ্যাজ্য কৃষ্ণং
গায়ন্ত্যুচৈঃ প্রেমভাস্তদবধি বিকলাঃ প্রেমসিদ্ধৌ বিমগ্না: ॥৪৯

যদবধি প্রেমের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গদেব এ জগতে প্রেমদান করিতেছেন ;
পাপী, তাপী, শুরাপী, কৃতদ্ব এং নিখিল জনগণের স্থাপ্য ধন-হরণকারী
মহাপাপী লোকসমূহ স্বকৃত কৃষ্ণ, সর্বধর্ম্ম এবং বিষয়বাসনা বিষতুল্য
পরিভ্যাগ করিয়া উচৈঃষরে কৃষ্ণনাম-গানে প্রমত্ত হইয়াছিল, তদবধি
তাহারা বিকল ভাব ধারণ করতঃ প্রেমমাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল ॥৪৯॥

যেযাং কস্মিন্ যুগে নাভুং নিস্তারো বহুজন্মনি

কলৌ তে তে স্মৃথে মগ্না নাম-গান-প্রসাদতঃ ॥৫০॥

যাহাদের কোনযুগে বহুজন্মেও নিস্তারের আশা ছিল না, তাহারা
কলিযুগে কৃষ্ণনাম-গানের রূপায় স্মৃথে মগ্ন হইয়াছিল ॥৫০॥

হরেনাম্না প্রসাদেন নিস্তরেং পাতকীজনঃ ।

উপদেষ্টা স্বয়ং কৃষ্ণচৈতন্যো জগদীশ্বরঃ ॥৫১॥

শ্রীহরিনামানুগ্রহে পাতকী ব্যক্তি নিস্তার প্রাপ্ত হয় । উহার উপদেষ্টা
স্বয়ং জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥৫১॥

অখিল-ভুবনবন্ধুর্নামদাতা কৃপালুঃ

কষিত-কনক-বর্ণঃ সর্বমাধুর্য্যপূর্ণঃ ।

অতি-সুমধুর-হাসঃ স্নিগ্ধদৃক্ প্রেমভাসঃ

স্মুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৫২॥

অখিল জগদ্বন্ধু. নামদাতা, দয়ালু, কষিত স্তবর্ণবর্ণবিশিষ্ট, সর্বমাধুর্য্যপূর্ণ,
সুসুন্দরহাস্যবদনযুক্ত, প্রেমময় ও স্নেহপূর্ণদৃষ্টিসম্পন্ন নটরাজ গৌরচন্দ্র আমার
হৃদয়মধ্যে স্মুরিত হইল ॥৫২॥

অতি-মধুর-চরিত্রঃ কৃষ্ণনামৈকমস্ত্রো

ভুবন-বিদিত সর্বপ্রেমদাতা নিতান্তঃ ।

বিপুল-পুলকধারী চিত্তহারী জনানাং

স্মুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৫৩॥

অতি মধুর চরিত্রবান্ কৃষ্ণনামই বীর একমাত্র মন্ত্র, যিনি সর্বপ্রেমদাতা
বলিয়া জগদ্বিখ্যাত, যিনি প্রচুর পুলকিতচিত্ত এবং যিনি সর্বজনচিত্তহারী,
সেই নটরাজ গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়মধ্যে উদ্ভিত হইল ॥৫৩॥

সকল-নিগমসারঃ পূর্ণ-পূর্ণাবতারঃ

কলি-কলুষ-বিনাশঃ প্রেমভক্তিপ্ৰকাশঃ ।

প্রিয়-সহচর-সঙ্গে রঙ্গভঙ্গ্যা বিলাসো

স্মুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৫৪॥

সর্ববেদসার, পূর্ণ—পূর্ণাবতার, কলিাপনাশক, প্রেমভক্তিপ্ৰকাশক, প্রিয়
সহচর-সহরঙ্গ-ভঙ্গ্যবিলাসকারী নটরাজ গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়মধ্যে স্মুরিত
হইল ॥৫৪॥

জগদতুল্যমনোজ্ঞো নাট্যশীলাভিবিজ্ঞঃ
কলিত-মধুরবেশো মুচ্ছিতাশেষ-দেশঃ ।
প্রবল-গুণ-গভীরঃ শুদ্ধসত্ত্ব-স্বভাবঃ

স্মরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৫৫॥

অগতে অতুলনীয় সুন্দর, নাট্যশীলাভিজ্ঞ, মধুরবেশপ্রাপ্তিধারা অশেষ-
দেশাকর্ষী, গুণ-গাভীরাপূর্ণ, শুদ্ধ সাত্ত্বিক-স্বভাব-সম্পন্ন নটবর গৌরচন্দ্র
আমার হৃদয়মধ্যে উদিত হউন ॥৫৫॥

নিরবধি গলদন্তঃ স্বেদযুক্তঃ স্বকম্পঃ
পুলকবলিত-দেহঃ সর্বলাবণ্য-গেহঃ ।
মনসিজ-শতচিত্ত-কোভকারী যশস্বী
স্মরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৫৬॥

নিরন্তর অশ্রুপূর্ণলোচন, ঘর্ম্মাক্তকলেবর, কম্পবান্, পুলকিতদেহ, সর্ব-
লাবণ্যের আকর, শত কামদেবের চিত্তকুরুকারী ও যশস্বী নটবর গৌরচন্দ্র
আমার হৃদয়মধ্যে স্মরিত হউন ॥৫৬॥

শমন-দমন-নাম কৃষ্ণনাম-প্রদানঃ
পরম-পতিত-দীন-ত্রাণ-কারুণ্যসীমঃ ।
ব্রজ-বিপিন-রহস্ত্রপ্রোল্লস্কারুগাত্রঃ
স্মরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৫৭॥

যে কৃষ্ণনাম যথেষ্ট দমনকারী বা নিয়ন্তা, সেই কৃষ্ণনাম প্রদানকারী,
অত্যন্ত পতিত-দীনকে রক্ষণার্থ কারুণ্যসীমাবিশিষ্ট ও ব্রজবনের রহস্ত্রজ্ঞানে
অতীব উল্লসিতচিত্ত নটবর গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়মধ্যে স্মরিত হউন ॥৫৭॥

সকল-রস-বিদগ্ধঃ কৃষ্ণনামপ্রমোদঃ
প্রবল-গুণ-গভীরঃ প্রাণিনিস্তার-ধীরঃ ।
নিরুপমতরুপঃ স্তোতৃতানজতূপঃ
স্মরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৫৮॥

সর্বরসচতুর, কৃষ্ণনামপ্রফুল্লিত, সর্বোৎকৃষ্ট গুণজ্ঞ, জীবজাণে ধীর ও
কামদেবতুল্য সুন্দর বিগ্রহধারী নটবর গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়মধ্যে উদিত
হউন ॥৫৮॥

বিমল-কমল-বস্ত্রঃ পঙ্কবিদ্বাধরৌষ্ঠঃ
 তিলকুসুমসুনাঃ কক্করুণঃ সুদীর্ঘঃ ।
 সুবলিত-ভুজদণ্ডো নাভিগন্তুরূপঃ
 সুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৫৯॥

অমল-কমলবদন, পঙ্কবিদ্বাধরৌষ্ঠ, তিলকুলনাসিক, শঙ্খের
 স্তায় কর্ণবিশিষ্ট, মনোহর-ভঙ্গিম-বাহুযুক্ত ও গভীর নাভিসম্বিত নটবর
 গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়মধ্যে সুরিত হউন ॥৫৯॥

কষিত-কনক-কান্তঃ সারলাবণ্যমুত্তিঃ
 কলিকলুষ-বিহস্তা যস্য কীৰ্ত্তির্বিরিষ্ঠা ।
 অখিল-ভুবন-লোকে প্রেমভক্তিপ্রদাতা
 সুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৬০॥

কষিত স্বর্ণোজ্জ্বল ও লাবণ্যদার-মুত্তিবিশিষ্ট, কলিযুগপাপনাশক শ্রেষ্ঠ
 কীৰ্ত্তিমান ও সর্বজগতে প্রেমভক্তিপ্রদাতা নটবর গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়মধ্যে
 সুরিত হউন ॥৬০॥

বহুবিধ-মণিমালা-বন্ধকেশো বিচিত্রো
 মলয়জ-তিলকোদ্ধতালদেশোহলকালিঃ ।
 ত্রাবণযুগল-লোলতু কুণ্ডল-হার-বন্ধঃ
 সুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৬১॥

বাহার কেশপাশ বহুপ্রকার মণিমালাকর্তৃক বিচিত্রভাবে বদ্ধ রহিয়াছে,
 বাহার ললাটদেশ মলয়জ-চন্দনরচিত তিলক ও কুণ্ডলরাশিদ্বারা সুশোভিত,
 বাহার কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল দোড়ালায়মান্ এবং বাহার বক্ষে 'হার' বিরাজিত,
 সেই নটবর গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়মধ্যে উদ্ভিত হউন ॥৬১॥

যদবধি হারিণাম প্রাত্তরাসীৎ পৃথিব্যাং
 তদবধি থলু লোকা বৈষ্ণবা সর্ব্ব এবৈত ।
 তিলক বিমল-মালা নামযুক্তা পবিত্রা
 হরি-হরি কলিমধ্যে এবমেবং বভূব ॥৬২॥

যেদিন হইতে শ্রীহরিনাম পৃথিবীতে প্রকটিত হইলেন, সেইদিন হইতে
 এই সকল লোক অমল তিলক-মালা ধারণ করত নামযুক্ত ও পবিত্র হইয়া
 বৈষ্ণববেশে কলিকালে 'হরি' 'হরি' বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৬২॥ (ক্রমশঃ)

সজ্জন—বদান্ত (৬)

শ্রীগৌরসুন্দর—অনর্পিতচর-কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা ও মহাবদান্ত

শ্রীগৌরসুন্দরের ছায় দানশীল আদর্শ, চতুর্দশ ভুবনে বা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁহার পদাপ্রিতগণ সেই অশৌকিক দয়া লাভ করিয়া তাহা বিতরণ করিতেও মুক্তহস্ত। বাচ্য সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর-যুগে জীবের অযোগ্যতা বিচার করিয়া প্রবৃত্ত হয় নাই, সেই উন্নত উজ্জল ভক্তিরস-মাধুরী অযোগ্য-জনেও সমর্পণ করিয়াছেন। শ্রীনন্দনন্দনের অপার মধুরিমা ভজন-পারঙ্গত অপরাধমুক্ত নিতাসিন্ধুরই প্রাপ্য, কিন্তু আমাদের উপাস্ত শ্রীশচী-তুলাল বদান্ত-শিরোমণি বলিয়া জুর্জল, প্রাকৃত-মদমত্ত জীবকে অপরাধ ছাড়াইয়া অনিত্য নশ্বর বিচারমুক্ত করিয়া পরমহর্ষিত ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিগূঢ় সেবায় নিযুক্ত করিতে ব্যস্ত।

ভগবৎ-সেবোন্মুখ জীবের প্রতি শ্রীগৌরহরির উপদেশ

বন্ধ-জীবকে অসচ্চরিত্র কণ্ট শিককের কবল হইতে উদ্ধৃত্ত করিবার জন্ত সেই গৌরহরি বলিয়াছেন যে, ভগবৎ-সেবোন্মুখ, সমস্ত জড়ভিনিবেশ-ত্যাগ, মলিন জড়ীয় জজ্ঞান-সমুদ্রের পরপারে গমনোৎসুক সজ্জনগণ যেন কোন প্রকারে যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গী বিষচীর সঙ্গ বা পরামর্শ গ্রহণ না করেন। যদি করিয়া ফলন, তাহা হইলে বিষয়-বিষে জর্জরিত হইয়া গৌরভক্তের অমলসন হইতে অন্তর্হত হইয়া জড়ো বিতারিত হইবেন।

শ্রীগৌর-তত্ত্ব, শ্রীরাধা-তত্ত্ব ও শ্রীবলদেব-তত্ত্ব

আরাধ্য-বস্তু গৌরসুন্দরের সচ অস্তিত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনিই সকল ঈশ্বরের, জীবের ও জড়ের পরমেশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; তিনি অনাদি, তিনি সর্বপ্রেম আদি এবং তিনি সকল কারণের কারণ। মহাপ্রভু কৃষ্ণই অপ্রাকৃত রসের একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট বিষয়; শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার অবলম্বন বা অপ্রাকৃত আশ্রয়। বলদেব সেই বিষয়ের বিস্তৃতি, প্রকাশ বা বৈভব। বিষয়-বৈভব হইতেই পরব্যোমে ও অপ্রাকৃত তদ্রূপ-বৈভব-সমূহে প্রান্তর প্রকাশ বাসুদেব প্রমুখ ঈশ্বর্য্যাস্রয়ের বিষয়-বিগ্রহ। মৃগাশ্রয় রাধিকা হইতে আশ্রয়-বৈভব ব্রজললনামুখ, দেবতী প্রমুখা প্রকাশাশ্রয়বৃন্দ, দ্বারকাদিতে মহিবী-বৃন্দ, পরব্যোমে লক্ষ্মীগণ, নৈমিত্তিক অবতারাাদিতে দীপ্তা প্রভৃতি নিত্য প্রকাশিত হইয়াছেন।

আশ্রয়-ভাবাদীকারে শ্রীগৌরলীলা ও বিষয়-ভাবাদীকারে শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব

পণসেখর মণামাধুরীর একমাত্র বিষয় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ যশোদাজুলাল স্বীয় নিত্য আশ্রয়-বিগ্রহ রাধিকার নিজ সেবাময়ী চিত্তবৃত্তি নিত্যকাল গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরঙ্গ-বিগ্রহে গোলোকে আশ্রয়-ভাবাদীকারে কৃষ্ণেশ্বর স্বতন্ত্র-অধিষ্ঠানে নিত্য লীলা-বিলাস করিতেন। আশ্রয়-ভাবাদীকারে গৌরলীলা ব্যতীত কৃষ্ণের কোন নিত্যলীলা নাই। বিষয়-ভাবাদীকারে কৃষ্ণ ব্যতীত গৌরঙ্গের কোন নিত্যলীলা নাই। সেই মধুর-রসদাতা বদান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট “নমো মহাবদান্ত্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নামে গৌরতিবে নমঃ।” বলিয়া নিত্য ভক্তনীর আছেন।

স্বয়ং মহাবদান্ত্যাবতার শ্রীগৌরহরি-কর্তৃক গৌর-নাগরী-অতবাদ নিরসন

তাহাকে প্রাকৃত বিচারে মিছা নাগর সাজাইয়া সাধক জড়ীয় নাগরী সজ্জায় ভঞ্জন করিতে পারেন না বলিয়াই সেই মহাবদান্ত্য স্মৃতিষ্ট ভাষায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সজ্জন বদান্ত্য কবিরাত্ত গোষাময়ী বলিয়াছেন। কৃষ্ণের আশ্রয়-জাতীয় ভঞ্জন বা গৌরলীলায় গোপনে কণ্টকাত্মক ব্যভিচার নাই।—এই পরম সত্য মহাবদান্ত্য শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি গৌর-নাগরীর সহ ব্যভিচারী নছেন।

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।

যাহা দেখি তুরে হন গৌর ভগবান্ ॥

প্রভু কহে,—বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।

দেপিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥

ছলার চন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।

দারু প্রকৃতি হরে মুনি-জন্মের মন ॥

প্রভু কহে,—মোর বশ নহে মোর মন।

প্রকৃতিসম্ভাবী বৈরাগী না করে দর্শন ॥

তবে শ্রীবাস তার (ছোট হরিদাসের) বৃত্তান্ত কহিলা।

যেছে সঙ্কল্প তৈছে জীবনী প্রবেশিলা ॥

জুনি হাসি* প্রভু কহে স্প্রসন্ন চিত্ত।

প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত ॥

অসংসঙ্গত্যাগ,—এই বৈষম্য-আচার ।

ঘোষিংসঙ্গী—এক অসাবু, কৃষ্ণাভক্ত—আর ॥

ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য ।

হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পড়িত নাহি ভজে অত ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোস্থামী-কর্তৃক সহজিয়া, গৌরনাগরী প্রভৃতি মিছাভক্তের ভ্রমাপনোদন

যে-সকল ব্যক্তি গৌরভক্তের নামে সহজিয়া, আউল, চূড়াধারী, গৌরনাগরী প্রভৃতির মতে চলিবেন এবং শুদ্ধভক্তকে রুঢ়-ভাবায় তাঁহাদের ছায় জড়ায় জানিয়া গালি দিবেন, তাহা হইলে তাদৃশ গৌরনাগরীগণ বদান্ত,—এ কথা অগৎ জানিবে না এবং সজ্জনই বদান্য, তাহাও বুঝিবে। বদান্য শ্রীকৃষ্ণ গোস্থামী, নির্দোষ নব্য-মতাবলম্বী ভাবী বালকগণের ও দলপতিগণের জন্মই বসনান্ত লিখিয়া বিষয়-আশ্রয়গত বস সূষ্ঠুভাবে জানাইয়াছেন। সেজন্ত অ-বদান্ত গৌরনাগরীর কোনো সিকান্ধই তাঁহার গ্রন্থে স্থান পায় নাই। কোন গৌরভক্তই মিছাভক্ত হইতে ইচ্ছা করেন না। সে লীলা আশ্রয়-ভাবাদীকারী কৃষ্ণ নিজ গৌরলীলায় প্রকট করেন নাই বা প্রকট করিবার যোগ্যতাও দেন নাই, সেই মিছা নাগরী-ভাব, মিছা কল্পনা করিয়া মিছাভক্ত সাজিবার আবশ্যক কি? মিছাভক্ত সাজিয়া হুনির্মূল পবিত্র চরিত্র গৌরোদ্ভে ব্যভিচার আরোপ করা এবং তদনুকূলে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ, সন্মুক্তি বা মহাজন-পথ না পাইয়া আপনাকে কৃষ্ণ-বিমুখিনী বৈরিণী সাজাইবার আবশ্যকতা কি? কোন বদান্তই মিছাভক্তকে প্রার্থ্য দেন না।

গৌরনাগরী-দলের উৎপত্তির কারণ ও তাহাতে শুদ্ধ গৌরভক্তগণের কর্তব্য

পাপ করিলে পাপীর প্রায়শ্চিত্ত নাই,—এ কথা মহাবদান্ত গৌরহৃদয়ের বলেন না। যিনি শুদ্ধভক্ত, তিনি হরিসেবা-বিমুখ নিজ ফলভোগময় পাপ করেন না বা পাপের প্রশ্রয়ও দেন না। ভক্তগণকে হরিবিমুগ্ধতা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীগৌরহৃদয়ের গোপনে ভোগ-তাৎপর্য্যের নদীয়া-নাগরী সহ ব্যভিচার করেন নাই। রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত গণিকা নাগরীর স্ত্রী গৌরপার্বদ হরিদাস ঠাকুর গোপনে ব্যভিচার করেন নাই। মাতা মীরাবাই শ্রীকৃষ্ণ গোস্থামী প্রভুর নাগরী নহেন। “অম্ব: কৃষ্ণ বহির্গো‘র:” শ্লোকের কুব্যাখ্যা-বলে গৌরনাগরী

নামক গৌরবিরোধী জীব গৌরাঙ্গকে মহাবদান্ত্য জগদগুরু না বলিয়া গোপনে ব্যভিচারী বলেন, ইহাই আশ্চর্য্য। ‘কৃষ্ণলীলা ব্যভিচারময়,’ এক্ষণ ভ্রান্ত ধারণাই নিজ ভোগ-তাৎপর্য্যপর গৌর-নাগরীগণকে বিপদগামী করিয়া গৌর-বিরোধী জীব করিয়া তুলিয়াছে। আশা করি, বদান্ত্য শুদ্ধ গৌরভক্ত, মিছা গৌরভক্তগণকে রাই-কানুর অপ্রাকৃত কথা শুনাইয়া নিজ জড়ভোগ-তাৎপর্য্যপর গৌরনাগরী দলের হৃদয়ত কাগ্নি বিনাশ করিবেন। এই কার্য্য করিলেই শুদ্ধ গৌরভক্ত-সঙ্ঘনকে বদান্ত্য বলিয়া সকলেই জানিবে।

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

ভক্তিতত্ত্ববিবেক—দ্বিতীয় প্রবন্ধ

(পূর্বে প্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৪ পৃষ্ঠার পর)

ছায়া-ভক্ত্যাভাস

এখন ‘ছায়া’-ভক্ত্যাভাস বিচার করা যাউক ! প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাসের ছায় ছায়া-ভক্ত্যাভাস কুটিল ও ধূর্ততাপূর্ণ নয়। ইহাতে সরলতা ও সদাঐহ সর্বদাই থাকে। ছায়া-ভক্ত্যাভাসের স্বরূপ ঐক্লপ গোপনীয় কর্তৃক এইরূপে লক্ষিত হইয়াছে,—

ক্ষুদ্র কোতুহলময়ী চঞ্চলা দুঃখ-হারিনী ।

রতেশছায়া ভবেৎ কিঞ্চিং তৎসাদৃশ্যাবলম্বিনী ॥

হরিপ্রিয়-ক্রিয়া-কাল-দেশ-পাত্রাদি-সঙ্গমাৎ ।

অপ্যানুবন্ধিকাদেবা কচিদজ্ঞেদপীক্ষাতে ॥

কিন্তু ভাগ্যং বিনা নাসৌ ভাগছায়াপ্যদৃষ্টিতি ।

যদভ্যুদয়তঃ ক্ষেমাং তত্র স্ভ্যজুত্তরোত্তরম্ ॥

হরি-প্রিয়জনৈশ্চৈব প্রসাদভর-লাভতঃ ।

ভাবাভাসোহপি সহসা ভাবত্মগচ্ছতি ॥

তন্মিমেবাণরাধেন ভাবাভাসোহিপ্যাহুস্তমঃ ।

ক্রমেণ ক্ষয়মাপ্নোতি যত্ঃ পূর্ণশলী যথা ॥

ছায়া-ভক্ত্যাভাস শুদ্ধভক্তির সহিত কিয়ৎ পরিমাণে সৌসাদৃশ্য প্রকাশ করে। কিন্তু ছায়া-ভক্ত্যাভাস স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র কোতুহলময়, চঞ্চল ও দুঃখহারী। হরির প্রিয়কাৰ্য্য, প্রিয় কাল, প্রিয় দেশ, প্রিয়পাত্রাদি-সঙ্গক্রমে কোনস্থলে

হরিসম্বন্ধমাত্র অবলম্বন-পূর্বক স্বরূপ-তত্ত্বানুশিষ্ট ব্যক্তিগণেতেও তাহা লক্ষিত হয়। সাম্প্রদায়িকেই হউক, অথবা দূরসম্বন্ধ-লব্ধ পঞ্চোপাসিকেই হউক, ভাব-চ্ছায়া কখনই প্রচুর ভাগ্যোদয় ব্যক্তিতে উদ্ভিত হয় না। যেহেতু যত ক্ষুদ্র পরিমাণেই হউক, ভাবচ্ছায়া একবার উদ্ভিত হইলে উত্তরোত্তর মঙ্গলই জন্মে। শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রসাদ-ভর লাভ করিতে পারিলে ভাবাভাসও সহসা ভাবরূপে উদ্ভূত হয়। পুনশ্চ শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ হইলে, আকাশস্থ চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে যেরূপ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ উত্তম ভাবাভাসেরও ক্ষয়-প্রাপ্তি হয়। ছায়া-ভক্ত্যাভাস দুই প্রকার—

১। স্বরূপ-জ্ঞানাভাব-জনিত ভক্ত্যাভাস।

২। ভক্ত্যুদ্বীপক বস্তু-শক্তি-জনিত ভক্ত্যাভাস।

(১) সাধক, সাধন ও সাধা এতজন্মের যে স্বরূপ-জ্ঞান, তাহা শুদ্ধভক্তির স্বরূপ হইতে অভিন্ন। সেই স্বরূপ-জ্ঞানের উদয় হয় নাই, যথচ সংসার-সমুদ্র পার হইবার বাসনামাত্র জন্মিয়াছে, এমতস্থলে যে ভক্তি-লক্ষণ দেখা যায়, তাহা স্বরূপ-জ্ঞানাভাব-জনিত ভক্ত্যাভাস। স্বরূপজ্ঞান হইবামাত্র ঐ ভক্ত্যাভাস শুদ্ধা ভক্তি হইয়া পড়ে। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণও যতদিন শিক্ষাগুরু চরণাশ্রয় করত স্বরূপ-জ্ঞান লাভ না করেন, ততদিন তাঁহাদের দীক্ষাগুরু প্রদত্ত বস্তু-প্রভা উদ্ভিত হয় না, সুতরাং স্বরূপ-জ্ঞানাভাবে স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি আচ্ছন্ন-ভাবে থাকায় ভক্ত্যাভাসই লক্ষিত হয়। যে-সকল পঞ্চোপাসক নির্বিশেষ-ফলাহুদ্বান শিক্ষা কবেন নাই এবং নিজ নিজ ইষ্টমূর্তিকে পরমার্থ জ্ঞান করিয়া অর্থাৎ ভগবদ্-বৈভব জানিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদের ভক্তিও ছায়া-ভক্ত্যাভাস। তথাপি সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ও পঞ্চোপাসকাস্তর্গত বৈষ্ণবের মধ্যে অনেকটা ভেদ থাকে। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের সর্বিশেষ বস্তুনিষ্ঠা পঞ্চোপাসক অপেক্ষাও অধিক। তত্ত্ব-শিক্ষার সহিত সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের যতটা শুদ্ধ-বৈষ্ণবতার আশা থাকে, স্বীয় তত্ত্বশিক্ষার সহিত পঞ্চোপাসকের তত আশা নাই। বিশেষতঃ পঞ্চোপাসকের সাধুসঙ্গ যত কঠিন, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের তত নয়। তবে যদি ভাগ্যক্রমে পঞ্চোপাসকের সাধুসঙ্গ হয় ও নির্বিশেষ-সঙ্গ না ঘটে, তবে তিনি সাম্প্রদায়িক-মতে পুনরায় সংকৃত হইয়া শুদ্ধভক্তি অবেষণ করিতে পারেন। ‘ভক্তিসম্বর্ভ’-ধৃত দুইটি শাস্ত্রীয় প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত করিলাম। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের ছায়া-ভক্ত্যাভাসেও ইঙ্গিত ফলপ্রাপ্তি-কখনে স্বন্দপূরণে শ্রীমহাদেব বাক্য যথা— দীক্ষামাত্রেন কৃষ্ণ নরা মোক্ষং লভন্তে বৈ।

কিং পুনর্ধে সদা ভক্ত্যা পুণ্যন্ত্যুচ্যুতং নরাঃ ॥

পঞ্চোপাসকদিগের মধ্যে বাহাদের 'প্রতিবিম্ব'-ভক্ত্যাভাস নাই, কিন্তু 'ছায়া'-ভক্ত্যাভাস উদ্ভিত হইয়াছে, তাঁহাদের সহজে আদি-বরাহপুরাণে কথিত হইয়াছে—

অম্মাত্তবদন্তেষু সমারাধ্য বৃষধ্বজম্ ।

বৈষ্ণবত্বং লভেদ্ধোমানু সৰ্ব্বপাপকয়ে সতি ॥

শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত এই যে, শাস্ত্রগণ ক্রমশঃ সৌরত্ব, সৌরগণ ক্রমশঃ গাণপত্য ও গণপতি-উপাসকগণ ক্রমশঃ শৈবত্ব, শৈবগণ ক্রমশঃ পঞ্চোপাসকান্তর্গত বৈষ্ণবত্ব ও পঞ্চোপাসকান্তর্গত বৈষ্ণবগণ ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবত্ব ও সকলে ক্রমশঃ সাত্ত্বত্ব বা নিষ্ঠুৰ-ভক্তত্ব লাভ করেন। শাস্ত্রাচা-সমূহদ্বারা ইহাই প্রতীত হয় যে, ছায়া-ভক্ত্যাভাস ক্রমশঃ নূনতা হইতে স্থূলতা লাভ করত সং-সঙ্গক্রমে অবশেষে শুদ্ধ ভক্তিরূপে প্রস্ফুটিত হয়।

(২) ভক্ত্যাদীপক বস্তুরাজি-জনিত ভক্ত্যাভাস শাস্ত্রে সর্বত্র পরিদৃষ্ট। তুলসী, মঙ্গাপ্রসাদ, বৈষ্ণব-পদ্যেরণু বৈষ্ণব-প্রসাদ, একাদশী, শ্রীমূর্তি, ক্ষেত্র, গঙ্গা, জয়ন্তী-তিথি প্রভৃতি অনেক ভক্ত্যাদীপক বস্তু আছে। অজ্ঞান-বশতঃ ঐ সমস্ত বস্তু-সংযোগেও জীবের স্থূল-বিশেষে মঙ্গল হয়। এমত কি, অপরাধ-রূপে তৎসংযোগ ঘটিলেও তদ্রূপ ফল হয়। তদ্রূপ সংযোগও ভক্ত্যাভাস। * * ভক্ত্যাভাসের এবিধ বিচিত্র ফল দৃষ্টি করিয়া ভক্তগণ কখনই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না। এষ্ট সমস্ত ফল শুদ্ধ ভক্তির অতুলা প্রভাব হইতেই উৎপন্ন। জ্ঞান বা যোগ পবিত্ররূপে কৃত না হইলে এবং একটু ভক্ত্যাভাসের সাহায্য না পাঠলে কিছুমাত্র ফল দেয় না। কিন্তু ভক্তিদেবী সর্বদা স্মতন্ত্রা। তাঁহার প্রতি যে-কেহ যেরূপেই হউক যে-কোন চেষ্টা করে, তিনি তাহাকে অনায়াসে ফল দেন। ভক্ত্যাভাসে এই সমস্ত ফল দেখা যায় বলিয়া ভক্ত্যাভাস আচরণ কর্তব্যরূপে নির্ণীত হয় নাই। শুদ্ধা ভক্তিই আচরণীয়। বাহাদের সম্পূর্ণ মঙ্গল লাভ করিবার ইচ্ছা, তাঁহারা যেন কোনক্রমে 'প্রতিবিম্ব'-ভক্ত্যাভাসকে চিত্তে স্থান দান না করেন এবং 'ছায়া'-ভক্ত্যাভাসকে সন্তুষ্ক আশ্রয়পূর্বক ভজন-বলে অতিক্রম করত শুদ্ধা ভক্তিদেবীর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অথর্ব বিশ্ববৈষ্ণব-দাসের এই মাত্র সিদ্ধান্ত আপনারা অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করুন—

প্রতিবিম্বস্তথা ছায়া ভেদান্তত্ব-বিচারতঃ ।

ভক্ত্যাভাসে বিধা নোহপি বর্জ্যশীলঃ সমাধিভিঃ ॥

যাঁহারা ভক্তিরস আশ্বাদন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা উভয় প্রকার ভক্ত্যাভাস হৃদয় হইতে বর্জন করিবেন। তত্ত্ববিচার দ্বারা এই মাত্র স্থির হইল যে, ভক্ত্যাভাস দুই প্রকার, অর্থাৎ প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস ও ছায়া-ভক্ত্যাভাস। প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস জীবের অপরাধ। ছায়া-ভক্ত্যাভাস জীবের অসম্পূর্ণতা। কিন্তু শুদ্ধা ভক্তিই জীবের আচরণীয়। শ্রীকৃষ্ণার্ণবমন্ত্ৰ।

ভক্তির প্রতি অপরাধ *

এই একটি বিষয় কথা। আমরা অনেক প্রকার ভক্তির অহুষ্ঠান করি। সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্রাহ্মণ-শূরুর নিকট মন্ত্ৰ গ্রহণ করি। প্রত্যহ দ্বাদশ তিলক ধারণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের অর্চন করি। একাদশী তিথি পালন করি। সাধামত নাম স্মরণ করি। শ্রীবৃন্দাবনাদি স্থানে দর্শন করি। কিন্তু হৃর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ভক্তি-দেবীর প্রতি অপরাধ না হয়, এরূপ যত্ন করি না। শ্রীভক্তি-দেবীর প্রতি অপরাধের লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তগণকে ‘মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া’ শিক্ষা দিয়াছেন। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।

ও ‘খড়্গজাঠিয়া’-বেটা না দোষবে মোরে ॥

প্রভু বলে,—“ও বেটা যখন যথা যায়।

সেই মত কথা কহি’ তথায় মিশায় ॥

বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।

ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি’ দন্তে ॥

অন্ত সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সান্তায়।

নাহি মানে ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায় ॥

ভক্তিস্থানে উহার হইল অপরাধ।

এতেকে উহার হৈল দর্শন-বাধ” ॥

শ্রীমুকুন্দদত্ত একজন ভগবৎপার্ষদ। সুতরাং প্রভুর তৎসংসঙ্গে যে কথা, তাহা রহস্যমাত্র। কিন্তু মহাপ্রভুর হৃদয় অতিশয় গম্ভীর। যে কথা যখন বলিয়াছেন

* ‘ভক্তিতত্ত্ব-বিবেক-প্রবন্ধটীর এই অংশে পূর্বপর্যন্ত ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ২১শে ভাদ্র রবিবার দিবস শ্রীশ্রীবিষ্ণুবিষ্ণু-সভার অন্তরঙ্গ বিভাগে ও বিকুপাদ শ্রীশ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পাঠ করেন। যদিও এই অংশ শ্রীগৌড়ীষ-পত্রিকার’ ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যার ৪৪৮-৪৫০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি উক্ত প্রবন্ধের গোপকতায় তাঁহারই লিখিত ভক্তির প্রতি অপরাধ অংশ নিয়ে সন্নিবিষ্ট হইল। —প্রকাশক

তাহাতে একটি উপদেশ আছে। উপদেশটী এই যে, কেবল দীক্ষাদি গ্রহণপূর্বক শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান করিলেই যে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন, তাহা নয়। অনন্ত-ভক্তিতে যাঁহার অনন্ত শ্রদ্ধা, তিনিই প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন। যাঁহার হৃদয়ে সে-প্রকার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনি শুদ্ধভক্তির পক্ষপাতে দৃঢ় হইয়া থাকেন। যেখানে শুদ্ধভক্তির প্রসঙ্গ নাই, সেখানে যান না বা বসেন না। যেখানে শুদ্ধ-ভক্তির বিষয় আলোচনা হয়, তথায় তিনি রুচিপূর্বক অবস্থিতি করেন। সরলতা, দৃঢ়তা ও একান্ততাই শুদ্ধভক্তের স্বভাব। লোকপেক্ষায় কখনও ভক্তিবিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন না। শুদ্ধ ভক্তগণ সর্বদা নিরপেক্ষ।

আজকাল অনেকগুলি লোক হইয়াছেন, যাহারা এই প্রকার অপরাধকে ভয় করেন না। ভক্ত দেখিলেই অশ্র-পুলক হয়। কখনও কখনও 'কথা'-আলোচনায় দশা-প্রাপ্ত হন। আবার আধ্যাত্মিক সম্ভার আধ্যাত্মিক মত্তের সহায়তা করেন। বিষয়াবিষ্ট হইয়া আবার বিষয়-চেষ্টায় নিতান্ত উন্মত্তবৎ ব্যবহার করেন। হে পাঠকবর্গ! এই প্রকার লোকসকলের নিষ্ঠা কি? আমরা বিবেচনা করি যে, প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যই তাঁহারা ভক্তদিগের নিকট ভক্তি-ভাবের লক্ষণ দেখাইয়া থাকেন। কোন স্থলে প্রতিষ্ঠা লাভের লোভে এবং কোনস্থলে অন্য পার্থিব প্রাপ্তি-লোভে ঐ প্রকার বহুদুর্গম ব্যবহার করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা জগৎকে ঐ প্রকার ব্যবহার শিক্ষা দিয়া শুদ্ধ-ভক্তির প্রতি কেবল অপরাধ করিতেছেন এমন নয়, জগজ্জীবের সর্বনাশ সাধন করিতেছেন।

হে পাঠকবর্গ! আমরা সাবধান হই। ভক্তিদেবীর প্রতি আমাদের যাহাতে অপরাধ না হয়, তাহা করি। প্রথমেই আমরা নিরপেক্ষ হইয়া ভক্তি বাঞ্ছন করিব, একপ প্রতিজ্ঞা করি। কোনপক্ষের অপেক্ষা করিয়া আমরা ভক্তি-প্রতিকূল কোন কথা কহিব না বা কোন কার্য্য করিব না। সকল কার্য্যে সরল থাকিব। হৃদয়ে এক, আবার ব্যবহারে অল্প, একপ হইব না। ভক্তি-প্রতিকূল পক্ষের লোকগণকে কোন কৃত্রিম লক্ষণ দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা-লাভের যত্ন করিব না। শুদ্ধা ভক্তিরই পক্ষপাত করিব। আর কোন প্রকার সিদ্ধান্তের পক্ষ সমর্থন করিব না। আমাদের হৃদয় ও ব্যবহার একই প্রকার হউক।

— জগদ্বক্তা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশীতার মর্মবাণী

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৪ পৃষ্ঠার পর)

দশম অধ্যায়

[বিভূতিযোগ]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—৫)

(শ্লোক-সংখ্যা : ৬—১১)

কহিলেন জনাৰ্দ্দন

ভৃগু, মনু, সনকাদি

পার্থের হিতার্থে

ঈশ্বর সন্তান।

জ্ঞান-প্রদায়িনী বাণী

তাঁহারা বিভূতিযুক্ত

জ্ঞান প্রদানিতে ॥১॥

অতি পুণ্যবান্ ॥৭॥

ঈশ্বরের জন্ম-কর্ম

নরকুলে নরপতি

রহস্যে আবৃত ।

সেই সব ধামি ।

দেবতাও নাহি জানে

তাঁহাদের প্রজা সবে

ধামিও তদ্রূপ ॥১॥

ধরাতে বসতি ॥৮॥

সকলের আদি তিনি

সৃজন করেন প্রভু

জনম রহিত ।

মানব প্রভৃতি ।

জানিলে সে মহেশ্বরে

কর্ম করে সর্বজীব

হয় সর্বহিত ॥৩॥

যেমন প্রকৃতি ॥৯॥

তিনি বুদ্ধি, তিনি জ্ঞান,

জানি ইহা তত্ত্বজ্ঞানী

শম দম ক্ষমা ।

গাহে হরিনাম ।

সুখ-দুঃখে সমভাব

একে বলে অন্তে শুনে

তিনি পরমাত্মা ॥৪॥

জুড়ায় পরাণ ॥১০॥

সন্তোষ, তপস্যা তিনি

শুনি সেই আলাপন

যশ, অপযশ ।

প্রভু হরষিত ।

নির্মোহ ভয়, অভয়

প্রদানেন বুদ্ধিযোগ

সত্য তথা সৎ ॥৫॥

ভক্তের নিমিত্ত ॥১১॥

জন্ম তিনি মৃত্যু তিনি

মোহরূপ অন্ধকার

তিনিই অহিংসা ।

হয় বিনাশিত ।

তিনি দান, তিনি প্রাণ

অভে পরমার্থ জ্ঞান

তিনিই মীমাংসা ॥৬॥

হয় জ্ঞান দীপ্ত ॥১২॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১২—১৫)

বশিষ্ঠ, নারদ, ব্যাস

দেবল অসিত, ।

করে তব স্তব-স্তুতি

গাহে জয় গীত ১৩॥

তুমিই পরম ব্রহ্ম

পরম আশ্রয় ।

পরম পবিত্র তুমি

জ্যোতির আলয় ॥১৪॥

তুমি নিত্য তুমি দিব্য

তুমি আদিদেব ।

জগতের পতি তুমি

তুমি দেবাদেব ॥১৫॥

তুমি কর জীব সৃষ্টি

তুমিই ভূতেশ ।

তুমি অজ তুমি বিভূ

প্রাণের প্রাণেশ ॥১৬॥

দেব দানবে অজানা

তব অভিব্যক্তি ।

তোমাকেই তুমি জ্ঞান

অন্যে কিবা শক্তি ॥১৭॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৬—১৮)

ভুবনে ব্যাপিয়া আছে

তোমার বিভূতি ।

করহ বর্ণনা কিছু

ওহে বিশ্বপতি ॥১৮॥

বিরাজিছ যাহে যাহে

কহ সেই নাম ।

জানিয়া শুনিয়া তাহা

করিব ধ্যান ॥১৯॥

অনন্ত প্রকাশ তব

বলহ শ্রীমুখে ।

যেদিকে চাহিব আমি

দেখিব বিভূকে ॥২০॥

আরো কিছু বল প্রভু

পাই যেন তৃপ্তি ।

অনন্ত বিভূতি তব

যাহে যাহে স্থিতি ॥২১॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৯—২২)

বিভূর বিভূতি আছে

জগৎ ব্যাপিয়া ।

কহিলেন কতিপয়

পার্শ্বে শুনাইয়া ॥২২॥

সর্বজীবে আত্মা তিনি

আদি মধ্য অন্ত ।

সৃষ্টি তিনি স্থিতি তিনি

লয়েতে প্রাণান্ত ॥২৩॥

জ্যোতি মध्ये সূর্য্য তিনি

যাহা রশ্মিমান ।

আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু

আদিত্য প্রধান ॥২৪॥

নক্ষত্রেতে চন্দ্র তিনি

বায়ুতে মরীচি ।

বেদ মধ্যে সামবেদ

মধুময় গীতি ॥২৫॥

ইন্দ্রিয়েতে মন তিনি

দেবগণে ইন্দ্র ।

প্রাণীতে চেতনা তিনি

যাহা প্রাণকেন্দ্র ॥১৬॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৩—২৬)

শঙ্কর কুবের তিনি

তিনি রুদ্র যক্ষ ।

বসু মধ্যে অগ্নি তিনি

বৃক্ষেতে অশ্বথ ॥২৭॥

সুমেরু পর্বত তিনি

শিখর প্রধান ।

পুরোহিতে বৃহস্পতি

পশ্চিম মহান ॥২৮॥

জলাশয় মধ্যে জিনি

অসীম সমুদ্র ।

কার্তিকেয় সেনা তিনি

দুর্গাদেবী পুত্র ॥২৯॥

মহর্ষিতে ভৃগু তিনি

তিনিই ওঙ্কার ।

স্বাবরেতে তিমালয়

জপযজ্ঞ সার ॥৩০॥

সঙ্গীতজ্ঞ চিত্ররথ

তিনিই নারদ ।

তিনিই কপিলমুনি

সিদ্ধ বিশারদ ॥৩১॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৭—২৯)

হস্তী মধ্যে ঐরাবত

নরে নরাধীপ ।

অশ্বেতে উচৈশ্রবা

গতিতে অধিক ॥৩২॥

গাভীগণে কামধেনু

ধেনু মধ্যে রাণী ।

সৃষ্টিক্ষায় কন্দর্প

তিনি চিন্তামণি ॥৩৩॥

অস্ত্র মধ্যে বজ্র তিনি

জগৎ ত্রাসিত ।

তিনিই বাসুকী সর্প

বিষে বিষায়িত ॥৩৪॥

নাগেতে অনন্ত নাগ

তিনিই বরুন ।

দণ্ডদানে শূকঠোর

যম নিদারুণ ॥৩৫॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৩০—৩২)

ক্ষয়কারী কাল তিনি

তিনিই গ্রহলাদ ।

বিনতা নন্দন তিনি

তিনি পশুরাজ ॥৩৬॥

তিনিই পবিত্র বায়ু

তিনি শ্রীরাম ।

অস্ত্রবিদ্যা পারদর্শী

সমরে প্রধান ॥৩৭॥

মৎস্যকুলে মকর

গঙ্গার বাহন ।

নদী মধ্যে গঙ্গা তিনি

পতিত পাবন ॥৩৮॥

সৃষ্টি-স্থিতি-লয় তিনি

তর্ক মধ্যে বাদ ।

তিনি বিদ্যা আধ্যাত্মিক

সাধু সঙ্গলাভ ॥৩৯॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৩৩—৩৬)

বর্ণমালায় অকার

সমাসেতে দ্বন্দ্ব ।

মধুর বসন্ত তিনি

গায়ত্রীতে ছন্দ ॥৪০॥

মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ

বলবানে বল ।

তেজস্বীতে তেজ তিনি

নহিলে দুর্বল ॥৪১॥

তিনিই অক্ষয়কাল

তিনিই বিধাতা ।

ত্রিগুণেতে সত্ত্বগুণ

সাত্বিক নির্মলতা ॥৪২॥

কীর্তি-শ্রী-বাক্ আদি

শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য ।

প্রভুর কৃপাতে হয়

ধরণীতে ধন্য ॥৪৩॥

পাশাখেলাতেও তিনি

সর্বের বিরাজিত ।

ছরন্তু খেলার মোহ

করয়ে অনিষ্ট ॥৪৪॥

তিনিই করাল যুত্বে

তিনি নব সৃষ্টি ।

জয়ের মূলেতে তিনি

তাহারি সৃষ্টি ॥৪৫॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৩৭—৪২)

পাণ্ডবেতে ধনঞ্জয়

বৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ ।

শুক্ৰাচার্য্য কবি তিনি

ব্যাসে সুপ্রসন্ন ॥৪৬॥

জ্ঞানিগণে জ্ঞান তিনি

গোপনীয় মৌন ।

দণ্ডদানে দণ্ড তিনি

শাসনের জ্ঞাত ॥৪৭॥

স্বাবর-জঙ্গম-আদি

যাহা দৃশ্যমান ।

প্রভুর কৃপাতে সব

পায় নব প্রাণ ॥৪৮॥

বিভূতির এক অংশে

ধরিয়া ধরণী ।

পালন করেন প্রভু

তিনি চিন্তামণি ॥৪৯॥

যাহা কিছু দর্শনীয়

গুণে গুণাবিত ।

বিভুর বিভূতিযোগে

মহিমা মণ্ডিত ॥

(ক্রমশঃ)

—কালীপদ মণ্ডল,

কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্ত-বিভাগের পদস্থ অফিসার,
নিউদিল্লী ।

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৫ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০০ পৃষ্ঠার পর)

ভগবানের সর্বস্বরূপতা

শ্রীমদ্ ভাগবতে দশমস্কন্ধের ষাটশ অধ্যায়ে অষ্টাঙ্গুর-মোক্ষণ-লীলাটি বর্ণিত হইয়াছে। ঐ অষ্টাঙ্গুরকে যখন কৃষ্ণ ১৮ করিলেন, তখন তাহার জীবাত্মা দিব্যজ্যোতিঃ নক্ষত্রের মত আকাশে উঠিয়া তৎপর শ্রীকৃষ্ণের চরণে আসিয়া পতিত হইল। তদর্শনে সমস্ত দেবগণ চমৎকৃত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি ও জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ গোবৎস-সকলকে স্বেচ্ছাবিচরণে ছাড়িয়া দিয়া গোপ-বালকগণকে লইয়া মণ্ডপাকারে ভোজনে বৃত্ত হইলেন। এই অবসরে ব্রহ্মা গোবৎসগণকে হরণ করিয়া লুকাইয়া রাখিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ বনভোজন-লীলার আবেশে গভীর নিমগ্ন থাকায় তাঁহার গোবৎসগণের প্রতি দৃষ্টিহার্য হইলেন। হঠাৎ তাহাদের কথা মনে হওয়ায় তাহাদিগকে না দেখিতে পাইয়া অবেশণ করিতে করিতে অন্ধত্ব চলিয়া গেলেন। ইতাবসরে ব্রহ্মা গোপ-বালকগণকেও কৃষ্ণ-হারা দেখিয়া তাহাদিগকেও হরণ করিয়া একস্থানেই লুকাইয়া রাখিলেন। কৃষ্ণ গোবৎসগণকে না পাঠিয়া পূর্বের ভোজন-স্থানে ফিরিয়া আসিয়া গোপ-বালকগণকে দেখিতে না পাঠিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। পরক্ষণেই ব্রহ্মার চাতুরী বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে মোহিত করিবার মানসে সেই গোবৎস ও গোপবালকগণের কাছাকাড়ি ফিরাইয়া না আনিয়া নিজেই সেটসকল বৎস ও গোপবালক-মুক্তিতে বিরাজিত হইয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, তখন সেই গোবৎসগণের মাতা গো-সকল আপন আপন বৎসগণকে পূর্বদিন অপেক্ষাও বাৎসল্যবশে বিশেষ আদরের সহিত অঙ্গলেহনাদি পূর্বক স্নান করাইতে লাগিল।

এদিকে গোপীগণও গৃহে প্রত্যাগত আপন আপন পুত্রগণকেই ফেরৎ পাইয়াছেন মনে করিয়া অচ্যুতদিন অপেক্ষা গোপ-বালকরূপী কৃষ্ণকে বহু আদর-যত্ন-সহকারে স্নান-পানাদি করাইতে লাগিলেন। এইভাবে গোপগণও পুত্র-বাৎসল্য পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। অথচ কেহই তাহার কারণ জানিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ পরদিনও নিজের সেই সেই মুক্তিকে লইয়া গোষ্ঠে গমন করিলেন এবং সায়াংকালে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে এক-বৎসর অতীত হইলে ষ্ঠৈয়গণ, গোপীগণ বা গোপগণের নিজ নিজ সন্তানের

শ্রীতি বাৎসল্য-স্নেহটা পূর্বাপেক্ষা দিন দিন এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে, তাঁহারাও চিন্তাবারা ইহাৰ কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন না।

পূর্বে তাঁহারা সকলে নিজ নিজ সম্বন্ধে অপেক্ষা যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে অধিক শ্রীতি করিতেন। এমন কি নিজ সম্বন্ধকে লালন-পালন করিতে হয়, তাহাই করিতেন মায়া; তাঁহাদের মন কিন্তু নন্দনন্দনের চিন্তায় সর্বদা ভরপুর থাকিত এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্ত গৃহকর্ম ত্যাগ করিয়া বা শীঘ্র যেমন ভ্রমণ ভাবে কার্ঘ্য সম্পন্ন করিয়া নন্দরাজ-ভবনে গমন করিতেন। কিন্তু যেদিন হইতে শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকরূপ ধারণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, সেদিন হইতে তাঁহারা আর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনজন্ত নন্দরাজ-ভবনে ছুটাছুটি করেন না এবং নন্দনন্দনে যেরূপ বাৎসল্য-স্নেহ ছিল, এখন তাহা নিজ নিজ সম্বন্ধে সঞ্চারিত হইয়াছে। এরূপ শ্রীত্যাধিকার মূল কারণ জানিতে না পারিলেও উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

মতবাং শ্রীকৃষ্ণের উক্ত লীলা হইতে শ্রীপ্রহ্লাদেব বাণী সত্তা বলিয়া প্রতীত হয়—ভগবান্ জীবমাত্রেয়ই নিত্য প্রিয় এবং ভগবানকে জানিয়াই হউক আর তাঁহাকে গোপগণের জ্ঞান না জানিচাই হউক, তাঁহাতে যে স্বরূপতাই প্রিয়ত্ব বর্তমান তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অজ্ঞান্য দেবতা তৎ-প্রিয়ত্বে অংশিঃ প্রিয় হইতে পারেন, স্বরূপতঃ তাঁহারা প্রিয় নহেন। তবে আমরা মাযার যবনিকা দ্বারা অজ্ঞাদিত বহির্বাছি বলিয়াই জড় পিষে প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি লাভ করিয়াছি মাত্র।

ভগবান্ জীবনিচয়ের আত্মা

দ্বিতীয়তঃ—ভগবান্ জীবের আত্মা। ভগবান্ বিভিন্নাংশ আত্মারূপে ও সাক্ষীস্বরূপ পরমাত্মারূপে জীব-জন্মে অবস্থান করেন। এই সম্বন্ধে উপনিষদ বলেন—

হা জুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষথজ্ঞাতে।

তথোরন্তঃ পিঙ্গপং স্বাধস্ত্যনয়নরত্নোহভিচাকশীতি।

(মুণ্ডক ৩।১.১, শ্বেতাশ্ব ৪।৬)

অর্থাৎ, সর্বদা সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন দুইটি পক্ষী একটি দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ 'জীব' নানা-বিধ স্বাদযুক্ত সুখভোগরূপ কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে; অতীত অর্থাৎ 'পরমেশ্বর' কর্মফল ভোগ না করিয়া কেবল সাক্ষীস্বরূপে দেহে অবস্থান করিয়া

জীবাত্মার কার্যসমূহ পরিদর্শন করেন। সুতরাং পরস্পর পরিচয়াদি না থাকিলেও একত্র অবস্থান করাই প্রিয়ত্বের লক্ষণ। এই জীবনিচয় ভগবৎ বিভিদ্ভাংশ এবং তাহাদের অংশী স্বয়ং ভগবান্। পিতা-পুত্রের পরস্পর প্রিয়ত্ব যেমন স্বতঃসিদ্ধ সেইরূপ জীব এবং ভগবানের মধ্যেও পরস্পর প্রিয়ত্ব নিত্য বর্তমান। মারার কুহকে জীব তাহা ভুলিয়া গিয়াছে, সেইজন্য ঐ প্রিয়ত্ব বুদ্ধিটি জীবের নাই।

শ্রীশুকদেব গো-গোপীগণের নিজ নিজ বৎস ও পুত্রাণেকা বর্ণোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীত্যাধিক্য বর্ণন করিয়াছেন। আবার বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে যখন তাঁহাদের বৎস ও পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইলেন, তখন সেই স্নেহ নিজ নিজ সম্মানে সম্বৎসর বাপী বহুভুগে বঞ্চিত হইয়াছিল। সেট গো-সকল নবপ্রসূত বৎসগণ অপেক্ষা এবং গোপীগণ ও গোপগণ পরবর্ত্তীকালে নবজাত পুত্রাণেকা বয়স সেট সেই সম্মানগণকে অধিক প্রীতি কবিতেন। ইহা শুনিয়া পরীক্ষিৎ মহারাজ পরপুত্র শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের এইরূপ প্রীতি যাহা নিজ নিজ পুত্রেও পূর্বে হয় নাই, তাহা জন্মিবার কারণ জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পর শুকদেব বলিলেন, (ভাঃ ১৭।১৪।৫০-৫১, ৫৫) যথা —

সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাষ্ট্রৈব বলভঃ ।

ইতরেহপত্যবিত্তাংস্তদুজ্জভতযৈব চি ॥

তদ্রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্বস্বকাত্মনি দেহিনাম্ ।

ন তথা মমতালম্বি-পুত্রবিত্ত-গৃহাদিবি ॥

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্ ।

জগদ্ধিতায় সৌহৃদ্যত্ব দেহীভাভাতি মায়য়া ॥

হে রাজন্, নিজ আত্মাই সমস্ত প্রাণীর প্রিয় হইয়া থাকে; আত্মা ভিন্ন স্ত্রী, পুত্র, ধন প্রভৃতি পদার্থ আত্মার প্রিয় বলিয়া গোণভাবে প্রিয়, বস্তুতঃ সাক্ষাৎ প্রিয় নহে। হে রাজেন্দ্র, অতএব দেহিগণের নিজ নিজ আত্মার প্রতি যেরূপ স্নেহ হয়, মমতার বিষয়ীভূত স্ত্রী, পুত্র, ধন ও গৃহাদিতে তাদৃশ স্নেহ হয় না। সুতরাং এই শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বজীবের আত্মরূপ (আত্মা) অর্থাৎ প্রিয় অপেক্ষাও প্রিয়তম বলিয়া জানিবে।

সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব

তৃতীয়তঃ—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর—নিয়ন্তা। তিনি জীবমাত্রেয়ই পরিচালক বা নিয়ামক। স্বাবর-জঙ্গমাত্মক পরাবর ভূত-সকলই তাঁহার

অজ্ঞাবহ দাস। ব্রহ্মাদি জ্ঞাবহাস্থাবর সকলকেই তিনি পরিচালনা করেন। কেহ তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহেন। সুতরাং “কর্তৃমকর্তৃ-মন্তথাকর্তুঃ সমর্থঃ ঈশ্বরঃ”—তাঁহার যাচা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। তাহার প্রমাণ যথেষ্ট রহিয়াছে।

“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বহম্”—ভাগবতের বাণী এস্থলে অরণীয়। ইচ্ছা ছাড়া—হিরণ্যকশিপু পুত্রবধের ইচ্ছায় অম্বরগণকে বলিলেন, ইচ্ছাকে (প্রহ্লাদ মহারাজকে) বধ কর। তখন সহস্র সহস্র বিকটাকৃতি প্রবল পরাক্রান্ত অম্বরগণ একসঙ্গে প্রহ্লাদকে ত্রিশূল দ্বারা আঘাত করিতে থাকে; কিন্তু অতি তীক্ষ্ণবায়ু সেইসকল ত্রিশূলাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হওয়া ত দূরের কথা, একবিন্দু রক্তপাতও হয় নাই। শ্রীপ্রহ্লাদ ঐ সব ত্রিশূলাঘাত পুষ্পবৃষ্টি বলিয়া অনুভব করিলেন। ত্রিশূলগণের ঐরূপ ব্যর্থতার কারণ—সেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, যেহেতু তিনি সকলের ঈশ্বর; অর্থাৎ সর্বনিয়ন্তা বা পরিচালক। ত্রিশূলগণের প্রতি প্রহ্লাদের বধার্থ ভগবানের আদেশ নাই বলিয়াই তাঁহার (ত্রিশূলগণ) ব্যর্থ হইল। আর তাঁহার আদেশ থাকিলে একটি ত্রিশূলাঘাতেই মৃত্যু ঘটিত। ত্রিশূল কেন, একটি কণ্টকারীতেও লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে। তৎপরে ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ, উগ্র বিষ দান, কস্তপদ-বন্ধনাবস্থায় সমুদ্রে নিক্ষেপ ও দীর্ঘদিন অনাহারে রাখা প্রভৃতি সর্বপ্রকার মরণ-কোশল অবলম্বন করিয়াও প্রহ্লাদকে বধ করিতে না পারার কারণ, সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তাঁহার একমাত্র ইচ্ছা প্রহ্লাদকে রক্ষা করা। সুতরাং তাঁহার সেই ইচ্ছাকে কাহারও বোধ করিবার ক্ষমতা নাই এবং সকলেই সেই ইচ্ছা পালন করিতে কোনও দ্বিধা বোধ করেন নাই।

উপনিষদে বর্ণিত ঈশ্বরত্বও এস্থলে আলোচনা করিব। কেন-উপনিষদেও একটি উপাখ্যানে দেখা যায় যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ স্ব-শক্তিতে দেবতাগণকে শক্তিমান করিয়া দেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই ভগবানের প্রদত্ত শক্তিকে নিজেদেরই শক্তি মনে করিয়া সকলে গর্বিত হইলেন। ভগবান্ দেবগণের বিচারভ্রান্তি ও গর্বনাশ করিবার জন্য স্বয়ং তাহাদের সমক্ষে যক্ষ-রূপে আবির্ভূত হইয়া অগ্নিকে একটি তৃণ ভস্ম করিতে, বায়ুকে সেই তৃণটিকে উড়াইতে এবং ইন্দ্রকে উহা তাঁহার বজ্রদ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ করিতে আদেশ করেন। আশ্চর্য্য বিষয়, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ স্ব-স্ব ক্ষমতা প্রচুররূপে প্রয়োগ করিয়াও সামান্য তৃণটুকুর কিছুই করিতে পারেন নাই। তৎপরে তাঁহার

ইহার কারণ অসুস্থজ্ঞান করিয়া জানিলেন,—স্বয়ং বিষ্ণু তাহাদিগকে শিক্ষা দিলেন যে, তিনিই একমাত্র সর্বশক্তিমান। তাহার নিকটই অস্ত্র দেবতাগণ শক্তি-লাভ করিয়াছেন যাত্র।

ভগবান্ সকল জীবের একমাত্র স্রষ্টা

চতুর্থতঃ—ভগবান্ সর্বজীবের স্রষ্টা। তিনি সর্বাবস্থায় শত্রু-মিত্র-নির্বিশেষে সকলের পক্ষেই হিতকারী। অস্ত্র দেবতাগণ যেমন আস্রা নহেন বশিয়া প্রিয় নহেন, সেইরূপ তাহারা স্বতন্ত্র ঈশ্বরও নহেন। মানবের মত তাহারাও পরমেশ্বরের পরতন্ত্র; সেইরূপ অন্যদেবগণ কখনও স্বতন্ত্র হিতকারী নহেন; বরং অনেকস্থলে তাহারা অনিষ্টকারীও হইয়া থাকেন। সামান্য ক্রটিতে তৎক্ষণাৎ তাহারা ক্রোধ-বশবর্তী হইয়া অভিশম্পাৎ করিয়া থাকেন।

দক্ষ-প্রজাপতির জামাতা স্ত্রীপতি মহাদেব কোনও দেবযজ্ঞে ব্রহ্মাদি দেবগণসহ উপবিষ্ট আছেন। একরূপ সময়ে দক্ষ-প্রজাপতি তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মাকে প্রশংসাদিপূৰ্ব্বক উপবেশন করিলেন। অপর দেবতাগণ তাহাকে প্রশংসাদি দ্বারা সম্মান করিলে শিব তাহা না করায় প্রজাপতি ক্রুদ্ধ হইয়া ‘জামা হইতে শিব কোন যজ্ঞ-ভাগ পাইবে না’—বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন। কেবল শাপদানে তুষ্ট না হইয়া শিবহীন একটী যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে নিজের জীবনটিও নষ্ট হইয়াছিল। স্বয়ং ভগবান্ স্রষ্টাদক্ৰমে এই জীবের বহু উপকার করিয়া তাহাদিগকে নানাপ্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন—ইহার উদাহরণের কোন অভাব নাই।

উদ্ধারের পথ

(পূর্ব প্রকাশিত ৩৫শ দর্শ, ২য় সংখ্যা, ৬৯ পৃষ্ঠার পর)

জ্ঞান-পথের বিশ্লেষণ ও জ্ঞান-প্রয়াসের নৈফল্য

জ্ঞানের ফলও নিতান্ত তুচ্ছ ও অমঙ্গলজনক। জ্ঞানের অধিকারীদের নিষ্ঠা উৎপাদনের জন্য জ্ঞানেব বিচার-ব্যবস্থা শাস্ত্রে উল্লিখিত থাকলেও জ্ঞানের আশ্রয়ে প্রচারিত অজ্ঞান ভ্রমোৎপাদ্য জীবের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত নেই। জড়জ্ঞানকেই সাধারণতঃ ‘জ্ঞান’ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। জীবের শুদ্ধ-জ্ঞান উদ্ভিত হ’লে মায়াব বন্ধন থেকে মুক্ত হন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকে পৃথক্ করে ‘জ্ঞানের’ সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন,

—“বে-কর্মে বা জ্ঞানে ভক্তিবৃত্তির আধার নাই অর্থাৎ কর্ম বা জ্ঞানেরই প্রভুত্ব লক্ষিত হয় এবং ভক্তি কেবল কর্ম বা জ্ঞানের দাসীর ন্যায় পরিচর্যা করে, সেই কর্মের নামই ‘কর্ম’ ও সেই জ্ঞানের নামই ‘জ্ঞান’; এই কর্ম বা জ্ঞানকে ‘ভক্তি’ নাম দেওয়া যায় না।”

জ্ঞান সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—বিষয়-জ্ঞান (জড়জ্ঞান) ও শুদ্ধজ্ঞান। বিষয়-জ্ঞানে স্তম্ভতা আছে, কিন্তু শুদ্ধজ্ঞান তথা ভক্তির অমুগামী জ্ঞান সর্বদা আনন্দরসময়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্রিহা ও ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যে বাহ্যজ্ঞানের ঊর্ণালক্ষি হয় তাহাই জড়জ্ঞান। ঈন্দ্রিয়জ্ঞান তথা আত্মবোধ, সঙ্গীত, শিল্প, দেশ প্রভৃতি সৎস্বকীয় জ্ঞান, নৈতিক জ্ঞান তথা রাজনীতি, শরীরনীতি, সংসারনীতি প্রভৃতি সৎস্বকীয় জ্ঞান, অস্থির সিদ্ধান্তের সচিং ঈশ্বর-জ্ঞান তথা ভগবানের স্থূল ও সূক্ষ্মরূপের কল্পনা করে পাক ও পূজা এবং প্রাপ্য-তত্ত্বকে নির্দিষ্টশেষ জ্ঞান—এই সমস্তই জড়জ্ঞান। ঈন্দ্রিয়জ্ঞান ও নৈতিক-জ্ঞান দ্বারা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি এবং জড়ীর ভোগসুখ কিছুটা লাভ হয়, কিন্তু ঈশ্বরীয় ভক্তি না থাকায় এই সমস্ত জ্ঞান অন্তর। এই সমস্ত লৌকিক জ্ঞানে ধর্মাদ্বৈত ও পাপ-পুণ্য আছে,—মানুষের বন্ধাবস্থা থেকে মুক্তির কোন সুযোগ নেই। ঈশ্বরের প্রাকৃত পূজা ভক্তির পরিণামী—ইহা জ্ঞানকাণ্ডের অস্বাভাবিক অবস্থার অজ্ঞান বিচার। ইহাতে ঈশ্বরের নিত্যস্বরূপ স্বীকার করা হয় না,—ইহাও শরীর, মন ও সমাজ সৎস্বকীয়; অতএব তুচ্ছ। শাস্ত্রে এই প্রেয়ীর জ্ঞান (ভাঃ ১০।৮৪।১৩) দ্বিকৃত হয়েছে—

“বস্তুভুক্তিঃ কুণ্ঠে ত্রিধাতুকে বধীঃ কলত্রাদিযু ভৌম ইজ্যাদীঃ।

যন্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কহিচ্ছিনেনষভিজ্জেষু স এব গোধরঃ।”

অর্থাৎ “যিনি এই স্থূল শরীরে আবদ্ধবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মুগ্ধাদি জড়বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবন্তকে আবদ্ধবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটিই করেন না, তিনি গরুদিগের মধ্যে গাধা অর্থাৎ অতিশয় নিকোঁদ।”

জ্ঞানকাণ্ডের অস্বাভাবিক অবস্থার অতি জ্ঞান পর্যায়ে জীব ভক্তি-যোগ পরিভাষ্য ক’রে নিজ চেষ্টায় নির্বাপন মুক্তির অনুসন্ধান করেন। কর্মকাণ্ডের মধ্যে যেমন ভোগের বিচার, জ্ঞান-কাণ্ডের মধ্যে তেমনি ভোগের বিচার। শুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা ভক্তিরাজ্যের দরজা পর্যন্ত পৌঁছানো যায়, কিন্তু ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করা যায় না;—‘ভক্তি মুখ-নিবীক্ষক কর্ম-যোগ-জ্ঞান’ (চৈঃ চঃ)।

ভুক্তি বা ভোগস্ব কৰ্মের ফলে পাওয়া যায়, তাই কন্মীমায়েই ভোগী ; আর নির্বিশেষ মুক্তি বা নির্বাণ মুক্তি জ্ঞানের ফলে পাওয়া যায়,—তাই জ্ঞানীরা প্রচ্ছন্ন ভোগী । কৰ্মের ফল ও জ্ঞানের ফল—উভয়ই নিজস্বাভিসন্ধি-মূলক । ভুক্তিহীন জ্ঞানের আশ্রয়ে নির্বাণ-মুক্তি বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না । স্ত্রীভাগবতে, যথা—

“যেহন্তেহরবিন্দাক বিমুক্তমানিন-

স্বযাপ্ত এবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।

আরুহ কচ্ছুণ পরং পদং ততঃ

পতন্তাদোহনাদৃতযুগদজ্যুয়ঃ ॥” (ভাঃ ১০।২।৩২)

অর্থাৎ “হে পদ্মলোচন ! আপনার ভক্ত বাতীত অস্ত্রে যাহারা আপনা-দিগকে বিমুক্ত বলে অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে । তাহারা শম-দমাদি অস্ত্রাস্ত্র কচ্ছুসাধনের ফলে ভীষণযুক্তবোধ করেও আশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় অধিকার হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয় ।”

ভুক্তিহীন জ্ঞানীরা জীবমুক্ত হ’য়েও ভগবচ্চরণে অপরাধী হওয়ার জঙ্ক পুনরায় সংসারে জন্ম নিতে বাধ্য হয় । কেননা ভগবান্কে অবজ্ঞা ক’রে পূর্বের সঞ্চিত জ্ঞান ক্ষয় হওয়ার ফলে অধঃপতন অনিবার্য্য হয় । ভক্তি বাতীত কেবল জ্ঞান বা নির্বিশেষ জ্ঞান মুক্তিফল দিতে পারে না ; নির্ভেদ ব্রহ্ম-জ্ঞানীদের ক্লেশই লাভ হয় । শাস্ত্র বলেছেন,—

“কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে পারে ভক্তি বিনা ।

কৃষ্ণানুখে সেই ভক্তি হয় জ্ঞান বিনা ॥” (চৈঃ চঃ)

সত্বগুণ থেকেই জ্ঞানের উৎপত্তি । শাস্ত্র জানিয়েছেন,—“সত্বাৎ সংজ্ঞারতে জ্ঞানং” (গীতাঃ) । নিকাম কৰ্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধির তারতম্য হয় । সত্বগুণ থেকে সত্বজ্ঞানের উদ্ভব হয়,—তখন আত্মানাত্ম যন্তু বিষয়ে উপলব্ধি হয় । দেহাভিমানের অতিরিক্ত জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান । সত্বজ্ঞান উদিত হ’লে অজ্ঞান দূরীভূত হয় ; কিন্তু শুদ্ধজ্ঞান বা ভগবৎজ্ঞান লাভ হয় না । ভগবান্ নিগূর্ণ, কাজেই সত্বগুণময় জ্ঞান দ্বারা তাঁকে অনুভব করা বা জানা যায় না ।

ভক্তি থেকে যে-জ্ঞান উদ্ভূত হয় তাহা ভগবৎজ্ঞান—তাহাই ভক্তি । নিগূর্ণাভক্তির উদয় হ’লে প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণ অতিক্রম ক’রে অপ্রাকৃত গুণের সমাবেশ হয় । ভক্তগণ নিগূর্ণ চক্ষে ভগবানের সবিশেষ নিগূর্ণ-স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন । জ্ঞানীদের যেটুকু গতি হয়, তাহাও ভক্তির আশ্রয়ে রয়ে থাকে ।

কড়ীষ বিশেষত্ব। তাহাই নির্বিশেষ জ্ঞান। নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী ব্রহ্মোপাসকগণ ব্রহ্ম-সামুদ্র বা নির্বিশেষ মুক্তি কামনা করেন, আর ভগবন্নিষ্ঠ জ্ঞানী সাধুগণ ফলে লুক্করিত পার্থনা করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শত্রুপক্ষ যথা অঘ, যত, জবাসন্ধ প্রভৃতি যে নির্বিশেষ মোক্ষ লাভ করেছিলেন, সেই নির্বিশেষ মোক্ষই অতিজ্ঞানী নির্বিশেষবাদীদের চরম লক্ষ্য। মোক্ষ জ্ঞানমার্গের চরম-ফল হওয়ায় তাহা নিতাবদ্ধ জীবের প্রয়োজন বলে স্বীকার করা যেতে পারে; কিন্তু নিতামুক্ত জীব তো মোক্ষপ্রাপ্ত, কাজেই নিতামুক্ত জীবের পক্ষে কি সেই মোক্ষ প্রয়োজন হ'তে পারে? জ্ঞানমার্গে সকল জীবের পক্ষে চরম প্রয়োজন নির্দ্ধারিত হয়নি। একমাত্র ভক্তিমার্গে জ্ঞানীদের বিচারিত চরম ফলেরও উর্দ্ধে ভগবৎ-প্রেমের কথা বাক্য হয়েছে—

“কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।

যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥

পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃত সিদ্ধি।

মোক্ষাদি আনন্দ যার নচে এক বিন্দু ॥ (৫ঃ চঃ)

জ্ঞানীদের গতি বিরজা অতিক্রম করে নির্বিশেষ ধাম বা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত। ব্রহ্মলোকের উর্দ্ধভাগে নৈকুঠ জগৎ,—বৈকুণ্ঠে কুঠা ধর্ম নাই; কিন্তু বৈকুণ্ঠের নিম্নভাগে ব্রহ্মলোকাদি যাবতীয় লোকে কুঠাধর্ম বিদ্যমান। ব্রহ্মলোক মায়াতীত হলেও কুঠাযুক্ত; বৈকুণ্ঠের চিহ্নিলাস-বৈশিষ্ট্য ব্রহ্মলোকে নাই। কুঠারাজ্যে চেয়তা, অনুপাদেয়তা, অজ্ঞানতা, নাস্তিকতা প্রভৃতি বিষয় লক্ষিত হয়।

অম্বদীর গুরুদেব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীম ভক্তিশ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবৎ একদা শ্রীমদ্ভাগবত-বাখ্যা শ্রবণে কেবল জ্ঞানের পর্য্যয়ে বলেছেন,—

জ্ঞানের দ্বারা জীবের মোক্ষ সম্ভব নহে, বিশেষতঃ নির্ভেদ ব্রহ্মভূতজ্ঞানপর জ্ঞান আত্মার অধঃপাতকারক। জ্ঞানে ‘মুক্তি’ শব্দ প্রযুক্ত হ'লেই সে-স্থলে অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞানকে লক্ষ্য করে। বিভূজ মুবলীধর কৃষ্ণচন্দ্রের পাদ-পদ-সেবা লাভই তথায় উদ্দিষ্ট বিষয়। কৃষ্ণের পদনখ-জ্যোতিঃই ‘ব্রহ্ম’। ঐষ্ট জগুট আমবা “জ্যোতিঃভাস্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্” বাক্য লক্ষ্য করে থাকি। “সূর্য্যামণ্ডল” বলতে যাবতীয় গ্রহ-নক্ষত্র-জ্যোতিঃমণ্ডল লয়েই সৌরজগৎ। শ্যামসুন্দরের জ্যোতিঃকে দেখেই জ্ঞানীগণ তাকে তত্ত্ববস্তু বলে মনে করেন। কিন্তু উহা সম্যক্ দর্শন নহে; উহা ভগবৎ-তত্ত্বের অসম্যক্ প্রতীতি মাত্র।

ব্রহ্মে লীন হ'য়ে যাওয়া—চিন্তাস্রোত হৃদয়ে প্রবেশ করলে বখনই অধঃপতন আরম্ভ হ'ল। জীব ভগবানের বিভিন্নাংশ সে কিরূপে পূর্ণের সহিত সমান হ'বে? “The part is equal to the whole, which is absurd” তজ্জন্য মেণ্ডলে বলেছেন,—“More than a man you can not be”, আমরা যাবিধ ধর্মের মধ্যে এতে পড়েছি বলেই ভগবানকে জানতে পারছি না।

অদ্বৈতবাদীগণ মায়াবাদী; তজ্জন্য তাহারা ব্রহ্মকে স্থাপন করতে গিয়ে মায়াময় ক'রে ফেলেন। তাহারা চরমে যাচা লাভ করবেন, তাহাও মায়া-মিশ্রিত। আমি জলের মধ্যেই থাকুব, অথচ গায়ে জল লাগবে না—ইহা সম্ভব নয়। অবিজ্ঞার মধ্যে থাকুব, অথচ অবিজ্ঞা হ'তে উত্তীর্ণ হ'ব, ইহা সম্ভব নহে।”

কোন জ্ঞানীদের চেষ্টায় বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ হয় না। কেবলজ্ঞানীদের পিচারদ্বারা নিত্য অকর্মণ্য, আত্মরিক চিন্তা-প্রসূত। জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদই প্রধান। মায়াবাদ-দর্শনে তাহা স্পষ্ট প্রতিফলিত। অম্বদীয় গুরু-পাদপদ্ম শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের লিখিত ‘মায়াবাদের আত্মরিক বিচার’ নিবন্ধের কিস্তদংশ এতলে উল্লেখ করছি,—“পদ্মপুরাণ যেমন পরিষ্কার ভাষায় মায়াবাদীয় স্বরূপ নির্ণয় করেছেন, গীতা তদপেক্ষা আরও সুস্পষ্টতম বিচার প্রদর্শন করে মায়াবাদ-ধর্ম যে আত্মরিক, তাহা স্পষ্টীকৃত করেছেন। গীতার ষোড়শ অধ্যায় ৮ম শ্লোকে মায়াবাদী অসুরগণের এবং নাস্তিকগণের পূর্ণস্বরূপ বাক্য হয়েছে, যথা—

“অসত্যম প্রতিষ্ঠিত্তে জগদাহরনীশ্বরম্।

অপরম্পরম্ সমুৎকং কিমজ্ঞং কামতেতুকম্ ॥”

অর্থাৎ গীতায শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—অসুর-সম্ভাব ব্যক্তিগণ জগতকে ‘অসত্য’ ও ‘অনীশ্বর’ বলেন; দেবের অর্থাৎ মিথ্যতা বলে কেহ নেই। জী-পুরুষের পরম্পর কামজনিত সংযোগেই ইহাও উৎপত্তি হয়েছে। এখন চিন্তা করে দেখুন, অদ্বৈতবাদী মায়াবাদীগণের প্রধান সিদ্ধান্ত—‘জগত অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা’। তাহারা জগৎ মিথ্যা, অসত্য, অলৌক, স্বপ্নবৎ বলবে, তাহারাষ্ট অসুর-শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং বেদব্যাসের বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং উক্তির দ্বারা মায়াবাদীগণ অসুর ইহা প্রতিপন্ন হচ্ছে।” (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিশুরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

জতুগৃহদাহ

[পৌত্তানিক গল্প : শ্রীমহাভারত হইতে]

বৎসরাবধি পাণ্ডবেরা বারণাবতে বাস করিবেন স্থির হইল। পূর্ব হইতে বিদুর সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। গৃহ পরীক্ষা করিয়া সকলে বুঝিলেন জ্যেষ্ঠ। গৃহ ঘূত ও জতু মিশ্রিত রসাগন্ধে পরিপূর্ণ। ভীম জুগ্ম হইলেন। ইচ্ছা, হস্তিনাপুরে ফিরিয়া যান। যুধিষ্ঠির নিবেদন করিলেন।

“যুধিষ্ঠির কহেন এ নহে সুবিচার।

এই কথা লোকে তবে হইবে প্রচার ॥

নিশ্চয় আমার কার্য্য পারিল জানিতে।

দুর্যোধন বিচার করিবে নিজ চিতে ॥

সৈন্যগণ সাজি ছুই করিবেক রণ।

তার হাতে সর্ব সৈন্য সর্ব রত্নধন ॥

কি কাজ বিবাদে ভাই না যাব তথায়।

নির্জন নিঃসৈন্য আমি নাহিক সহায় ॥

সাবধান হৈয়া এই গৃহেতে বধিব।

আমরা যে জানি ইহা কারে না বলিব ॥”

ধর্মের বিচার ধীর, গভীর ও চাক্ষুশ। পাঁচ ভাই এইরূপ বিচার স্থির করিলেন—প্রতিদিন মৃগয়াহলে পথ-ঘাট জ্ঞাত হওয়া উচিত; সর্বদা অগ্রণ করিলেও সমস্ত পথ জানা যায়, নক্ষত্রদ্বারা দিগ্‌নির্ণয় হয়, ইন্দ্রিয়গণকে বশে রাখিলে কখনও অবসন্ন হইতে হয় না, ইহাও বিদুরের সঙ্কেত। পাণ্ডবেরা তাহাই করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা সর্বদা সতর্ক। এদিকে বিদুরও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছেন না। তিনি খনককে পাঠাইলেন।

পাণ্ডবদিগের মনে ঘোরতর অবিশ্বাস আসিয়াছে। কে কখন কিস্ত্রে আসিয়া কোন্‌ অনিষ্ট সাধন করিয়া যায়, এজন্ত পাণ্ডবেরা পরীক্ষা না করিয়া কাহারও উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতেন না। পাণ্ডবেরা ভিতরেও এইরূপ সতর্ক। ইঁহারা ধার্মিক। যে জ্ঞানরত্ন হারাইয়া মানুষ আত্মরাজ্য ভ্রষ্ট হয় ও পাশ্চশালার ছায় এই পৃথিবীতে আসিয়া ষড়দস্যুর হাতে পড়ে, ইঁহারা সে-রত্ন সযত্নে রক্ষা করিতেন, বহিদস্যুতা ভয়ে টিকিতে পারিবে কেন?

খনক আসিল। যুধিষ্ঠির পরীক্ষা করিয়া জানিলেন খনক বিদুর প্রেরিত। আগনার লোক দেখিলে ছুঃখের কথা বাহির হয়, অজাতশত্রু অক্রোধী

যুধিষ্ঠির তুই কোরবের চরিত্রে বাধিত হইয়াছেন, সকলের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত না হইলে কুরুক্ষেত্র সমরে তুই কুরুকুল সংতার হইবে কিরূপে ?

খনককে পাঠিয়া যুধিষ্ঠির বলিতে লাগিলেন,—

“অবধানে দেখ তুই কোরব রচিত,
অৰ্ণ অতুগৃহ বাঁশ সংযোগে রচিত ।

চতুর্দিকে গড় দেশ গভীর বিস্তার,
অক্ষৌহিনী বলে পুরোচন রাখে দ্বার ।

এতরূপে পড়িয়াছি বিপদ বন্ধনে,
উপায় করিয়া মুক্ত কর ভয় জনে ॥”

বিপদ বুঝিয়া দেখ । ঘরে অগ্নি লাগিলেও পলায়নের পথ বন্ধ । জতু-
গৃহের চারিদিকে গভীর গড় । একটি মাত্র দ্বার । বলপূর্বক পলায়ন
অসম্ভব । অক্ষৌহিনী সেনা দ্বাণ বন্ধ করিতেছে ।

লালাভম ও মাটি মিশ্রিত করিয়া গৃহের সর্বস্থানে প্রলেপ দেওয়া
হইয়াছে । অস্তিরমত কঠিন শুভ্র পদার্থে গৃহ নির্মিত । গৃহের গম্বুজের ভিতরে
সুরঙ্গ । সেই সুরঙ্গ দ্বারা মুক্তির অন্য উপায় নাই ।

প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল । বিহ্বলের পরামর্শে খনক সুরঙ্গ প্রস্তুত
করিতে আসিয়াছে । সুরঙ্গ প্রস্তুত হইল । সুরঙ্গের মুখে কবাট । উপরে মাটি
দিয়া চারিদিকের মৃত্তিকা সমান করিয়া রাখিল । জতুগৃহের চারিদিকে পুরোচন
যে গভীর গর্ত কাটিয়াছিল, খনক তদপেক্ষা অধিক নিয়ে খনন করিয়া চলিল ।
জতুগৃহ হইতে গম্বুজের পর্য্যন্ত গর্ত নির্মিত হইল । গম্বুজ এখানে যুক্তবেণী টিক
বলা যায় না, যেন মা পতিতপাবনী মুমুক্শুকে প্রথমে এই স্থানে আনয়ন করিয়া
মুক্তির পথ দেখাইয়াছেন । এই ঘাটের নাম যুক্তবেণী ঘাট । আর যে ঘাটে স্নান
করিগে প্রিয় সঙ্গে কখনও বিযোগ ঘটে না, তাহার নাম যুক্তবেণী ঘাট ।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল । পুরোচন বুঝিল যে,
পাণ্ডবদিগের বিশ্বাস জন্মিয়াছে । যুধিষ্ঠির পুরোচনের ভাণ বুঝিলেন ।
ভ্রাতাদিগকে বলিলেন, সম্প্রতি আমরাদিগের পলায়নের সময় উপস্থিত হইয়াছে ।
আজ বারে পুরোচন জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিবে, সকলে সাবধানে থাকিও ।
একান্ত নির্ভরশীল ভক্তকে ঈর্ষগবান্ কিরূপে বঞ্চা করেন তাহার একটি
গল্প অবতারণা করিতেছি ।

দিবাভাগে কুন্তীদেবী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন । স্নাত্তুরা এক নিষাদী
কালপ্রেরিত হইয়া পঞ্চ পুত্রের সহিত ভোজন করিতে আসিল । নিষাদী ঐ

রাত্রি কোথাও গেল না, জতুগৃহে অবস্থান করিল। নিষাদীর নাম কুন্তী।
পুত্রা নিষাদীর স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করিল। স্বামীর নাম পাণ্ডু। পঞ্চ পুত্রের
নাম যুধিষ্ঠিরাদি। আশ্চর্য্য ঘটনা। পুত্রা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার এ
তুর্গতি কিসে হইল? নিষাদী আপন ছুঃখের কথা বলিতে লাগিল;—

নিত্যকর্ম্ম মুগয়া করেন মোর স্বামী—
উদ্যার্থে মাংস বিক্রী করিতাম আমি।
স্বামী গেল জাল নিয়া মুগয়া কারণ,
না পাইল মুগ বহু করি অন্বেষণ।
অত্যন্ত চিন্তিত ব্যাধ আসে নিজ মনে।
হেনকালে এক মৃগী দেখিল নয়নে ॥
মৃগীর প্রসবকাল আসি উপস্থিত।
হেনকালে ব্যাধ তারে বেড়ে চারিভিত্তি ॥
একদিকে অগ্নি দিল জাল আর দিকে।
অন্যদিকে শ্যাং ছাড়ি দিল অতিবেগে ॥
আপনি যে বসু ধরি অস্ত্র নিল হাতে।
ব্যাকুল হইয়া মৃগী চাহে চারিভিত্তিতে ॥
চারিদিক নিরখিয়া পথ না পাইল।
কাতরা হইয়া মৃগী স্থির দাঁড়াইল ॥
দেখিলে মৃগীর ভাব মনে হেন লয়।
নগতিবিম্বিতে নাথ মৃগী যেন কয় ॥
হে কৃষ্ণ, হে আর্জুনাত্মা যাদব-নন্দন।
এ মহাসঙ্কটে মোরে করহ তারণ ॥
তণ-জল খাই, কারো হিংসা নাহি জানি।
তবে কেন ব্যাধ মোর হরয়ে পরাণি? ॥
এইরূপে মৃগী যেন কাতরা হইয়া।
রক্ষা কর ভগবান্থ বলিল ডাকিয়া ॥

হরিণী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। নেত্র দিয়া জলধারা পড়িতেছে,
উদ্ধে মস্তক তুলিয়া মৃগী যেন কাতরে দীনবন্ধুর শরণ লইতেছে।

কাতর হইলেই জীব ভগবানের শরণাগত হয়। ইহাই জীবের স্বাভাবিক
অবস্থা বা ধর্ম্ম। মৃগীর কাতরোক্তি বুঝি ভগবানের কর্ণে পৌঁছিল।

“তুনি নারায়ণ, চয়ে সদয় হৃদয় ।
 মেঘে আজ্ঞা দিল তবে যেন বরিষয় ॥
 অগ্নি নিভাটল, জাল উড়িল বাতাসে ।
 অকস্মাৎ এক ব্যাঘ্র স্থানেরে বিনাশে ॥
 ব্যাঘ্র-শিরে তখনই হইল বজ্রপাত ।
 চারিদিকে মুক্ত তাবে করেন শ্রীনাথ ॥
 দিনকর অস্ত গেল নিশা প্রবেশিল ।
 যথাস্থানে গিয়া তারা শয়ন করিল ॥

আজ চতুর্দশীর রাত্রি । দুর্ভেদ্য অন্ধকাবে চারিদিক আচ্ছন্ন । বহু নাই, সমস্তই এক হইয়া গিয়াছে । যেন রজনী বহু দৃশ্যজ্ঞান মার্জনা করিয়া কাহারও সহিত মিলন সুখ অনুভব করিতেছেন । দোষিতে দেখিতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর আসিল । দূরে শৃগাল শব্দ করিয়া দ্বিতীয় প্রহর জানাইল । জৌগৃহস্থিত পেচকেবা চীৎকার করিল ।

জতুগৃহের দ্বার বন্ধ করিতেছে পুরোচন । যুধিষ্ঠির ইজিত করিলেন ভীমসেন সর্বপ্রাণে পুরোচন গৃহে অগ্নি প্রদান করিল । শাস্ত্রে আছে ক্ষত্রিয় হুবৃন্তের দণ্ড না দিলে ক্ষত্রধর্ম পালন হয় না । জৌগৃহের দ্বারে এবং চতুর্দিকে অগ্নি জ্বলিল । লাক্ষাগৃহ একবারে জ্বলিয়া উঠিল । তখন জননীর সহিত পঞ্চভ্রাতা খনক নির্মিত সুরভমধো প্রবেশ করিলেন ।

সেই রজনীতে বিশাল জতু-নির্মিত-প্রাসাদ পুড়িয়া ভস্মরাশি হইল । আর ঐ অগ্নিতে পুড়িয়া মরিল পুরোচন । গ্রামবাসিগণ অগ্নি দেখিয়া হাহাকার করিতে করিতে দৌড়িয়া আসিল । ঘৃত, তৈলবস্যা এবং লাক্ষার গন্ধে বুঝিল জতুগৃহ । তাহারা ধৃতরাষ্ট্রকে শতমুখে গাণি দিল । অগ্নি নির্বাপিত হইলে দেখিল পুরোচন পুড়িয়া মরিয়াছে । সকলে বলিল,—

নির্দোষ জনের হিংসা করে যেই জন ।

এইরূপে তাহে শাস্তি দেন নারায়ণ ॥

খনক জতুগৃহ পরিষ্কার করিবার ছলে স্বকৃত গব্বর এইরূপে ভর্তি করিয়া দিল যে কেহই উহার বিন্দু-বিসর্গ অনুসন্ধান পাইল না । পাণ্ডবেরা সকলের প্রিয় হইয়াছিল । পাণ্ডবদিগের শোকে গ্রামবাসিগণ হাহাকার করিয়া উঠিল । তাহাদের গুণ স্মরণ করিয়া এবং ধৃতরাষ্ট্রের জর্য্যবহার দেখিয়া উদ্ভত হইয়া বলিল,—

“এইক্ষণে আমি সবাকার এই কাজ।

লোক পাঠাইয়া দেহ হস্তিনার মাঝে ॥

ধৃতরাষ্ট্রে বল, না করিহ কিছু ভয়।

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোৱ হ'ল ছরাসয় ॥

সক্ষম বাক্তি মুক ও কার্যাপ্রাণ হয়, কিন্তু অক্ষম লোকের গাতিদাহ বক্তৃতা-
মাতেই নিষারিত হওয়া চিরন্তন রীতি।

হস্তিনাপুরে এ সংবাদ পৌছিল। অন্ধ রাজা শোকে আচ্ছন্ন হইয়া
পড়িলেন। “আজ জানিলাম আমি পাণ্ডুর নিধন।

ভ্রাতৃ-শোক না ছিল—এ সবার কারণ ॥

এ ক্রন্দন অতিরঞ্জিত—ক্রন্দন নহে। ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্র ব্যাসদেব সেরূপ জুর
করেন নাই। ইহা সার্থক অববেকীজনের কণস্থায়ী দত্ত সন্তাপ।

যতই কু-অভিপ্রায় থাকুন কেন, সকল প্রকার লোকের নিকট অজ্ঞতঃ
এক এক মুহূর্ত্তেও ভ্রাতৃশোক হুস্পরিহার্য। লক্ষণের শক্তিশেষে রাম বিলাপ
করিয়াছিলেন,—

“দেশে দেশে কলত্রাশি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।

অন্তদেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা মহোদরঃ ॥

পাণ্ডবদিগের ও কুতীর মৃত্যু সংবাদে গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণ এবং ভীষ্ম,
দ্রোণাদি মর্য্যাহত হইলেন। বিহ্বল বড়ই চঞ্চল হইলেন। খনক এখনও
ফিরিয়া আইনে নাই। বিহ্বল একজন কৈবর্ত্তকে গঙ্গা পার করিয়া দিবার
জন্ত পাঠাইয়া দিয়াছেন। উহার আগমন প্রতীক্ষায় বিহ্বল বড়ই উদ্বিগ্ন
রহিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র যথাসময়ে পাণ্ডবদিগের শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সমাপন
করাইলেন। স্রুৎ দ্বারা বভীতেও পাণ্ডবদিগের উদ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল, কারণ
কুন্তীদেবী বহুদেবের সহোদরা। বহুদেবের নিকট জতুগৃহ দাক্ত সংবাদ
পৌছিল। বহুদেব সত্যাকির প্রতি জতুগৃহ দাক্ত পাণ্ডবদিগের অস্থি সংস্কারের
ভার্য্যার্পণ করিলেন। ঠিক এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ মতান্ত্রায়াব পিতা দত্তরাজিত
সংহারকারী ভোজগতি শতধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাঁতা করেন।

— শ্রীমহাদেব দত্তশর্ম্মা (H.G.T.)

সাহিত্য-রসভী, পুণাবশ্রাজী (স্বর্ণদক শ্রাপ্ত)

নবদ্বীপ-শহরস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-পরিচালিত শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

(পূর্বাংশকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৫ পৃষ্ঠার পর) :

১০ই চৈত্র, ১৩৮৯ (২৫শে মার্চ, ১৯৮৩) শুক্রবার শ্রীধাম পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর মঙ্গলারতি দর্শন করিয়া পরিক্রমা-পাটী কোলদ্বীপ পাদ-সেবন; ঠাণ্ডা-সমুদ্রগড় যাত্রা করিয়া অভিন্ন ব্রজের বাধাকুণ্ডস্থানে উপস্থিত হন। এখানে শ্রীপাদ কানাই-লাল ব্রহ্মচারী—“রাধে জয় জয় মাধব-দয়িতে”, শ্রীমদ্ ভক্তিবিশ্বহ আশ্রম মহারাজ “শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পদতমলে মন, কেমনে লভিবে চরম শরণ” কীর্তন করেন। আট/নয় হাজার যাত্রীর বসার স্থান না হওয়ায় পরিক্রমা-পাটী সমুদ্র-গড় যাত্রা করেন। এখানে শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী—“এ ভব সংসারে পড়িয়া মানব, না পায় ছুঃখের শেষ” এবং শ্রীপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী “পাইয়া তুর্লভ-জন্ম শ্রীকৃষ্ণভজন বিহু” কীর্তন করেন। কীর্তনান্তে শ্রীল নারায়ণ মহারাজ বক্তৃতা করেন। শ্রীগৌরপার্বদগণের কীর্তন-বিলাস আনন্দান করিবার আশায় সমুদ্র এই স্থানে বাস করেন। এখানে সমুদ্রসেন রাজা রাজত্ব করিতেন। পূর্বে ভগবান্ রাম-নৃসিংহরূপে ভক্তের অতিলম্বিত বর প্রদান ও ভক্তবাহু পূর্ণ করিয়াছিলেন, কিন্তু গোপীগণ যে-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি করিয়াছেন, তদনুরূপভাবে কৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি করিতে পারেন নাই, তাই বলিয়াছেন—“পূর্কি হইতে কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে। যে যৈছে ভঞ্জে কৃষ্ণ তাহে ভঞ্জে তৈসে ॥ কিন্তু অহরূপ না পারে ভজিতে। অতএব ষ্ণী কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥ পঞ্চপাণ্ডব রাজস্বয় যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিয়া অশ্ব ছাড়িয়া দিলে এটখানে সমুদ্রসেন পাণ্ডবের একান্ত বাহুব শ্রীকৃষ্ণের দর্শন মানসে অশ্ব আটকাইয়া ভীমকে বন্দি করেন। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে সমুদ্র-সেন ভীমকে ছাড়িয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন। শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত পর্যটক নরারাজ ধাম-মাহাজ্ঞা কীর্তন করেন। এখান হইতে পরিক্রমাকারী-গণ শ্রীগৌরগদাধর মঠে উপস্থিত হন। শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদ্ ভক্তিবিশ্বহ আশ্রম মহারাজ “বঙ্গুগঞ্জে যদি তব রক্ত পরিহাস” কীর্তন করেন। অতঃ শ্রীআমলকী একাদশীর উপবাস। শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত ত্রিদণ্ডী

মহারাজ বক্তৃতা করেন। শ্রীল নারায়ণ মহারাজ সাধকজীবনের ক্রমবিকাশ, শুদ্ধ জয়দেব-পদ্মবেতীঃ প্রেমসেবা ও চাপাফুলের দ্বারা সজ্জিত শ্রীবিগ্রহ এবং চাপাফুলের ঠাট প্রভৃতির চিত্রিত। দ্বিজ বাণীনাথের গৌরসেবা বর্ণন করেন যথা “ঋতুদীপ সমুদ্রগুড চাপাহাটী গ্রাম। গৌরগদাধর দ্বিজবাণীনাথের প্রাণঃ” গৌরগদাধর মঠ হইতে মধ্যাহ্ন পরিক্রমাণাটী শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করিয়া একাদশীর অমুকল্প গ্রহণ করেন। বৈকাল তটতে কীর্তনানন্দ হয়। সন্ধ্যায় আরতির পর শ্রীনাট্য-মন্দিরে শ্রীগৌরদাম প্রচারিণী সভার অধিবেশন হয়।

উক্ত দিবসে সভাপতির ভাষণে পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত বামন মহারাজ বলেন,—শরণাগতির লক্ষণ, একাদশী বা হরিবাসর বিবির উল্লেখ করিতে গিয়া মির্জালা মানে নিঃ নাস্তি কলম্ যস্তাং সা একাদশী। উপবসতি বা সা উপবাস। রূপ গোস্বামিনাদের “আনুকূল্যস্ত সঙ্কল্পঃ...শ্লোকেব অবতারণা। শ্রীভগবান্ লীলাশক্তি পরায়ণ। লীলা-পুরুষোত্তম শব্দের ব্যাখ্যা। শ্রীভগবানকে ভালবাসিতে আনুকূল্য সঙ্কল্প ও প্রতিকূল ত্যাগের প্রয়োজন। সাধুগুরুর কাছে পরিপ্রশ্নেই যথার্থ কল্যাণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গণের যুগল উপাসনার তাৎপর্য্য। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উপাস্ত শ্রীশ্রীরাধাবিনোদের উপাসনা। যে যথা গাং প্রপদ্যন্তে” শ্লোকাदिতে শুদ্ধ ভগবানের পদস্পর্শ ভাববিনিময় ঘটয়াছে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচিন্তা-পরায়ণা শ্রীরাধা-চিন্তা-নিবিষ্টই শ্রীকৃষ্ণেব স্বীয় অঙ্গবর্ণ চাহাইবার কারণ। অর্থাৎ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ যেমন সেবার প্রতি প্রীতি—আচরণশীল, এখানকার সেবাও তদ্রূপ সেবকের প্রতি করুণা-পরায়ণ। শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ-কারী শ্রীল গুরুপাদগণের ইহাই আনুষ্ঠানিক তত্ত্ব-দর্শন।

১১ই চৈত্র, শনিবার সন্ধ্যায় সভাপতির অধিনে পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ বৃত্ত হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ বিষয় শ্রীভগবান্, তাঁহার ভগবতা ও অংশ-কলাবতাবের পরিচয় দিয়া ভাষণ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত দামোদর মহারাজ সাংস্কৃতিক কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল এবং ভক্তিই জীবের শাস্ত শান্তির হেতু সর্বত্র বক্তৃতা আরম্ভ করেন। পরিশেষে প্রহ্লাদ মহারাজের শ্রবণ-কীর্তনং শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত ন্যাসী মহারাজ মানব-জীবনে ধর্মাচরণ-দ্বারাই মনুষ্যের দাবী রক্ষা করা সম্ভব। ফণ্ডুর দেহধারী জীবের মধ্যে মানব

জীবন দুর্লভ। এ দেখ্‌দ্বারা শ্রীকৃষ্ণভক্তনষ্ট মানব জন্মের সার্থকতা। ভক্তসম্বন্ধেয়, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে জীবাত্মার নিত্য স্বভাব বা স্বৰ্ণ্য। কঠোপনিষদ্ “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য” শ্লোক উদাহরণ দ্বারা বলেন,—একমাত্র সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি ভাষ্যই শরণাগতির দ্বারা লাভ সম্ভব। শ্রীগুরুদেবই সেই সম্প্রদায়নের পরম বাদ্য।

১২ই চৈত্র (২৭শে মার্চ). সন্ধ্যায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিয়ারী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ সভাপতিব আসন অলঙ্কৃত করিলে এই দিবস বিশেষ বক্তৃতা-রূপে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। বিষয়—শ্রীধাম-পরিষ্কৃমা মানব জীবনের সার্থকতা এবং বৈচিত্র্যই দর্শনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রাঞ্জল ভাষায় দার্শনিক দিক্ দর্শন করান।

২য় বক্তা—শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যক্তি মহারাজ। বিষয়—পরদুঃখ-দুখী গুরু-বৈষ্ণবের জীবকল্যাণের যত্ন। ৩য় বক্তা—শ্রীনগীনন্দন ব্রহ্মচারী।

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিবাসর

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিয়ারী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ এই দিবসেও সভাপতিব আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রথম বক্তা ত্রিদণ্ডিয়ারী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর ধাম-প্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য, আদর্শ সেবকগণকে উপাধিদানের সূচন। সভাপতি মহোদয়ের বক্তৃতায় গৌরাবির্ভাবের কথাই এক্ষণ্যতীনতার লক্ষণ, গুরুপরম্পরায়—শিষ্যপরম্পরা ও ভাগবত পরম্পরা দুইটি পদ্ধতি। ত্রীগীতায় গুরুপরম্পরা স্বর্ধাৎ শ্রীকৃষ্ণ, স্বর্ধা মনুকে, মনু ইত্যাকুকে ইত্যাকার দৃষ্ট হয়। শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভায় শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক শ্রীষিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারীকে “কৃতিব্রত” উপাধি দান করেন। পরবর্তী আর এক অবিরোধনে তিনি ধামপ্রচারিণী সভায় সভাগণকর্তৃক “উপদেশক” উপাধি দান করেন। “উপাধি বাধিবের চ” যেখানে, সেখানে উপাধি দানের ব্যবস্থা করেন। ইহা সেবকগণের যোগাতার স্বীকার মাত্র। তিনি সভায় নিম্নোক্ত মানপত্রও ঘোষণা করেন, যথা—

সর্বশ্রী ১। মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী—“রাগভূষণ”, ২। হরিসাধন ব্রহ্মচারী “সেবাব্রত”, ৩। কানাইলাল ব্রহ্মচারী “বাণালঙ্কার”, ৪। কুঞ্জ-

বিহারী ব্রহ্মচারী “ভক্তিপ্রমোদ” ৫। গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী “রাগরত্ন”, ৬।
 শ্রীদামদত্তা ব্রহ্মচারী “সেবাবল্লভ”, ৭। চিত্তগানন্দ ব্রহ্মচারী “ভক্তিবিকাশ”,
 ৮। নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী “বিদ্যাবাগীশ”, ৯। নিতাইদাস ব্রজবাসী
 “সেবসাক্ষর”, ১০। শৈলেন্দ্রগোবর্দ্ধন দাসাদিকারী “সেবাসৌরভ”, ১১।
 দেবকীনন্দন ব্রজবাসী “ভক্তিহুন্দর”, ১২। বজ্রনাভ ব্রজবাসী “ভক্তিপ্রকাশ”,
 ১৩। সারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী “ভিবহরত্ন”, ১৪। কনলাপতি ব্রহ্মচারী “ভক্তি-
 কুসুম”, ১৫। বনোয়ারীলাল সিঙানিয়া “ভক্তিজীবন”, ১৬। অনাদিনাথ দত্ত
 “সেবাবারিধি”, ১৭। শুভানন্দ ব্রজবাসী “সেবাবিলাস”, ১৮। সব্যসাচী
 ব্রহ্মচারী “ভক্তিব্রত”, ১৯। শ্রীযুক্তা উমাবাবী দেবী “ভক্তিমাধুরী”, ২০।
 শ্রীমতী পুর্ণিমা দেবী “ভক্তিলতিকা”, ২১। বলাইচাঁদ ঘোষ “সেবাসুন্দর”।

শ্রীমদ্বৈপথ্যম-পত্রিকার সপ্তম অধিবেশনে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেনোক্ত নারায়ণ
 মহারাজ সভাপতিব আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিশ্ব অংশ্রম মহারাজ
 “শ্রীশ্রী ১৭শ পদ্য”, “জুন হে রাসকরণ কৃষ্ণগণ গগণন,” শ্রীমহামন্ত্র কীর্তন।
 শ্রীল সভাপতি মহোদয়ের মুখবন্ধ। ১ম বক্তা শ্রীশ্রী নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী
 শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বিচার-ধারার কথা উল্লেখ করেন। “ন ধনং ন জনং
 কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে” শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর
 সঙ্গসান্নিধ্যে শ্রীল সনাতন গোস্বামী যে প্রসন্ন করিয়াছেন—“কে আমি, কেন
 মোরে জারে তাপত্রয়? ইহা নাহি জানি মোর কিসে হিত হয় ॥ মহাপ্রভুর
 ভক্তগণ বৈরাগ্য প্রধান। তাঁহারা মণিমানিকোর প্রতি উদাসীন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-
 ভজন সাধনে প্রবীণতা লাভ করেন। ২য় বক্তা—শ্রীসদাশিব ব্রহ্মচারী,
 ৩য় বক্তা—শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী প্রভু ‘জল যে উষ্ণতা নিমিত্ত বাষ্প ও
 শীতলতা নিমিত্ত বরফ’—ইহা নৈমিত্তিক ধর্মের দিগদর্শক বলিয়া বর্ণন করেন।
 তিনি বলেন,—এ উদাহরণ জীবের ক্ষেত্রে যথার্থ, যেহেতু জীব অতি ক্ষুদ্র।
 কিন্তু পরমাত্মায় ইহা সম্ভব নহে, কারণ সমুদ্র অতি বৃহৎ। তিনি জীব-
 স্বল্পপের কথা-প্রসঙ্গে বাদামের দুই আবরণের কথা, শ্রীকৃষ্ণের তিন শক্তির
 কথা যথার্থতঃ জানিলে জীব মাত্রাবদ্ধ হয় না। তদন্তর কীর্তনমুখে সঙ্গার
 কার্য সমাপ্ত হয়।

— শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ দর্শনান্তে বিশেষ কয়েক ব্যক্তির অভিমত

[১]

It is my great fortune to visit Shri Devananda Goudiya Math at Nabadwip and participate in the evening 'Arati' an enlightening experience which will ever remain fresh in my memory. The Math is devoted to spiritual awakening, which is the highest service to humanity, with all humility, it would give a right direction to social work. Without a spiritual base, social work would not be able to achieve any objective.

With prayers to the Lord to lead us all on the path of Bhakti.

Sd.—Nirmala Deshpande,

6. 5. 83

[BRAHMAVIDYAMANDIR,
P. O. Paunar-442111, Maharashtra,]

[২]

আজকের ভারতের কথা মনে রেখে, বড় বেশী করে গৌড়ীয় মঠের কার্যাবলীর প্রয়োজন উপলব্ধি করি। অন্যতন হিন্দুধর্মের প্রচার, বৈষ্ণব-ভাববীরা, ওগবত গাবীনা এবং বৈষ্ণবপ্রেম-জোয়ারে মানুষকে ডরিয়ে দিতে হবে। তারই প্রচেষ্টায় নিয়োজিত এই আশ্রম এবং কংজন গানু মহারাজ।

আমার গতকাল দুপুর থেকে আজ সকাল পর্যন্ত এঁদের মাহাত্ম্য অদ্ভুত লাগল এবং মনের মণিকোঠায় রাখার মর্মেতা ভেট্টা করব। ইচ্ছা রাখি, পরিবারের প্রত্যেককে নিয়ে এবং বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আবার আসব। দেখি, ওগবান্ধু কি করেন !

আশ্রমের দ্বার্ষিক মঙ্গল কামনায় উহার উত্তরোত্তর প্রীতি কামনা করি।

(স্বাঃ) শ্রীকর বন্দ্যোপাধ্যায়

অধিকর্তা, ৭/৫/৮৩

খাদি এবং গ্রানোদক কমিশন, ভারত সরকার ;

কলিকাতা—৭০০০১২

T. No. 26-9491/46-8660

[৩]

In this serene atmosphere I had the occasion to stay for a day. Short was my visit no doubt but the memory of this will remain in my mind for long. The inmates of the Ashram inspite of their pre-occupations were all attention to us.

Religious functions are observed here with devotion and apparent sincerity and no tint of commercialism is to be found in this Ashram.

Sd.—R. N. Mitra

8. 5. 83

[Advocate, Calcutta High Court]

14/1B, Bechu Chatterjee Street,

Calcutta - 700009

সাধুসঙ্গে দক্ষিণ-ভারত দর্শন

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(রেজিষ্টার্ড)

ফোন : এন্-ভি-ডি—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;

জিলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ) ।

যথাবিহিত সম্মানপূর্ব্বকেষু—

আগামী ১০ই কান্তিক, ১৩৯০ (ইং ২৮।১০।৮৩), শুক্রবার
দিবসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে দক্ষিণ ভারত-পরিভ্রমণ
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । উক্ত দিবসে শ্রীবিনোদবিহারী গোড়ীয়
মঠ, ১৮ নং হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৭০০০০৪,
(ফোন : ৫৫-৭২২৭) — ঠিকানা হইতে দিবা ১২টার সময়
আরামপ্রদ (Luxury Bus) মোটরযানে যাত্রা আরম্ভ করিয়া
তীর্থাদি দর্শনান্তে আবার উক্ত ঠিকানাতে যাত্রা সমাপ্ত করা হইবে ।
যাঁহারা সাধুসঙ্গে তীর্থ-দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অবিলম্বে
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তবেদান্ত বামন
গোস্বামী মহারাজের সহিত উল্লিখিত নবদ্বীপ অথবা কলিকাতা
ঠিকানায় পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করতঃ বিস্তারিত নিয়মাবলী অবগত
হইবেন । আসন-সংখ্যা সীমিত, সুতরাং সংরক্ষণে বিলম্ব করিলে
অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হইবে না । ইতি—১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯০ ।

শুদ্ধভক্তকৃপালেশ্য প্রার্থী—

সেবকবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিঃ দ্রঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা পাঠাইতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ, জিলা নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ),—ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য । অনিবার্য
কারণে অনুসরণিকা পরিবর্তন স্বীকার্য্য এবং দৈব-তুর্কিষাকের জন্য কর্তৃপক্ষ বা সমিতি
দায়ী হইবেন না ।

দর্শনীয়া ভীষ্মস্থান :-

১। বামেশ্বর (ক্ষীরচোরা গোপীনাথ, রেঘুনা) ২। ভুবনেশ্বর,
৩। কুর্মাচলম্, ৪। সিংহাচলম্ (জিওড় নৃসিংহ), ৫।
মঙ্গলগিরি (পানানুসিংহ), ৬। মাদ্রাজ, ৭। পক্ষীতীর্থ, ৮।
মহাবলীপুরম্, ৯। পণ্ডিচেরী, ১০। মায়াভরম্, ১১। চিদাম্বরম্
(নটরাজ), ১২। কুম্ভকোণম্, ১৩। তাজোর (বৃহদীশ্বর),
১৪। ত্রিচিনাপল্লী (শ্রীরঙ্গনাথ), ১৫। মাতুরাই (মিনাক্ষীদেবী),
১৬। কামেশ্বরম্, ১৭। ত্রিচুন্দুর, ১৮। শ্রীবৈকুণ্ঠম্, ১৯।
কন্যাকুমারী, ২০। ত্রিভেঙ্গাম্ (অনন্ত পদ্মনাভ), ২১।
বৃদ্ধাচলম্, ২২। শ্রীবিষ্ণুকাঞ্চী, ২৩। শ্রীশিবকাঞ্চী, ২৪।
তিরুপতি বালাঞ্জী, ২৫। রাজমন্ড্রী, ২৬। কভুর, ২৭।
শ্রীপুরীধাম, ২৮। সাক্ষীগোপাল, ২৯। কোণারক, ৩০।
শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচার কেন্দ্র (বাউদপুর) প্রভৃতি ।

—নিয়মাবলী—

- ১। যাত্রিগণকে একবেলা জলখাবার ও দুটবেলা প্রসাদ, বাস-ট্রেনভাড়া,
ধর্মশালায় খরচাদি খাবাদ প্রত্যেককে ৪নং হইতে ২৩নং পর্যন্ত আসনের
জন্য ১১৭৫'০০ (এগারশত পঁচাত্তর) এবং বাকী আসনগুলির জন্য
১০৭৫'০০ (দশশত পঁচাত্তর) টাকা হিসাবে আনুকূল্য দিতে হইবে।
- ২। মোট দেয়-টাকার মধ্যে অগ্রিম ৩০০'০০ (তিনশত) টাকা ১০ই
আশ্বিন, ১৩৯০ (ইং ২৭/৯/৮৩) তারিখের পূর্বে জমা দিয়া আসন
সংরক্ষিত করিবেন। বাকী টাকা যাত্রা-দিবসের ১৫ দিন পূর্বেই
কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে।
- ৩। যাত্রিগণ প্রত্যেককে একটি বাটি, খালা, খুণ হাক্কা ধরনের বিছানাপত্র
(মশারীসহ) লইবেন। বড় স্টুটকেস বা বাক্স সঙ্গে আনিবেন না।
নিজেদের ব্যবহার্য কাপড়, মাছন, সাবান বা প্রয়োজনবোধে টচ-
লাইট ইত্যাদি কাছে রাখিবেন।

জ্ঞাতব্য :- দ্বাদশ বৎসরের কম বয়স্কদিগকে সঙ্গে লওয়া সম্ভব হইবে না।
পূজার্চন-সংক্রান্ত ও পাণ্ডাবিদায় প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ব্যাপার। এই পরিক্রমায় ২২
হইতে ২০ দিন সময় লাগিতে পারে।

ধর্মঃ স্থাপিতঃ পুংসাং বিধুসেন-কথাস্থ যঃ ॥	<p style="text-align: center;">স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়ান্না সুপ্রসীদতি ॥</p>	নোংশাদয়েদ্ যদি রতিং ভ্রম এব হি কেবলম্ ॥
---	---	--

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ।

অন্য ধর্ম হৃষ্টরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার রতি নৈলে পও সেই ভ্রম ।

৩৫শ বর্ষ	২২ বামন, বাসুদেব, ৪৯৭ গৌরাক ৩২ আষাঢ়, রবিবার, ১৩৯০; ইং ১৭৭৭/১৯৮৩	মে সংখ্যা
----------	---	-----------

সান্ন্যাসাদং

শ্রীচৈতন্যশতকম্

[শ্রীমৎ সার্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতম্]

জীবে পূর্ণ-দয়া যতঃ করুণয়া হা হা রতৈঃ প্রার্থনাং
 হে হে কৃষ্ণ কৃপানিধে ভগমহাদাবাগ্নি-দন্ধান্-জনান্ ।
 ত্রাহি ত্রাহি মহাপ্রভো স্বকৃপয়া ভক্তিং নিজাং দেহি মাং
 এবং গৌরহরেঃ সদা প্রকুরুতে দীনৈকমাখঃ প্রভুঃ ॥৬৩।

। দীনজনের একমাত্র স্বামী ও প্রভু শ্রীগৌরহরি জীবের প্রতি পূর্ণ দয়া-বশতঃ 'হা'- 'হা'-রবে কাতরস্বরে শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—
 "হে মহাপ্রভো! হে কৃপাসমুদ্র! সংসার-দাবানল-দগ্ধ জীবগণকে ত্রাণ করুন এবং কৃপাপূর্ণক আগনার নিমিত্তিক আমাকে দান করুন ॥৬৩।

বিষয়-চিন্তান্ কলিপাপ-ভীতান্
 সংবীক্ষ্য গৌরো হরিনামমন্ত্রম্ ।
 স্বয়ং দদৌ ভক্তজনান্ সমাদিশৎ
 কুরুষ সঙ্কীৰ্ত্তন-নৃত্য-বাছান্ ॥৬৪॥

কলিপাপভীত বিষয়চিন্তা জনগণকে দর্শন করত শ্রীগৌরচন্দ্র স্বয়ং তাহা-
 নিগকে হরিনাম-মন্ত্র দান করিলেন এবং ভক্তগণকে নৃত্য ও বাছের সহিত
 সঙ্কীৰ্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন ॥৬৪॥

হরেমুষ্টিং সুরূপাঙ্গং ত্রিভঙ্গ-মধুরাকৃতিম্ ।
 ইতি গৌরো বদেত্তক্তান্ স্থাপয়স্ব গৃহে গৃহে ॥৬৫॥

শ্রীগৌরচন্দ্র ভক্তদিগকে বলিলেন,—“ত্রিভঙ্গ-সুন্দর মধুরাকৃতিবিশিষ্ট কৃষ্ণ-
 মুষ্টি প্রতিগৃহে স্থাপন কর ” ॥৬৫॥

সুশোণপদ পত্রাঙ্কঃ সুবিদ্বাধরপল্লবৈঃ ।
 সুনাসাপুটলালিত্যং গৌরচন্দ্র নমোহস্ত তে ॥৬৬॥

রক্তকমল-লোচন, বিহ্বলসদৃশ অধরপল্লব ও সুন্দর নাসিকাযুক্ত হে
 গৌরচন্দ্র ! আপনাকে নমস্কার জানাই ॥৬৬॥

কন্দৰ্প-কোটি-লাবণ্য-কোটিচন্দ্রাননভিষে ।
 কোটিকাঞ্চন-পুষ্পাভ গৌরচন্দ্র নমোহস্ত তে ॥৬৭॥

কোটি কামদেবতুল্য সৌন্দর্য্য, কোটি স্বর্ণপুষ্পাভাযুক্ত হে গৌরচন্দ্র !
 আপনাকে নমস্কার করি ॥৬৭॥

সুমুক্তাদস্তপঙ্ক্ত্যভো হাস্যশোভা-শুভাকরম্ ।
 সিংহগ্রীব-লসৎকণ্ঠ গৌরচন্দ্র নমোহস্ত তে ॥৬৮॥

সুন্দর মুক্তাসদৃশ দত্তরাজিমণ্ডিত, মঙ্গলপ্রদ হাস্যযুক্ত ও সিংহের ন্যায়
 গ্রীব ও উজ্জল কণ্ঠবিশিষ্ট হে গৌরচন্দ্র ! আপনাকে প্রণাম জানাই ॥৬৮॥

মল্লিমালোল্লসদ্বক্ষঃ কর্ণালম্বিত মোক্তিকাঃ ।
 কঙ্কণাঙ্গদ-সংযুক্ত মহাভূজ নমোহস্ত তে ॥৬৯॥

বক্ষঃস্থলোপরি মল্লিকামালা সুষোভিত, কর্ণদ্বয় মোক্তিকবচিত ও কঙ্কণ-
 অঙ্গদযুক্ত হে মহাবাহো ! আপনাকে প্রণাম করি ॥৬৯॥

মৃগেন্দ্র-মধ্য-কঙ্কাল-জানু-রক্তাতিসুন্দর ।
 কূৰ্ম্মপৃষ্ঠ-পদদ্বন্দ্ব গৌরচন্দ্র নমোহস্ত তে ॥৭০॥

সিংহসদৃশ কটিদেশযুক্ত, কদম্বীকণ্ঠের ছায়া সুন্দর জাহ্নবিশিষ্ট ও কচ্ছপ-
পৃষ্ঠতুল্য দৃঢ় পদযুগলায়িত হে গৌরচন্দ্র ! আপনাকে নমস্কার জানাই ॥৭০॥

আশ্রয়ং তব পাদাক্ষং কলিকা-চম্পকাজুঙ্গম ।

কৃপাং কুরু দয়ানাথ গৌরচন্দ্র নমোহস্ত তে ॥৭১॥

আপনার পাদপদ্ম ও চম্পককলিকাসদৃশ অঙ্গুণীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ।
হে কৃপালু গৌরচন্দ্র ! আমাকে কৃপা করুন । আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥৭১॥

নখপঙ্ক্তি-জিতানেক-মানিকা-মুকুরহাতে ।

চরণে শরণং যাচে গৌরচন্দ্র নমোহস্ত তে ॥৭২॥

বহু মানিকা-দর্পণের ছাতিহরণকারী নখশ্রেণীযুক্ত আপনার চরণে আশ্রয়
প্রার্থনা করিতেছি । হে গৌরচন্দ্র ! আপনাকে প্রণাম জানাই ॥৭২॥

ধ্বজবজ্রাঙ্কিতে পাদপদ্মেহং শরণংগতঃ ।

করিষ্যতি যমঃ কিং মে গৌরচন্দ্র নমোহস্ত তে ॥৭৩॥

যে গৌরচন্দ্রের পাদপদ্ম ধ্বজ-বজ্রাঙ্কিত সেই চরণে আমি শরণ লইলাম ।
যম আমায় কি করিবে ? হে গৌরচন্দ্র ! আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥৭৩॥

শত-শত পতিতানাং ত্রাণকর্তা প্রভুত্বং

কথমপি কিমু দোষে বঞ্চিতোহং প্রপন্নঃ ।

কলিভয়-কৃতভীতং ত্রাহি মাং দীনবন্ধো

শরণাগত-গতিত্বং কিং ক্রবে গৌরচন্দ্র ॥৭৪॥

হে গৌরচন্দ্র ! আপনি শত-শত পতিতের উদ্ধারকর্তা ও প্রভু । এই
শরণাগত কেন এবং কোন্ দোষে ত্রাণে বঞ্চিত ? হে দীনবন্ধো ! আপনিই
শরণাগতের একমাত্র গতি । আমি কলিভয়ে ভীত, আমাকে উদ্ধার করুন ।
হে গৌরচন্দ্র ! আমি আর কি বলিব ॥৭৪॥

কিমদ্ভুতং গৌরহরি চরিত্রং

নামোপদেশাঙ্কুরিমাশ্রয়ন্তি ।

নৃত্যন্তি গায়ন্তি রুদন্তি লোকা

রটন্তি অর্থান্ হরিভক্তিবৃদ্ধাঃ ॥৭৫॥

শ্রীগৌরহরির কি অদ্ভুত চরিত্র ! তিনি শোকসমুদ্রে নামোপদেশ
করিতেই তাহার। শ্রীহরিকে আশ্রয়পূর্বক ভক্তিবৃদ্ধ হইয়া কখনও নৃত্য, কখনও
গীত, কখনও ক্রন্দন ও নাম জপ করিতেছে ॥৭৫॥

নিরন্তরঃ কৃষ্ণকথা পরস্পরং

সুভক্তিদং নাম হরের্বদন্তি বৈ ।

জল্পন্তি লোকা ভুবি ভাববিস্ময়া

গৌরেহবতীর্ণে কলিপাপনাশকে ॥৭৬॥

কলিপাপনাশক শ্রীগৌরচরিত্রি এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার পর মহামুগ-
গণ নিরন্তর পরস্পর কৃষ্ণকথা ও সুভক্তিদাতা চরিত্রনাম করিতে থাকে এবং
ভাবে বিস্তার হইয়া সংসারে নাম-জল্পনায় দিনযাপন করে ॥৭৬॥

সত্য-ব্রহ্মা-দ্বাপরেষু যজ্ঞ-ধ্যান-তপঃ-ব্রতৈঃ ।

কেমাং কেমাং ফলং জাতং ধর্মবিধানতঃ ॥৭৭॥

কথো শ্রীগৌরকুপয়া নামমাত্রৈকজল্পকাঃ ।

কৃষ্ণসান্নিধ্য-সংপ্রাপ্তা প্রেমভক্তিপরায়ণাঃ ॥৭৮॥

সত্য-ব্রহ্মা-দ্বাপরযুগে ধ্যান-যজ্ঞ-তপস্তা ও ব্রতদ্বারা ধর্মবিধানসারে
কাহারও ফল প্রাপ্তি হইত, কিন্তু কলিযুগে শ্রীগৌরচরিত্রি কুপায় প্রেমভক্তি-
পরায়ণ হইয়া কেবল নামজনদ্বারা কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভ করা যায় ॥৭৭-৭৮॥

জ্ঞান-ব্রহ্মা-দ্বাপরেষু যজ্ঞ-ধ্যান-তপঃ-ব্রতৈঃ ।

হরেকৃষ্ণ হরে-নামমালা-ভক্তিপ্রদায়িনী ॥৭৯॥

ভক্তিপ্রদায়িনী 'হরেকৃষ্ণ' 'হরেবাম'-নামমালা শ্রীচৈতন্যদেব এই ব্রহ্মাণ্ডে
সম্যগ্ভাবে আনিধাছেন ॥৭৯॥

জল্পন্তি হরিনামানি চৈতন্যজ্ঞানরূপতঃ ।

ভজন্তি বৈষ্ণবা যে তু তে গচ্ছন্তি হরেঃপদম্ ॥৮০॥

যে-সকল বৈষ্ণব শ্রীচৈতন্যদেবের কথাছসারে হরিনাম জপ ও ভজন
করেন, তাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে পৌঁছিয়া থাকেন ॥৮০॥

শ্রবন্তি যে বৈ গুরুতত্ত্বগাথাং গায়ন্তি যত্রে ইহিনামমন্ত্রম্ ।

পূজন্তি সাধু-গুরু-দেবতাঞ্চ চৈতন্যভক্তাঃ কলিকালমধ্যে ॥৮১॥

বাহারা গুজ্জয় তত্ত্বকথা শ্রবণ করেন, বাহারা যত্নপূর্বক হরিনামকল্পী মন্ত্র
গান করেন এবং সাধু-গুরু-দেবতার পূজা করেন, তাঁহরাই কলিযুগে শ্রীচৈতন্য
মহাপ্রভুর ভক্ত হইয়া থাকেন ॥৮১॥ (ক্রমশঃ)

সজ্জন—মূহ (৭)

বিষয়ীর হৃদয় তর্ক-কঠিন, মূহ নহে

বিষয়ী বিষয় সেবায় কঠিন হৃদয়। বিষয়ের স্বাত-প্রতিঘাতে তাঁহার চিত্তের
আদৌ কোমলতা নাই। বিষয়ের ক্লেশগুলির তীব্র কটাক্ষ সহ্য করিতে গিয়া
তাঁহার হৃদয় দিন দিন কঠিন হইতে কঠিনতর হয়। অজ্ঞান বা মূর্খতা তাঁহাকে
পদে পদে বিপন্ন করে দেখিয়া তিনি নানাপ্রকার কঠোর আত্মজ্ঞানব্রতে
পারদর্শিতা লাভের চেষ্টা করেন। নানাপ্রকার অসুবিধা ও অভাবে জর্জরিত
হইয়া উদ্ধতা শিক্ষা করিয়া কোমলতা বর্জিত হন। তর্ক বিতর্ক শিক্ষা করিয়া
হৃদয়কে কঠিন করেন এবং স্থানাস্থান বিচার না করিয়া তাকিককেশরী হইয়া
বিজয়াকাজক্ষা করেন। অতীর বাবহারাবলীতে ক্ষুব্ধ হইয়া পরদ্রোহময় ভাবে
নানা অনর্থ ও অশ্রিয় অহুষ্ঠানের আবাচন করেন। হরিপরাধণগণের হৃদয়
সেক্রপ নহে। তাঁহার মূহ।

ভগবান্ মূহুত্বের উৎস, তাঁহারই গুণ-চেষ্টার
প্রাবল্যহেতু সজ্জনও মূহ

ভগবান্ বিষয়ীর নিকট বজ্রের স্থায় কঠিন হইলেও সজ্জনের নিকট কুণ্ডলম
অপেক্ষাও মূহ। বিচারকের নিকট চঠকারী বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিলেও
তাঁহার মধুরিমা স্নেহোন্মত্ত হৃদয় সাধুর নিকট পরম কমণীয়। ভগবানের পরম
মনোজ্ঞ কমণীয়তা প্রভাবে তাঁহার নিঃপ্রাণিত তদীয়গণে মূহুত্বের উৎস সর্বদাই
ধিরাজ্য করে। সেই সজ্জনগণের সাধন-প্রণালীতে অনর্থমিবৃত্ত অবস্থায় ভাবের
সমাগমে ওড়বিষয়ে ক্ষান্তি বলিয়া একটি অবস্থা লক্ষিত হয়। ভগবদ্-বিষয়িনী
কুচি দ্বারা সাংকের চিত্ত সর্বদাই আর্দ্র। অনর্থমুক্ত সজ্জন-শুদ্ধসত্তা
বিশেষাশ্রম্য। ভগবদ্ বিষয় ও তাঁহার আশ্রয়বলধনের সম্বন্ধ তাঁহার হৃদয়ে
অষ্টুভাবে উদ্ভিত। বিষয়াশ্রয় পরস্পরের উদ্ধীপনীয় ভাবসমূহে চিত্ত
আপ্লুত। ভগবানের গুণ এবং চেষ্টা প্রবল হওয়ায় হৃদয় মূহুভাববিশিষ্ট।

অষ্টসাত্ত্বিকাদি ভাবও মূহুত্বের পরিচায়ক

সেই মূহুত্বের অববোধক চিত্তের ভাবপ্রকাশকারী অহুষ্ঠানসমূহ তাঁহার
কার্য্যরূপে প্রকাশ পায়। সজ্জনের কণটিকা বহিত গান ও গুণাদিকে অপূর্ণ

কোমলতা দেখা যায়। অপ্রাকৃত হরিভাবদ্বারা চিত্তের আক্রমণকেই সত্ত্ব বলে। এতাদৃশ শুদ্ধ সত্ত্ব হইতে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উদয়। আবার বিশেষতঃ স্থায়ীভাবে কুস্মরতিকে অভিমুখী করিয়া বাক্য ও অঙ্গাদিতে বিচরণ করিয়া ত্রয়স্রিংশস্তাবের প্রকাশ করায়। কোন কালেই সাধুর চিত্তবৃত্তিতে আদ্র ভাবের অভাব নাই।

অসৎসজ্জত্যাগকালে সজ্জনের কঠোরতাও মৃদুতা

সজ্জন নিত্যকাল মৃদু। সাধন কালে হরিবিরোধিতার শয্যের দুঃসঙ্গ ত্যাগ বাসনায় তিনি যে সকল অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকেন তাহা কঠিনহৃদয় বিষয়ীঃ দৃষ্টিতে মৃদুত্বের অভাব জ্ঞাপন করিলেও বাস্তবিক সেকালেও তিনি মৃদুভাব বর্জিত নহেন। পরম মৃদু গৌরচরির আশ্রিতত্বনে সর্বকাল মৃদু স্বভাব আছে। কঠিন সামাজিকগণের অসম্ভাবহাররূপ দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিতে গিয়াও অন্তঃস্থিত নৈমগ্নিক কোমলতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না। সজ্জন ব্যতীত অণ্ডে কখনই মৃদু হইতে পারে না। অসম্ভাবিত কোনকালে মৃদু নহে।

শুচি (৮)

অন্যাভিলাষী, কন্ম্যী, জ্ঞানের রুচিভেদে ‘শুচি’র বিভিন্ন ধারণার সজ্জনের মতানৈক্য

রুচিভেদে শুচির ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। যাহাকে কেহ শুচি বলিয়া আখ্যা দেন, তাহাই অপরের বিচারে অশুচি বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। অন্যাভিলাষী যাহাকে পবিত্র বোধে শুচি বলিয়া নির্ণয় করেন, তাহা ভগবদ্ভক্ত বীকার করিতে পারেন না। কন্মিগণ যাহাকে শুচি বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহাও সজ্জনের শুচি সংজ্ঞার সহিত একত্ব লাভ করেন না। অহংগ্রহোপাসক নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানীর মতে যাহা শুচি, তাহাই সজ্জনের বিচারে অপবিত্র বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। কন্ম ও জ্ঞান-শাস্ত্রের সদাচারকে সজ্জনগণ শুচি বলিতে বাধ্য নহেন। অন্যাভিলাষীর স্বার্থ, কন্ম্যীর ফলভোগ-পিপাসা, জ্ঞানীর ত্যজনেচ্ছা—ভক্তের নিকট সমভাবে আদৃত হয় না।

দেশ-কাল-পাত্রভেদে শুচি-অশুচির বিচার

সজ্জনগণ বলেন,—অসজ্জনের রুচির বশবর্তী হইয়া তাঁহারা শুচি বিষয়ে নির্দেশ করিতে বাধ্য নহেন। যে-স্থানে হরিকথার প্রসঙ্গ নাট, সেট স্থানই

অশুচি ; যে-কালে হরি-সেবন নাই, সেই কালই অশুদ্ধ ; যে পাত্র ভজনের অন্ত্যে বিরত, তিনিই অশুচি। পরমপবিত্র মহাভারতের, রামায়ণের ও বেদের আদি, মধ্য ও অন্ত্যভাগে হরি সর্বত্রই গীত হইল। এই সকল পবিত্র গ্রন্থে হরি-গুণগানের কথা আছে বলিয়া এই সকল শাস্ত্রই পবিত্র এবং এই সকল শাস্ত্র পাঠ করিয়া জীবগণ ধৃত হইলেন।

ভগবৎ-প্রসঙ্গহীন কৃষ্ণেতর বিষয়ই অশুচি ; ভগবানই একমাত্র সর্বশুচির মূলধার

সজ্জনগণ বলেন,—যেখানে হরি-কথার আদর নাই, সেই অশুচি অবস্থান করে, সজ্জনগণ সর্বদা তাঁহাদের সকল চেষ্টায় হরিকে বিষয়-রূপে বরণ করেন। যে-স্থলে হরি বিষয় নহেন, যে-স্থলে সজ্জনগণের দৃষ্টিতে শুচি লক্ষিত হয় না। কৃষ্ণেতর বিষয়ে সাধুগণ সর্বদা অশুচি জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন। ভগবানই একমাত্র সর্বশুচির আধার। যেখানে ভগবৎ-প্রসঙ্গের অভাব, তাহাই অশুচিপূর্ণ বিষয়। মাঘিক দর্শনে কম্বী জল, অগ্নি ও সূর্য্যে শুচিত্ব আরোপ করেন, বস্তুতঃ তাহাকে হরি-সম্বন্ধ না দেখিলে এইগুলি কখনই শুচির বিষয় হইতে পারে না।

লৌকিক-ব্যবহারিক তারতম্যে শুচি-অশুচির ধারণা তাৎকালিক ; ভগবদ্ভুক্ত সজ্জন সর্বোত্তোভাবে শৌচগুণে পরিপূর্ণ

সজ্জনগণ বলেন,—কৃষ্ণেতর বিষয়ই অশুচির বাধান। কৃষ্ণই সকল শুচির কেন্দ্র এবং কৃষ্ণভক্তই বাস্তবিক শৌচগুণে পূর্ণ। কলা, মূলা, খোড়ের শুচি-অশুচি বিচার, আতপ ও উষের শুচি-অশুচি ধারণা প্রভৃতি নানাপ্রকার ভেদ শুচি-বিচারে অবতারণিত হয়। কিন্তু সজ্জনগণ হরি-সম্বন্ধি-বস্তুতে শুচি এবং হরি-সেবার প্রতিকূল বস্তুগুলিকে অশুচি বলিয়া জানেন। বর্ণের বিচারে, লৌকিক ব্যবহারের তারতম্যে শুচি-অশুচির ধারণাগুলি তাৎকালিক ; বৈষ্ণবের নিত্য ধারণা সর্বোত্তোভাবে শৌচাচার-পুষ্ট।

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ

ভক্তিতত্ত্ববিবেক — তৃতীয় প্রবন্ধ

ভক্তির স্বভাব-বিবেক *

গুরুভক্তি-স্বভাবস্ত প্রভাবান্ যৎপদাশ্রয়াৎ ।

সদৈব লভতে জীবন্তং চৈতন্যমহং ভজে ॥

গুরুভক্তিঃ ছয়টি স্বভাব। ভক্তি স্বভাবতঃ ক্লেশঘ্নী, গুণদা, মোক্ষ-
লব্ধ্যাক্ষয়, সুহৃৎপ্ৰীতি, সাক্ষানন্দ-বিশেষায়া ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী। সাধনাবস্থায়
ভক্তির কেবল প্রথম দুইটি গুণ লক্ষিত হয়, তাবাবস্থায় প্রথম চারিটি গুণ
লক্ষিত হয় এবং প্রেমাবস্থায় উক্ত ছয়টি গুণই লক্ষিত হয়। ভক্তির স্বভাবগত
ছয়টি গুণ আমরা আত্মপূর্বিক বিচার করিতেছি।

(১) ভক্তি ক্লেশঘ্নী। যিনি গুরুভক্তিকে আশ্রয় করেন, ভক্তি স্বভাব-
প্রভাবে তাঁহার সমস্ত ক্লেশ নাশ করেন। ক্লেশ তিনি প্রকার; যথা
শ্রীকৃষ্ণবাক্য,—ক্লেশাস্ত পাপং তদ্বীজমবিজ্ঞা চেতি তদ্বিধা।

পাপ, পাপবীজ অর্থাৎ বাসনা ও অবিজ্ঞা—এই তিনপ্রকার জীবের ক্লেশ।
জীব জন্ম জন্মান্তরে যে-সমস্ত পাপ করিয়াছেন ও করিবেন সে-সমুদয় পাপ
দ্বারা জীবের কষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামূর্তের দ্বিতীয় দৃষ্টি, পঞ্চম দ্বারায় প্রধান
প্রধান পাপ-সকল নির্ণীত হইয়াছে। ঐ সমস্ত জীবকৃত পাপ দুই ভাগে
বিভক্ত হয়, অর্থাৎ অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ। তথা শ্রীকৃষ্ণবাক্য,—

অপ্রারব্ধং ভবেৎ পাপং প্রারব্ধং চেতি তদ্বিধা।

কোন একটি জন্ম লাভ করিয়া সেই জন্মে জীব যে-পাপগুলি ভোগ করিতে
বাধ্য হন, সেইগুলি প্রারব্ধ পাপ। অন্যত্র ভাবী জন্মের ভোগের জন্ত যে
যে-সকল পাপ অবশিষ্ট থাকে, সে-সকল পাপকে অপ্রারব্ধ বলে। জন্মে জন্মে
জীব যে-সকল পাপাচরণ করেন সে-সমুদয় পূর্বকৃত অপ্রারব্ধ পাপের মধো
পরিগণিত হইয়া ভাবী জন্ম-সময়ে প্রারব্ধ হইয়া পড়ে। এই প্রকার অনাদি
বিধি-দ্বারা জীব জন্মে জন্মে নিত্যকৃত পাপ-কল অবশ্য ভোগ করিয়া থাকেন।
ব্রাহ্মণ-জন্ম, যবন-জন্ম, ধনীলোকের গৃহে জন্ম, জন্মকালীন সৌন্দর্য্য ইত্যাদি
সমস্ত প্রারব্ধ কর্মফল; তন্মধ্যে যবন-জন্ম ইত্যাদি প্রারব্ধ পাপ। ভক্তি

* এই প্রবন্ধটী শ্রীশ্রীবিষ্ণুভৈরব সভায় ১২৯৩ বঙ্গাব্দ, ১লা কা্তিক,
১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে পঠিত হয়।

প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ উভয়বিধ পাপকে ধ্বংস করেন। জ্ঞান স্তম্ভরূপে কৃত হইলে কেবল অপ্রারব্ধ কর্ম নাশ করে, প্রারব্ধ কর্ম জ্ঞানীদিগের শাস্ত্রমতে অবশ্য ভোক্তব্য। ভক্তির প্রারব্ধ-হরত্ব-ধর্ম ভাগবতে কথিত হইয়াছে,—

যদ্ব্যমধেষ্য-শ্রবণানু কীর্ত্তনাং যৎপ্রহ্লাধাং শ্রবণাদপি কচিৎ ।

শ্রাদোহপি সত্যঃ সর্বনাশ কল্পতে কৃতঃ পুণ্যন্তে ভগবদ্দর্শনাং ।

হে ভগবন্, যখন তোমার নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, তোমার নমস্কার ও তোমার স্মরণ করিলে চণ্ডালেরও সৃষ্টি অর্থাৎ জগৎকর অপেক্ষা না করিয়া সর্বনাশ করণ-যোগ্যতা লাভ হয় অর্থাৎ ত্রাক্ষণাদিকার প্রাপ্তি হয়, তখন তোমার দর্শনে যে কি লাভ হয়, তাহা বলা যায় না। এতুলে দুর্জাতিক্রম প্রারব্ধ পাপ নাশ ভক্তির স্বভাব বলিয়া উক্ত হইল।

ভক্তির অপ্রারব্ধ-হরত্ব-ধর্ম পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে,—

অপ্রারব্ধ-ফলং পাপং কুটং বীজং ফলোন্মুখম্ ।

ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তি-রতাত্মনাম্ ॥

ঐহাদের বিষ্ণুভক্তিতে একান্ত অনুরাগ আছে, ঐহাদের অপ্রারব্ধ পাপ, কুট অর্থাৎ বীজত্ব-লাভে-মুখ অর্থাৎ যে-সকল অজ্ঞিত পাপ কেবল বীজত্ব অর্থাৎ বাসনাময় প্রাপ্ত হইতেছে, বীজ অর্থাৎ বাসনাময় পাপ ও ফলোন্মুখ অর্থাৎ প্রারব্ধ সেই সমস্তই ক্রমশঃ লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব ভক্তি পাপের সর্ব-অবস্থাতেই তমাশক, ইহা লক্ষিত হইবে। ভক্তদিগের পাপ নাশের জন্ত কর্ম বা জ্ঞানময় প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনীয়তা নাই।

জীবের হৃদয়ে যে পাপ-বাসনা তাহাকেই পাপবীজ বলে। সেই পাপবীজ কেবল ভক্তিদ্বারাই নষ্ট হয়; যথা শ্রীভাগবতে,—

তৈস্তান্যঘানি পুণ্যন্তে তপোদান-ব্রতাদিভিঃ ।

নাধর্মজং তদুদয়ং তদপীশাজি-সেবয়া ॥

ধর্মশাস্ত্রে সামান্য কর্মমার্গে যে কচ্ছু-চান্দ্রায়ণাদি-ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত এবং শাস্ত্রান্তরে তপঃ ও দান দ্বারা যে পাপনাশের ব্যবস্থা আছে, সে-সকল প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই সেই পাপমাত্রই ক্ষয় হয়, কিন্তু পাপসকলের বীজ যে অবিদ্যাজাত পাপ-বাসনা তাহা ঐ সকল প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ক্ষয় বা শোধিত হয় না। তাহা কেবল কৃষ্ণপদ-সেবা দ্বারাই হইয়া থাকে অর্থাৎ ভক্তি ব্যতীত আর কেহই পাপবীজরূপ হৃদয়-বাসনা দূর করিতে পারে না। ভক্তিদেবী হৃদয়ে আসীন হইলে পাপ-বাসনা পুণ্য-বাসনার সহিত সমূলে তাড়িত হয়।

ভক্তির অবিদ্যাহরত্ব গল্পপুর্বাণে ও ভাগবতে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে বিচারিত হইয়াছে,—

কভামুখাতা বিদ্যাভিচারি ভক্তিরনুভূতা ।

অবিদ্যাং নির্দোষ্যাত্ত দাবজ্যাশেষ পন্নগীম্ ॥

হরিভক্তি যখন হৃদয়ে আসেন, তখন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিদ্যাশক্তি আসিয়া দাবানলে বনস্থ সর্গিনীর স্থায় জীব-হৃদয়গত অবিদ্যাকে সহসা দগ্ধ করিয়া ফেলেন ।

যৎপাদ-পদ্ম-পলাশ-বিলাস-ভক্তিা

কর্মাশ্রয়ং স্থিতিমুদগুং যন্তি সন্তঃ ।

ভুত্ব রিক্তমকমো যতয়ো নিকৃদা—

শ্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাপ্তদেবম্ ॥

জীব-হৃদয়ে অহঙ্কাররূপ হৃদয়-গ্রাস্তিকে নির্বিষয়-মতি যতিগণ সমস্ত ইন্দ্রিয়-গণকে নিকৃদ করিয়াও সেক্ষপ উন্মোচন করিতে পারেন না, যেহেতু ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-পলাশ-বিলাস-ভক্তিদ্বারা সহজে করিয়া থাকেন । অতএব সেই আশ্রয়রূপ শ্রীকৃষ্ণকেই ভজন কর ।

জ্ঞান-চেষ্টাদ্বারা কথঞ্চিং অবিদ্যানাশ হইলেও ভক্তি ব্যতীত নিরাশ্রিত সাধকের অবশ্য পতন হয় । যথা, শ্রীভাগবতে দশমে,—

যেহতেরবিন্দাক্ষ বিমুক্ত-মানিনস্ত্যাস্তভাবাবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ ।

আক্লব্ব কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যারোহনাদৃত-যুগ্মদজ্জ্বয়ঃ ॥

হে অরবিন্দাক্ষ ! যাহারা জ্ঞানমার্গে 'উহা নয়, ইহা নয়' করিয়া জড়াতিরিক্ত অবস্থা লাভ করত আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের ভক্তিহীন-বুদ্ধি অবিভূদ, অতএব অনেক ক্লেশে অবিদ্যা অতিক্রম করত ব্রহ্মরূপ পরমপদ লাভ করিয়া তোমার পাদপদ্মের নিত্য আশ্রয় অভাবে পুনরায় অধঃপতন লাভ করেন ।

হে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ! অবিদ্যার নাম শ্রবণ করিবামাত্র আপনাদের অবিদ্যার স্বরূপ জামিনার ইচ্ছা জন্মিয়া থাকিবে । তজ্জন্ত আমি অবিদ্যা সম্বন্ধে আর ছই একটী কথা বলিব । শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি । তদ্বোধো চিহ্নজি, জীবশক্তি ও মায়াক্রিয়—এই তিনটি আমাদের নিকট প্রধানরূপে পরিচিত । চিহ্নজি হইতে ভগবদ্ধাম, ভগবল্লীলা ও ভগবল্লীলোপকরণ সমুদয় প্রকাশিত হয় । চিহ্নজির অগ্রতম নাম বক্রপশক্তি । জীবশক্তি হইতে অনন্ত

জীবের উদয়। জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধ চিত্তত্ব, কিন্তু পূর্ণতা-অভাবে মায়ী-প্রবণ,—
মায়ামুক্ত ন'ন। ইচ্ছা করিলে কৃষ্ণবহির্গুণতা-ক্রমে মায়ার বশতাপন্ন লাভ
করেন। ইচ্ছা করিলে কৃষ্ণ-সামুখ্য-সহকারে মায়ী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র
থাকেন। ইহাই ব্রহ্ম ও মুক্তদীপের পার্থক্য। বদ্ধাবস্থায় জীব মায়ার
বশতাপন্ন হইয়া মায়ায় দুইটী প্রভাব অর্থাৎ বিজ্ঞা-প্রভাব ও অবিজ্ঞা-প্রভাব, ঐ
দুয়ের মধ্যে অবিজ্ঞা প্রভাবদ্বারা স্বরূপ আবৃত হইয়। চিৎস্বরূপ গুহ্যবিজ্ঞা-প্রভূত
অবস্থারকে পরিত্যাগপূর্বক অবিজ্ঞা-প্রভূত জড়তত্ত্বে আত্মাভিমানরূপ
বিকৃতভাবকে যৌকার করিতে বাধ্য হন। এই অবিজ্ঞা-বন্ধনই জীবের
বদ্ধাবস্থা-প্রাপ্তি। অবিজ্ঞামুক্ত হইলে জীব নিকপাধিক হইয়া মুক্তাবস্থা লাভ
করেন। অতএব অবিজ্ঞা আর কিছুই নয়, কেবল জীবের স্বরূপ-বিস্ময়কারিণী
মায়ী-প্রবৃত্তি-বিশেষ। অবিজ্ঞা হইতেই জীবের কৰ্ম্ম-বাসনা; জীবের
কৰ্ম্মবাসনা হইতেই পাপ-পুণ্য ক্রিয়া। এই অবিজ্ঞাই জীবের সমস্ত ক্লেশের
আকর। একমাত্র ভক্তিই অবিজ্ঞা নাশ করিতে সক্ষম। কৰ্ম্ম পাপমাত্র নাশ
করিতে পারে। জ্ঞান পাপ-পুণ্য উভয়ের মূল বাসনাকে নাশ করিতে পারে।
কিন্তু ভক্তি পাপকে, পাপ-পুণ্যের বীজ-বাসনাকে এবং বাসনার জননী—
অবিজ্ঞাকে সমূলে নাশ করিতে পারেন। (ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম

ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহার বেদান্ত-দর্শন বা ব্রহ্মসূত্রে প্রথম সূত্রের
অবতারণা করিলেন, ‘অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা’। এই যে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার
প্রয়োজন—ইহা উপনিষদের কথা। পুনঃ পুনঃ ইহা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে।
‘যো বৈ ভূমা তং স্বং নাস্তং স্বখমস্তি, ভূমৈব স্বং ভূমঃস্তেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ’
যিনি ভূমা তিনি স্বংস্বরূপ, তদতিরিক্ত স্বখ নাই। তিনিই স্বখ, তিনিই
জিজ্ঞাস্ত। ‘অন্যত্র বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো
মৈত্রেয়ি’, অর্থাৎ হে মৈত্রেয়ি, আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও শ্রুত বিষয়
একতানে পুনঃ পুনঃ প্রগাঢ়ভাবে ধ্যাতব্য। ‘যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,
যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব’ অর্থাৎ যাহা

হইতে এই ভূতসকল জন্মে, জাত ভূতগণ যাঁহাদ্বারা জীবন ধারণ করে, প্রাণে যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা কর।

এক্ষণে এই পরতত্ত্ব ব্রহ্মবস্তু কি প্রকাৰ, ভাঙা অল্পসন্ধান করিতে হইবে। উপনিষদসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায়, বহুপ্রকারে নানাবিধভাবে, নানা দিক দিয়া নানা ভূমিকার সাহায্যে ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত করা হইয়াছে। ব্রহ্ম কি? জীবজগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কার্য্য-কাৰণ-বাদের যুক্তি দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ করা স্বাভাবিক। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় স্তূত্রে বলা হইয়াছে ‘জন্মান্তরায়তঃ’। যাঁহাহইতে এই বিশ্বের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, তিনিই ‘ব্রহ্ম’। তৈত্তিরীয় উপনিষদের তৃতীয় বঙ্গীর প্রারম্ভে উল্লিখিত আছে,—বক্ষণত-য় ভৃগু পিতা বক্ষণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “ভগবন্, ব্রহ্ম কি, তাতা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন।” উত্তরে তিনি বলিলেন, “অমং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। অর্থাৎ অন্নময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ময়, কর্ণময়, মনোময় ও বাচ্ময় ব্রহ্ম। আবার মণ্ডুকোপনিষদেও উক্ত হইয়াছে,—‘যথা সূদীপ্তাং পাবকাস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রাণঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ। তথা ক্ষরাং বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি’। অর্থাৎ প্রজলিত অগ্নি হইতে অগ্নিৰূপবিশিষ্ট সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি, হে সৌম্য! অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীবসমূহ উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়। উপনিষদে অতুল্যও দেখা যায়,—

‘অগ্নিমূর্ত্ত্বা চক্ষুর্বা চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌বৃন্তাস্চ বেদাঃ।

বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্তপজ্জ্যাং পৃথিবী হোষদর্কভূতান্তরাঙ্গা ॥

অর্থাৎ অগ্নি (জ্যোত্বক) ইঁহার মস্তক, চন্দ্র-সূর্য্য চক্ষুর্ময়, দিক্‌সমূহ কর্ণময়, প্রকাশিত বেদসমূহ বাঁকা, বায়ু, প্রাণ ও তাঁহার হৃদয় বিশ্ব। ইঁহার পাদদ্বয় হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। ইনি সমস্ত প্রাণীর অন্তরাঙ্গা।

ব্রহ্ম যে অখিল চরাচর বিশ্বের অন্তরাঙ্গাস্বরূপ, তাহা বহুপ্রকারে বলা হইয়াছে। শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং মনসো মনো বদ্বাচো চ বাচং স উ প্রাণস্ত প্রাণঃ চক্ষুষ্চক্ষুঃ—তিনি কর্ণের কর্ণ, চক্ষুঃ চক্ষু অর্থাৎ যাঁহার অধিষ্ঠানে এই সকল ইন্দ্রিয় আপন আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মই চেতন ও অচেতন নিখিল চরাচরের মূলস্বরূপ। ‘নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং’ ব্রহ্ম যাবতীয় অনিত্য নামরূপাদি বস্তুমধ্যে নিত্য হন, আর সমুদয় চৈতন্যবিশিষ্ট চেতনারও তিনি একমাত্র কারণ। আবার তিনিই

বেদের অবলম্বন, যথা—‘সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি সর্বে বেদা যত্রৈকী ভবন্তি’ অর্থাৎ সমস্ত বেদ এক বস্তুকে প্রতিপন্ন করিতেছেন এবং সকল বেদ যে-স্থানে এক হইতেছেন।

ব্রহ্ম বিশ্বের কারণ ও অন্তরাত্মা হইলেও তিনি ইহা হইতে সমাগ্ বিলক্ষণ। এই জ্ঞানই, শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—‘বদ বাচানভাদিতং যেন বাগভাদেতি অর্থাৎ বাক্য বাহ্যাকে বলিতে পারে না, কিন্তু যিনি বাক্যকে বিশেষ বিশেষ অর্থে নিযুক্ত করেন। আবও অজ্ঞান দুইট হয়, যথা—

‘বন্মনদান মনুতে, যেনার্হ্মনোমতম্’;

‘যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি’;

‘যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্’

অর্থাৎ মন বাহ্যাকে নিশ্চয় করিতে পারে না, যিনি মনকে কহিতেছেন; বাহ্যাকে লোকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না, আর বাহ্যদ্বারা চক্ষুর দর্শন-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়; বাহ্যাকে কর্ণেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রবণ করিতে পারে না, আর যিনি কর্ণেন্দ্রিয়কে শ্রবণ করাইতেছেন ইত্যাদি। পুনরায় শ্রুতি বলিতেছেন—

‘ন তত্র স্বর্ঘো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং

নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি কুতোহক্ষয়মগ্নিঃ।

তমেব ভাস্তুমন্তুভাতি সর্বং

তস্য ভাস্য সর্বমিদং বিভাতি ॥ (কঠ ২।২।১৫)

অর্থাৎ স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মকে স্বর্ঘ্য-চন্দ্র-নক্ষত্রসমূহ বা এই বিদ্যাৎসকল প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নির কথা আর কি বলিব? কিন্তু স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মকে অনুসরণ করিয়া স্বর্ঘ্য প্রভৃতি দীপ্তি পাইয়া থাকে, সেই পরব্রহ্মের অজ্ঞকান্তিতেই এই সকল অর্ঘ্যৎ জগৎ দীপ্তিশীল হয়।

কিন্তু ব্রহ্ম যখন বিশ্ব হইতে সম্যক্ পৃথক্, তখন সেই ব্রহ্ম হইতে বিশ্বের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব? উপনিষদ্ব বলিতেছেন—

‘যথোর্ণনাস্তি: স্বজতে গৃহতে চ যথা পৃথিব্যামোষধম: সন্তবয়ন্তি।

যথা নত:পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাহক্ষরাৎ সন্তবন্তীহ বিশ্বম্ ॥

অর্থাৎ যেমন মাকড়সা অল্প কাহারও সাহায্য বিনা আপনা হইতে স্বত্রে স্বষ্টি করে ও পুনরায় গ্রহণ করে; যেমন পৃথিবী হইতে ওষধি-সমূহ জন্মে এবং যেমন জীবন্ত মহাশয়ের দেহ হইতে কেশ-লোমাদির উৎপত্তি

হয়, সেইরূপ এই সংসারে সমুদয় বিশ্ব সেই অবিদ্যার ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।

ব্রহ্মা বিরুদ্ধ ধর্মসমূহের সমাবেশ করিয়াছে এবং ইহা তাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তিকর্তা তিনি কীদৃশ ? উপনিষদ্ বলিতেছেন,—

‘অপানিগাদো জবনে গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শূন্যোত্যাকর্ণঃ ।

স বেত্তি বেদ্যং ন তস্ত্যাস্তি বেত্তা, তমাহব্রহ্মাং পুরুষং মহাত্মম্ ॥ (শ্বেঃ ৩।১২)

অর্থাৎ, তাঁহার প্রাকৃতহস্ত না থাকিলেও অপ্রাকৃতহস্তদ্বারা গ্রহণ করেন ; পদহীন হইলেও গতিশীল, চক্ষুবিহীন হইলেও দর্শন করেন ; কর্ণহীন হইয়াও শ্রবণ করেন । তিনি জেয়বস্ত্র জ্ঞানেন, তাঁহাকে কেহই জ্ঞানে না । বুদ্ধগণ তাঁহাকে অগ্রগণ্য মহাপুরুষ বলিয়া থাকেন । তিনি স্থূল বা অণু ; ত্র্যম্ব বা দীর্ঘ নহেন । তিনি অবিচিন্ত্য-শক্তিম্পন্ন, সূত্রাত্মক সর্বশক্তিমান । তাই গীতার স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

“সর্বতঃ পাণিপাদভ্যং সর্বতোহক্ষি শিরোমুখম্ ।

সর্বতঃ শ্রুতিমজ্জোকে সর্বযাবুত্যা তিষ্ঠতি ॥” (গীঃ ১৩।১৪)

তাঁহার হস্ত, পদ, চক্ষুঃ, কর্ণ, মুখ ও মস্তক সবই বিদ্যমান আছে । তিনি চরাচর বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিত আছেন ।

এ পর্য্যন্ত নানা শ্রুতিবচনদ্বারা ব্রহ্মের ভটস্থলক্ষণ বিবৃত হইল । অতঃপর ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ উদ্ধৃত হইতেছে,—

‘সস্ত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ।’

ব্রহ্ম সাক্ষ্যরূপ অর্থাৎ সনাতন বা চিরতবে বিদ্যমান । তিনি অনন্ত অর্থাৎ দেশ-কালাদি-পরিচ্ছেদ-রহিত ; তিনি চিৎস্বরূপ অর্থাৎ সঙ্গিন বা জ্ঞানস্বরূপ । নিয়োক পঞ্চদশীর শ্লোকদ্বারা তাঁহার জ্ঞানবস্তুর আশাঙ্গ উপলব্ধ হইবে ।

“যেনেদং জ্ঞানতে সর্বং তৎ কেনাকেন জ্ঞানতাম্ ।

বিজ্ঞাতারং কেন বিজ্ঞাচ্ছত্বে বেদে তু সাধনম্ ॥

স বেত্তি বেদ্যং তৎ সর্বং নান্যস্তস্যাস্তি বেদিত্য ।

বিদিতা বিদিতাভ্যাং তৎ পৃথক্ বোধ-স্বরূপকম্ ॥

বোধেইপ্যভবো যস্ত ন কথঞ্চন জায়তে ।

তৎ কথং বোধেচ্ছাজ্ঞং লৌক্যং নঃসমাকৃতিম্ ॥

জিহ্বা মেহন্তি ন বেতুক্তিলজ্জায়ৈঃ কেবলং যথা ।

ন বুধ্যতে ময়া বোধো বোধব্য ইতি তাদৃশী ॥

যস্মিন্ যস্মিনন্তি লোকে বোধন্তত্বপক্ষণে ।

যদ্ বোধমাত্রং তদ্ ব্রহ্মেত্যেবং ধীরক্ষণিষ্ঠয়ঃ ॥

অর্থাৎ, যে সাক্ষীস্বরূপ চৈতন্যদ্বারা সমস্ত জানা যায়, তাঁহাকে অন্য কিসেব দ্বারা জানা যাইবে? যিনি বিজ্ঞাতা, তাঁহাকে কে জানিবে? যাহা বেত্ত বা জেয়, তৎসমস্ত তিনি জানেন। তিনি বিদিত ও অবিদিত উভয় হইতে পৃথক্। জ্ঞান বস্তুতে অমুভব যাহার কোন প্রকারে জন্মে না, সেই লোষ্ট্রতুলা জড় মনুষ্যকে শাস্ত্র কি করিয়া বুঝাইবে? জিহ্বা আমার আছে কি নাই—ইহা বলা যেমন কেবল লজ্জার কারণ, বোধ বা জ্ঞান বস্তু বুঝিতে পারিতেছি না, পরে বুঝিতে হইবে, ইহা বলাও তদ্রূপ। জগতে যে, যে ঘটাদি বিষয়ে জ্ঞান থাকে, সেই সেই ঘটাদি বিষয় বাদ দিলে যে বোধমাত্র অবশিষ্ট থাকিল, সেই সর্বত্রানুসূত কোষ বা জ্ঞানই ব্রহ্ম; ইহা জ্ঞাত হইলে ব্রহ্মের অবগতি হইল।

বেদান্তদর্শনে আমরা দেখিতে পাই, “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ ॥”—এই আনন্দময় ব্রহ্মই পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ।

শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে লক্ষ্যভূত পরব্রহ্মকে ‘পরব্রহ্ম’ পদের পরিবর্তে কেবলমাত্র ‘ব্রহ্ম’ পদ প্রযুক্ত করা হইয়াছে, ইহাতে সুধী সাধারণের বিভ্রান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই ভ্রান্তি-নিরসনকল্পে এই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

অজ্ঞানতত্ত্ব অর্থাৎ নিত্য বিনাশরাহিত এবং অবস্থান্তরশূন্য তত্ত্বই ‘ব্রহ্ম’, ‘পরব্রহ্ম’ নহেন। ‘পরব্রহ্ম’ শব্দদ্বারা কেবল নিত্যবিশেষযুক্ত ভগবৎস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝিতে হইবে। পরমতত্ত্ব সাক্ষাৎ বৈষ্ণবপূর্ণভগবান্-সবিশেষ, সক্রিয়, সলীল, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; আর নির্কিংশেষ, নিরাকার, নিষ্কায়, নিলীল অদ্বৈততত্ত্বই ‘ব্রহ্ম’। উপনিষত্ত্বক অদ্বৈতব্রহ্ম স্বয়ং ভগবানের অঙ্গকাস্তি। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি প্রভু বলিয়াছেন,—

‘স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, বিষ্ণু পরতত্ত্ব ।

পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব ॥

প্রকাশ-বিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম ।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আর স্বয়ং ভগবান্ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২/৮, ১০)

পঞ্চাবলীতে (১২৭ শ্লোকে) শ্রীমদ-প্রণামে দেখিতে পাই—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্তে ভক্তভ ভব-ভীতাঃ ।

অহমিহ নন্দং বন্দে যস্তালিন্দে পরব্রহ্ম ।

অর্থাৎ ভবভীত ব্যক্তিগণ কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ বা মহাত্মারতকে ভজনা করুন, (আমি কিন্তু এই স্থানে) শ্রীমন্দেরই বন্দনা করি,—
যাঁচার অলিন্দে (বারান্দায়) পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ খেলা করেন ।

অতএব সজ্জন অধীরুন্দের নিকট অধমের নকাতর প্রার্থনা—নির্বিশেষ
ত্রয়োদশম পরিচয়গপূর্বক সবিশেষ পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণভজনে
তৎপর হইয়া স্মরণীয় মনুষ্যজীবন সার্থকতায় পর্যাবসিত করুন ।

—ত্রিদিগ্‌ধামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ

শ্রীগীতার মর্ম্মবাণী

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৪ পৃষ্ঠার পর)

একাদশ অধ্যায়

[বিশ্বরূপ-দর্শনযোগ]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—৪)

তোমারি সে বিশ্বরূপ

কহিল বিনীত অতি

দুর্লভ দর্শন ॥৪॥

পার্থ মহারথী ।

(শ্লোক-সংখ্যা : ৫—৮)

আপন মনের সাধ

শুনিয়া শ্রীজনার্দন

সে হয় মহতী ॥১॥

পার্থের মিনতি ।

ওহে কমল-লোচন

তাঁহে ভাবি উপযুক্ত

দুর্মোহ হরণ ।

দিলেন স্বীকৃতি ॥৫॥

কৃপা করি শুনাইলেন

দেখাইতে রূপরাজি

অমৃত বচন ॥২॥

বিশ্বরূপ তাঁর ।

জীবের উৎপত্তি লয়

দিবাচক্ষু প্রদানেন

বহু বিবরণ ।

তবে অর্জুনের ॥৬॥

অনন্ত মাহাত্ম্য তব

কহিলেন জনার্দন

করিলে বর্ণন ॥৩॥

বীরভক্ত পার্থে ।

দেখিতে চাহি যে আমি

দেখ তুমি বিশ্বরূপ

হে বিশ্বরঞ্জন ।

দেখই একত্রে ॥৭॥

শতৈক সহস্ররূপ

পূর্বৈ অদর্শিত ।

দর্শন করহ পার্থ

হও হরষিত ॥৮॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৯—১৩)

বিশ্বরূপে বহুমুখ

চক্ষু অগগন ।

দিব্যমাল্য বস্ত্রধারী

প্রভু সুদর্শন ॥৯॥

দিব্যগন্ধে অহুলিপ্ত

দিব্য অস্ত্রধারী ।

আভরণে বিভূষিত

মুনি মনোহারী ॥১০॥

কোটি সূর্যাসম দীপ্তি

তীব্র জেজাবিত ।

বিশ্বরূপের ঝলকে

পার্থ ঝলকিত ॥১১॥

দেব-মনুষ্যে মিলিত

ক্ৰীহরি-শরীরে ।

তথা বিশ্ব পরিদৃষ্ট

যোগী বিশ্বের ॥১২॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৪—১৭)

বিশ্বরূপ নিরখিয়া

পার্থ মহারথী ।

কহিলেন সবিস্তারে

করিয়া প্রণতি ॥১৩॥

বিশ্বের আশ্রয় তুমি

অক্ষয় অবায় ।

স্বাবর-জন্ম তুমি

তুমি সর্বময় ॥১৪॥

তোমাতেই দেখিতেছি

ব্রহ্মা প্রজাপতি ।

দেবতা দেবর্ষিগণ

বাসুকী প্রভৃতি ॥১৫॥

মুকুট শোভিত তুমি

সদা চক্রধারী ।

দেহ তব সীমাহীন

কেমনে নেহারী ॥১৬॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৮—২০)

উর্দ্ধ নভ, নিম্নে পৃথ্বী

মধ্যে অন্তরীক্ষ ।

তুমি আছ যত্র তত্র

সর্বত্রই দৃষ্ট ॥১৭॥

আদি-মধ্য-অন্তরীক্ষ

চক্ষু চন্দ্র-সূর্য্য ।

মুখ তব অগ্নি-সম

হরিদ্রা সুলভ ॥১৮॥

জ্ঞানীগণের জ্ঞাতব্য

ধর্ম সনাতন ।

পরম পবিত্র তুমি

করুণা নিদান ॥১৯॥

স্বর্গ, মর্ত্ত, সর্বস্থলে

সর্ববি বিচলিত ।

ভয়ঙ্কর রূপ হেরি

অত্যশ্চর্য্যাবিত ॥২০॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২১—২৩)

রুদ্র, বায়ু, বসুগণ

অসুর, গন্ধর্ব্ব ।

অশ্বিনীকুমার সহ

আদিত্যাদি সর্ব ॥২১॥

কেহ করে স্তব স্তুতি

কেহ ব্রহ্ম ভীত ।

করজোড়ে রহে কেহ

চক্ষু নিমিলিত ॥২২॥

প্রবেশিছে ঋষি মুনি
তোমারি বপুতে ।

মহর্ষি ও সিদ্ধগণ
স্বস্তি কহে উচৈ ॥২৩॥

কভু উরু, কভু বাহু
বহুত চরণ ।

বহু মুখ বহু দন্ত
জ্বলন্ত নয়ন ॥২৪॥

ভয়ানক রূপ হেরি
হইয়া সন্ত্রস্ত ।

নিজেই বিস্মিত পার্থ
অতিমাত্রা ভীত ॥২৫॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৪—২৫)

আকাশেতে স্পর্শিয়াছে
মস্তক তোমার ।

সুরঞ্জিত দেহখানি
বিস্ময় অপার ॥২৬॥

বিস্ফারিত বদনেতে
ভয়ঙ্কর দন্ত ।

জ্বলিতেছে চক্ষু তব
অঙ্গার জ্বলন্ত ॥২৭॥

দেখিয়া বিশাল বপু
দৃশ্য ভয়ঙ্কর ।

পার্থ অতি ভীত ত্র্যস্ত
তাহারি অন্তর ॥২৮॥

চিনিতে না পারে দিক
নাহি পায় স্বস্তি ।

দেবেশ মিনতি করে
ধর পূর্ব মূর্ত্তি ॥২৯॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৬—৩০)

রাজা মহারাজা সাথে
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ।

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ
আর পাণ্ডুসৈন্য ॥৩০॥

প্রবেশিছে মুখে তব
জ্বলন্ত অগ্নিতে ।

কেহ কেহ পায় বাধা
দন্তের সন্ধিতে ॥৩১॥

নরমুণ্ড লেহনিছে
জিহ্বা তোমারি ।

অঙ্গ-আঙ্গা আলোকিছে
ধরা আলো করি ॥৩২॥

নদী যথা ধায় বেগে
সমুদ্রের দিকে ।

পতঙ্গ অগ্নিতে ধায়
নিজেকে দহিতে ॥৩৩॥

তেমতি মানবকুল
প্রবল সবেগে ।

প্রবেশিছে মুখে তব
কেহ পিছে আগে ॥৩৪॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৩১—৩৪)

কেশবের উগ্রভাব
দেখি ধনঞ্জয় ।

নমস্কার করিলেন
চাহি পরিচয় ॥৩৫॥

উগ্ররূপ ধরিয়াছ
কিবা মনে সাধ ?

কিবা উদ্দেশ্য সাধিবে
কহ মোরে আঙ্গ ॥৩৬॥

প্রবোধিতে ধনঞ্জয়ে
কহিল গোপাল ।

লোক ক্ষয়কারী হই
আমি মহাকাল ॥৩৭॥

যুদ্ধ যদি নাহি কর
 কিবা আসে যায় ।
 মরিবেই ভীষ্ম আদি
 কহিলু তোমায় ॥৩৮॥
 ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ আদি
 পূর্বেই নিহত ।
 বধ কর এবে পার্থ
 তুমি ত নিমিত্ত ॥৩৯॥
 হত্যা কর শত্রুকুল
 লভ যশ-মান ।
 সুখে কর রাজ্যভোগ
 হইবে কল্যাণ ॥৪০॥
 (শ্লোক-সংখ্যা : ৩৫—৩৯)
 শুনিয়া অমৃত-বাণী
 পার্থ মহারথী ।
 কহিলেন করজোড়ে
 ভয়ে ভীত অতি ॥৪১॥
 ওহে প্রভু তব নামে
 যতেক দুর্জয় ।
 ভীত ত্র্যম্ব পলায়িত
 সর্শঙ্কিত মন ॥৪২॥
 সাধুজনে তব নামে
 করে গুণগান ।
 নাম গানে হরষিত
 তুষিত পরাণ ॥৪৩॥
 মহাত্মা দেবেশ তুমি
 জগৎপালক ।
 ব্রহ্মার ধ্যানের বস্তু
 তুমি লোকনাথ ॥৪৪॥
 তুমিই অক্ষর ব্রহ্ম
 আদি সৃষ্টিকর্তা ।

তুমি চন্দ্র, তুমি অগ্নি
 তুমি জেয়-জাতা ॥৪৫॥
 তুমি বায়ু, তুমি যম
 করি নমস্কার ।
 অগ্নি ও বরুণ তুগি
 প্রণমি আবার ॥৪৬॥
 (শ্লোক-সংখ্যা : ৪০—৪২)
 সম্মুখে পশ্চাতে নমি
 নমি সর্বভাগে ।
 অমিত বিক্রম তুমি
 জানি নাই আগে ॥৪৭॥
 তুমি আছ যথা তথা
 আছহ ব্যাপিয়া ।
 তুমি ছাড়া নাহি কেহ
 বলে মম হিয়া ॥৪৮॥
 হাস্য পরিহাস-ছলে
 প্রণয়ের কালে ।
 কহিয়াছি কত কিবে
 সকাল বিকালে ॥৪৯॥
 তোমার মহিমা প্রভু
 ছিল যে অজানা ।
 বলিয়াছি যাহা তাহা
 কর মোরে ক্ষমা ॥৫০॥
 যত করি নমস্কার
 তাহে নাহি তৃপ্তি ।
 পুনরপি নমি আমি
 অগতির গতি ॥৫১॥
 (শ্লোক-সংখ্যা : ৪৩—৪৫)
 প্রণমিয়া গোবিন্দেরে
 কহে ধনঞ্জয় ।
 ক্ষমা কর অপরাধ
 ভুল যদি হয় ॥৫২॥

অমিত বিক্রমি তুমি
 সবলের পিতা ।
 তুমি পূজ্য গুরু শ্রেষ্ঠ
 ধাতা ও বিধাতা ॥৫৩॥
 পিতা যথা করে ক্ষমা
 নিজের পুত্রকে ।
 প্রিয় যথা যায় ভুলি
 প্রিয়ার ক্রটীকে ॥৫৪॥
 সখা যদি করে দোষ
 তাহে ক্ষমা পায় ।
 সেইরূপে কর ক্ষমা
 পার্থের অশ্রায় ॥৫৫॥
 (শ্লোক সংখ্যা : ৪৫—৪৯)
 বিশ্বরূপ দেখি পার্থ
 আশ্চর্য্য স্তম্ভিত ।
 তাহা অতি ভয়ঙ্কর
 করে সঙ্কিত ॥৫৬॥
 তাই কহে জনার্দনে
 হও কৃপাময় ।
 দেখা দাও পূর্বরূপে
 হইয়া সদয় ॥৫৭॥
 গদাচক্র সুশোভিত
 মস্তকে মুকুট ।
 হও মূর্ত্ত চতুর্ভূজে
 ওহে বিশ্বরূপ ॥৫৮॥
 প্রসন্নিতে ধনঞ্জয়ে
 কুঞ্জের বিহারী ।
 ধরিলেন পূর্বরূপ
 প্রভু চক্রধারী ॥৫৯॥

ধনঞ্জয় প্রকৃতিস্থ
 দেখি অপরূপ ।
 মানুষের রূপ তাহা
 পরম পুরুষ ॥৬০॥
 কিরীটি-কুণ্ডল-গদা
 দিব্য দেহধারী ।
 ধনঞ্জয় প্রসন্নিত
 সে-রূপ নেহারী ॥৬১॥
 বেদজ্ঞ তাপস দানী
 করিয়া যতন ।
 নাহি দেখে বিশ্বরূপ
 দুর্লভ এমন ॥৬২॥
 দেবতার্য্য করে পূজা
 নাহি পায় দেখা ।
 বিশ্বরূপ অদর্শনে
 পায় মনে ব্যথা ॥৬৩॥
 অর্জুনেতে সন্তবিল
 অণ্ডে অসম্ভব ।
 তাহার সমানভক্ত
 জগতে দুর্লভ ॥৬৪॥
 করে কর্ম্ম সর্বদাই
 ঈশ্বরের নামে ।
 সদা মুখে হরিকথা
 দিবস ও যামে ॥৬৫॥
 বিষয়েতে অনাসক্ত
 সকলি আপন ।
 সেই ব্যক্তি ভক্ত অতি
 কহে জনার্দন ॥৬৬॥
 (ক্রঃ :)

—কালীপদ মণ্ডল,

কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্ত-বিভাগের শদস্থ অফিসার,
 নিউদিল্লী ।

উদ্ধারের পথ

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৩ পৃষ্ঠার পর)

নির্বিশেষপর জ্ঞানীর বিচারধারা মায়া সম্বন্ধযুক্ত। বৌদ্ধদিগের মতে এজগৎ স্ত্রী-পুরুষের সংসর্গ বা স্বভাব হ'তে জাত হয়েছে, জৈন দিগের মতে এজগৎ কেবল কাম-মূলক, চার্বাকদিগের মতে এজগৎ স্ত্রী-পুরুষের কাম হ'তে সৃষ্টি—এবমিধ মতবাদীদের যুক্তিদমূহ গীতার উক্ত বাক্যে আত্মরিক মতবাদ বলে সিদ্ধান্তিত হয়েছে।

সত্যযুগ থেকেই নির্বিশেষ জ্ঞান বা কেবল জ্ঞান প্রচারিত আছে। জ্ঞানীগণ নিজের অবস্থার প্রথম সীমা ব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হ'য়ে ভক্তিব্যোগের আশ্রয় মিলে ক্রমশঃ নির্বিশেষতা বিদূরিত হয় এবং পরে চিৎশিষ্য হয়ে ভক্তিরসামৃত আশ্বাদন করেন।

ভগবান্ গীতায় “চতুর্বিধা ভজন্তে মাং—শ্লোকঃ যে হুত্বিতীশীল জ্ঞানীর কথা উল্লেখ করেছেন, সেই জ্ঞানী কেবল-জ্ঞানী ন'ন। তাই তিনি গীতায় স্পষ্ট করে বল্লেন,—“তেষাং জ্ঞানী নিতায়ুক্ত একভক্তিবিশিষ্টতে”,—অর্থাৎ “তাহাদের মধ্যে মদগতচিত্ত একান্ত মদহরক্ত তত্ত্ববিৎ জ্ঞানীব্যক্তি শ্রেষ্ঠ।” তৎপরে “বহুগাং জন্মানামন্তে জ্ঞানবান্”—শ্লোকঃ জানালেন, ভগবানের স্বরূপজ্ঞান প্রাপ্ত হ'য়ে সর্বত্র বাসুদেব দর্শী জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই হুত্বর্জ। এইরূপ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি জ্ঞানলাভ-কালে কিয়ৎ পরিমাণে অপ্রবৃত্ত্যাব গ্রহণ করে অল্প চৈতন্য নিষ্ঠ হন। এস্থলে “বহুগাং জন্মানামন্তে”—কথিত হওয়ায় বহু জন্মের পরে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ক্রমশঃ সংসদ-প্রভাবে ভাগবতধর্মের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করে ভগবানে প্রপত্তিলাভ করে।

গীতায় (১৮।৬৬) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা,—

“সর্বধর্ম্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভো মোক্ষস্থিতিমি মা শুচঃ॥”

অর্থাৎ—“বর্ণাশ্রমাদি সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব, তুমি শোক করিও না।” উক্ত শ্লোক ‘সর্বধর্ম্যান্ পরিত্যজ্য’ বস্তুতে সমস্ত বর্ণাশ্রম, কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি, কৃষ্ণ ব্যতীত দেবতাস্বরের পূজাদি, ভাগবতধর্ম ব্যতীত যাবতীয় ধর্মাদি এবং নানা দেবোদ্দেশক সঙ্ক্যা-বন্দনাদি পর্যন্ত নিতাধর্ম পরিত্যাগ করার জন্ত উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আবার ভগবান্ বল্লেন—“শরণং” অর্থাৎ শরণ গ্রহণ কর।

জীবের স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীন ইচ্ছা থাকায় সংপথেও যেতে পারে, আবার অসং পথেও যেতে পারে। জীব স্বতন্ত্রতার অসম্ভাবহার করে নিজের আত্মস্তুতি ও অভিজ্ঞানকে নির্ভরশীল থেকে ভগবানকে ভুলে প্রকৃত ধর্ম-পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ইতর পন্থাহুগামী হীন-ধর্মে আসক্ত হয়ে পড়েছে। তাই করুণাময় ভগবান জীবকে হীনধর্ম পরিত্যাগ করে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য উক্ত উপদেশের অবতারণা করলেন। ইহাই ভগবানের শরণাগতির শিক্ষা। “তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যাসি শান্তম্”—গীতার এই বাণী অমুসারে সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হ'লে তাঁর কৃপা মিলবে এবং একমাত্র তাঁর কৃপাতেই পরম শান্তি ও নিত্যবাম লাভ হবে। “সর্বধর্ম্যান্ পরিত্যজ্য যামেকং শরণং ব্রজ”—শ্লোকটি সম্পর্কে প্রপূজাপাদ পরমহংসদেব শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অমূল্য উপদেশ দিব্যত কর্তি,—“গীতার ভগবান্ সকলপ্রকার ধর্ম ছেড়ে তাঁর চরণে শরণ গ্রহণের কথা বলেছেন। যে ভগবান্ গীতার অন্ত্য স্বয়ং উপদেশ করেছেন যে, স্বধর্ম ছেড়ে পরধর্ম গ্রহণ করলে কোনও সুভোদয় হয় না—স্বধর্মে থেকে নিহত হওয়া ভাল, তবুও ভয়াবহ পরধর্ম বাঞ্ছন করা উচিত নহে; সেই ভগবান্ আবার বলেছেন—তোমাদের যাবতীয় ধর্ম পরিত্যাগ কর। এই উভয়বিধ ভগবদ্বাক্যের সামঞ্জস্য কোথায়? দেখুন, মানব নিজ বিজ্ঞা, বুদ্ধি, পারদর্শিতার দ্বারা পুরুষোত্তম ভগবান্কে জানতে পারে না, ভগবানের কৃপাতেই লোক ভগবান্কে জানতে পারে, আমরা যদি সেই কৃষ্ণচন্দ্রের ঔদার্যময়-শীল-প্রকটকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা আলোচনা করি,—যিনি কৃষ্ণ হ'য়েও কৃষ্ণের কথা বলবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁর কথা মন দিয়ে শ্রবণ করি, তবেই এ'প্রশ্নের সজুস্তর স্তম্ভভাবে পেতে পারি।

জীবগণ ভগবান্ কৃষ্ণের সেবক, কৃষ্ণ জীবের নিত্য প্রভু, কৃষ্ণ-সেবাই জীবের নিত্যকর্ম বা মুখ্য কৃত্য—একমাত্র শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। আমরা দেহ নই—দেহী—অণুচৈতন্য আত্মা, ইহাই শাস্ত্রবাক্য। কিন্তু এসব কথা ভুলে যখন আমরা দেহ-মনকে ‘আমি’ বলে মনে করি, তখনই যত অসুবিধা, যত বিজ্ঞাট্।

গীতার বক্তা—ভগবান্। তিনি বলেছেন—আত্মা নিত্য, অপরিবর্তনীয়; দেহ—অনিত্য ও হ্রাসবৃদ্ধিযুক্ত। যাহারা দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তনহীন

আত্মার পরিবর্তন বা জন্ম-মৃত্যু স্বীকার করে, তাহারাই মুর্থ; সুতরাং ‘সর্বধর্ম’ শব্দে জীবের দেহ-মনে আত্ম-বুদ্ধি করে যতপ্রকার ধর্ম স্বীকৃত হয়েছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র—বর্ণধর্মসমূহ; ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, আশ্রমধর্মসমূহ এবং ঐতিহাসিক অস্তিত্বাদি ধর্ম, লৌকিক নিষ্ঠা-ভোগ বা ত্যাগপর পারলৌকিক ধর্ম এবং বিশেষভাবে বলতে গেলে কৃষ্ণাশ্রয় বা কৃষ্ণ-সেবা-ধর্ম বাতীত চতুর্দশ ভূবনের যাবতীয় ধর্ম বুঝায়।

দেহ-মনের ধর্ম—অনিতা ধর্মকে ত্যাগ করে, শুধু ত্যাগ করে নয়—পরিত্যাগ করে অর্থাৎ দেহ-মনের স্মৃতিতে বিস্মৃতি এনে—প্রাকৃত অভিমান ছেড়ে নিতা আত্মার নিতাধর্ম পরমাত্মার সেবা কর—‘আমার ভজন কর’—এই কথা কৃপা করে ‘করুণাময় ভগবান্’ আমাদেরকে বলেছেন। কিন্তু এই সহজ সত্যকথা ব্রাহ্ম জীব হঠাৎ গ্রহণ করতে পারে না। তাহার প্রমাণ দেখুন, পরবর্তী বাক্যে ভগবান্ বলেছেন—‘অহং জ্ঞাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি’। অনিত্য জড়-দেহ-মনো-ধর্ম ছেড়ে নিতাধর্ম গ্রহণ করতে গিয়ে জীব—যে-বস্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছেড়ে যাবে, চলে যাবে, বিনাশ প্রাপ্ত হবে, পূর্বসন্ধিবশে বা মোহবশে সেই অনিত্যধর্ম ত্যাগে পাপ হবে বলে বিচার করে। হায়! হায়! যে নিতাধর্মের অপালনই মহাপাপ বা মহাপরাধ, সেই নিত্যে উদাসীন, অনিত্যে নিতা-বুদ্ধিকারী বদ্ধজীব অনিত্য-ধর্মের অপালনকে পাপ বলে বুঝে। আবার শুধু পাপবুদ্ধি করেই শেষ নাই—পরন্তু শোক করছে। তাই “মা স্তুচঃ”—ভগবত্তুষ্টি।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে এসে এতকরে ভগবদ্ ভক্তনের কথা বলে গেলেন, কিন্তু আমরা তাঁর কথা শুদ্ধি কৈ? তাঁর আদেশ বা নির্দেশ পালন করছি কৈ?

* * * * *

শ্রীমদ্ভাগবত গীতার এত বড় বাক্যকেও “এহো বাহু আগে কহ আর”—এ কথা বারবারমানন্দ প্রভুকে বলেছেন। কেন-না, ভক্তি আত্মার সহজ বৃত্তি, তা’তে ভগবান্কে বলে করে, প্রতিজ্ঞা-পত্র দিয়ে ভক্ত করবার জন্ত চেষ্টা করতে হয় না। ভক্ত প্রীতিবশতঃ বাস্তবিকভাবেই ভগবানের স্মৃতির জন্ত সতত ব্যস্ত থাকেন।

পিতাকে যদি সাধনা ক’রে পুত্রকে স্বভক্ত করতে হয়, তবে পুত্রের মহিমা বা পুত্রের কৃতিত্ব বুঝতে সাধারণের বাকী থাকে কি? কোথায় ভক্ত

আপনা হ'তে আপনভাবে আপন প্রভুর সেবা করবে, তা'না হ'য়ে বিপরীত হচ্ছে না কি? এখানে ভক্ত শুধু ভগবানকে ভুলে নাই, নিজেকেও ভুলেছে—
 নিজের নিত্যস্বরূপ, নিত্য অস্তিত্বের কথা ভুলে অনিত্যের প্রভু হয়ে অনিত্যের
 সেবায় নিযুক্ত হচ্ছে। এটি জনাই মহাপ্রভু এতবড় কথাকে “এছো বাহু”
 বলে জগৎকে শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য—সর্বোত্তম ব্রহ্মভক্তের কথা
 জানাবার জন্য যত্ন করেছেন।” এইভাবে গীতার সর্বশ্রেষ্ঠ শ্লোকে বর্ণাশ্রমাদি
 ধর্ম্মত্যাগে পাপের ভয় উদ্ভিত হওয়ায় তৎক্ষণাৎ শোক করার দেহান্তিনিবেশ
 বিদ্যমান হেতু ভগবান্ সেই পাপ থেকে মুক্ত করবেন বলে জানাচ্ছেন। কিন্তু
 ব্রহ্মগোপীদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের প্রতি যে-প্রেমভক্তির উদয় হয়েছিল,
 তা'তে ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্তব্য-অকর্তব্য, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি বোধজনিত দেহান্তিনিবেশ
 ছিল না। তাঁদের ভক্তির উদাহরণ স্বরূপে ‘শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত’
 বলেছেন,—

“লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম।

লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহস্থ, জাত্মস্থ মর্ম্ম ॥

দুস্তাঙ্গা অর্থাৎ, নিজ পরিজন।

স্বপ্নে করয়ে যত তাড়ন-ভৎসন ॥

সর্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।

কৃষ্ণ-স্থ হেতু করে প্রেম-সেবন ॥

* * *

আত্মস্থ-হৃৎথে গোপীর নাহিক বিচার।

কৃষ্ণস্থ হেতু করে সব ব্যবহার ॥

কৃষ্ণ-লাগি 'আর সব করি' পরিত্যাগ।

কৃষ্ণ-স্থ হেতু করে শুদ্ধ অহরাগ ॥”

গোপীদের ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা বিদ্যমান। ‘গীতার’
 উক্ত শ্লোকের উপদেশে ভক্তির অপরিপক অবস্থায় শরণাগতি উল্লিখিত
 হয়েছে। উক্ত শরণাগতির পর ‘শ্রীমদ্ভাগবতে’ নবধাভক্তির কথা বর্ণিত
 আছে। শরণাগত হয়ে ভজন কর্তে কর্তে সাধাবস্ত প্রেমভক্তি লাভ হয়।
 তাই শরণাগতি-নির্দেশক উক্ত শ্লোকটিকে মহাপ্রভু বাহু বলে জানিয়েছেন।

ভক্তি-প্রধান জ্ঞানই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি! কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি হ'তে জ্ঞানমিশ্রা
 ভক্তি শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি যাজক ব্রহ্ম-সামুদ্র্য প্রার্থী ন'ন, পরন্তু ককতত্ত্ব
 জ্ঞানের প্রার্থী। শ্রীগীতায় উক্ত হয়েছে,—

“ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদুক্তিং লভতে পরাম্ ॥ (গীতা ১৮।৫৪)

অর্থাৎ—“ব্রহ্মে অবস্থিত বা দেহান্তিমানশূন্য প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কখনও নষ্ট দ্রব্যের প্রতি শোক ও অপ্রাপ্ত বস্তুর ভয় আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনিই সর্বভূতে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হ’য়ে আমাতে (ভগবানে) পরাভক্তি লাভ করেন।”

ভগবানের সঙ্গে কীকের কেবলমাত্র চিজ্জাতীয়ত্ব সাদৃশ্য থাকায় আলোচ্য শ্লোকে “ব্রহ্মভূত” শব্দের অর্থ নির্ণয়ে শ্রীধর স্বামিপাদ বল্লেন—“ব্রহ্মে অবস্থিত” এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ বাক্য যথা,—“সতো মনঃ স্থিতিবিশ্বো ব্রহ্মভাবঃ উদাহৃতঃ।” “ব্রহ্মভূত” শব্দে ভগবানের সঙ্গে একত্ব বা সমভাব বুঝায় না। জীৱ ভগবানের সঙ্গে একত্ব অথবা সমতা প্রাপ্ত হ’লে পরা ভক্তিলাভের ক্ষমতা বন্ধ করা কি সম্ভব হবে? ‘পরা ভক্তি’ অর্থে প্রেম-লক্ষণযুক্ত ভক্তি হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য ভক্তি এবং কৃষ্ণপ্রেম লাভের জন্য কৃষ্ণজ্ঞান প্রদায়িনী ভক্তির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ ও বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান লাভটী যথেষ্ট নয়। তদপেক্ষা কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান লাভের শ্রেষ্ঠত্ব থাকায় ব্রহ্মজ্ঞানের বহিঃসুখিনী অনুভূতি তুচ্ছকৃত হ’লে কৃষ্ণোন্মুখিনী ভক্তিবৃত্তি উদয়ের সম্ভাবনা। তাই ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে’ দেখা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধা-সাধন-তত্ত্ব নির্ণয়ে কৰ্ম্ম, কৰ্ম্মার্পণ, কৰ্ম্মভাগরূপ সমাধি এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির চরমফলে বৈকুণ্ঠের বাহিরে বাহ্যানুভূতি প্রাপ্তি এবং ভগবৎ-সেবাবৃত্তির বিলুপ্তি থাকায় কহিলেন,— “এহা বাহু, আগে কহ আর।”

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে ভুক্তি ও মুক্তির ভাব থাকায় অনর্থ উৎপাদিত হয়। রায় রামানন্দপ্রভু তখন জ্ঞানমিশ্রাভক্তির অসারতা উপলব্ধি ক’রে জ্ঞানশূন্য ভক্তির কথা (ভাঃ ১০।১৪।৬) বল্লেন,—

“জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্ত্র নমন্তু এব

জীবন্তি সনুধরিতাং ভবদীযবার্ত্তাম্।

জ্ঞানে স্থিতাঃ ক্রুতিগতাঃ তনুভাজনেভি-

র্থে প্রায়শোঃখিত জিতোৎপাসি তৈস্তিলোক্যাম্ ॥”

অর্থাৎ,—“ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাবলম্বনে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুলাভের চেষ্টার নাম আরোহবাদ বা অশ্রোতপন্থা। জ্ঞানলাভের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা না করেও যারা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমধর্মে অবস্থান-পূর্বক সাধুমুখে উচ্চারিত আপনার কথা শ্রবণ ও কায়মনোবাক্যে উহাংস সংকার অর্থাৎ অনুমোদনাদি

করে জীবন ধারণ করেন, তাঁরা অল্প কোন কর্ম না করিলেও, তাঁদের দ্বারাই আপনি অখিপন্যে অ-জিত হয়েও জিত, অর্থাৎ বশীভূত হয়ে থাকেন।”

শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও শাস্ত্রাদি ভক্তের নিকট শ্রবণ করাই একমাত্র ঋত্বিক। উক্ত শ্লোকের শিক্ষা এই যে, ভগবদ্ভক্তের নিকট চরিত্র-কথা-শ্রবণ না করা পর্য্যন্ত ভগবানের উপদেশ বুঝা যায় না। শ্রীল বায় রামানন্দ প্রভু যখন সাধুভক্ত-মুখে উচ্চারিত অষ্টাভিলাষশূন্য ও জ্ঞান-কর্মাদি দ্বারা অনাহত ভগবৎ কথা শ্রবণ করাই সাধ্য সার বলে বর্ণনা করলেন। তখনই মহাপ্রভু বললেন,—‘এহো হুয়, আগে কহ আর।’ কিন্তু তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত মহাপ্রভু ‘এহো বাহু’ বলে অভিহিত করেছেন। এক্ষণে মহাপ্রভুর বিচারে নির্বিশেষ জ্ঞানের পায়স অত্যন্ত তুচ্ছ ও বাহু সাধ্য বলে নির্ণিত হ’ল ও সাধাসার-রূপে অনুমোদন পেল না। কিন্তু জ্ঞানশূন্য ভক্তিতে কৃষ্ণানুশীলন সাধাসার-রূপে প্রাথমিক স্তরে অনুমোদন লাভ করল। আরোহণস্থান্যামী কেবল-জ্ঞান বিকৃত হ’ল। জ্ঞানী—অরসিক; কিন্তু ভক্ত—রসিক। নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানী ও শুদ্ধভক্তের তুলনা ক’রে বায় রামানন্দপ্রভু জানিয়েছেন,—

“অরসজ্য কাক চুবে জ্ঞান-নিষফলে।

রসজ্য কোকিল খায় প্রেমাত্ম মুকুলে ॥

অভাগিয়া জ্ঞানী আশ্রদিয়ে শুদ্ধ জ্ঞান।

কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান ॥ (১৮: ৫:)

কর্ম, জ্ঞান, যোগ, অষ্টাভিলাষ ইত্যাদি ভক্তির আবরণ মাত্র। জ্ঞানীগণ ভক্তির সহায়তায় সাধিকর্য ছেড়ে গুণাতীত হন। কিন্তু ভক্ত সাধক-দশার প্রাথমিক অবস্থা থেকেই গুণাতীত হয়ে থাকেন। কর্মী-জ্ঞানীর তথাকথিত সিদ্ধ-দশায় কর্ম-জ্ঞান-সাধন থাকে না, পক্ষান্তরে ভক্তের সিদ্ধ-দশাতেও ভক্তি-সাধন থাকে। নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানীগণের ব্রহ্মে লীন হওয়ার সাধনায় ভক্তি বিলুপ্ত হয়—তাই তাঁরা ভগবানের পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হন না। মুমুক্ষু বাসনাই জীবের দুর্ভাগোর কারণ হয়,—ঐক্লপ দুর্কীর্ণনা-বশে জীব ব্রহ্মতত্ত্বে সম্যকভাবে অবস্থান করতে সমর্থ হয় না। জ্ঞান-মার্গের উপাসনায় বুধাই বহুদিন গত হয়ে যায়, তবে সৌভাগ্যবশে কৃষ্ণ-ভক্তের সঙ্গ হ’লে কৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং তখন মোক্ষ-বাহু দুর্বল হয়। এইভাবে কৃষ্ণ-ভক্ত সঙ্গক্রমে কৃষ্ণ-ভজনে মতি হয়। ভক্তির সহায়তায় জ্ঞান-মার্গের উপাসকগণ বিলম্বে হ’লেও কৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হয়।

“জ্ঞান-মার্গের উপাসক—দুই ত’ প্রকার ।
 কেবল ব্রহ্মোপাসক, মোক্ষাকাজী আর ॥
 কেবল ব্রহ্মোপাসক তিন ভেদ হয় ।
 সাধক, ব্রহ্মময় আর প্রাপ্ত ব্রহ্মলয় ॥
 ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয় ।
 ভক্তি সাধন করে যেই প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় ॥
 ভক্তির স্বভাব-ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ ।
 দিবা দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন ॥
 ভক্ত দেহ পাইলে হয় গুণের স্বরূপ ।
 গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্মল ভজন ॥
 জন্ম হৈতে শুক-সনকাদি ব্রহ্মময় ।
 কৃষ্ণ-গুণাকৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
 সনকাত্মের কৃষ্ণকৃপায় সৌরভে হরে মন ।
 গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্মল ভজন ॥
 ব্যাসকৃপায় শুকদেবের লীলাদি-স্বরূপ ।
 কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া করেন ভজন ॥
 নব-যোগীশ্বর জন্ম হৈতে সাধক জ্ঞানী ।
 বিধি-শিব-নারদ-মুখে কৃষ্ণ-গুণ গুনি’ ॥
 গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন ।
 একাদশ-স্বক্কে তাঁর ভক্তি-বিবরণ ॥
 মোক্ষাকাজী জ্ঞানী হয় তিন প্রকার ।
 মুমুকু, জীবনুষ্ঠ, প্রাপ্তস্বরূপ আর ॥
 মুমুকু অনেক জগতে সংসারী-জন ।
 মুক্তি লাগি’ ভজ্ঞে করে কৃষ্ণের ভজন ॥
 সেই সবেব সাধুসঙ্গে গুণ শ্রবায় ।
 কৃষ্ণভজন করায়, মুমুক্ষা ছড়ায় ॥
 শ্রীসূতাদির সঙ্গে শৌনকাদি মুনিগণ ।
 মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈলা কৃষ্ণের ভজন ॥
 কৃষ্ণের দর্শনে, কেহ কৃষ্ণের কৃপায় ।
 মুমুক্ষা ছাড়িয়া গুণে ভজ্ঞে তাঁর পায় ॥

জীবনুজ্ঞ অনেক, সেহ দুই ভেদ জানি ।
 ভক্যে জীবনুজ্ঞ, জ্ঞানে জীবনুজ্ঞ মানি ॥
 ভক্যে জীবনুজ্ঞ গুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণ ভজে ।
 শুদ্ধজ্ঞানে জীবনুজ্ঞ অপরাধে অধো মজে ॥
 ভক্তিবলে প্রাপ্তব্রহ্মপ দিব্যদেহ পায় ।

কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণ-পায় ॥ —(১৫: চঃ, মধ্য)

অতএব কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তিব্যতীত জ্ঞানীও উদ্ধার পায় না এবং জ্ঞানী যেহেতু শুদ্ধভক্তির বাঞ্ছা করে সেহেতু ভক্তিমার্গ অপেক্ষা জ্ঞানমার্গ নিকট ।

পরম ভাগবত শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় “জৈব-ধর্ম” গ্রন্থে লিখেছেন,—‘কর্ম ও জ্ঞান’—যে দুইটি উপায় কথিত হয়েছে, তাহা কেবল ভুক্তি ও মুক্তির সাধন, জীবের নিত্যসিদ্ধতাবের সাধন নয় ।”

জীবের বন্ধাবস্থা থেকে শুদ্ধাবস্থায় উপনীত হবার জন্ত যজ্ঞ, পূজা, তপস্যা, দান প্রভৃতি বহুপ্রকারে অর্থেজ্ঞানিক উপায় প্রচলিত আছে, কিন্তু সেগুলি কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি-তত্ত্বের অধীনে বিভাগ্যমান । কর্ম-জ্ঞানকাণ্ডের সিদ্ধি আপাততঃ সুখদ মনে হ’লেও তাহা পরিণামে দুঃখজনক ও অমঙ্গলপ্রদ । কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অনিত্যতা উপলব্ধি করে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গেয়েছেন,—

“কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড,

‘শ্রমুজ’ বলিয়া যেবা খায় ।

নানা যোনি সদা ফিবে কদর্যা ভক্ষণ করে,

‘তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥’ (ক্রেমশঃ) ।

—শ্রীচিস্তনুজ্ঞান মণ্ডল, কবিত্বষণ

বৈষ্ণব চিনিতে হইবে

জীবের মুখা প্রয়োজনলাভের একমাত্র উপায় শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাক্ষেপেই জীবের পক্ষে সদানুগ্রহ শ্রীগুণবানের কৃপাকটাক্ষ লাভ করা সম্ভব, ইহা আমরা পূর্বাপর গুনিয়া আসিতেছি । ইহাও গুনিয়াছি, গুরুবৈষ্ণবের কৃপা অষ্টৈতুকী, জগতের কোন বস্তু বা আগতিক কোন বস্তুর নির্বিশেষেই তাহা কৃপার উৎপত্তির কারণ নহে । এই হেতুকতার বিপরীত বস্তুটী যে কি ব্যাপার, তাহা না বুঝিয়া অনেক সময় শ্রীগুরুবৈষ্ণবের করুণাকে আমরা একটা কাল্পনিক রূপ দিয়া বলি । আমরা মনে করি, আমাদের পক্ষে সেবানিষ্ঠা বা তজ্জন্ম যত্নগ্রহের কোন প্রয়োজন নাই । আমরা আমাদের

মত চলিতে থাকি, একদিন আকস্মিকভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় সর্বস্বার্থসিদ্ধি হইয়া যাইবে। ভজনাগ্রহণী যেন মিছা ভোক্তাভিমাত্রী, মনোবন্দী, বন্ধজীব আমরা সাধু-গুরু-কৃপা ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবেই করিতে পারি।

বাহারা ঐক্লপ বলেন, তাঁহারা সাধুর কৃপা ও জীবের পক্ষে সেবার আগ্রহ যে স্বতন্ত্র বস্তু নহে, ইহা বুঝিতে পারেন না। সাধুর কৃপালাভ করিবার জন্য তাঁহারা যে সত্য সত্য অন্তরের সহিত আত্মবিশিষ্ট নহেন, ইহাও তাঁহাদের ঐক্লপ কপটতাপূর্ণ উক্তি হইতেই বুঝা যায়। বৈষ্ণবের কৃপালাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে মহাজনগণ এক্লপ বলেন,—

যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া আদর করিব যথেষ্ট।

বৈষ্ণবের কৃপা যাছে সর্বসিদ্ধি, অবশ্য পাইব তবে ॥

যিনি যেমন বৈষ্ণব অর্থাৎ ভক্তিমার্গ বাহারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকার বিচার করিয়া, কনিষ্ঠ, মধ্যম অথবা উত্তম যেক্লপ যোগ্যতা যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে সেইক্লপ আদর করিতে হইবে। কনিষ্ঠাধিকারীকে উত্তম অধিকারীর প্রাণ্য সম্মান দিলে বা মধ্যম অধিকারীর সহিত কনিষ্ঠের লায় ব্যবহার করিলে আদর স্তূৰূপে হয় না। বৈষ্ণবের প্রতি ব্যবহার যথাযথরূপে সম্পন্ন হইলেই জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত বৈষ্ণবাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। তখনই বৈষ্ণবের সর্বসিদ্ধিদাতা, অমায়্য কৃপার স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হয়।

অতরাং বৈষ্ণব চিনিবার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। চিনিতে পারিলেই আদর বা মমতা স্বতঃই উদ্ভূত হয়। নিজের ভ্রাতাকে ভ্রাতা বলিয়া চিনিবার সঙ্গে সঙ্গেই অনাস্বাদিতপূর্বক ভ্রাতৃস্নেহের মাধুর্য্য অহুভূত হইতে থাকে, উহা সময়ের অপেক্ষা করে না। এই চেনা বা আপনজ্ঞানে, স্বজনজ্ঞানে, বান্ধবজ্ঞানে প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বৈষ্ণব আমাকে কতটা স্নেহ করেন বা আপন জ্ঞান করেন, এই বিচারই পর্য্যাপ্ত নহে। কারণ আমি বৈষ্ণবের স্নেহভাজন, এই চিন্তায় যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়— উহা অন্তরের অন্তরালে অবস্থিত ভোগপিপাসারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আমি বৈষ্ণবের প্রতি কতটা মমত্ববুদ্ধিবিশিষ্ট হইতে পারিয়াছি, এই বিচারই সর্বসিদ্ধি অভ্যুদয়ের সূচনা করে। বৈষ্ণব চিনিয়া তাঁহার প্রতি আত্মীয়বুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত আমার প্রতি বৈষ্ণবের মমতার প্রকৃত স্বরূপ আমার পক্ষে উপলব্ধি করা কখনই সম্ভব হয় না।

কিন্তু এই বৈষ্ণব চেনা বা তাঁহার প্রতি সমত্বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার মধ্যে কয়েকটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য করিবার আছে। প্রাকৃত দৃষ্টিতে বৈষ্ণব দেখিতে গিয়া আমরা তাঁহাদের মধ্যে যেমন দোষ দেখিতে পাই, সেইরূপ নান্যপ্রকার গুণও দেখিয়া থাকি। বৈষ্ণবের অহং-বিনীত ব্যবহার স্বভাবসুলভ ক্ষমা ও উদারতা অনেক সময় আমাদের আকৃষ্ট করে। ঐ গুণগুলি বিচার করিয়াই আমরা বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতার পরিমাপ করিতে উদ্যত হই। ঐ গুণগুলিই আমাদের আকর্ষণ করিয়া বৈষ্ণবের প্রতি একটা সমত্বাভাসের জন্মদান করে। এই প্রকার বাহ্যগুণদর্শনে স্বরূপ-বিচার ও সেই সকল অশুদ্ধ গুণের প্রতি আকর্ষণজনিত সমত্ববোধের দ্বারা বাস্তবিক বৈষ্ণবদর্শন এবং বৈষ্ণবে আদর হয় কিনা আমাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত। বৈষ্ণবকে চিনিতে হইবে আদর করিতে হইবে তাঁহার বৈষ্ণবতার দিক্ দিয়া। বৈষ্ণবতা অর্থে বিষ্ণু ঐকান্তিকী সেবাপরতা। উভাই বৈষ্ণবের স্বরূপ। যদি বৈষ্ণব চেনাই আমাদের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে বিষ্ণুসেবাতোষণার্থমুদ্যত কি পরিমাণে আছে তাহাষ্ট দেখিতে হইবে।

বৈষ্ণবের চাক্ষুষগুণ গুণের বিষয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে কুটম্বকশরৎতা বৈষ্ণবের স্বরূপ লক্ষণ, বৈষ্ণবের বৈষ্ণবত্ব। অত্র পঁচিশটি গুণ ঐ স্বরূপলক্ষণের আশ্রয়ে প্রকাশিত হইয়া উহাকে মাধুর্য্যামণ্ডিত করে। যিনি বৈষ্ণব, তাঁহার মধ্যে বৈষ্ণবতার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গুণগুলি থাকিবেই। বৈষ্ণব, অথচ তিনি নর বা স্ত্রীল নহেন একরূপ হইতে পারে না। তবে বৈষ্ণবতার তারতম্য অনুসারে ঐ গুণগুলির বিকাশের তারতম্য হইতে পারে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঐ সকল গুণ সম্বন্ধে আমাদের যেকোন সাধারণ ধারণা, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সেক্ষেপ বলেন নাই। সাধারণভাবে বিচার করিতে গেলে আমাদের একরূপ ধারণা হয় যে, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বৈষ্ণবের যে-সকল গুণের কথা বলিয়াছেন, ঐ সকল গুণ বৈষ্ণব ব্যতীত বর্ণাশ্রমধর্ম্মপরায়ণ চতুর ব্যক্তিতেও থাকিতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে বৈষ্ণবের গুণ কিছু অবৈষ্ণব ব্যক্তিতে থাকিবার সম্ভাবনা নাই। বৈকুণ্ঠবন্দের বাচ্যবস্ত্র এজগতের বস্ত্রের ন্যায় সঙ্কীর্ণ, অগ্নিত্য বা স্থূল নহে। এজগতে শব্দ যে-সকল বস্ত্র উদ্দেশ্য করে, সেট সকল বস্ত্র নিতান্ত তুচ্ছ। সুতরাং একই গুণ বৈষ্ণব এবং

বৈষ্ণবের বাক্যে দৃষ্ট হওয়া সম্ভব একরূপ বিচার নিতান্ত ক্ষুদ্রদর্শীগণের নিকটেই আদর পাঠয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলি যাঁহাতে পারে "বদান্ততা" বৈষ্ণবের একটি গুণ, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী একরূপ বলিয়াছেন। "বদান্ততা" এই শব্দটি একগুণে অঙ্কুরিতবৃত্তিতে যে-অর্থ নির্দেশ করে, তাহা সাধারণ মানবে দেখা যাঁহাতে পারে কিন্তু বিহ্বলবৃত্তিতে ঐ শব্দ যে-অর্থ প্রকাশ করে, তাহা একমাত্র বৈষ্ণব বাতীক আর কাহারও প্রতি প্রযোজ্য হয় না।

কিন্তু বৈষ্ণবের এই গুণগৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবেন কে? বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতাকে আদর করিবার প্রয়োজনীয়তা তিনিই উপলব্ধি করেন যিনি বৈষ্ণবতার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি সেবামুখ হইয়াছেন। নিকপট শরণাগত ব্যক্তির নিকটেই বৈষ্ণবের গুণসকল যথার্থ-স্বরূপে প্রকাশিত হয়। বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত এবং অনন্য-সাধারণ গুণ তিনিই দর্শন করেন, তিনি উহাকে প্রাকৃত গুণসাম্যে দর্শন করিয়া অপরাধের আবাচন করেন না। সেবাবিমুখ আমরা কিন্তু এই বৈষ্ণবতার দিক হইতে বৈষ্ণব দেখিবার রহস্য ব্যতিতে পারি না। আমরা অনেক সময় বৈষ্ণবের স্নেহময়তা প্রভৃতি গুণে আকৃষ্ট হইয়া থাকি। বৈষ্ণবের ধৈর্য্য, সচ্ছিয়তা প্রভৃতি গুণের প্রশংসাও করি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বৈষ্ণবের গুণ কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু নহে। বৈষ্ণবের স্নেহ বা তাঁহাদের ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ, যাহা আমরা বর্তমানে লক্ষ্য করিতেছি, তাহা যদি আমাদের বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় প্রবুদ্ধ না করে, ঐ সকল গুণ যদি বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতার প্রতি আকৃষ্ট না করে, তাহা হইলে বৃত্তিতে হইবে বাস্তবিক পক্ষে বৈষ্ণবের প্রকৃত গুণ আমাদের দর্শন হয় নাই; অথবা উহা দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

বৈষ্ণবোচিতগুণ সকল বৈষ্ণবেই থাকিবে। প্রাকৃতচক্ষে দেখিতে গিয়া যদি বলি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কবি ছিলেন কিন্তু শিবানন্দ সেন অথবা শ্রীমদ্রূপ প্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দের সেরূপ কবিত্ব শক্তি ছিল না, তাহা হইলে বৈষ্ণবের কবিত্ব-গুণটি দর্শন হইল না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে সাধারণ সাহিত্যিক মনে করিয়া তাঁহাতে প্রাকৃত কবিত্বরূপ একটি প্রাকৃত, আকস্মিকগুণের সমাবেশ লক্ষ্য করা হইল মাত্র।

প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট মানব কৃষ্ণকশরগতের দিক হইতে বৈষ্ণব দেখিতে পারেন না, বৈষ্ণবকে সাধারণ মানবসাম্যে দেখিতে গিয়া তাঁহাতে দোষ,

গুণাভাস ইত্যাদি দেখিয়া ফেলেন। তাঁহারা বৈষ্ণবের গুণাভাসদর্শনেই বৈষ্ণবতার বিচার করিয়া থাকেন। কোন ঐশ্বর্যে সাধারণ মানবের জ্ঞান গাভীর্য্য প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রশংসা করেন, ঐ দিক দিয়াই তাঁহার বৈষ্ণবতা বিচার করেন। যদি কোন বৈষ্ণব তাঁহার ঐ গুণটি অপ্রকাশিত রাখেন, তাঁহাকে আর বৈষ্ণব বলেন না, আর যদিই বা বলেন তাহা কইলে বলিবেন, ইনি বৈষ্ণব সত্য কিন্তু ইঁতার অমুক বৈষ্ণবের ন্যায় গাভীর্য্য নাই। উহা সোনার পাথর-বাটীর ন্যায় নিরর্থক বাক্য। বৈষ্ণবের দোষাভাস আমাদের ইঞ্জিয়ের অকৃতিকর বলিয়া তাহা দেখিয়া বৈষ্ণবের প্রতি অস্বা পববশ হওয়া যেমন নিরর্থকপ্রাপক, বৈষ্ণবের গুণাভাস আমাদের ইঞ্জিয়ের তৃপ্তিকর বলিয়া ঐ গুণদর্শনে বৈষ্ণবের প্রতি মমতায়ুক্ত হওয়াও তদ্রূপ অস্ববিধাজনক। উভয় ক্ষেত্রেই দর্শকের দৃষ্টি প্রাকৃততেই বদ্ধ, অপ্রাকৃত বৈষ্ণব চিনিয়া লওয়া তাঁহার ভাগ্যে ঘটয়া উঠে না। সুতরাং বৈষ্ণব চিনিতে গিয়া আমরা যেন প্রাকৃত গুণবিশিষ্ট অথবা প্রাকৃত গুণহীন কোন ব্যক্তিবিশেষ না চিনিয়া বসি।

মহাজনগণ বলিয়া থাকেন—“বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শক্তি।” আমরা অসহায়, দুর্বল মানব, অজ্ঞ ও মূর্খ বৈষ্ণব কি প্রকারে চিনিব? বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতা কি প্রকারে বুঝিব? সম্বন্ধতত্ত্বে অনতিজ্ঞতা এবং বৈষ্ণবের কৃপায় অবিশ্বাস যতদিন প্রবল থাকে ততদিন অসংখ্য নানাপ্রকার বিতর্ক আসিয়া বৈষ্ণবের কৃপালাভে আমাদেরকে বঞ্চিত করিয়া রাখে। কোন বৈষ্ণব এই প্রশ্নের অতি সুন্দর এবং স্মৃষ্টিপূর্ণ উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—দেবগণও বৈষ্ণব চিনিতে পারেন না—একথা সত্য। কিন্তু সেজন্য আমি কেন ভীত হইব? দেশের সম্রাট আমার জননীকে না চিনিতে পারেন, কিন্তু সেজন্য ক্ষুদ্র শিশু আমার পক্ষে আমার জননীকে চিনিতে বাধা নাই। আমি যখন অতি শিশু ছিলাম, তখন জননীকে জননী বলিয়া জানিতাম না, তাঁহার স্নেহের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিবার যোগ্যতাও আমার ছিল না। কিন্তু আমি জানিতাম না বলিয়াই যে আমার জননী তখন জননী ছিলেন না বা আমি মাতার স্নেহ হইতে তখন বঞ্চিত ছিলাম তাহা নহে। মাতাকে মাতৃরূপে আমি না চিনিলেও তখনও মাতার সহিত আমার সম্বন্ধ ছিল, তাঁহার স্নেহ হইতে তখনও আমি বঞ্চিত হই নাই। মাতার স্নেহে পুষ্ট হইয়াই আমি প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া মাতার সহিত আমার কি সম্বন্ধ এবং

মাতৃস্নেহ কি বস্তু তাহা জানিতে পারিয়াছি। শিশুকালে মাতাকে চিনিতাম না, তজ্জন্য মাতার স্নেহ অামার প্রতি বর্ষিত হইলেন উহাও মাদুর্বা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কিন্তু মাতার স্নেহ যত্নে যখন পরিপূর্ণ-বয়স্ক হইলাম, তখন মাতার স্নেহ ও কৃপাতেই তাঁহাতে চিনিতে পারি। তাঁহার প্রতি মমতাব্যক্ত হইল। সাক্ষক-ভক্ত-মধ্যম অধিকারে উপনীত হইলে “সে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়।” তাঁহার প্রতি মমত্বস্থাপন করেন। তখনই তিনি বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিয়া থাকেন। এমাম অধিকার লাভ কবাপ্ত বৈষ্ণবেরই কৃপা-সাপেক্ষ। বৈষ্ণবের কৃপা সর্বকালেই ক্রিয়াবর্তী। অনর্থযুক্ত বশিষ্ঠদ্বীপ কনিষ্ঠাদিকারে ‘নাম’ সেবা করিবার প্রবৃত্তিও বৈষ্ণবের কৃপা হইতেই লাভ করেন। কিন্তু কনিষ্ঠাদিকারী উহা উপলব্ধি করিতে পারেন না। চটাই তাঁহার কনিষ্ঠত্ব। কনিষ্ঠ অধিকারী বৈষ্ণবের কৃপা অজ্ঞাতমারে লাভ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবের কৃপা তৎকালে অজ্ঞাতভাবে তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়া তাঁহাকে মধ্যম অধিকারে উন্নীত করায়। বৈষ্ণবের কৃপাতেই তিনি বৈষ্ণব চিনিয়া তাঁহার প্রতি আদরযুক্ত হন। বৈষ্ণবের সহিত আমাদের সম্বন্ধ নিতা, তাঁহার সন্তিত নুতন করিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয় না। সেই সম্বন্ধটী উপলব্ধি কবাই আমাদের প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের কৃপাবলেই হইয়া থাকে, তজ্জন্য সঙ্কুচিত হইবে কেন?

বৈষ্ণবে আত্মীয়জ্ঞানে কতটা আদর করিতে পারিয়াছি, ইহা জানিবার একমাত্র কষ্টসাধ্য হইতেছে—অবৈষ্ণবের প্রতি আত্মীয়জ্ঞানে কতটা ঔদাসীন্ধ্য বা অনাদর আসিয়াছে, এই জ্ঞান। অবৈষ্ণবে সম্পূর্ণরূপে অনাদর বা আত্মীয়-বুদ্ধি না আসা পর্যন্ত বৈষ্ণবে আত্মীয়জ্ঞান হইবার আশা নাই। যে-পরিমাণে অবৈষ্ণবকে পববুদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে বৈষ্ণবে আপনবুদ্ধি আসিবে। একেবল মুখের কথা নহে, সত্যই যদি বৈষ্ণবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে আমাদের ইচ্ছা হয় তাহা হইলে অবৈষ্ণবের প্রতি মমতা সর্বাগ্রে পরিহার করিতে হইবে। আমাদের মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু এবং তথাকথিত আত্মীয়-স্বজন এমন কি আমাদের দেহ বা মনও বৈষ্ণব-সেবার বিরোধী হন, তাহা হইলে সেই চৈতন্যবিমুখ নিষ্কলনগণকে প্রকৃতপক্ষে পব জানিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইবার মত দৃঢ়তা অর্জন না করা পর্যন্ত বৈষ্ণবকে আত্মীয়জ্ঞান করা কেবল ছলনা মাত্র। অবৈষ্ণবকে আত্মীয়জ্ঞান নাই অথচ বৈষ্ণবে মমতা বা আত্মীয়বুদ্ধি আছে, ইহা সম্পূর্ণ বিকৃত।

বিড়াল তপস্বী

গ্রামের কৃষক শহরে আসিল কিনিতে যে সোনাদানা ।
মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দিবে বেচি জমিজমা ॥
পরিচয় নাই কারো সনে তার কি করিবে ভাবে একা ।
নজরে পড়িল বুড়োরে এক কপালে তিলক রেখা ॥
তুলসীর মালা গলাতে শোভিছে অতি মনোহর বেশে ।
কৃষ্ণনাম বুড়ো সদাই জপিছে সুখেতে মধুর হেঁসে ॥
কৃষকটি ভাবে, “দোকানী ধান্মিক ঠকাবে না কভু মোরে ।
এই দোকানেতে গহনা কিনিব উচিত মূল্যের দরে ॥”
দোকানে প্রবেশি’ কৃষক অবাক চোখ হ’ল ছানাবড়া ।
চাকরও তাহার হরিরে ডাকিছে ভাসায়ে প্রেমের ধারা ॥
‘কে-সব’ ‘কে-সব’ বলিয়া চাকর চীৎকার করি ডাকে ।
ইঙ্গিত তাহার এই কথাটিতে “এসেছে কে, এসেছে কে ?”
শুনিয়া মালিক সেও যে হাঁকিল ‘গো-পাল’ ‘গো-পাল’ বলি’ ।
“গ্রামের গো-রক্ষক এসেছে রে ওরে” কিছু পরে যাবে চলি’ ॥
পুনরায় এবে চাকর কহিল, বল মন ‘হ-রি, ‘হ-রি’ ।
‘কৃষকের ধন হরণ যে করি’ এই গুপ্ত কথা তারি ॥
মালিক তখন ‘হ-র’ ‘হ-র’ নামে জানাল মনের কথা ।
‘হরণ কর সব অর্থ গুর’ বিয়েতে পড়ুক বাধা ॥
কৃষকটি তবে সুদৃঢ় বিশ্বাসে কিনিল সব গহনা ।
‘মেকির-গহনা’ দিয়ে যে দোকানী করিল তারে বঞ্চনা ॥
‘বিড়াল-তপস্বী’ সাজয়ে অনেকে লোক ঠকাবার তরে ।
সুখ তার কভু না মিলে জীবনে নরকেতে গিয়ে মরে ॥
‘সাজা’ ও ‘হওয়া’ এক কভু নয়, মুড়ি-মিছরীর মত ।
সরল হইয়া ভজন করিলে ‘কৃষ্ণ-কথা’ হবে তত ॥

—শ্রী বালভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

॥ শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ ॥

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

মহোৎসবে আহ্বান

[পুরীধামের প্রথামুসারে]

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(রেজিফার্ড)

ফোন : এন্-ভি-ডি—২৪৭

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

তেঘরিপাড়া.

পেঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

অগ্ৰ্য্য বৎসরের ণ্মায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উত্তোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আগামী ২৫শে আষাঢ়, ১৩৯০ (ইং ১০।৭।৮৩) রবিবার হইতে ৩রা শ্রাবণ, ১৩৯০ (ইং ২০।৭।৮৩) বুধবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃত্তা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সম্ভজন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যানুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও থাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী শ্রুকৃতি অর্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯০

ইং ১৯৫৮৩

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্যঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ বামন মহারাজের নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

—ঃ সেবাপঞ্জী :—

- ১। ২৫শে আষাঢ় (ইং ১০।৭।৮৩), রবিবার—অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।
- ২। ২৬শে আষাঢ় (ইং ১১।৭।৮৩), সোমবার—পূর্বাহ্ন ৭ ঘটিকায় নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন-মুখে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠান্তে গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন ও মঠে প্রত্যাবর্তন।
- ৩। ২৭শে আষাঢ় (ইং ১২।৭।৮৩), মঙ্গলবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা, অপরাহ্ন ৩টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তনযোগে শোভা-যাত্রাসহ রথাক্রমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যা ৮টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত আরাত্রিক, সঙ্কীৰ্ত্তন ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে রথযাত্রা প্রসঙ্গ পাঠ।
- ৪। ২৮শে আষাঢ় (১৩ জুলাই) বুধবার হইতে ৩০শে আষাঢ় (১৫ই জুলাই) শুক্রবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যারাত্রিকান্তে রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরামলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৫। ৩১শে আষাঢ় (ইং ১৬।৭।৮৩), শনিবার—হেরাপঞ্চমী দিবসে শ্রীলক্ষ্মীবিজয়-উৎসব। পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন। অপরাহ্ন ৫টা হইতে সঙ্কীৰ্ত্তন, সন্ধ্যায় আরাত্রিক, তদনন্তর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।
- ৬। ৩২শে আষাঢ় (১৭ই জুলাই) রবিবার হইতে ২রা শ্রাবণ (১৯শে জুলাই), মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীৰ্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীমদ্ভাগবতের বিবিধ শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৭। ৩রা শ্রাবণ (ইং ২০।৭।৮৩), বুধবার—অপরাহ্ন ৩টা হইতে সঙ্কীৰ্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা। শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তনান্তে আরতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং কীর্ত্তন-মহোৎসব।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্তনযোগ্য।

ধর্মঃ ষ্ণুষ্টিতঃ পুংসাং বিবক্সেন-কথাস্থ যঃ ।	<p>স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।</p>  <p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥</p>	নোংপাদয়েৎ যদি প্রতিঃ শ্রম এব হি কেবলম্
--	--	---

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাহা আত্ম-পরসম ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নহুত ।

অন্য ধর্ম যুক্তকালে থাকে বেই জ্ঞান ।
হার-কথার রাত নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩৫শ বর্ষ	}	২৪ শ্রীধর, অনিরুদ্ধ, ৪৯৭ গৌরাঙ্গ ৩১ শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৯০ ; ইং ১৭।৮।১৯৮৩	{	৬ষ্ঠ সংখ্যা
----------	---	--	---	-------------

সামুদায়িক

শ্রীচৈতন্যশতকম্

[শ্রীমৎ সার্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতম্]

কৃষ্ণচৈতন্যদেবেন হরিনাম প্রকাশিতম্ ।

যেন কোপি তৎপ্রাপ্তং ধন্যোহসৌ লোকপাবনঃ ॥৮১॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কর্তৃক শ্রীহরিনাম এই জগতে প্রকাশিত । যে কেহই ঐ হরিনাম প্রাপ্ত হইলে তিনি ধন্য ও লোকে পবিত্র করিতে সক্ষম হন ॥৮২॥

যদি স্যাদ বৈষ্ণবে শ্রীতিঃ সদা কীর্তন লম্পটৈঃ ।

গৌরাঙ্গচন্দ্রবিমুখঃ নঃ বৈ ভাগবতোহপি সঃ ॥৮৩॥

যদি কাহারও বৈষ্ণবে শ্রীতি ও কীর্তনে আসক্তি জন্মে, পরন্তু গৌরাঙ্গচন্দ্রে বিমুখ হন, তবে তিনি কখনও ভাগবত বলিয়া কথিত হন না ॥৮৩॥

অন্যচেতা হরিমূর্ত্তিসেবাং করোতি নিত্যং যদি ধর্মনিষ্ঠঃ ।

তথাপি ধন্যো ন হি তত্ত্ববেত্তা গৌরাঙ্গচন্দ্রে বিমুখো যদি স্ত্যং ॥৮৪॥

যত্বেপি কোন ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অনন্তচিত্ত হইয়া নিত্য হরিমূর্ত্তি সেবা করেন,
পরন্তু গৌরাঙ্গচন্দ্রে বিমুখ। তথাপি তিনি ধন্য বা তত্ত্বজ্ঞানী নহেন । ৮৪॥

কিমু সুখমুপভোক্তুং বাঞ্ছয়েদ্ বঞ্চিতোহসৌ

সফলানগমসিদ্ধং গৌরচন্দ্রং ন বেত্তি ।

হরি-হরি-কথমেতৎ কুত্র জাতং চরিত্রং

স ভবজলধিমধ্যে কুস্তিপাকে পপাত ॥৮৫॥

যে দর্শবেদসিদ্ধ গৌরহরিকে জ্ঞানে না, সে ত বঞ্চিত । সে কি প্রকারে
সুখ উপভোগ করিতে ইচ্ছা করে ? কেবল হরি-হরি বলিলেই এরূপ চরিত্র
উৎপন্ন হয় না । সে ভবনাগরমধ্যে কুস্তিপাক নরকে পতিত ॥৮৫॥

শচীশুভ-পদাশুজে শরণমাত্রমনেষণং

করোমি কুলদৈবতে প্রবলকাতরে বৈষ্ণবাঃ ।

কৃপাং কুরুত সর্বদা ময়ি বিচিত্র বাঞ্ছাম্পদং

মম প্রণত-চেতসো ভবতু সিদ্ধিরব্যাহতা ॥৮৬॥

শচীশুভ শ্রীগৌরহরির পাদপদ্মে শরণগ্রহণ করা মাতেই তাঁহাকে প্রাপ্ত
হইবার ইচ্ছা উদ্ভিত হয় । যাহাতে এই বিচিত্রা ইচ্ছা পূর্ণ হয়, হে কুল-
দেবতা ! অতিশয় কাণ্ডবৃন্দর আমার প্রতি বৈষ্ণবগণ সর্বদা কৃপা করুন ।
মদীয় প্রণত চিত্তের সিদ্ধি অব্যাহতা হউক ॥৮৬॥

ন ধনং ন যশো ন কুলং ন তপো

ন জনং ন শুভং ন সূতং ন সুখম্ ।

চরণে শরণং তব গৌরহরে

মম জন্মানি জন্মানি দেহি বরম্ ॥৮৭॥

আমি ধন, জন, কুল, পুত্র, যশ, তপস্বী, শুভ, সুখ—এসব কিছুই চাই না । হে
গৌরহরি ! জন্মে জন্মে আপনার চরণে শরণ পাই, এই বর প্রদান করুন ॥৮৭॥

নানাক্লেশ-ময়াযুক্ত-স্মৃতিহীনশচ মাং প্রভো ।

ভবভীতাদ্ গৌরচন্দ্র ত্রাহি ত্রাহি কৃপানিধে ॥৮৮॥

আমি সংসারে নানাক্লেশযুক্ত হওয়ায় ভবদীর্ঘ স্মৃতিহীন হইয়াছি ।
হে দয়ানিধে, গৌরচন্দ্র ! ভবভীত আমাকে কৃপাপূর্ব্বক উদ্ধার করুন ॥৮৮॥

অনেকজন্ম-ভ্রমণে মনুষ্যোহহং ভবন্ কলৌ ।

বাকুলাত্মা পদাজে তে শরণং রক্ষ মাং প্রভো ॥৮৯॥

অনেক জন্ম ভ্রমণের পর এই কলিযুগে মনুষ্য-জন্মলাভ করিয়া অতিশয়
বাকুলচিত্তে আপনার পাদ-পদ্মে শরণ লইতেছি। হে প্রভো! আমাকে
রক্ষা করুন ॥৮৯॥

কাতরং পতিতং শোচ্যং ত্রাহি মাং শ্রীশচীহৃত

সর্বৈ প্রেমসুখে মগ্নাঃ বঞ্চিতং মা কুরু প্রভো ॥৯০॥

হে শ্রীশচীহৃত! আমি পতিত, কাতর ও শোচ্য, আমাকে উদ্ধার করুন।
সকলেই প্রেমসুখে মগ্ন, হে প্রভো! আমাকে বঞ্চিত করিবেন না ॥৯০॥

সর্বেষাং পাপযুক্তানাং ত্রাতৃংশক্তোহগৃহেবতঃ।

মমোদ্ধারে প্রভু গৌরো যতঃ পতিতপাবনঃ ॥৯১॥

সকল পাপযুক্ত ব্যক্তিকে অল্প দেবতা ত্রাণ করিতে সক্ষম, কিন্তু গৌরাদেব
মহাপ্রভুই আমাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ, কারণ তিনি পতিত পাবন ॥৯১॥

শ্রীগৌরচরণে দ্বন্দ্বৈ যাচে যাচে পুনঃ পুনঃ।

জীবনে-মরণে বাপি তব রূপং বিচিন্তয়ে ॥৯২॥

শ্রীগৌরহরির চরণযুগলে বার বার এই প্রার্থনা করি যেন জীবনে-
মরণেও আপনার রূপ চিন্তা করিতে পারি ॥৯২॥

কৃষ্ণং ত্বং দ্বাপরে শ্যামং কলৌ গৌরাদ-বিগ্রহম্।

ধৃত্বাহশেষজ্ঞানান্ প্রেমভক্তিং যচ্ছসি লীলয়া ॥৯৩॥

হে কৃষ্ণ! আপনি দ্বাপরে শ্যামবর্ণ ও কলিযুগে গৌরবর্ণ ধারণ করিয়া
লীলাহেতু অসংখ্য জনগণকে প্রেমভক্তি প্রদান করিতেছেন ॥৯৩॥

যথেষ্টিতং গৌরপদারবিন্দে নিবেদিতং দেহ-মনোবচোভিঃ।

সর্বার্থসিদ্ধিং কুরু মে কৃপালো নিরন্তরং তে স্মৃতিরস্তু নিত্য্য ॥৯৪॥

হে দয়াময়, গৌরহরি! আপনার পাদপদ্মে কাষমনোবাক্যে নিবেদন
এই যে, মদীয় যথাভীষ্ট সর্বসিদ্ধি করুন এবং আপনার স্মৃতি নিত্য নিরন্তর
বর্তমান থাকুক ॥৯৪॥

অতদ্ব্যস্ত প্রভোরৈব লীলামনুজবিগ্রহম্।

ধৃত্বা লোকপরিভ্রাণং কৃতবান্ হরিনামভিঃ ॥৯৫॥

হে প্রভো! আপনি অতদ্ব্যস্ত। লীলাগচ্ছ্য-শরীর ধারণ করিয়া হরিনাম
দ্বারা লোকসকলকে পরিভ্রাণ করিয়াছিলেন ॥৯৫॥

অনাথবন্ধো করুণৈকসিদ্ধো সংসার-বন্ধাৎকুরু মাং বিমুক্তম্।

ভ্রমামি তীর্থান্ তব নামগানৈর্দৃষ্টা মহাত্মান্ হরিদেব-রূপান্ ॥৯৬॥

হে অনাথের বন্ধো ! করুণাসাগর ! এই সংসার-বন্ধন হইতে আমাকে বিশেষভাবে মুক্ত করুন। আমি আপনার নাম-গান করিতে করিতে ও হরিদেব-রূপ মহাজ্ঞানীগকে দর্শন করতঃ সকল তীর্থ শ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি ॥ ৯৬ ॥

যত্নতং যৎকৃতং যৎশ্রুতং যন্মনোগতম্ ।

সর্বং ক্ষমস্ব হে গৌর ত্বং-স্মৃতিঃ স্ম্যৎ সদা মম ॥৯৭॥

আমি পূর্বে যাহা বলিয়াছি, যাহা করিয়াছি এবং যাহা শুনিয়া মনে বিচার করিয়াছি, হে গৌরহরি ! আমায় সমস্ত ক্ষমা করুন এবং আপনার স্মৃতি আমার হৃদয়ে সর্বদা জাগরুক থাকুক ॥৯৭॥

লজ্জাং তাক্ত্বা পদে যাচে ভক্তিং মাং প্রেমসঞ্জনাম্ ।

দেহি গৌর কৃপাসিন্ধো তদ্বিনা নাস্তি দুঃখহা ॥৯৮॥

হে কৃপাসিন্ধো গৌর ! লজ্জা ত্যাগ করতঃ আপনার পাদপদ্মে এই প্রার্থনা করিতেছি—আমাকে প্রেমসঞ্জনা ভক্তি প্রদান করুন, কারণ উহা ব্যতীত আমার দুঃখ নষ্ট হইবে না ॥৯৮॥

অনেকজন্ম-কৃতমজ্জনোহঙ্কৌ সিদ্ধিং কুরুস্ব প্রভো গৌরচন্দ্র !

সমুজ্জ্বলাং তে পাদপদ্মসেবাং করোমি নিত্যং হরিকীর্তনঞ্চ ॥৯৯॥

আমি অনেক জন্মে দিছুতে স্নান করিয়াছি। হে প্রভো, গৌরচন্দ্র ! আমাকে সিদ্ধি দান করুন। আমি আপনার পাদপদ্মের সমুজ্জ্বলা সেবা ও নিত্য হরিকীর্তন করিতেছি ॥৯৯॥

ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্নং গৌরাজ্ঞ ত্বাং নিবেদয়ে ।

কৃপাং কুরু দয়ানাথ সর্বসেবাং করোমাহম্ ॥১০০॥

হে ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন গৌরাজ্ঞ ! আপনার পাদপদ্মে নিবেদন এই যে, হে দয়ানাথ ! আপনি আমায় কৃপা করুন, যাচাতে আমি আপনার সকল প্রকার সেবা করিতে পারি ॥১০০॥

গায়তি যো বত্নিতেন চৈতন্যশতকং মুদা ।

যঃ পঠেৎ শৃণুয়াৎ নিত্যং প্রাপ্তিঃ স্ম্যৎ শ্রীশচীসুতে ॥১০১॥

যিনি প্রেমভরে ও আনন্দসহকারে নিত্য শ্রীচৈতন্যশতক গান পাঠ ও শ্রবণ করেন, তাঁহার ফলে শ্রীগৌরাজ্ঞের দর্শন-প্রাপ্তি হইবে ॥১০১॥

সজ্জন—অকিঞ্চন (৯)

অকিঞ্চনের লক্ষণ

যিনি অহংগ্রহোপাসনা-মদে মত্ত নহেন, যিনি স্বীয় কর্মফল-লাভের জন্য উদ্যত নহেন এবং যিনি ভগবদ্বিভিন্ন অপরাধ-প্রাপ্তির জন্য ব্যস্ত নহেন, তাঁহার জ্ঞান-সম্পত্তি, কর্ম-সমৃদ্ধি এবং লৌকিক সুখ-লাভে চিন্তা ব্যর্থ নহে।

কর্মী, জ্ঞানী ও ত্যাগী অকিঞ্চন নহে ; কিঞ্চন বা কিছু

ভোগী-সজ্জায় অধীন ও বদ্ধ

এই জড়-জগতে থাকিয়া জীব অনেক সময়ে আত্মহারা হইয়া নির্কিংশেষ-জ্ঞানে জ্ঞানী, স্বর্গ-সুখাদিতে ভোগী এবং ত্রৈলোক্য ইন্দ্রিয়পর হইয়া আপনাকে ধনী মনে করেন। পৃথিবীর কোন না কোন বস্তুকে নিজের আয়ত্তাধীন করিতে প্রয়াসী হইয়া তত্তৎফল-লাভের উদ্দেশ্যে কখনও বা ত্যাগীর বেশে, ভোগীর ভোগময় তাৎপর্য্যে এবং যথেষ্টাচারের প্রবল তাড়নায় আমার ছিলাম, আমার আছে বা আমার চাই বলিয়া “কিছু” অবশেষ করেন। যেকাল পর্য্যন্ত জীব “কিছু” পশ্চাদ্ধাবিত হইবার দাবী রাখেন তখন পর্য্যন্ত “কিছু” তাঁহাকে ছাড়ে না। “কিছু” সংগৃহীত হইলেই জগতের সকল লোক তাঁহার পিছু পিছু ছুটিতে থাকে।

সজ্জন কে?—যাহা কিছু, সমস্তই আশ্রয় জাতীয়,

সুতরাং সজ্জনের ভোগ্য নহে

যাহার “কিছু” নাই তিনিই অকিঞ্চন তিনিই সজ্জন। তাঁহার কিছু অবশেষ করিতে হয় না। কিছু ছিল, আছে বা থাকিবে বলিয়া দৌড়াইতে হয় না। সোজা সুজি সেই “কিছুটা” আশ্রয় জাতীয় বস্তু। জীব স্বয়ং সুনির্মূল আশ্রয় জাতীয় হইয়াও তাহা ভুলিয়া গিয়া নিজের অস্তিতাকে বিষয় জাতীয়ের অভিন্ন জানিয়াছেন ; সুতরাং আশ্রয় বা অবলম্বন অনুসন্ধান করিতে গিয়া ভোগ্য আশ্রয় লাভের জন্য টুড়িতেছেন। তিনি স্বয়ং আশ্রয় জাতীয় এবং ভগবান্ই তাঁহার একমাত্র মিত্য বিষয় একথা ভুলিয়াছেন। যেকাল পর্য্যন্ত তাঁহার অকিঞ্চনতার উপলক্ষ্য না হয় তৎকাল্যাবধি তিনি সাকিঞ্চন অর্থাৎ জ্ঞানী কর্মী বা অন্তাভিলাষী।

শুদ্ধ বৈষ্ণবই অকিঞ্চন, সুনীচ, সহিষ্ণু ও প্রপন্ন

ভগবানের গুণভরুই অকিঞ্চন। অকিঞ্চন তুলাপেক্ষা সুনীচ অর্থাৎ জড়ের কোন উপাধিকে তিনি নিজ সম্পত্তি বলিয়া জানেন না। অকিঞ্চন তরু অপেক্ষা সহস্রগুণ বিশিষ্ট অর্থাৎ জড়ের কোন বস্তুর আক্রমণের যোগ্য বলিয়া আপনাকে জানেন না। অকিঞ্চন সকলকেই সম্পত্তিমানু জানেন এবং কোন সম্পত্তিতে নিজের প্রতিষ্ঠা চান না। সজ্জনই একমাত্র অকিঞ্চন। তিনি সুবিমল কৃষ্ণ-সেবাপরায়ণ। সজ্জন হিংসা-দ্বेष-বজ্জিত পরাপেক্ষা রহিত। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের—

যন্ত্রাববুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজাদীঃ।

যন্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কৰ্হিচিচ্ছেনৈবভিজ্যেযু ন এব গোধরঃ॥

—শ্লোকটির মর্ম গ্রহণ করিয়া অকিঞ্চন বা সজ্জন হইয়াছেন। বিনাশী অসদ্বস্তুর প্রতি তাঁহার কোন অভিনিবেশ নাই। তিনি প্রপন্ন।

সর্বোপকারক (১০)

চারি শ্রেণীতে জীবমধ্যে ১ম শ্রেণী অন্যাভিলাষী

জগতে জীবগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। অন্যাভিলাষী, কল্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত। প্রথমতঃ অন্যাভিলাষী বাহারা কর্ম, জ্ঞান বা ভক্তিযোগ স্বীকার না করিয়া নিজ স্বচিন্তাতে চালিত হইয়া যথেষ্ট আচরণ করেন এবং তাদৃশ আচরণদ্বারা নিজ সুখ-দুঃখকেই পুরুষার্থ বলিয়া জানেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী—ত্রেবর্গক কল্মী

দ্বিতীয়তঃ কল্মীবলম্বক, বাহারা সংকর্ম অনুষ্ঠানপূর্বক নিজ সুখভোগ উদ্দেশ্যে চালিত হইয়া পুণ্য সংগ্রহ করেন। পিতৃশ্রদ্ধা, স্বর্গসুখভোগ, মহা: জন সত্য তপোলোক-সাভেচ্ছায় চেষ্টাবান্, জীবের জড়সুখ লাভের উদ্দেশ্যে ঐহিক চেষ্টা-বিশিষ্ট, বিজ্ঞানালয়, চিকিৎসালয়, অশ্বখপ্রতিষ্ঠা, পথনির্মাণ জলদানাদি ইষ্টাপূর্ত্ত, ব্রাহ্মণ-ভোজন, লোকচিত্তকর শ্রীক্ষা-মন্দির প্রভৃতি কার্যদ্বারা পুণ্য সংগ্রহপূর্বক তত্ত্ব সংকর্মের পরিবর্তে ফলস্বরূপে নিজ প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ বা নিজের জড়েশ্বরতর্পণ প্রভৃতি কার্যে তৎপর। উহাকেই তাঁহারা ধর্ম্য, অর্থ ও কাম-লাভ নামক ত্রিবর্গমিদ্ধি বলিয়া থাকেন। কল্মীকাণ্ডরত মানবগণ অনিত্য ফলভোগ কামনায় জগতের প্রকৃত উপকার করিতে সমর্থ নহেন।

২য় শ্রেণী মধ্যে পুণ্যকামী কর্ম্মী পরোপকারক নহে

পূণ্যবান কর্ম্মীর ব্রহ্ম চর্চাযোগ ও বৈদিকানুষ্ঠানগত বর্ণাশ্রমধর্ম প্রভৃতি অনিত্য সংকর্ম্মগুলি, অজ্ঞাভিলাষীর যথেষ্টাচার হইতে অপেক্ষাকৃত সং। অজ্ঞাভিলাষী অপেক্ষা সংকর্ম্মপর মানব অনেকের অনিত্য ও আংশিক উপকার করিতে সমর্থ কিন্তু সর্বোপকারক নহেন। কর্ম্মী নিজেরই যথার্থ উপকার করিবার সম্বন্ধে উদ্যোগীন, আবার নিজ জন বলিয়া যাতাদিগকে বলেন তাহাদের স্বরূপ নির্ণয়ে অসমর্থ। ঐহিক বা আনুভূতিক খণ্ডকালগত শ্রেয়ঃলাভের পন্থা ব্যতীত নিত্যসুখ ও পূর্ণসুখের দৃশ্য তাহার বস্তুমানে দৃশ্য গোচর হয় না, ইত্যই হৃৎকের বিষয়। কর্ম্মী, জগতে বক্তৃতা করিয়া উপদেশ দেন এবং নিজে সেই উপদেশফলে অনিত্য জড়সুখ অর্জন করেন মাত্র।

৩য় শ্রেণী—জ্ঞানী, দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনলোপকারী নির্বিশেষবাদী

তৃতীয়তঃ জ্ঞানী, কর্ম্মকাণ্ডনিপুণের দ্বায় আংশিক ও অনিত্য সুখের ভিক্ষু নহেন। জ্ঞানীর বিচারে খণ্ডকালের অনিত্য সুখ কখনই পূর্ণ নহে; সুতরাং কর্ম্মীকে তিনি নিত্যসুখ খর্ব্ব দৃষ্টি-সম্পন্ন ভোগী বলিয়াই জ্ঞানেন। জ্ঞানীর মতে অজ্ঞাভিলাষীর চেষ্টা ও কর্ম্মীর পুণ্যাদি উভয়ই বর্জনীয়। তিনি ভোগী নহেন, আপনাকে ত্যাগী বা বৈরাগী বলিতে বাস্তব। জ্ঞানী বলেন ভোগবুদ্ধিতে অজ্ঞান বাস করে, কালদ্বারা তাহা পরিবর্তিত হয়। তাহার বিচার মতে বস্তুর অদ্বয়তার সহিত নির্বিশেষতাব বিজড়িত। নির্বিশেষ বিচারে বস্তুর বিচিত্রতা না থাকায় দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শনগত নিত্য বিশেষ নাই। অহং-গ্রহোপাসক মুহুর্ৎ জ্ঞানী বলেন,—এই ভেদ-জগতে অজ্ঞানক্রমে দ্বৈতভাব উদয় হওয়ায় এই প্রকার অশান্তি কল্পিত হইয়াছে। অজ্ঞান তিরোহিত হইলেই অখণ্ড জ্ঞান, অখণ্ড সত্তা ও অনবচ্ছিন্নানন্দের উদয় হয়। তখন জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন, আনন্দান্তিত্ব, আনন্দাহুতবকারী ও আনন্দ নামক বিশেষত্ব অনন্তকালের অন্ত বিলুপ্ত হইয়া অদ্বয়তার নির্বিশেষত্বই অবশিষ্ট থাকে।

৩য় শ্রেণী—জ্ঞানী—পরোপকারক নহে

জ্ঞানীর এই নির্বিশেষ কেবল্যদ্বৈতসিদ্ধিই বহুমাননের বিষয়। তিনি মনে করেন এইরূপ শুদ্ধ, পূর্ণ, নিত্য, মুক্ত ভগবৎসত্যকে জড়ের প্রকারভেদরূপে

প্রচার করিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিবেন। এইরূপ একটি কাল্পনিক জড়বিচার কখনই ভগবানের অনন্ত শক্তিসত্তার হ্রাস করিতে সমর্থ হয় না। ভ্রমরোগের চিকিৎসার জ্ঞান অজ্ঞাভিলাষী ও কর্মী অসমর্থ হইয়াছে দেখিয়া জ্ঞানাবলম্বকের মুমুক্শুবিচারে ঈশ্বর-রাহিত্যের মাহাত্ম্য দর্শনে ভগবন্তুক্রগণ উপকৃত হন না। যথেষ্টাচারী নাস্তিক্য প্রচার করিতে গিয়া যে-সকল কথা বলিয়াছেন তাহাই জ্ঞানী ন্যূনাধিক সমর্থন করিয়া নিজদল পুষ্টি করার ভগবন্তুক্রগণ উপকৃত হইলেন না—একথা মায়াবাদী জ্ঞানীও বুঝিতে পারেন।

জ্ঞানী মুমুক্শুর বিচার ভক্তগণ কর্তৃক ধিকৃত

মুমুক্শু, বিচারকের পরিচ্ছদে যে-সকল উপদেশ বাহাকে দিলেন, সে-সকল কথাই অজ্ঞানোক্ত জড়বিচারাবধীন, সুতরাং তাদৃশ করণসাহায্যে তাদৃশ অহুষ্ঠানের মাহাত্ম্য ভক্তিব্যোগীর নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও হাস্যাস্পদ মাত্র। জ্ঞানীর লক্ষ্য বস্তু কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইলে আত্মবিনাশরূপ চরম ফল লাভই ঘটে। নির্বিশেষত্ব কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিয়া তাঁহার ঐ প্রকার দলপোষণ স্বীয় অপকতার নিদর্শন মাত্র। অপক পনসকে যদি প্রপক কাটাতে পরিণত করা হয় তাহা হইলে উহা এঁচড়ে পাকা বলিয়া উদ্দেশের বাধ্যত করে।

জ্ঞানীর মোক্ষ কাল্পনিক ও জ্ঞানী সজ্জন-চরণে অপরাধী

সর্লশক্তিমান ভগবান্ নিতাকাল পূর্ণ চিদ্বিলাসরঞ্জে নিজ সচ্চিদানন্দস্বরূপ-শক্তি প্রকট করিয়া যে-সর্বোপকারকতা বিস্তার করিতেছেন তাহা ভক্তের নিত্য-পরিপন্থী-নির্বিশেষবাদীর জ্ঞানের গম্য নহে। নিষ্ঠুর জ্ঞানী সজ্জনের চরণে নিত্যকাল অপরাধী বলিয়া মোক্ষের যে-কাল্পনিক চিত্র জড়বিচারে অঙ্কন করিয়াছেন, তদ্বারা ভক্ত বাতীত অস্ত্রের উপকার করিতে সমর্থ মনে করেন। ভক্তিব্যোগের পরিপন্থী জ্ঞানযোগ কখনই কাহারও কোন উপকার করিতে পারে না। জড়বস্তুর অহুপাদেয়তার ইন্ত হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে চিন্ময় শক্তিমান ভগবান্কে কেবলমাত্র নির্বিশেষবাদীকূপে পতিত করিয়া যে-অপরাধ সঞ্চিত হয় তদ্বারা মুমুক্শুর কোন উপকার হয় না এবং ভক্তেরও তিনি উপকার করিতে পারেন না। মায়াবাদী মুমুক্শু তমোগুণের দ্বারা বিচার করিতে গিয়া সচ্চিদানন্দ ভগবন্তুকে জড়নির্বিশেষত্বে স্থাপন করিলেই তিনি কি প্রকারে সর্বোপকারক হইবেন ?

জ্ঞানীর জড়-নির্কির্দেশ্য ভক্তের চিৎ-সবিশেষের তুল্য নহে

জড়নির্কির্দেশ্য কখনই চিৎ-সবিশেষের তুল্য নহে। চিরকির্কির্দেশ্য মুখে বলিয়া উহাকে জড়-সবিশেষের প্রকার ভেদ জ্ঞান করিলে অজ্ঞান পুষ্ট হয়, তাহা কখনই মুক্তপুঙ্খের চিত্তবৃত্তি হইতে পারে না। অতঃপ্রহোপাসক নির্কির্কির্দেশ্য বৈদান্তিক নিজ মংসরতাময় চিত্তবৃত্তিকে শাস্তুরস বলিয়া প্রতিপাদন করিলেই যে তিনি সর্বোপকারক সজ্জন সংজ্ঞা লাভ করিবেন একথা সজ্জন কখনই বলেন না।

মায়াবাদী বা প্রাকৃত সহজিয়া পরোপকারক নহে

কপটভক্ত মায়াবাদী বা প্রাকৃত সহজিয়া বৈষ্ণব-পরিচয়াকাজ্ঞী বলেন যে তাঁহারা সর্বোপকারক যেহেতু তাঁহারা নিঃশেষস কৃষ্ণভক্তিকেই আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহাদের কৃষ্ণসম্বন্ধ জ্ঞানাভাবে তাঁহারা শুদ্ধভক্তসংজ্ঞায় কখনই দৃষ্ট হইতে পারেন না। বেকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের হৃদয়ে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব পুষ্ট হইতেছে, মায়াবাদী, কন্মী, যথেষ্টাচারী প্রভৃতি পরহিংসাময় ভাব-সমূহ হৃদয়ে অন্তঃসলিলা ফজ্জনদীর ছায় প্রবাহিত হইতেছে। মেকালপর্য্যন্ত পরোপকারের স্বরূপ প্রতীতি তাঁহাদের হৃদয়ে অধিকার করিতে পারে না।

চতুর্থ কৃষ্ণভক্ত—কন্মী, জ্ঞানী ও অজ্ঞাভিলাষীর মঙ্গল বিধায়ক

শেষতঃ (চতুর্থ) শুদ্ধকৃষ্ণভক্তই একমাত্র সর্বোপকারক। তিনিই সজ্জন। শুদ্ধভক্তই মায়াবাদীকে তাহার বিচারমূঢ়তা হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ, তিনিই কন্মীকে তাঁহার ফল ভোগবাসনা হইতে উদ্ধার করিতে বলবান, তিনিই কেবল যথেষ্টাচারীকে তাহার ক্ষুদ্র অভিশাষের কৈঙ্কর্য্য হইতে উত্তোলন করিয়া কৃষ্ণ-সেবার নিযুক্ত করিতে ক্ষমবান। সেইজন্যই শুদ্ধভক্ত কলশেখর বলিয়াছেন—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ অথবা পার্থিব অশান্তি অপনোদনের চেষ্টারূপ মোক্ষ শুদ্ধভক্তের থাকিতে পারে না, মুমুক্ষু নান্নী চলনা কখনই শুদ্ধভক্তকে আক্রমণ করিতে পারে না। একমাত্র জীবের নিত্যবৃত্তি হরিদেবাই জীবের পরমোপকারে সমর্থ এবং হরিজনগণই সর্বোপকারক।

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত—সজ্জন ও সর্বোপকার

তাঁহারা (শুদ্ধভক্তগণ) মায়াবাদীর ছায় মতবাদ-প্রচার বা ভোগীর গায় ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলে বিরূপ স্বার্থে প্রমত্ত নহেন। কৃষ্ণস্বার্থ ব্যতীত মায়িক ভোগের স্বার্থ বা শুড়্যাগণের অর্থ ভক্তকে পোষনদিন প্রাপ্ত করিতে সমর্থ

নহে। কৃষ্ণ-প্রপত্তি বাঞ্ছিত জীবের কাঙ্ক্ষনিক অণবর্গ-মার্গে কখনই মায়ার হস্ত
হটতে মুক্ত করিতে সমর্থ নহে। একমাত্র কৃষ্ণৈকপ্রপন্ন সজ্জনই নিজেপকারক
এবং সমস্ত জগৎকে চরিত্র-জ্ঞানে সর্বাঙ্গকারক সংজ্ঞায় নিদিষ্ট হটবার
যোগ্য। শুদ্ধভক্ত সর্বদাই অছাতিলাষী, কন্মী ও জ্ঞানীর দুঃসঙ্গ ছাড়াইবার
চেষ্টায় নিযুক্ত আবার মিছাভক্তগণের দুঃসঙ্গ ছাড়াইবার চেষ্টাও তাঁহার হৃদয়ে
বপবান্। সজ্জনকুলচন্দ্র ঠাকুর নরোত্তম লিখিয়াছেন—“কন্মী, জ্ঞানী মিছাভক্ত,
না হব তাতে অনুরক্ত”। সর্বাঙ্গকারকের বিরূপ বিস্তারিত দয়া, সজ্জনগণ
হৃদয়ে ধারণা করুন এবং জাদৃশ সর্বাঙ্গকারক হটয়া কৃষ্ণসেবা করুন,—ইহাই
শুদ্ধভক্তগণের একমাত্র শিক্ষা। সজ্জন নির্ময়গর। অসজ্জন মৎসর।
মৎসরতা প্রবল হটলে উপকার-বৃদ্ধি তিরোহিত হটয়া অপকার বা হিংসায়
পৰ্যাবসিত হয়। সজ্জন নিভা কৃষ্ণদাস সুতরাং মায়াবাদী, কন্মী বা জ্ঞানীর
মৎসরতা তাঁহাকে কোনদিন আক্রমণ করে না। তিনি বিভ্যাকল মৎসর
সম্প্রদায়ের উপকার করিয়া সর্বাঙ্গকারক নামের সার্থকতা করিয়া থাকেন।

—জগদগুরু ও বিদুপাদ শ্রীমন্ন সরস্বতী প্রভুপাদ

ভক্তিতত্ত্ববিবেক—তৃতীয় প্রবন্ধ

(পূর্বে প্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৬৭ পৃষ্ঠার পর)

ভক্তির স্বভাব-বিবেক

(২) ভক্তি স্বভাবতঃ শুভদা। তত্র শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দ-নামা—

ওষ্মানি প্রীনগং সর্ব-জগতাম্বরকৃত্য।

সদগুণাঃ সুখমিত্যাদিত্যাতানি মনোবিভিঃ ॥

সমস্ত জগতের প্রতি প্রীতি ও সমস্ত জগতের অমুরাগ লাভ, মানবের
যতপ্রকার সদৃশ্য আছে এবং সুখ প্রভৃতি কয়েকটি যজ্ঞলব্ধ প্রাপ্তিতে পণ্ডিতগণ
শুভ বলিয়া থাকেন। পদ্যপুরণে কথিত আছে, যথা—

যেনার্চিতো হরিস্তেন তপিতানি জগন্ত্যপি।

বজাস্তি চন্দ্রবস্ত্র ভক্তমা স্থাবরা অপি ॥

যিনি শ্রীহরিকে অর্চনা করিয়াছেন, তিনি সমস্ত জগৎকে ভূষিত দান
করিয়াছেন। স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত জীবগণই তাঁহার প্রতি অমুরাগ করিয়া
থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, হরি-ভক্তনশীল ব্যক্তি সর্বদা সকলের প্রতি

বিবেচনায় থাকিয়া অনুরাগ করেন। সুতরাং সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরাগ করিয়া থাকে।

ভক্তলোকের সকল সঙ্গুণই সম্ভাব্যতঃ উদয় হয়। ভক্তগণের জীবনী আলোচনা করিলেই সহজে ইহা দৃষ্ট হয়। ভাগবতে তৎসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, যথা—

যশাস্তি ভক্তির্ভগবতাকিঞ্চন। সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাস্তে সুরাঃ।

ভবাবভক্তস্য কুতো মহৎগুণা মনোরথেনাসক্তি বাবতো বহিঃ ॥

ভগবানে বাঁচার অকিঞ্চন। ভক্তি আছে, সমস্ত সঙ্গুণ সহকারে সমস্ত দেবভাগ্য বশীভূত হইয়া তাঁহাতে অবস্থিতি করেন। অসং মনোরথক্রমে বর্জিতাবস্থান্ অকল্প পুরুষের মহৎ গুণ কিরূপে সম্ভব হয়? দয়া, সত্য, নম্রতা, দৈন্ত্য, বৈরাগ্য, জ্ঞান প্রভৃতি যে-সকল মহৎ গুণ আছে, তাহা ভক্তিপূত হৃদয়েই উদিত হইতে পারে। ইতর তৃষ্ণায় ব্যাকুল-হৃদয়ে ঐ সকল গুণ বহু চেষ্টা করিলেও উদয় হইতে পারে না। সুখলাভ শুভ মধ্যে গণিত হইলেও পৃথক বিষয়রূপে বিচারিত হইতেছে।

ভক্তি স্বভাবতঃ সুখদা। শ্রীকৃষ্ণ গোদামী লিখিয়াছেন,—

সুখং বৈষয়িকং ব্রাহ্মমৈশ্বর্যক্ষেতি তত্রিধা।

বহুজীবের সুখ তিন প্রকার। মূঢ় জীবের বৈষয়িক সুখ নাই। তিন প্রকার সুখ—বৈষয়িক-সুখ, ব্রাহ্ম-সুখ ও ঐশ্বর-সুখ। ঋতুজগতে যত প্রকার জড়শ্রিত সুখ আছে সে-সমুদয়ই বৈষয়িক সুখ। যোগীদিগের অষ্টাদশ বিদ্বি, কন্যাদিগের স্বর্গাদি-লোক-সুখ এবং নিত্যন্ত ইঞ্জিয়-পবিত্র ব্যক্তিদিগের ঐহিক সুখ সমস্তই বৈষয়িক সুখ। জড়কে ব্যতিরেক চেষ্টা দ্বারা পূর করিতে বিকারহীন স্রোতের সতি নিজে আত্মাকে ঐক্যরূপে চিন্তা করিতে করিতে যে নির্বিশেষ সুখ হয়, তাহাকে ব্রাহ্ম সুখ বলে। সর্বৈশ্বর্য-পূর্ণ ভগবানের নিত্য আনুগত্য-জনিত যে-সুখ হয়, তাহাকে ঐশ্বর সুখ বলি। হরিভক্তি স্বভাবতঃ সমস্ত সুখই দিতে পারেন, নিষ্কণ্ট হৃদয়ে উদিত হইলে ঐশ্বর-সুখ দেন। অবস্থা-বিশেষ এবং চিত্তের বাসনানুসারে বাঁচাদের চাতুর্ক্যগিক সুখকে সুখ বলিয়া বোধ হয়, তাঁহাদিগকে শুভং সুখ দান করেন। যথা ভক্তে,—

সিদ্ধয়ঃ পরমার্শুর্গ্যা ভুক্তিমুক্তিঞ্চ শাস্বতী।

নিত্যঞ্চ পরমানন্দং ভবেদগাবিন্দ-ভক্তিযঃ ॥

অশ্বিনা, মহিমা, লক্ষ্মিমা, পাণ্ডি, ঈশিতা, বশিষ্ঠ, প্রাকাম্য এবং কামাবশ্যিতা এই আটটী যোগসিদ্ধি। ভুক্তি অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ময় স্তম্ভ, মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ এবং নিত্য পরমানন্দ এসমস্তই গোবিন্দ-ভক্তি হইতে উৎপন্ন হয়।

‘হরিভক্তিসুখোদয়’-গ্রন্থে লিখিত আছে,—

ভূগোহপি যাচে দেবেশ স্বয়ি ভক্তিদূর্দান্ত মে ।

যা মোক্ষান্ত-চতুর্বর্গ-ফলদা সুখদা লতা ॥

হে দেবেশ ! আমি পুনরায় তোমাতে দৃঢ়া ভক্তি যাঞা করি। যে-ভক্তি-প্রভাবে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ ফল ও প্রেমস্বর্থ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারিণ লভ করিয়া থাকেন। ফলকথা এট যে, ভক্তি সমস্ত ফল দিতে সক্ষম। অংফলে তুচ্ছ-জ্ঞান করিয়া ভক্তলোক কেবল প্রেম-ফলকে অদেষণ করেন। জ্ঞান ও কর্ম ভক্তিকে আশ্রয় না করিলে নিজ নিজ প্রতিজ্ঞাত ফল দান করিতে পারে না; অতএব ভক্তি ব্যতীত জীবের কোন অবস্থায় বা কোন অধিকারে সুখোদয় হয় না।

(৩) ভক্তি স্বভাবতঃ মোক্ষ-লঘুতাকুৎ । ভক্তি কিছুমাত্র উদিত হইলেই মোক্ষ পর্যান্ত চতুর্বিধ পুরুষার্থ সম্পূর্ণরূপে ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। যথা, নারদপঞ্চরাত্রে,— হরিভক্তি মহাদেবীঃ সর্বা মুক্তাদি-সিদ্ধয়ঃ ।

ভুক্তয়ত্ত্বতাস্তৃশাশ্চৈটকাবদনৃত্যতাঃ ॥

মুক্তাদি সমস্ত সিদ্ধি এবং অতুচ্ছ ভুক্তিসমূহ হরিভক্তি মহাদেবীর চৌটকা অর্থাৎ পরিচারিকারূপে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। অতএব অতিশুন্দর-রূপে শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

যনাগেব প্রাক্ষটায়ান্ত্রদয়ে ভগবদ্রতৌ ।

পুরুষার্থস্ত চত্বারভূগাংস্তে সমস্ততঃ ॥

অতএব যখন ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই বর্গ-চতুষ্টয়কে স্বভাবতঃ তুচ্ছ বোধ হইবে, তখনই শুদ্ধভক্তির উদয় স্বীকার করা যাইবে।

(৪) হরিভক্তি স্তুল্লভা ; অতএব শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন, যথা,—

সাদ্বর্নোবৈবনাস্টৈবলভ্যা সুচিরাদপি ।

হরিণা চান্দেয়েতি বিধা সা শ্রাৎ স্তুল্লভা ॥

হরিভক্তি দুই প্রকারে স্তুল্লভা। প্রথমতঃ চিরকাল ‘আসঙ্গ’-শূন্য হইয়া প্রজ্ঞা পুঞ্জ সাধন করিলেও তাহা পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ ‘আসঙ্গ’-যুক্ত সাধনে প্রবৃত্ত হইলেও শ্রীহরি উহা সহজে দেন না। ‘আসঙ্গ’-শব্দে ভজন-

নৈপুণ্যকে বুঝিতে হইবে। ভজ্ঞন-নৈপুণ্য-বিহীন যে-কোন সাধনই হউক, তাহাতে হরিভক্তি লাভ হয় না। ভজ্ঞন-নৈপুণ্যের সহিত বহুদিন ভজ্ঞন করিলে নাশাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধ দূরীকৃত হয়। তাহা হইলে ভগবৎ-কৃপাক্রমে স্বরূপ-জ্ঞানময়ী পরা ভক্তি উদ্ভিত হন। এতদ্ব্যতীত একরূপ উক্ত হইয়াছে,—

জ্ঞানতঃ স্নানভা মুক্তিভূ-ক্লিষ্টজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।

সেয়ং সাধন-সাহসৈহ-রিভক্তিঃ সুতুল্লভঃ।

জ্ঞান হইতে মুক্তি সহজে লাভ করা যায় এবং যজ্ঞাদি পুণ্যকর্মদ্বারা ভুক্তি অনায়াসে পাওয়া যায়। কিন্তু সহস্র সহস্র সাধনেও হরিভক্তি সহজে পাওয়া যায় না।

ভগবান্ যে সহজে ভক্তি দেন না, তাহা ভাগবতে কথিত হইয়াছে, যথা—

রাজন্ পতিশ্চরলং ভবতাং বদুনাং

দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ কচ কিকরো বঃ।

অস্ত্রেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো

মুক্তিং দদাতি কহিচিং অ ন ভক্তিযোগম্॥

হে রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দ তোমাদের ও বহুবংশীয়দিগের পতি, গুরু, কুল-নাথক, দেবতা, প্রিয় এবং কখন কখন আশ্রয়দাতা। ইহা সাধারণ সৌভাগ্যের বিষয় নয়। কেননা, ভজ্ঞনকাবীদিগকে তিনি যত শীঘ্র মুক্তি দান করেন, তত শীঘ্র পরমধন ভক্তিযোগ দান করেন না। এতদ্ব্যতীত শ্রীজীব গোপাচার্য লিখিয়াছেন,—“তস্মাদাসক্তেনাপি কৃতে সাধনভূতে সাক্ষাৎভক্তিযোগে সতি বাবৎ ফলভূতে ভক্তিযোগে গাঢ়াসক্তির্ন জায়তে তাবন্ন দদাতীত্যর্থঃ।” তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা নববিধ সাধনায় অবলম্বন করিয়া ভগবন্তুজনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা যে-পর্য্যন্ত শুদ্ধস্বরূপ-জ্ঞানময়ী ফল ভক্তিরূপা রতিতত্ত্বে গাঢ় আসক্তি না করেন, সে-পর্য্যন্ত ভগবান্ তাঁহাদিগকে শুদ্ধা ভক্তি দেন না, তাঁহাদের ভজ্ঞনাদি সমস্তই ছায়াভক্ত্যাভাসরূপে থাকে।

(৫) ভক্তি স্বভাবতঃ সান্দ্ৰানন্দ-বিশেষাঙ্গা। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, ভগবান্ পূর্ণসন্নিধানন্দ-স্বরূপ এবং জীব তাঁহার কিরণ-কনস্থানীয় অণুচিদানন্দতত্ত্ব-বিশেষ। অতএব ভীবেতেও চিং ও তদ্ব্যবস্থাপন আনন্দ কিং পরিমাণে আছে। আনন্দ বলিলে সহজে লোকে জড়ত্বকে মনে করেন, কিন্তু সমস্ত জড়সুখ সমষ্টি করিলেও আনন্দ-তত্ত্বের নিমিত্ত স্বভাবতঃ নান। জড়গত আনন্দ অত্যন্ত শিথিল ও ক্ষণিক। চিদগত আনন্দ সাম্র্য অর্থাৎ নিবিড়

ব' ঘণীভূত তত্ত্ব-বিশেষ। ভক্তি সেই স্বাভাবিক-স্বরূপ। ভক্তির তুল্য আর
কোনোর আনন্দ নাই। ইহা জীবের সহজানন্দ। ব্রহ্মসুখও ইহার নিকট
কিছুই নহে। যেহেতু জড়সুখকে অতিক্রম করতে বাতিরেক চিন্তাতে যে
নির্বিশেষ সুখকে কল্পনা করা যায়, তাহার মত ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দ
জীবের নিত্যানন্দ নহে, জড়ের বিপরীত চিন্তাসুখ মাত্র। অতএব
শ্রীরাগ কহিয়াছেন,— ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরাধ্ব-গুণীকৃতঃ।

নৈতি ভক্তিসুখাভ্যাংধেঃ পরমাণু-তুলামপি ॥

যাহাকে কেবল 'জড়ৈক-বাদিগণ অর্থাৎ নির্বিশেষ-বাদিগণ ব্রহ্মানন্দ বলেন,
সেই আনন্দকে যদি পরাধ্ব-গুণীকৃত করা যায়, তাহাও ভক্তিসুখ সমুদ্রের
পরমাণুর তুলা হয় না। তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মানন্দকে যতই আগ্রহদ্বারা
সম্বন্ধিত করা যায় না কেন, তাহা কখনই জীবের স্বরূপগত আনন্দের কিছুমাত্র
সাদৃশ্য লাভ করিবে না। জীবের স্বরূপগত আনন্দ, সহজ বস্তু, অতএব
স্বাভাবিক। ব্রহ্মানন্দ জীবতত্ত্বের বিকল্পগত-চেটাজনিত সুখবিশেষ হওয়ায়
তাহা অস্বাভাবিক, অতএব অস্থায়ী। অতএব 'হরিভক্তিসুখোদয়ে'—

ত্বংসাক্ষাৎ-করণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাক্রি-স্তিতস্য মে।

সুখানি গোপ্পদাত্তে ব্রহ্মাপি জগদ্গুরো ॥

হে ভগবন্! তোমাকে সাক্ষাৎ-করণদ্বারা শিশুর আনন্দ-সমুদ্রে আমি
স্থিত হইয়াছি। জড়সুখের ত' কথাই নাই। ব্রহ্মসুখ প্রভৃতিও আমার নিকট
এখন গোপ্পদ-তুলা বোধ হইতেছে। শাস্ত্রে অনেকস্থলে এইরূপ বাক্য
আছে। বাহ্যভাষে আর শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিলাম না।

(৬) ভক্তি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী। যথা শ্রীরাগবাক্য,—

কৃষ্ণা হরিং প্রেমভাষং প্রিয়বর্গ-সমবিতং।

ভক্তির্বশীকরোতীতি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী মতা ॥

সাধন-দশাগত শুদ্ধাক্রি সমস্ত প্রিয়বর্গ-সহিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমদ্বারা বশীভূত
করিয়া থাকেন, ইহাই ভক্তিদেবীর শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণীত্ব-ধর্ম। তাৎপর্য এই যে,—
সাধনদশায় যে-পর্যন্ত শুদ্ধা ভক্তি উদ্ভিত না হন, সে-পর্যন্ত ভক্ত্যভ্যাসই
কার্য করে। সেই অবস্থায় ভক্তির গুণভিত্তি। কিন্তু সাধনদশা-সম্বন্ধে যখন
শুদ্ধাভক্তি উদ্ভিত হন, তখন ভক্তনাঙ্গের কয়েকটি সৌন্দর্য প্রকাশ পায়।
জীবের সির-স্বরূপানুভব ও ভগবন্তত্ত্বের সির-স্বরূপানুভব এই সৌন্দর্যগুলি মধো
প্রদীপ্ত হয়। ফলভূত ভক্তিতে গাঢ় আসক্তিরূপ একটি ব্যাকুলতা জন্মে।

তদ্রূপ ভজন-দশা উপস্থিত হইলে শুদ্ধা সাধনভক্তি শীঘ্রই রক্তি বা ভাবরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া অবশেষে প্রেমরূপে দেদীপ্যমান হন। ভাবাবস্থায় ভক্তি প্রিয়বর্গ-সহিত শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ দ্বারা করেন, কিন্তু প্রেমাবস্থায় ভক্তি ভক্তকে শ্রীকৃষ্ণলীলার উপকরণ করত পরমরস সন্তোষ করেন। এই সকল বিষয় পরে আরও পরিষ্কৃত হইবে। এ-সমুদয় বিচারপূর্বক বিশ্ববৈষ্ণব-দাস নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্লোক লিখিতেছেন,—

ক্রেশয়ী শুভদা ভক্তির্যদা সা সাধনাত্মিকা ।
 হৃদয়ে বদ্ধ-জীবানাং তটস্থ-লক্ষণাষিতা ॥১॥
 ক্রেশয়ী শুভদা মোক্ষলবুতাকং সুহৃৎভিত্তি ।
 সা ভক্তির্ভাবরূপেণ যাবত্তিষ্ঠতি চেতনী ॥২॥
 প্রেমরূপা যদা ভক্তিশুদ্ধা তত্তদগুণাষিতা ।
 সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা ॥৩॥
 মুক্তানামেব সা শখং স্বরূপানন্দরূপিণী ।
 সম্বন্ধ-স্বরূপা নিতাং রাজতে জীব-কৃষ্ণয়োঃ ॥৪॥
 তক্ত্যাভাসেন বা লভ্যা মুক্তির্মায়া-লিঙ্গমুদনী ।
 সা কথং ভগবদ্ভক্তিঃ সামাং কাঙ্ক্ষতি চেটিকা ॥৫॥

শুদ্ধভক্তির তিনটি দশা। সাধন-দশা, ভাব-দশা ও প্রেম-দশা। সাধনদশাপ্রাপ্ত ভক্তির দুইটি স্বভাব,—ক্রেশয়িত্ব ও শুভদত্ব। ভাবাবস্থায় ভক্তির চারিটি স্বভাব লক্ষিত হয়,—ক্রেশয়িত্ব, শুভদত্ব, মোক্ষলবুতাকারিত্ব ও সুহৃৎভিত্তি। প্রেমাবস্থায় ভক্তি ঐ চারিটি স্বভাব প্রকাশ করেন এবং তদধিক সান্দ্রানন্দ-বিশেষত্ব ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষকত্ব আর দুইটি স্বভাব প্রকাশ করেন। জীব যতদিন বদ্ধাবস্থায় থাকেন ততদিন ভক্তির স্বরূপগত স্বভাব তিনটি অর্থাৎ সান্দ্রানন্দ-স্বরূপত্ব, শ্রীকৃষ্ণাকর্ষকত্ব ও সুহৃৎভিত্তি স্বভাবের সহিত তিনটি তটস্থ স্বভাব অর্থাৎ ক্রেশয়িত্ব, শুভদত্ব ও মোক্ষলবুতাকারিত্ব স্বভাব অনুভূত থাকে। মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীবের ভক্তি—জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে নিত্যসম্বন্ধগত সেবা ও স্বরূপানন্দ-রূপিণী হইয়া বিরাজমান হন। মায়ায় আবরণ-নাশিনীরূপা মুক্তি ভক্ত্যাভাসেই লভ্য হইতে থাকে। সেই মুক্তি ভগবদ্ভক্তি-দেবীর বহু পরিচারিকার মধ্যে একটি সামান্য পরিচারিকা-মাত্র। সে কিরূপে ভক্তিদেবীর সমান হইতে বাসনা করিতে পারে?

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীগীতার মঙ্গলবাণী

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৬ পৃষ্ঠার পর)

দ্বাদশ অধ্যায়

[ভক্তি-যোগ]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—২)

কেহ করে ফলভাগ

ডাকে বিশ্বেশ্বরে ।

কেহবা করে ধ্যান

অব্যক্ত অক্ষরে ॥১॥

পার্থ চাহে জানিবারে

শ্রেষ্ঠ কোন ভক্ত ।

ভগবানে সদা যুক্ত

অথবা অব্যক্ত ॥২॥

কহিলেন জনার্দন

শ্রেষ্ঠের লক্ষণ ।

শ্রেষ্ঠ ভক্ত সর্ব কৰ্ম

করে সমর্পণ ॥৩॥

সর্বদা রয়েছে যুক্ত

ঈশ্বরের সাথে ।

সেই ভক্ত শ্রেষ্ঠতর

জানিবে তাঁহাকে ॥৪॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৩—৭)

অক্ষর অচল প্রব

অচিন্ত্য স্বাগত ।

সর্বব্যাপী অনির্দেশ্য

নিগূর্ণ অব্যক্ত ॥৫॥

নিগূর্ণ ঈশ্বর চিন্তা

বড়ই কঠিন ।

সগুণের চিন্তা করা

তাই সমীচীন ॥৬॥

সর্ব কৰ্ম সমর্পিলে

প্রভুর চরণে ।

প্রভুধামে মিলে স্থান

তাঁহারি সদনে ॥৭॥

যেই চিত্ত সমর্পিত

প্রভু পরায়ণ ।

ভারণ করেন তাহে

পতিত পাবন ॥৮॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৮—১১)

মনস্থির করিবারে

করহ প্রয়াস ।

ঈশ্বরীয় চিন্তা কর

প্রগাঢ় প্রয়াস ॥৯॥

ইহাতেও মন যদি

হয় উচাটন ।

কর কৰ্ম প্রীতিভরে

কৃষ্ণে পরায়ণ ॥১০॥

তাহাতেও অস্থিরতা

আসে যদি মনে ।

সমর্পিলে কৰ্মফল

প্রভুর চরণে ॥১১॥

কৰ্মরাজি সমর্পিলে

প্রভু প্রীত হয় ।

প্রভু যবে হয় প্রীত

কিবা আর ভয় ॥১২॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১২—১৪)

না বুঝিয়া অর্থ কিছু

বৃথা-শাস্ত্র-পাঠ ।

ইহা থেকে আরো ভাল

সাধু সদালাভ ॥১৩॥

আলাপ হইতে শ্রেষ্ঠ

ধ্যান ও ধারণ ।

তদপেক্ষা আরো ভাল

কর্ম ফলার্পণ ॥১৪॥

কর্মফল সমর্পিলে

হয় শান্তিলাভ ।

ভক্ত কহে হরিকথা

লাভে সঙ্গলাভ ॥১৫॥

সুখ তাহে আবে সম

শূন্যে অহঙ্কার ।

মমতা বিতীন চিত্ত

ক্ষমে স্বাকার ॥১৬॥

বিদ্বেষ ভুলিয়া যায়

মিত্র ভাবাপন্ন ।

তুর্দিনে অধীন নহে

সতত প্রসন্ন ॥১৭॥

দীনজনে করে দয়া

সংযত চিত্ত ।

সেই ভক্ত উপযুক্ত

তাহে প্রভু প্রীত ॥১৮॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৫—২০)

প্রিয় ভক্ত কহে তাহে

যেজন নির্ভীক ।

অন্যকে না দেয় বাণী

কহি অহুচিৎ ॥১৯॥

দেহ মনে রহে শুচি

না রহে কামনা ।

অনল উদাসীন

উদ্বিগ্ন জানেনা ॥২০॥

কর্ম করে সর্বক্ষণ

ফলে নাহি আশা ।

প্রভুকে ডাকয়ে সদা

তিনিই ভরসা ॥২১॥

নহে হরষিত অতি

সুখ সন্ধিক্ষণে ।

শোকে নহে অভিভূত

রহে সন্তর্পণে ॥২২॥

শীত-উষ্ণ সমবোধ

ভক্ত স্থিরচিত্ত ।

মোহেতে জড়িত নহে

মমতা রহিত ॥২৩॥

বিষয়ে নাহিক স্পৃহা

বাণী সুসংযত ।

শত্রু-মিত্রে সমচিত্তে

দ্বিধাহীন ভক্ত ॥২৪॥

নিন্দা-স্তুতি সমতুল্য

অল্লিতে সন্তুষ্ট ।

প্রিয়ভক্ত বহুগুণে

হয় পরিপুষ্ট ॥২৫॥

অমৃত সমান ধর্ম

যে করে পালন ।

সেই ভক্ত গুণযুক্ত

প্রভুর আপন ॥২৬॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল,

কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্ত-বিভাগের পদস্থ অফিসার,

নিউদিল্লী ।

উদ্ধারের পথ

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮৪ পৃষ্ঠার পর)

যোগপথের বিশ্লেষণ ও যোগ-চেষ্টার অপকর্ষ প্রদর্শন

জ্ঞানী ও যোগী উভয়েই মুমুক্ষু। মুমুক্ষু যাজ্ঞেই ফলভোগবাদী। জ্ঞানীর সাধ্য মোক্ষ এবং যোগীর সাধ্য কৈবল্য। জ্ঞানী ও যোগী সাধ্যলাভ করার জন্ত সাধনা করেন এবং সাধ্যলাভ হ'লে আর সাধনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। জ্ঞানীর উপাস্ত নির্বিশেষ ব্রহ্ম, আর যোগীর উপাস্ত জীব হৃদয়ে বিজ্ঞান পরমাত্মা। কঠোপনিষদ্ (২।১।২) বলেছেন,—“অদৃষ্ট মাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি”—অর্থাৎ “অদৃষ্ট মাত্র পরিমাণ পরমাত্মা-প্রতীকীভব-স্বরূপে আছেন।” পরমাত্মার অদেয়শক্তি যোগী নিয়ত তৎপর থাকেন। পরমাত্মার জ্ঞান বলতে কক্ষের একাংশের জ্ঞান বুঝায়।

“কক্ষাংশ পরমাত্মা বৈ ব্রহ্ম তজ্জ্যোতিরিব চ।

পরবোমাধিপত্যৈশ্বৰ্য্য-মূর্তি ন সংশয়ঃ ॥” (গোপালতাপনী)

অর্থাৎ—“শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সর্বৈশ্বর। পরমাত্মা তাঁহার অংশ। ব্রহ্ম তাঁহার জ্যোতি। পরবোমনাথ নারায়ণ তাঁহার ঐশ্বৰ্য্যবিলাস মূর্তি বিশেষ। এই সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র সংশয় নাই।”

কক্ষের ব্রহ্ম পরমাত্মা নামগুলি গোপনামরূপেই শাস্ত্রে কথিত হয়েছে। গীতাতেও ভগবান্ কক্ষব্রহ্ম বলেছেন,—বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎনুমেকাংশেন স্থিতো জগৎ—অর্থাৎ তিনি একাংশে পরমাত্মারূপে সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হ'য়ে সমুদয় বিভূতি প্রকাশ করেছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে—

“আত্মাত্মর্যামী যারে যোগশাস্ত্রে কয়।

সেই গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয় ॥”

ব্রহ্মপথাক্রম হ'বার মার্গকে যোগ বলা হয়। ঈশ্বর চিন্তারূপ ধ্যানই যোগ। যোগী সাধারণতঃ দুই প্রকার—সগর্ভ ও নিগর্ভ। সগর্ভ ও নিগর্ভ যোগীর লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—

“কেচিৎ হৃদেহাস্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তদ্।

চতুর্ভূজং কঞ্জরখাদ্য-শঙ্খ-গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥” (ভাঃ ২।২।৮)

অর্থাৎ,—“কোন কোন যোগী হ্রীং দেহস্থিত হৃদয়মধ্যে প্রাদেশমাত্র শঙ্খ-চক্র-গদাপাদধারী চতুর্ভূজ পুরুষকে ধারণাধারা স্মরণ করে থাকেন— ইহাই সগর্ভ যোগীর লক্ষণ।”

“এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলক্ভাবো

ভক্ত্যা দ্রবদ্রুদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ ।

উৎকণ্ঠাবাপ্পকলয়া মুহুরদ্যমান-

স্তুতাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্কিবুদ্ভুক্তে ॥” (ভাঃ ৩।২৮।৩৪)

অর্থাৎ,—ভগবান্ শ্রীহরিতে প্রেম হ’লে হৃদয় দ্রব হয় এবং আনন্দে পুলকাদি উৎপন্ন হয়, তখন বড়িশের ন্যায় ধ্যানযুক্ত চিত্তকে ধোয়বস্তুর ধারণা হ’তে ক্রমে ক্রমে বাহির করে ফেলে—ইচ্ছাট নিগর্ভ যোগীর উদাহরণ ॥”

সগর্ভ ও নিগর্ভ-ভেদে প্রত্যেকের যোগসাধনায় যোগারুণকু, যোগাক্রুত ও প্রাপ্তি-সিদ্ধি আছে। যোগারুণকুগণ যোগসাধনার যম, নিয়ম, আসন, প্রানায়াম,—এই শারীরিক কর্মগুলি কবে যোগে আবেশণ করতে ইচ্ছুক হন। আর যোগাক্রুতগণ ধ্যান-ধারণা-প্রত্যাহার রূপ যম বা শাস্তি লক্ষ্য করে অগ্রসর হন। ভগবান্ কৃষ্ণ কিঞ্চিৎ সর্বিশেষ ব্রহ্মরূপে বা পরমাত্মারূপে শাস্ত্রবিশিষ্ট বিষয় হ’লেও যোগ-সাধক ঐ সমস্ত প্রক্রিয়ার কামাদির বশীভূত হ’য়ে অবান্তর বিভূতিতে লুপ্ত হয়। যোগমার্গে ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার—এগুলি মানসিক কর্ম। অষ্টাঙ্গ যোগের উক্ত সপ্ত অঙ্গ অতিক্রম ক’রে পরিশেষে যে-সমাধি লাভ হয়, তাহাও আধ্যাত্মিক কর্মের অন্তর্গত। অষ্টাঙ্গ-যোগের সমাধিতে দেহ-বিষয়াদির চিন্তা না থাকলেও তা’তে ভগবৎ প্রেমের উদয় হয় না। অতএব যোগমার্গ কর্ম-মার্গেরই অঙ্গ-বিশেষ। সগর্ভ ও নিগর্ভ যোগীর কেহই সর্বিশেষ পরমপদ পরব্যোমধ্যম বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন না। উভয়ের প্রাপ্য বৈকুণ্ঠের বাহিরে অবস্থিত নির্বিশেষধাম ব্রহ্মলোক। যোগাভ্যাসের পরিণাম সম্পর্কে শাস্ত্র বলেন,— “তমেব বিদিত্বাতি-নৃত্যুশেতি”। (শ্বেঃ ৩।৮)

অর্থাৎ—“শ্রুতিশ্রুত যোগীর নির্বিশেষ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় অর্থাৎ জড়-মোক্ষ ও চিং-প্রকৃতিকে লাভ করেন ॥”

রাজযোগী পাতঞ্জলি বলেছেন,—“যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ” অর্থাৎ—“চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ।” অতএব যোগের দ্বারা মনেরই উন্নতি সাধন হয়। তবে কৃষ্ণ-রূপা ব্যতীত মনের সম্পূর্ণ নিরোধ বা নিগ্রহ অতীব দুষ্কর। আত্মার উন্নতি সাধনের বিষয় যোগ-শাস্ত্রে দেয়া যায় না; পরস্তু সাধন-ভক্তির দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন হয়ে থাকে। যোগের দ্বারা মনের

নিগ্রহ দুইপ্রকারে হয়ে থাকে, যথা—হট-নিগ্রহ ও ক্রম-নিগ্রহ। অবশ্য যোগমার্গে যম-নিষমাদির দ্বারা মনের নিগ্রহ স্থায়ীভাবে না হয়ে সাময়িক ভাবেই হয়ে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টভাবে অষ্টাঙ্গাদি যোগ নির্দিষ্ট হয়েছে,— “যমাদিভির্যোগ পঠেঃ কামলাভহতো মুহঃ।

মুকুন্দ সেবয়া যদ্বং তথাক্সা ন শ্যামতি ॥” (ভাঃ ১।৬।৩৬)

অর্থাৎ—“মুকুন্দ-সেবন দ্বারা কাম-লোভাদির বশীভূত অশান্ত মন যেক্রপ সাক্ষাৎ নিগ্রহীত হয়, যম-নিষমাদি অষ্টাদশ যোগমার্গদ্বারা সেক্রপ শান্ত হয় না।” যোগের অনুষ্ঠানে জীবের আদৌ মজল হয় না। তত্ত্ব মুচুকুন্দের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, যথা,—

“যুগ্মানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।

অক্লীণ বাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুৎথিতম্ ॥” (ভাঃ ১০।৫১।৬০)

অর্থাৎ—“হে রাজন্! অভক্তযোগী এবং জ্ঞানিগণের মন প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠানেও বাসনাশূন্য না হয়ে পুনরায় বিষয়াভিমুখী হ’তে দেখা যায়।” যোগের দ্বারা লব্ধ সমুদয় অনিমাди সিদ্ধি, ঐশ্বর্য প্রভৃতি ভুক্তিবাহ্যর অন্তর্গত। যোগীরা প্রায়ই ‘বিভূতি’ ভোগ করতে করতে নিজেকে ‘অহংব্রহ্ম’ বোধে চিংস্র লাভে বঞ্চিত হয়।

জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিবিদ্যোদ ঠাকুর মহাশয় “শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত” গ্রন্থে যোগ সম্পর্কে লিখেছেন,—“বৈদিক পঞ্চাঙ্গি বিজ্ঞা ও নিদিধ্যাসন বৈদিক যোগ-তাপসদিগের প্রক্রিয়া। অষ্টাঙ্গ যোগ, ষড়ঙ্গ যোগ, দশভাঙ্গ যোগ ও গোরক্ষনাথী যোগ প্রভৃতি অনেক প্রকার যোগ প্রস্তাবিত হয়েছে। তন্মধ্যে তত্ত্বোক্ত হটযোগ ও পাতঞ্জলোক্ত রাজযোগ জগতে অনেকটা আদৃত হয়েছে। পাতঞ্জল দর্শনের অষ্টাঙ্গযোগ সর্ব প্রধান। ঐ যোগের তাৎপর্য এই যে, কর্তৃবদ্ধ জীব আদৌ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ—এইরূপ পাঁচটি যম অভ্যাস করবে এবং শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এইরূপ পাঁচটি নিষম অভ্যাস করবে; তদ্বারা অসংকর্ম পরিত্যক্ত ও সংকর্ম অভ্যস্ত হ’লে, আসন, অভ্যাস ও পরে প্রাণায়াম অভ্যাস করতঃ জিতবাস হবেন। জিতবাস হয়ে বিষমুক্তির ধ্যান, পরে ধারণা করবে। সমস্ত বিষয়-নিবৃত্তিরূপ প্রত্যাহার ধ্যানের পূর্বেই করবে। পরে চিত্ত নিশ্চল হ’লে সমাধি করবে। এই প্রক্রিয়ার মূল তাৎপর্য এই যে, অভ্যাসক্রমে কর্ম ত্যাগ পূর্বক কর্মশূন্য হ’বে। ইহাতে অনেক বিলম্ব ও ব্যাঘাত হয়।”

যে যোগীগণ পঞ্চাঙ্গি বিদ্যা প্রভৃতি জানেন, তাঁরা মৃত্যুর পর দেবদান পথে অনেক কষ্ট ভোগের পর ব্রহ্মলাভ করেন। গীতায় বর্ণিত আছে,—

“অগ্নির্জ্যোতিরহঃ স্তব্ধঃ ষণ্মাসা উত্তরাযণম্।

তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥” (গীতা ৮:২৪)

অর্থাৎ,—“অগ্নি, জ্যোতি, শুভদিন, স্তব্ধপক্ষ, ষণ্মাসরূপ উত্তরাযণকালে এই সকল কালাভিমানিনী দেবতার মার্গে যে-সকল ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি প্রয়াণ লাভ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।”

উক্ত শ্লোকের ভাষা শ্রীম ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় লিখেছেন,—
“ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ, অগ্নি, জ্যোতিঃ, শুভদিন ও উত্তরাযণকালে দেহত্যাগ করুলে ব্রহ্মলাভ করেন। ‘অগ্নি’ ও ‘জ্যোতিঃ’ শব্দের দ্বারা অর্চিরাভিমানিনী দেবতা, ‘অহঃ’ শব্দে অষ্টাভিমানিনী দেবতা, ‘স্তব্ধ’ শব্দে পঞ্চাঙ্গিমানিনী দেবতা, ‘উত্তরাযণ’ শব্দে উত্তরাযণাভিমানিনী দেবতাকে বুঝতে হবে অর্থাৎ তত্ত্ববস্তু ও কালপ্রাপ্ত হন প্রভৃতি ঈশ্রিয়ের প্রসঙ্গতাই যোগীর ব্রহ্মলাভের কারণ হয়। এইরূপ সময়ে মৃত্যুলাভ হ’লে যোগিদ্বিগের পুনরাবৃত্তি হয় না।”
শাস্ত্রে এষ্ট অর্চিবাতি-মার্গকে স্তব্ধগতি বা দেবদান-মার্গ বলা যায়। অবশ্য উক্ত ক্রমের দেবদান-মার্গ অপেক্ষাও স্তব্ধ-ভক্তিযোগ-মার্গ সুখসাধ্য ও অধিকতর শ্রেষ্ঠ। স্তব্ধভক্তি-যোগমার্গের আশ্রিত অনন্ত ভক্তগণকে অর্চিবাতি-মার্গের অপেক্ষা করিতে হয় না এবং অক্লেশে ভগবৎ-ধামে গমন করেন।

বরাহপুরাণে লিখিত আছে,—

“নয়ামি পরমং স্থানমর্চিবাতিগতিং বিনা।

গকড় স্কন্ধমারোপ্য যথেক্ষমনিবারিতঃ ॥”

অর্থাৎ,—“অর্চিবাতি গতি ব্যতীতও অনন্ত ভক্তগণকে গকড় স্বন্ধে আরোহণ করিয়ে যথেক্ষ ও অবাধে পরমস্থানে উপনীত করি।”

একমাত্র নিষ্কাম স্তব্ধভক্ত ব্যতীত আত্মারাম যোগীরাও অপ্রাকৃত ধাম বৈকুণ্ঠের ভিতরে প্রবেশ করতে পারেন না। তবে শাস্ত্রে কোনও অঙ্গুরের কদাচিৎ ক্ষণকালের জন্য বৈকুণ্ঠে যাওয়ার কথা শুনা গেলেও তার সে-সময় বৈকুণ্ঠের সুখমুভূতি থাকে না। কাজেই তার বৈকুণ্ঠ-গমন নিরর্থক হ’য়ে পড়ে। কোন রাজার পরিকরগণ সহ ভক্তাদির খেলা দেখবার ইচ্ছা হ’লে ভক্তাদির ছায় জন্তুও যেমন ক্ষণিকের জন্য রাজপ্রাসাদে ওঠে, তেমনি

ইচ্ছাময় ভগবান্ কৌতুকবশে কোনও হৃদয়কে কখনও কিছু সময়ের জন্য বৈকুণ্ঠ-দ্বারে ল'য়ে যাবার ইচ্ছা পোষণ করলে তা'কে অবশ্যই যেতে হয়। একদা ব্রহ্মার মানসপুত্র ব্রহ্মজ্ঞানী চতুঃসন মুনিগণ যথা সনক, সনাতন, সনন্দন, ও সনৎকুমার বৈকুণ্ঠে নারায়ণকে দর্শন করবার জন্ত গমন করেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠের দ্বারদেশে জয়-বিজয় নামক দ্বার-রক্ষকব্রহ্ম কতৃক তাঁরা বাধাপ্রাপ্ত হন ও লাঞ্চিত হন। তখন মুনিগণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে জয়-বিজয়কে অভিশাপ প্রদান করেন। ইত্যবসরে সেই স্থানে স্বয়ং নারায়ণ শ্রীলক্ষ্মীর সহিত উপস্থিত হ'লে সেই মুনিগণ সুস্থ? অনুরূপমান ভগবান্ নারায়ণকে গরুড় স্বৰূপে হস্তার্ণণ অবস্থায় ক্ষণকালের জন্য দর্শন করেন। বৈকুণ্ঠাধিপতি ভগবান্ নারায়ণ তখন মুনিদের বলেন,—‘হুতা জয়-বিজয় বাহা করেছে, তাহা আমার কৃত-কর্ম।’ ইহাতে মুনিগণ লজ্জিত হলেন এবং জয়-বিজয়ের প্রতি তাঁদের অভিশাপ বহাল রাখা বা না রাখা সম্পর্কে ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করলেন। আবার তাঁদের এবম্প্রকার কার্যের জন্য ভগবানের নিকট উপযুক্ত দণ্ড প্রার্থনা করলেন। ভগবান্ সেই সময় জয়-বিজয়কে আহ্বান করে বললেন,—‘তোমাদের ঐ ব্রহ্মশাপ নিবারণ করবার মত শক্তি থাকলেও তাহা প্রয়োগ ক'রো না। আমার ইচ্ছাতেই ঐরূপ অভিশাপ তোমাদের উপর বর্ষিত হয়েছে।’ জয়-বিজয়ের প্রতি ভগবানের ঐরূপ আজীবনব্যবহারে মুনিগণ অপেক্ষা জয়-বিজয়ের সৌভাগ্য যেমন অধিক স্মৃতিত হয়, তেমনি জয়-বিজয়ের প্রতি ভগবানের রূপার উৎকর্ষও প্রকাশ পায়। এইভাবে ভগবান্ মুনিগণের দ্বারা শাপচ্ছলে ভক্তব্রহ্মকে অনুরযোনিতে তিনজন্য শত্রুভাবে প্রেরণ করেন এবং বুদ্ধ-কৌতুক অনুভব ক'রে তাঁদগকে উদ্ধার করেন।

চতুঃসন মুনিগণের দ্বারা ব্রহ্মসমাদি-শাপনের ফলে উক্তরূপ ভগবৎ-দর্শন স্বর্গাচিং সাময়িকভাবে কোনও যোগীর ভাগ্যে ভগবৎ-রূপান্তে সম্ভব হয়। আত্মারাম যোগিগণের ভগবত্তাহুভব অপেক্ষা ব্রহ্মতাহুভব অধিক থাকলেও এস্থলে সনকাদি মুনিগণ ক্ষণকালের জন্ত বৈকুণ্ঠনাথের দর্শন পেয়ে ভগবত্তাহুভবের প্রাধান্ত উপলব্ধি করেছিলেন। সনকাদি মুনিগণ ভক্তির বলে এইভাবে ভগবৎ-দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। উক্ত আত্মারাম-ব্রহ্মজ্ঞানীগণ শুটস্থভক্ত বা শান্তভক্ত এবং তাঁদের ব্রহ্মচিন্তা বিশেষ। তাঁদের রতি সম্বন্ধে ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামতে’ জানা যায়,—‘নিত্যাস্ত নিকর্কশেষ ব্রহ্মচিন্তায় রতি নাই। উৎপন্ন রতি পুরুষের যে-ব্রহ্ম, তাহাও সবিশেষ-প্রায়।’

কিন্তু ব্রহ্মের যে নিত্য বিশেষ, তাহাতে সিদ্ধান্ত কতকটা অস্থির থাকে। অতএব কখন চতুর্ভুজ, কখন ঐশ্বর্যাগত কক্কস্বরূপ, কখন আধ্যাত্মিক পরমাত্ম-স্বরূপ তাঁদের চিত্তে উদ্ভিত হন। সনক, সনাভন, সনন্দন, সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষিগণ এইরূপ ভক্তের আদর্শ। যে-স্বরূপটি ভগবানের নিত্য তাহা স্থির না হওয়ায় শাস্ত্রভক্তের কক্ষের প্রতি মনোভা হয় না। মনোভা স্বভাবতঃ স্বরূপ নিবন্ধন ভাব-বিশেষ। অতএব শাস্ত্রভক্তের রতি অসম্পর্কতা বশতঃ উদ্ধাবস্থাতেই থাকে। সচ্চিদানন্দ ঘনীভূত স্বরূপ, আত্মারাম-শিরোমণি, পরমাত্মা পরব্রহ্ম, সদাশ্বরূপ সংপ্রাপ্ত, গতিদাতা, লয়াশীল, বিহু এবজুত গুণ-নিশিষ্ট ত্রিবিধ শাস্ত্র-ব্রতের অলঙ্ঘন না বিষয়। ঐ রত্নের আশ্রয় যে জীব, তিনি হয় আত্মারাম বা ত্রাপন।” উক্ত আত্মারাম ভক্তগণ ভগবৎকৃপায় বৈকুণ্ঠদ্বারে সাময়িকভাবে বৈকুণ্ঠনাথের দর্শন পেলেন ও বৈকুণ্ঠের ভিতরে নিত্যকালের জন্য বৈকুণ্ঠনাথের সেবাধিকার পেলেন না। পরন্তু ভগবানের ঐকান্তিক শুদ্ধ ভক্তগণ ভগবৎ কর্তৃক প্রেরিত বিমান-যোগে বৈকুণ্ঠে গমন করেন ও ভগবানের সেবা-মাধুর্য্যাদি আনন্দন করে নিত্যকাল সেশ্বেলে পার্বদরূপে বিরাজ করেন। এ কারণে আত্মারাম অপেক্ষা ভগবন্তুই শ্রেষ্ঠ। আত্মারাম যোগীর পক্ষে ঐরূপ সৌভাগ্যও কল্যাণ হইতে পারে।

চতুঃসনের মধ্যে সনৎকুমার একদা শ্রীনাথ-সঙ্কীর্ণনরূপ ভাগবত ধর্ম্মের (ভাঃ ৪.২২।৩২) কথা অবগত হ’য়ে বলেছিলেন,—

“যং পাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ষ্য্য কৰ্ম্মাশয়ং গ্রথিতমৃদুগ্রন্থয়ন্তি সন্তঃ।

তদ্বগ বিক্ৰমতয়ো যতয়োইপি রুদ্ধশ্রোতোগণাশ্রমরনং ভজ বাসুদেবম্ ॥”

অর্থাৎ,—“শুদ্ধভক্তগণ শ্রীভগবানের পাদপদ্মের পত্রসদৃশ অঙ্গুলি সমূহের কান্তি ভক্তিপূর্বক স্মরণ কর্তে কর্তে কৰ্ম্মাসনাময় হৃদয়-গ্রন্থিকে অনায়াসেই ছেদন করেন, ভক্তিরচিত, নির্ঝিষী যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করে ও তদ্রূপ ছেদন কর্তে সমর্থ হন না। অতএব শুধু ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদির চেষ্টা পরিত্যাগপূর্বক বাসুদেবের ভজনা কর।” যোগ সাধন সময়ে বিভূতিক্রম অবাস্তুর লাভে আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকায় মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গল হয়ে থাকে। পাতঞ্জল-দর্শনে রাজযোগে দৈশ্বর-সামুদ্ররূপ কৈবল্যালাভে আদৌ প্রেমামিত্ত না থাকায় তাহা কল্যাণপ্রদ নহে। যোগ-পন্থার সবিশেষ তত্ত্ব উপাসনার হেয়তা সম্পর্কে শাস্ত্র-যুক্তি, যথা ;—“সামুদ্র্য দুই প্রকার—ব্রহ্ম-সামুদ্র্য ও দৈশ্বর-সামুদ্র্য। মায়াবাদী বৈদান্তিকের মতে, জীবের চরম ফল—

ব্রহ্ম-সামুজ্য ; পাতঞ্জল মতে—কৈবল্য অবস্থায় ঈশ্বর সামুজ্য । এই দুই সামুজ্যের মধ্যে ঈশ্বর-সামুজ্যই অধিকতর ঘৃণাহঁ । ব্রহ্ম-সামুজ্যে নির্বিশেষ জ্ঞান-দ্বারা নির্বিশেষ গতি-লাভ ; কিন্তু সবিশেষ ঈশ্বরকেই ধ্যান করিয়া যে কৈবল্যরূপ ঈশ্বর-সামুজ্য লাভ হয়, তাহাই বাসনাদোষে অতিরিক্ত পতনরূপ ফল । ‘ক্লেদকর্মবিপাকশয়ৈব পরামৃষ্টঃ পুরুষ-বিশেষঃ ঈশ্বরঃ ।’ ‘স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালানবচ্ছেদাৎ’ । এতদ্বারা সবিশেষ ঈশ্বরের নিত্যত্ব দেখা যায় । পুনরায় ঐ পাতঞ্জলে কৈবল্যপাদে ‘পুরুষার্থ-পুণ্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যাং স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি’—এই স্বত্র-দ্বারা সাধকের সিদ্ধাবস্থায় অল্প পুরুষ ঈশ্বরের অবস্থানাভাব । সবিশেষ-তত্ত্বাশ্রয়স্থলে যোগমার্গ নিত্যত্ব অকিঞ্চিংকর । তাৎপর্য্য এই যে, (যোগপন্থায়) সবিশেষ তত্ত্বের উপাসনার সবিশেষ ফল না হ’য়ে অত্যন্ত সূদূরবর্তী সিদ্ধার যোগ্য ফল হ’ল ।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ স ৬।২৬৯

কৈবল্য যোগ-সিদ্ধগণ ও নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানীগণ বৈকুণ্ঠের বাহিরে যে বিলাসশূন্য ব্রহ্মলোক বা সিদ্ধলোক তাহাই প্রাপ্ত হ’ন, সেই স্থানে ভগবান্ কর্তৃক নিহত অসুরগণও বাস করেন । শাস্ত্র-প্রমাণ, যথা—

সিদ্ধলোকস্ত তমসঃ পারে যত্র বসন্তি তি ।

সিদ্ধা ব্রহ্মস্থে মগ্না দৈত্যাস্ত হরিণা হতাঃ ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

[ভগঃ অর্থাৎ মায়িক জগতের পারে ব্রহ্মধামরূপ সিদ্ধলোক । সেখানে ব্রহ্মস্থমগ্ন মায়াবাহিগণ ও ভগবৎ কর্তৃক বিনষ্ট কংসাদি অসুরগণ বাস করেন, পাতঞ্জল যোগিগণ কৈবল্য লাভ করেও সেই লোক প্রাপ্ত হ’বেন ।]

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২।১৯) ভক্তপ্রবর উদ্ধব, বিদূরকে বলেছিলেন,—

“দৃষ্টা ভবন্তিনহু রাজসূয়ে চৈতন্য কক্ষং দ্বিসতোহপি সিদ্ধিঃ ।

যাং যোগিনঃ সম্পৃচ্ছন্তি সমাগ্ যোগেন কন্তুধিরহং মহেত ॥”

অর্থাৎ,—“যোগিগণ সম্যক্ যোগপ্রভাবে যে-সিদ্ধি বাঞ্ছা করেন, রাজসূয়-যজ্ঞে কক্ষের প্রতি বিদ্রোহ করেও শিতপাল সেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ।”

ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তগণের অবস্থানের ক্ষেত্র বৈকুণ্ঠের অভ্যন্তরে, আর অসুরগণের অবস্থানের ক্ষেত্র বৈকুণ্ঠের বাহিরে । ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তি-গণের বৈকুণ্ঠ-বৈচিত্র্য ও ভগবৎ শক্তগণের বিলাসশূন্য সিদ্ধলোক প্রাপ্তি সম্পর্কে ভগবৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেছেন,—

“প্রতিকূল-অনুশীলন-ফলে কৃষ্ণ-দেহিগণ যখন বৈরাগ্যবদ্ধ দ্বারাও সদগতি লাভ করতে পারে, তখন অনুকূল-অনুশীলন ফলে শুদ্ধভরুগণ যে সর্বাপেক্ষা উত্তমগতি কৃষ্ণপাদপদ্ম বা কৃষ্ণ-প্রেম লাভ করবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?”

এমতে অসুরগণের অবস্থানের ক্ষেত্রে নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধগণ ও কৈবল্য যোগসিদ্ধগণের অবস্থিতিতে তদপেক্ষা ভগবন্তভরুগণের গতির উৎকৃষ্টতা প্রতিপাদিত হয়। যে-জ্ঞানী ও যোগিগণ পরব্যোম বৈকুণ্ঠলোকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেন না, তাঁরা বিমল প্রেমযোগ ব্যতীত বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধে গোলোক-বৃন্দাবনে কি যেতে পারেন? জ্ঞানী ও যোগী অপেক্ষা কৃষ্ণভক্ত যে সচলাংশ শ্রেষ্ঠ - ইহাতে সন্দেহ নাই। রাজযোগ ও হটযোগ-মার্গে ভক্তির স্থল নাই। জগৎগুরু শ্রীকীল ভক্তিসিদ্ধাস্বয় শ্রী গোবামী প্রভুপাদ একদা হরি-কপাসুত পরিবেশন করতে গিয়ে জ্ঞানিয়েছিলেন,—“যখন স্বয়ংদেহ ও স্থলদেহ উভয়কে সংযুক্ত ক’রে অ’লোচনা করি, তখন চিদচিন্মিত্রতাব, কৰ্ম্ম-বিচারে হটযোগ ও জ্ঞানবিচারে রাজযোগের কথা জ্ঞানি-চিদচিন্মিত্র-ভাবে উপদিষ্ট হই।”

হটযোগ সাধনাও খুব কষ্টকর এবং হৃদ্বারা সামান্য ‘হেস্‌মেরিজিম’ কার্য্য ও দৈহিক কিছু উন্নতি সাধন হয়। তাজিকেরাষ্ট হটযোগ সাধনা করে থাকেন। যোগমার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন ক’রে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় “প্রেম-প্রদীপ” গ্রন্থে লিখেছেন,—“যোগ ও ভক্তিমার্গের প্রভেদ এই যে, যোগমার্গে কষাৎ অর্থাৎ আত্মার উপাধি-নিবৃত্তিপূর্বক সমাদিকালে আত্মার স্বধর্ম্ম অর্থাৎ প্রেমকে উদ্দীপ্ত কবায়। তাহাতে আশঙ্কা এই যে, উপাধি নিবৃত্তির চেষ্টা করতে কর্ত্তে অনেক কাল যায় এবং স্থল-বিশেষে চরম ফল পা’বার পূর্বেই কোন না কোন ক্ষুদ্রফলে আবদ্ধ হ’য়ে সাধক ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে ভক্তিমার্গে প্রেমেরই সাক্ষাৎ আলোচনা আছে। ভক্তি প্রেমতত্ত্বের অনুশীলন মাত্র। যে-স্থলে সকল কার্য্যই চরম ফলের অনুশীলন, সে-স্থলে অবাস্তর ক্ষুদ্র ফলের আশঙ্কা নাই। সাধনট ফল এবং ফলই সাধন। অতএব ভক্তিমার্গ যোগমার্গ-অপেক্ষা সহজ ও সর্বত্রোভাবে আশ্রয়নীয়।” (ক্রমশঃ)

— শ্রীচিন্তরঞ্জন দাসগুপ্ত, কবিভূষণ

বৈষ্ণব-অপরাধ কি ভীষণ !

বৈষ্ণব-অপরাধ কাকাকে বলে ? যিনি বিষ্ণুর দাস, শ্রীবিষ্ণুর নাম করেন, তাঁহার সেবা করেন, তিনি বৈষ্ণব । এই বৈষ্ণবের শ্রীচরণে অপরাধ করিলে বৈষ্ণব-অপরাধ হয় । এই বৈষ্ণব-অপরাধ কি ভীষণ, তাহা সামান্য মর্ত্যাবুদ্ধি মানবের বোধগম্যের বিহীন হয় না । ভক্তজ্ঞ বৈষ্ণব অপরাধটী কি, তাহা বিশদভাবে লিপিত হইল । অপরাধ অনেক প্রকার আছে, যথা—নামাপরাধ, ধামাপরাধ, সেবাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ ইত্যাদি । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিয়াছেন,—

যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে তাতী মাতা ।

উপাড়ে বা ডিঙে, তার গুণি' যায় পাতা ॥

তাতে মা'নী যত্ন করি' করে আনরণ ।

অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদগর ॥ (চৈঃ চঃ নঃ ১৯।১৫৬-১৫৭)

বৈষ্ণব-অপরাধ মস্ত হস্তী-স্বরণ ; হস্তী একবার মা'নিয়া উঠিলে তাকাকে নিবারণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে । বৈষ্ণব-অপরাধেব কি ভীষণ পরিণাম, তাহা শাস্ত্রের কয়েকটি উপাখ্যানে বিশেষ অবগত হইতে পারা যায় । আমরা এই অপরাধ হইতে সর্বদা সাবধান হইব ।

(১) এই বৈষ্ণব-অপরাধ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ চৈতন্যদেব তাঁহার মাতার আদর্শে জগজ্জীবকে শিক্ষা-প্রদান করিয়াছেন । সেই অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর একদিন তাঁহার জন্মনী শ্রীশচীদেবীকে বলিয়া বসিলেন—“মাতঃ ! তোমার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট বৈষ্ণব-অপরাধ হইয়াছে, তাঁহার চরণে ক্ষমা ভিক্ষা কর, নহিলে তোমার বিমুক্তি হইবে না ।” বৈষ্ণব-অপরাধ এমনই যে, ভগবান্ পর্য্যন্ত তাকার মোচন করেন না । তবে তাঁহার নিকট যে-অপরাধ হইয়াছে, তিনি যদি ক্ষমা করেন, তবেই সে অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারে, নতুবা নহে । শ্রীশচীমাতার অপরাধের কারণ,—তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের টোলে লাল্স অন্য়মন করিতেন । হঠাৎ তিনি সন্ধ্যাস আশ্রম অবগমন করিলে শ্রীশচীমাতা মনে মনে বিশেষনা করিলেন,—অদ্বৈত-আচার্য্য কি নিষ্ঠুর । তাঁহার উপদেশ পাটয়াই বুঝি আমার পুত্র এই যৌবন বয়সে সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিল । পরিশেষে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের কথায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পদে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া এই ভীষণ বৈষ্ণব-অপরাধ হইতে মুক্ত হইলেন ।

(২) ‘হুহু’-নামে একটি গন্ধর্ব্ব একদিন বিলাস-পরায়ণ হইয়া একটি সরোবরে স্নীগণ-বেষ্টিত হইয়া জলক্রীড়ায় মত্ত ‘হুহু’ হিতাহিত জ্ঞান-শূণ্য হইয়া ঋষিকে অবজ্ঞা করিয়া জলমধ্যে তাঁহার চরণ ধরিয়া আকর্ষণ করিয়াছিল। ইহাতে শ্রীদেবল-ঋষি অসম্বৃত্ত হইয়া ‘হুহু’-গন্ধর্ব্বকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন, “বাও, তুমি কুস্তীর হইয়া জন্মগ্রহণ কর।” মুনিবরের শাপে সেই দুরাচার এক ভীষণ কুস্তীররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৩) পূর্বে ‘ইন্দ্রদ্যুম্ন’-নামে বিষ্ণুব্রত-পরায়ণ বিখ্যাত পাণ্ড্যদেশীয় নৃপতি ছিলেন। ইনি মলয়াচলে গমন করিয়া আশ্রয় নির্মাণ-পূর্ব্বক মোনব্রতী হইয়া ভগবাদাধিনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এমন সময়ে একদিন মহাযশ অগস্ত্য-ঋষি বহু শিষ্য-সমভিব্যাহারে তাঁহার আশ্রমে উপনীত হন। কিন্তু রাজা শ্রীহৃদয়জনের চলনায় ঋষিকে কোন অভ্যর্থনা না করায়, মুনিবর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তিনি রাজাকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন,—“রে বর্ষর! তুমি অবিলম্বে কষ্টী-দেহ প্রাপ্ত হও। তুমি রাজোন্মত্ত অস্তিমানে সাধুবর্ম্মবাদী বক্ষা করিলে না।” ঋষির অভিশাপে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা এক ভীষণ কষ্টী-দেহ প্রাপ্ত হইলেন।

(৪) ভক্তগণের মধ্যে শ্রীবাস প্রধান; তাঁহার অঙ্গনে শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু সপার্বদ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন করিতে ন। বহির্মুখ পাষণ্ডীগণের দ্বার-মানা ছিল; ‘চাপাল গোপাল’-নামে এক বিপ্র অত্যন্ত বহির্মুখ এবং বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিল; শ্রীবাস অঙ্গনে প্রবেশ করিতে না পারিয়া একদিবস রাত্রিকালে কীর্তন-দ্বারে ঐ পাষণ্ডী শুবানী-পূজার ড্রাগাদি—মদ, মাংস, জ্বাপুষ্প প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া অপবিত্র করিলে ভীষণ বৈষ্ণবাণ্ডায়ে পতিত হয়। তাহ’র ফলে, সে মচাকুষ্ঠ-নাগ্নগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কৃষ্ণের যত্নগায় ঐ বিপ্র বৃক্ষতলে পড়িয়া দিবারাত্রি চীৎকার করিয়া চট্‌ফট্‌ করিত।

একদিবস শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু গঙ্গাস্নানে যাঠবার সময় ঐ বিপ্র তাঁহার পদতলে পড়িয়া মুক্তি-প্রার্থনা করিল। ‘মদ্যপ্রভু তাহার প্রতি ক্রোধে আরক্ত-লোচন হইয়া বলিলেন,—‘রে পাপিষ্ঠ! এখন তোর কি হইয়াছে? তবে মাত্র বৈষ্ণব-অপরাধের ফল আরম্ভ হইয়াছে। জন্ম-জন্ম কুস্তীপাক নরকে পচিয়া মরিবি। আমার সাধ্য নাই, তোকে উদ্ধার করি। তুই আমার একান্ত প্রিয়ভক্ত শ্রীবাসের চরণে অপরাধী।’ এই বলিয়া ক্রতপদে চলিয়া গেলেন। ঐ বিপ্র মহাব্যাধিতে অশেষ যত্না ভোগ করিতে লাগিল।

পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু সমাধি গ্রহণান্তে কুলিয়ায় আগমন করিলে, পুনরায় ঐ চাপালগোপাল কান্তর হঠিয়া দৈত্ব করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পশ্চিম হইলে মহাপ্রভু তাতাকে বলিলেন—“তুমি যে বৈষ্ণবের চরণে অপরোধ করিয়াছ, তাঁহার (শ্রীধাম-ভক্তের) চরণে ক্ষমা প্রার্থনা কর।” ঐ বিপ্র কৃষ্ণের জালায় অস্তির হইয়া পবন ভক্ত শ্রীধাম ঠাকুরের চরণে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলে, বিপ্র দক্ষণ কৃষ্ণবেগ হইতে মুক্ত হইল।

(৫) এক দিবস শ্রীকৃষ্ণা তাঁহার কল্যাব প্রতি কাম-মোহিতের ছায়া অঙ্ক-লীলা প্রদর্শন করিলে, তাঁহার পৌত্র মদীচাঁদি সকলে হাস্য করায় তাঁহাদের বৈষ্ণব অপবাদ হয়। তাঁহার ফলে তাঁহারা স্বর্গভূমি হইয়া নানা জন্ম-জন্মান্বরে কীর্ণ কষ্ট পায়। তাঁহারা লোক-পিতামহ ব্রহ্মার লোক সিদ্ধ পুরুষ। পরিশেষে মাতৃদেব কামের চক্ষু নির্মূল্যভাবে নিঃসৃত হইয়া নানা নিগ্রহ ভোগ করতঃ দেবকীদেবীর স্তূত পান করিয়া উদ্ধার লাভ করেন। সিদ্ধ-পুরুষগণ যদি এত যত্নপা পান, আর অসিদ্ধ-জনের কি অবস্থা হয়, তাহা বর্ণনাতীত।

(৬) এক দিবস মহাযোগেশ্বর শ্রীশিব উলঙ্গ-অবস্থায় শ্রীদুর্গাদেবীকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়াছিলেন। সঙ্কল্প-সঙ্কল্প ঋষি তপায় আগমন করিয়া ইষ্টাদেবকে তদবস্থায় দেখিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। আকাশ-মার্গে রাজা চিত্রকেতু শ্রীমহেশকে ঐক্লব অবস্থায় দেখিয়া হাস্য করিলেন, এবং একটি রক্তপূর্ণ বিক্রম বাছোঁক করিলে শ্রীপার্বতীদেবী বৈষ্ণবের পশ্চি দিক্‌গণ সন্তুষ্ট করিতে না পারিয়া বাকা চিত্রকেতুকে অভিশাপ পদান করিলেন,—“তুমি জগদ্বিক্রম পবন মঙ্গলময় পবনকাকিণি বৈষ্ণবসেই শ্রীমহেশকে অক্লান্ত-বন্দনঃ যেমন কাঞ্চিলা করিলে, তাহার ফলস্বরূপ অক্লান্তে অগ্নিব-সেই প্রাপ্ত হই।” শ্রীপার্বতীর অভিশাপে অক্লান্তে চিত্রকেতু এক ভীষণ-স্বায় ত্রিভুবন-আতঙ্ককারী, পিশাল-দর্শন ধারী ব্যতাসুর হইয়া জগদগ্রহণ করিলেন। তাঁহার ঐ নিরাট্ মূর্তি দর্শনে এবং পদকম্পন-সঙ্গাৎ পৃথিবী কম্পিত হইত।

(৭) যিনি বিপুল ধনের অধীশ্বর, শিবাহুচর সেট কুবের মহাত্মার ছুট পুত্র ছিল। একটীর নাম নলকুবের, অপরটির নাম যশিষ্ঠীর; তাঁহারা অত্যন্ত বিলাসী ছিল। একদিবস কৈলাস-নিবাসের নিম্নে একটি সরোবরে দুই ভ্রাতা অপরীণসহ উলঙ্গ হইয়া জলকীড়ার মগ্ন ছিল। সঙ্গী শ্রীনারদ ঋষি বীণাযন্ত্র-সহকারে ঐ স্থানে আগমন করেন। তাঁহারা আসব-পাশে মগ্ন থাকায় জলে উলঙ্গ হইয়া রহিল; অপরীকৃত লজ্জায় অধোমুখী হইয়া বস্ত্র-সংবরণ করিল।

পরমকারুণিক মহামুনি শ্রীনারদ তাঁহাদের (নলকুবর ও মণিশ্রীবেশের) মঙ্গলের নিমিত্ত এই বলিয়া অতিশয় প্রদান করিলেন,—“তোমরা এ দেবস্থানে থাকিবার যোগ্য নহ, সত্বর বৃক্ষরূপে জন্ম পরিগ্রহ কর।” বহুকাল কুবেশের এই পুত্রদ্বয় শ্রীহৃদাবনে যমলাজ্জুন বৃক্ষরূপে অবস্থান করেন। পরিশেষে মননম্ভন শ্রীগোপালদেবের কৃপায় তাঁহারা বৃক্ষবোনি হইতে মুক্ত হন।

(৮) কুশিয়ার বাস করেন, শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত। ইনি ব্রাহ্মণ-সন্তান, ফলাহার এবং দুগ্ধপান করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। ইনি শ্রীভাগবতের পণ্ডিত, ভাগবত-শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন। একদিবস শুভ শ্রীবাস তাঁহার ভবনে ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিতেন। ভাগবতের শ্লোক শুনিয়া শ্রীবাস-পণ্ডিতের অষ্টসাংখ্যিক দিকাব উপস্থিত হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ, কাম্পান-সহকারে সভামধ্যে মুচ্ছিত হইলে অবৈষ্ণব দেবানন্দ-পণ্ডিত শ্রীবাস-পণ্ডিতে বাহির করিয়া দিবার জন্ত শিস্তদিককে আদেশ দেন। শ্রীবাস গৃহে প্রত্যাগমন করেন। মহাপ্রভু একদিন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই বৈষ্ণব-অপরাধী দেবানন্দ-পণ্ডিতের ভাগবত ছিঁড়িতে গিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন,—“ও বেটার ভাগবত পাঠের কোনও অধিকার নাই—পরম শুভ শ্রীবাসের সে অপমান করিয়াছে।” শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু সম্রাট গ্রহণ করিয়া কুশিয়ায় আগমন করিলে দেবানন্দ পণ্ডিতকে শ্রীবাসের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করাইয়া বৈষ্ণব-অপরাধ হইতে মুক্ত করেন। সেই অবধি কুলিয়ার “অপরাধ-ভঞ্জন-পাট” বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করে। অতএব সাধু-সাবধান, যেন জীবনে কখনও বৈষ্ণব-অপরাধ না হয়।

—নিবেদন—

শ্রীপত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যা-রূপে ইহা আত্মপ্রকাশ করিলেন। সদাশয় গ্রাহকবৃন্দের নিকট সাংসদ নিবেদন,—ইহাদের বার্ষিক দেয় ভিত্তি এখনও প্রাপ্ত হয় নাই, তাঁহারা দয়া করিয়া শীঘ্রই সকলটাকা পাঠাইয়া আমাদিগকে যেন দেবায় তৃপ্তি প্রদান করেন। দ্রব্যমূল্য অত্যধিক বর্দ্ধিত হওয়া হেতু অগ্রিম আত্মকূল্য না পাওয়ার প্রকাশনে প্রতিকূল্যই পরিলক্ষিত হইতেছে। অতএব, গ্রাহকবৃন্দ কৃপাপূর্ণক সহানুভূতি, প্রদর্শন করত আমাদিগকে সেবায় সহায়তা করিবেন—এই অনুরোধ জানাইতেছি। ইতি—

বিনীত—

ত্রিদণ্ডিতকু শ্রীভক্তিবন্দ্য আচার্য্য

সেবা-সচিব,

শ্রীগেড্ডায়-পত্রিকা-কার্য্যালয়

আসাম প্রদেশের অন্তর্গত
 শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত
 নবনির্মিত শ্রীমন্দিরের দ্বারোদঘাটন ও
 শ্রীশ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের
 শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ-মহোৎসব
 [শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে]

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবস অক্ষয় তৃতীয়া-তিথিকে উপলক্ষ্য করিয়া আসাম প্রদেশস্থ সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে নবনির্মিত শ্রীমন্দিরে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিরামক পরমহংসকুল-চূড়ামণি শ্রীমতীলালপ্রবীণ ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ ও উক্ত নবনির্মিত শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীশ্রীগৌর-বাধা-বিনোদবিহারীজীউ বিগ্রহগণের উক্ত মন্দিরে শুভবিজয়ানুষ্ঠান-উপলক্ষ্যে বিগত ৩১শে বৈশাখ, ১৩৯০ (ইং ১৫/৫/১৯৮৩) রবিবার বিরাট মহোৎসবের আয়োজন করা হয়।

সমিতির বর্তমান সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিহামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তি-বেদান্ত ব্রহ্মন মহারাজের অধ্যক্ষতায় সমিতির সেবকবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই মহা-মহোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ-রক্ষক ও উহার অন্যতম রক্ষক ত্রিদণ্ডিহামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজের বিশেষ আগ্রহ ও সেবাপ্রচেষ্টায় আসামের রাজনৈতিক অশান্ত পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও সমিতির কর্ণধার তথা অনেক সেবকবৃন্দ উৎসাহের সহিত উক্ত মহোৎসবে যোগদানের জন্য ইতিমধ্যে নবদ্বীপ ও কলিকাতাস্থ সমিতির মঠ হইতে কয়েক দিবস পূর্বেই উক্ত মঠ-উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পশ্চিমবঙ্গ শিলিগুড়ি শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ হইতেও সমিতির অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিহামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ এবং আরও অনেক ভক্তবৃন্দ নিউজলপাইগুড়ি জংশনে মিলিত হইয়া নিউকোচবিহার কৈশনে পৌছেন। ঠাহারা সকলে পৌছিবার পূর্বেই হইতেই কয়েকজন সেবক-বৃন্দসহ রিজার্ভ বাস লইয়া শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ—সমিতির অধ্যক্ষ,

সহঃ সভাপতি, সম্পাদক এবং বৈষ্ণববৃন্দকে স্বাগত জানাইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বৈষ্ণবগণ তথায় পৌঁছিলে ভক্তবৃন্দসহ মুহূর্ত্ত জয়ধ্বনীর সহকারে দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করিলে শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ সভাপতি-মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দকে মালাদান করেন এবং কীর্তন-সহ বাসযোগে তাঁহারা গোলোকগঞ্জ অভিমুখে অগ্রসর হন। ত্রিগোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠে বৈষ্ণবগণ শুভ-বিজয় করিলে বহু ভক্তবৃন্দ পুষ্পবৃতিসহ স্বাগত অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীমঠ ও কীর্তনরোলে মুখরিত হয়।

৩০শে বৈশাখ (ইং ১৯৫৮৩) শনিবার দিন অধিবাস উপলক্ষে সর্গতির উপাধাঙ্গ ত্রিদণ্ডিধামী শ্রীমন্তজিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের ব্যবস্থাপনায় মাসিক অগুষ্ঠানাদি সূচীত হয়। উক্ত দিবস সন্ধ্যারতি সমাপ্তান্তে এক মহা সভার আয়োজন হইলে উক্ত সভায় সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্যদেব প্রভু-তত্ত্ব ও বিগ্রহ-তত্ত্ব সম্পর্কে নীতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন এবং প্রমুখ্যে ব্যক্ত করেন যে, আসান প্রদেশের অন্তর্গত এই মঠটিই গোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রাচীনতম প্রচারকেন্দ্র। এর পর পূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজ তাঁহার ভক্তিতত্ত্ব-সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদানান্তে উৎসবকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য আহ্বান জ্ঞাপন করেন এবং আগামী কল্যাণমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিক সমাপ্তান্তে শ্রীহরি-কীর্তন-মুখে নগর-পরিভ্রমণ করা হইবে—তাঁহাও ঘোষণা করেন। তদনন্তর ত্রিদণ্ডিধামী শ্রীমন্তজিবেদান্ত পর্যটক মহারাজের পুল্লিত কণ্ঠে শ্রীহরিনাম কীর্তিত হইলে সভার কার্য সমাপ্ত হয়।

৩১শে বৈশাখ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রি সমাপ্তান্তে মঠবাদী ও বহু ভক্তের মিলিত এক শোভাযাত্রা শ্রীহরিনাম কীর্তনমুখে বহির্গত হন। নগর পরিভ্রমণান্তে সহরের পাদদেশে প্রবাহিত গঙ্গাধর নদী হইতে মঙ্গলঘটযোগে বারিধারা সংগ্রহ করত শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করিলে অভিষেকাদির অগুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

উক্ত শ্রীমঠ ও সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক মহারাজের শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশাগুষ্ঠান আরম্ভ হয়। একদিকে উচ্চ শ্রীহরিনাম-কীর্তন অন্যদিকে মাসিক দ্রব্যাদির সংরোহ। যজ্ঞের নিয়মাধুযায়ী প্রস্থানত্রয় পাঠ করিয়াছেন যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিধামী শ্রীমন্তজিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ ন্যায় প্রস্থান (বেদান্ত); ত্রিদণ্ডিধামী শ্রীমন্তজিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ প্রতিপ্রস্থান (উপনিষৎ); ত্রিদণ্ডিধামী শ্রীমন্তজিবেদান্ত বিখু মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিধামী

শ্রীমন্তজিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ ক্ষুদ্রপ্রস্থান (যথাক্রমে শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত) পাঠ করেন। এই যজ্ঞানুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, যজ্ঞকর্ত্তা শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, হোতা শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ এবং উদ্যোক্তা শ্রীমৎ পরিব্রাজক মহারাজ। এতদ্ব্যতীত যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক সহায়তা করেন শ্রীপাদ যশোদানন্দন ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুখানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ বলরামদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নবীনমদন ব্রহ্মচারী ও আরও অনেক বৈষ্ণবগণ। শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র সুললিত কণ্ঠে পরিবেশনায় শ্রীপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারী প্রসুখের নাম উল্লেখযোগ্য। নারো মাঝে পুরুষসূক্ত-মন্ত্রোচ্চারণ ও শ্রীগুরু-গৌরাদেবের জয়ধ্বনি তথা যজ্ঞের ধুম দিগ্দিগন্ত ব্যাপ্ত হইতেছিল।

নিরামক-আচার্য্যদেবের শ্রীবিগ্রহ অভিষেক হইলে পরমারাধ্যতন শ্রীশ্রী গুরুপাদপদ্ম পরিব্রাজক আচার্য্য ত্রিদণ্ডিষ্যমী ১০৮শ্রী শ্রীমন্তজিবেদান্ত বামন গোহাঙ্গী মহারাজের আস্থানে শ্রীবৈষ্ণব-সম্মিলনী ও শ্রীব্রহ্ম-নাথ গোড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিষ্যমী ১০৮শ্রী শ্রীমন্তজিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মোচন করেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাদ-রাধা-বিনোদবিহারী-জীউর জয়ধ্বনি এবং রমণীগণের উল্লুংহনি আকাশ-বাতাস মুখরিত করায় ভক্তগণ আমন্থে উদ্বেলিত হন। তদনন্তর মধ্যাহ্নে ভোগারতি করেন শ্রীপাদ শ্রীকান্তদাস ব্রহ্মচারী প্রভু ও পূজাপাদ কানাই প্রভুর মূল গায়কণ্ঠে সুললিত কণ্ঠে ভেসে আসে আরতি-কীর্তন। কীর্তনান্তে শ্রীল পর্যটক মহারাজ শ্রীগুরু-বর্গ তথা বিষয়-বিগ্রহ ও পদধ্বজের জয়ধ্বনি করেন।

তদনন্তর আমন্ত্রিত, অতিথি, রবান্তত উপস্থিত সকলকেই মহাপ্রসাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এমনকি আগন্তুক জনগণও আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ পাইবার সুযোগ লাভ করেন। স্থান অসম্মূল্য হওয়া হেতু বহির্দ্বারেও বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ করার ব্যবস্থা করিতে হয়। শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাপনায় প্রচুর তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন। বৈকাল ৫।০ ঘটিকা পর্য্যন্ত উন্মুক্ত হস্তে প্রচুর মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

ঐ দিন গোদুলী-লগ্নে সন্ধ্যারতি অন্তে মহাজন দীপ্তি-কীর্তন হইলে পর এক মহতী সভার আয়োজন হয়। এই দিবসে সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিষ্যমী শ্রীশ্রীমন্তজিবেদান্ত বামন গোহাঙ্গী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভার পুরোভাগে ত্রিদণ্ডিষ্যমী শ্রী শ্রীমন্তজিবেদান্ত পরিব্রাজক

মহারাজ শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। তদনন্তর শ্রীমৎ নারায়ণ
মহারাজ শ্রীগুরু-তত্ত্ব ও তাঁহার শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ সম্পর্কে গূঢ়-তত্ত্বপূর্ণ ভাষণ
প্রদান করেন। এরপর শ্রীমৎ হ্রিদয়ী মহারাজ, শ্রীমৎ পরমাটক মহারাজ,
শ্রীমৎ বিষ্ণু মহারাজ প্রমুখ সম্মানীয় ভক্তি-তত্ত্ব-সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।
তৎপশ্চাৎ শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ শ্রীগোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠের সংক্ষিপ্ত
ইতিহাস এবং প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক আচার্য্যদেবের শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশে
যাঁহার আত্মকৃত্য প্রদান করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।
তদুপরি শ্রীমন্দির, দেবকমণ্ড ও ভূতি নির্মাণে এই মঠ-রক্ষক তথা অন্যান্য
দেবকমন্দের যে ঐকান্তিক সেবা-প্রচেষ্টা তাহারও ভূয়সী প্রশংসা করত
বাহাতে তাঁহারও সেবা প্রাণতা জাগরুক হয়— ইহা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের
নিকট প্রার্থনা করিয়া বক্তব্য সমাপ্ত করেন। পরিশেষে শ্রীমৎ বৈদ্য মহারাজ
এই উৎসব যে সুইভাবে সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব হইয়াছে তাহা একমাত্র শ্রীহরি-
গুরু-বৈষ্ণবগণের অহৈতুকী কৃপারই নিদর্শন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। বিশেষতঃ
বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও যাঁহাদের অদম্য উৎসাহ-উদ্বীপনার ও সহানুভূতিতে
এই পর্য্যন্ত এগিয়ে আসা সম্ভব হইয়াছে— তাঁহাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা
প্রকাশ করেন এবং বক্তব্য রাখেন যে, বহু দোষ-ত্রুটির মধ্যে এ জীবন
প্রবাহিত, সুতরাং বৈষ্ণবগণ যেন কৃপা করিয়া অহৈতুকী শুভদৃষ্টি রাখেন
বাহাতে অসমাপ্ত নির্মাণ-কাৰ্য্যাদি ক্রম-পন্থায় এগিয়ে যান এবং সেবাময়
জীবন লাভে যেন ব্যস্ত না হই।

পরিশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন যে, পৃথিবীতে
অসংখ্য শ্রীল গুরুপাদপদের শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ করিতে পারাটা আমাদের
প্রথম সৌভাগ্যের বিষয়। শ্রীল গুরুপাদপদের বিশ্রান্ত দেবকণ্ঠ রাজ আনন্দে
উচ্চলিত। এই মঠ সুদীর্ঘদিন পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেও স্থান অসমুল্য এবং
বিভিন্ন প্রতিকূলতা হেতু ইহার যথার্থ গুজ্জলতা বর্ধন করা সম্ভব হয় নাই—
ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয়। শ্রীল গুরুপাদপদের কৃপাশীর্ষ্যদে যাঁহাদের অক্লান্ত
প্রচেষ্টা ও অহতুল অবদানে আজ এতদূর এগিয়ে আসিয়াছে, তাঁহার জগতের
কলাশকামী, ইহাতে কে'ন সন্দেহের অবকাশ নাই। স্থানীয় জনসাধারণ
জারও আমাদের নিকটস্থ হইবেন, তজ্জন্য আমরা আশা পোষণ করি।
বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর বক্তব্য রেখে সভা সমাপ্তির ঘোষণা করেন। তদনন্তর
শ্রীপাদ গোবর্ধন শ্রবুর দস্তাবেজ দুল্লভ দুমধুর কণ্ঠে ভেদে উল্ল প্রার্থনা-গীতি।

১লা জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মমূর্ত্তে বঙ্গলায়তি অন্তে বৈষ্ণবগণ কীর্তনমুখে নগর পরিক্রমা আরম্ভ করেন এবং প্রত্যাবর্তনমাত্রে শ্রীমদ্ভক্তিবেন্দ্য পাঠ করেন দ্বিবিগ্রহামী শ্রীমদ্ভক্তিবেন্দ্য আচরণ মহারাজ। তদনন্তর কীর্তন-সহযোগে শ্রীতুলসী পরিক্রমা করা হয়। এর পর প্রদান পাঠিয়া শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে ষাইবার জন্ম প্রসূতি চর্চিতে থাকে। এই স্থান হইতে বাসুগাঁও-এর দূরত্ব প্রায় ৫০ কিলোমিটার। ইহাও আমাদের অন্তর্গত গেম্বালপাড়া জেলার অবস্থিত। এখানেই শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ। উক্ত মঠেও এবার্নিম্মমান মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ শুভ-বিসম্ব করিবেন এবং প্রতিমাতা-আচাৰ্য মহারাজের শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হইবেন। বিহারের-লগ্ন যদিও বেদানন্দ স্বক নিহত আগত আর এক অর্পণের কর্তব্য-প্রণয়ন যাত্রাকে স্থান করিতে পারেন নাই।

[শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে]

ট্রেনিং-যোগে বৈষ্ণবগণ যখন বাসুগাঁও স্টেশনে পৌঁছেন, তখন অল্পলোক সমবেত হইবেন। উক্ত মঠের রক্ষক এদাওহাযী শ্রীমদ্ভক্তিবেন্দ্য ঐযুক্ত মহারাজ বৈষ্ণবগণকে চন্দন ও পুষ্পমালা-ভূষিত করেন এবং ভক্তগণ মুহূর্ত্তে জয়ধ্বনি দ্বারা সঙ্গীতের মূখর হন। শ্রীমঠে বৈষ্ণবগণ ভক্তবিজয় করিলে আনন্দিক আরম্ভ হয়।

২রা জ্যৈষ্ঠ, ব্রাহ্মমূর্ত্তে মঙ্গলায়তি সমাপ্ত হইলে এক শোভাযাত্রা-যোগে নগর-পরিক্রমা আরম্ভ হয়। যদিও ঐ সময় দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অশান্ত ছিল তবুও এহ অল্পটানে অমরবিধা বাট লাট। নগর-পরিক্রমা সমাপ্ত হইলে মঠে শ্রীমদ্ভক্তিবেন্দ্য পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। পূজাপাদ শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজ শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু নীলাচল গমন-কালে ক্ষীর-চোরা-দে-গীবাথ ও সঙ্কীর্ণাশাল দর্শনকালের উপাখ্যান প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। শ্রীভগবদ্গীতা যে সাক্ষাৎ ভগবান এবং অভিন্নরূপে বিরাজমান ; উহার নিদর্শনস্বরূপে প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করেন। শ্রীনাম ও নামীতে যেমন ভেদ নাই, শ্রীবিগ্গ ও ভগবানেও তদ্রূপ অভিন্ন তত্ত্ব। পরে কীর্তনান্তে শ্রীতুলসী-পরিক্রমা করিলে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠার কাণ্ড আরম্ভ হয়।

ঐ দিন সন্ধ্যায় এক মচতী সভা আরম্ভ হইলে পূজাপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভাপতি মহারাজের নির্দেশে শ্রীমৎ পর্যটক মহারাজ উহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে

বলিতে গিয়া দুঃখ প্রকাশ করত বলেন,—“আমাদের অত্যন্ত দুর্দৈব যে, মানব-সমাজ আজ শুধু ভোগ-বাজ্জ লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পরিয়াছেন। তামসিক ও নৈশাচিক প্রমত্ততায় ব্যস্ত; যাহা মানব জীবনের সর্বোপরি কার্য্য নহে। জগতে ভোগ-লিপ্সা চরিতার্থ করার জগ্জই যে আহার গ্রহণ করা প্রয়োজন—ইহাই একমাত্র লক্ষিতব্য বিষয় নহে। বাচিবাব জন্য খণ্ডার প্রয়োজন—সত্য, কিন্তু খাইবার অল্প যেন বেচে থাক, ইহা সম্ভব নহে। এই তাৎপর্য্য পর্যালোচনার জন্য ধর্ম্মের প্রয়োজন।” এর পর শ্রীমৎ ত্রিদেশী মহারাজ সনাতন ধর্ম্মের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলেন, “সব একাকার করিতে গিয়া বিভ্রান্তিতে আনয়ন করিতেছে। অজ্ঞ বাজিগণ উচার যথার্থ তত্ত্ব অবগত না হইয়া পদস্থ উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়া বসে। অথবা ‘এক’ ও ‘বহু’—ইহার সংজ্ঞা আগে অবগত হওয়া প্রকার। ‘নচেৎ প্রত্যাবলী ব্যতীত অজ্ঞ কিছু লাভ হওয়া দুঃখ।”

তদনন্তর সভাপতির আদেশে শ্রীল মহারাজস্বামী “পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥”— শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী আবৃত্তি করিয়া বলেন, শ্রীগৌরসুন্দরের এই বাণী পৃথিবীতে আজ ক্রমশঃ বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বাণীই জগতে প্রকৃত মঙ্গল আনয়ন করিতে সমর্থ। বিশ্বভ্রাতৃ—এই ধারায় রূপায়ন সম্ভব, নচেৎ গতিবদ্ধ তাত্কালিক বা নৈমিত্তিক ধর্ম্মচিন্তায় উচার প্রসারতা অব্যবস্থা। এর পর কীর্তনধ্বনি উচ্চারিত হয় ও সভার কার্য্য সমাপ্তি ঘটে।

এবা জৈষ্ঠ ব্রহ্মহুর্দে মঙ্গলরতি যথারীতি অনুষ্ঠিত হইলে এই দিনেও নগর-পরিক্রমা আরম্ভ হয়, শ্রীমঠকে কেন্দ্র করিয়া পরিষ্কার ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরে সত্তর পরিক্রমাস্ত্রে শোভাযাত্রা। শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করিলে পূর্ব্বাহ্ন হইতেই যজ্ঞানুষ্ঠান ও মাহাত্মিক-স্তব্যাতির সমাধোৎসব এবং যথারীতি কীর্তন-মুখে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান-কাণ্ড সূচিত হইতে থাকে। শ্রীগোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের লায় এখানেও বিপুলভাবে আনুষ্ঠানিক কার্য্য সম্পাদিত হয়। এর পর শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য-দেবের শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত ও আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানাদি সূচিত হইলে সমিতির সর্ব্বদান সভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মোচন করেন এবং বিপুল ভক্তধর্ম্মিণী যথোপযোজনায় উপস্থিত হইতে থাকে।

ভদনন্তর বিবিধ উপকরণাদি উৎসর্গীত হইলে ভোগারতি আরম্ভ হয়। শ্রীপাদ গোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারী প্রভুর মূলগায়কত্বে স্থলনিত কর্ত্তে আরতি-কীর্ত্তন ভেসে উঠে। আরতি অন্তে শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ গুরুবর্গ তথা বিষয়াশ্রয়-বিগ্রহগণের জয়ধ্বনি প্রদান করেন। এর পরেই সারি সারি লোকজনকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হয়। সহস্র সহস্র লোক আকর্ষ্ট হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যায় আরতি সমাপ্ত হইলে এক মহতি সভার আয়োজন হয়। এই সভায় শ্রী শ্রীল গুরুপাদময় ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেন্দান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ সভাপতির আসন অধিকৃত করেন। মালা-চন্দনাদি-দ্বারা সন্মার্জিত-মহারাজ ও সন্ন্যাসীওঁক তথা বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্রহ্মচারীবৃন্দকে অলঙ্কৃত করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সর্ব্বপ্রথমে এই দেশীয় ভক্ত শ্রীপাদ পোমানন্দ দাসাদিকারী পক্ষ সভাপতি-মহারাজের নির্দেশে অসমীয়া ভাষায় তিনি ভক্তিতত্ত্বপূর্ণ দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন এবং তিনি অত্যন্ত আবেগ ভরে প্রকাশ করেন যে, আজ অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়, কারণ ভক্তিবর্ষের দ্বুতিকালে এই প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে গগনচুম্বি গুণু মন্দিরেই রচিত হয় নাই, উপরন্তু বাহ্যতে ভক্তিতত্ত্ববাণী সঞ্জিবীত থাকিতে পারে তজ্জন্ত তাহার ব্যবস্থাও গ্রহণ করিয়াছেন— এই মর্মে উজ্জলতা দান করিয়া।

ভদনন্তর শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ অসমীয়া ভাষায় এক দীর্ঘ ভাষণে বলেন, শ্রীল প্রভুপাদ দৈববর্গ শ্রম প্রতিষ্ঠা করার জন্ত যেকোন প্রয়াস চালাইয়া ছিলেন— তাহা ইতিপূর্বে ঐরূপ কেহ করিয়াছেন বলে জানা নাই। আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে তবেই ইহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। শ্রীমন্নিমানন্দ সেবাতীর্থ প্রভু সেট বাণীব মূর্ত্তবিগ্রহরূপে বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও আসামে তিনি যেকোন নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালাইয়া ছিলেন— তাহাওই ফলস্বরূপে আজ আসাম-দিগন্তে শ্রীগৌর-বাণী প্রচার হওয়া সম্ভব হইয়াছে বলিলে অতুল্য করা হইবে না। তাহার স্মৃতি রক্ষার্থে অসমীয়া গুরুপাদময় চিহ্নলাস নিতালীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ বাসুগাঁও-এর এই মঠের নামকরণ “শ্রীমন্নিমানন্দ গৌড়ীয় মঠ” করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে অন্তিতে পারা গেল, ঐ নামানুসারে ‘আসাম বৈষ্ণব-সম্মিলনী’ একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অতঃপর ‘শ্রী বাসুদেব গৌড়ীয় মঠ’ নামে রূপান্তরিত হইল। শ্রীল

প্রভুপাদের সময় তাঁহার পার্শ্বদর্শনের অনেকেই এক একজন দিকপাল মূর্তি ছিলেন। তন্মধ্যে আসাম-প্রান্তে শ্রীল নিমানন্দ প্রভু অন্যতম।” এর পর তিনি আরও বলেন, আজ আমাদের অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এই মঠের যিনি প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য পরমহংসকুল মুকুটমণি নিকালীল,-প্রতিষ্টে ঐ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তকিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ও তাঁহার ঐকান্তিক প্রার্থনাক্রমে এবং আনুকূল্যে এই মঠ প্রতিষ্ঠা হইবার সুযোগ হইয়াছিল—সেই বিদেহী পার্কীচরণ রায় মহাশয় আজ আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রহেছেন। আজ তাঁহাদের বিরহ-আলা হৃদয়কে বিদীর্ণ করিতেছে।

তদনন্তর শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমৎ পর্যটক মহারাজ, শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমৎ পরিব্রাজক মহারাজ প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব, মঠ-মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা, সনাতন ধর্ম্ম-তত্ত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন। এর পর মঠ-রক্ষক শ্রীমন্তকিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বৈষ্ণবগণের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্ব্বক বক্তব্য রাখেন যে, পরম-কারুণিক শ্রীশ্রী গুরুপাদপদ্যেব অষ্টৈতুকা করুণায় এবং বৈষ্ণবগণের শুভেচ্ছায় শ্রীমন্দিরের নির্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ সমাপ্ত না হইলেও অগ্রগতির প্রায় শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়াছে—এর মধ্যে তত্বতো অনেক ফ্রটি-বিচ্যুতি না হইয়া থাকে নাই। অতএব তাহা যথাযথ ভাবে রূপায়িত হয়—এ ব্যাপারে পুজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ যেন কৃপা কটাক্ষ রাখেন—তজ্জ্ঞ প্রার্থনা জানাই।” তদনন্তর সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব নাহিন্দীর্ঘ ভাষণে বিভিন্নমুখ্য দিক্ প্রদর্শন করাইয়া শেষে বলেন,—আমরা গৃহেই থাকি আর বনেই থাকি না কেন, মানব জীবনের যে-মুখ্য উদ্দেশ্যই হইল—ভগবন্তজন, তাঁহার প্রতি যেও উদাসীন না হই। এর পর কীর্ত্তনধ্বনি শুভে মঠে।

এই উৎসব-সম্পাদনায় শ্রীপাদ রূপগতিদাস ব্রজবাসী প্রভু, শ্রীপাদ সনৎকুমার ব্রজভারী প্রভু, শ্রীজয়গোপাল ব্রজচারী প্রভু প্রমুখ আরও প্রভু-গণের সেবা-প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

—শ্রীসচ্চিদানন্দদাস ব্রজচারী

লালাবাবুর বৈরাগ্য

“চুড়ি চাই, চুড়ি চাই,
বেলা নাই, বেলা নাই,”

ফেরিও'লা চলিছে যে হাঁকি' ।

লালাবাবু বাতায়নে

বসি ছিল আনমনে

ডাক শুনি' উঠিল চমকি' ॥

“হায় হায় কি করিহু

রাধাকৃষ্ণ না ভজিহু,

বুখা কাজে সময় যে গেল ।

ধন-জন-দেহ সবে

মৈলে কিছু নাহি রবে,

মন মোর শুধু বিষ খেল ॥”

লালাবাবু এত চিন্তি'

লভিতে পরম শান্তি

ধরিল যে ভিখারীর বেশ ।

সব ধন বিলাইয়া

রাধাকৃষ্ণ নাম নিয়া

মুগুন করিল সব কেশ ॥

ঘরে ঘরে ভিক্ষা চায়

কৃষ্ণনাম গান গায়,

নয়নেতে বহে অশ্রুধার ।

বাসস্থান বৃক্ষতলা

সাথী হল জগৎকাল

অস্ত্রমেতে ভবসিন্ধু পার ॥

THE ADVENT ANNIVERSARY OF
Lord Shri Krishna
AT

SHRI MEGHALAYA GOUDIYA MATH, TURA

Guided By The Devotees Of
Shri Goudiya Vedanta Samiti (Regd.)
—1983—

ALL GLORY TO SHRI SHRI GURU & GOURANGA

Sir/Madam !

*A great religious conference, Nam-Sankirtan,
Ramayan discourse, theistic exhibition of Shri
Krishna-Lila, film show of Shri Krishna-
Lila, Shri Chaitanya-Lila, Shri Ram-Lila etc.
will be held at*

SHRI MEGHALAYA GOUDIYA MATH TURA
*as previous years according to the following
programme. All are cordially requested to
co-operate and sympathise the renowned society
irrespective of caste and creed this holy function.*

Yours ;

*In the Service of the Supreme Lord,
Members of*

SHRI GOUDIYA VEDANTA SAMITI (Regd.)

—: Programme :—

Religious Conference

All the meeting will be presided over by the present President-Acharyya of Sri Gaudiya Vedanta Samiti (a religious organisation, situated all over India), Tridandi-Swami 108 Shri Shrimat Bhakti Vedanta Baman Goswami Maharaj.

31-8-83 Wednesday : (6-30 P. M. to 9 P. M.)

Subject :- Lord Shri Krishna and His Philosophy.

Inauguration by :- Tridandi-Swami B. V. Yati Maharaj.

Chief Guest :- Mr. Sanford Marak, Honourable Health-Minister of Meghalaya.

Chief Speaker :- Tridandi-Swami B. V. Acharyya Maharaj.

—: Presidential Address :—

* * * * *

RAM LILA KIRTAN (In Bengali)

From 21-00 to 22-30

By Shyamal Krishna Dasadhikari,

Rag-Bhushan (Radio-Artist)

1-9-83 Thursday : (6-30 P. M. to 9 P. M.)

Subject :- Sanatan Dharma and World Problem.

Chief Guest :- Mr. D. N. Arya,

Asstt. Commandant, 96 Bn. B. S. F., Tura.

Chief Speaker :- Prof. T. K. Das, Tura Govt. College,

Short Speech by :- i) Mr. P. K. Azim

ii) Tridandi-Swami B. V. Baishnav Maharaj

iii) Tridandi-Swami B. V. Sannyasi Maharaj

iv) Tridandi-Swami B. V. Vishnu Maharaj

—: Presidential Address :—

* * * * *

RAM LILA KIRTAN (In Bengali)

From 21-00 to 22-30

By Rag-Bhushan (Radio-Artist)

All India Pilgrimage Film Show : By—

Shri Kamalapatidas Brahmachari, Bhakti-Kushum.

ধর্মঃ ঈশ্বরোত্তমঃ পুংসাং যিবকুসেন-কথাসু যঃ ।	<p>স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।</p>  <p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা স্প্রপ্রসীদতি ॥</p>	নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিঃ জম এব হি কেবলম্
--	---	--------------------------------------

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরদম ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদগ্ধশূ ।

অত্ম ধর্ম সুচক্রেপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই জম ।

৩৫শ বর্ষ	}	২৫ হৃষিকেশ, ক্ষীরোদশায়ী, ৪৯৭ গোবিন্দ ৩১ ভাদ্র, শনিবার, ১৩৯০ ; ইং ১৭/৯/১৯৮৩	{	৭ম সংখ্যা
----------	---	--	---	-----------

সামুদ্রানন্দ

শ্রীরাধারমণ-গুরুবর-স্মরণাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-বিবর্তিতম্]

প্রাতঃ শ্রীভূগবী-নামঃ স্ব-করতন্ত্রং-পিণ্ডিকা-লগনং
তৎসামুখ্যমথ স্থিতিঃ স্মৃতিরথ স্ব-স্বামিনোঃ পাদয়োঃ ।
তৎসেবার্থ-বহু-প্রসূন-চয়নং মিত্যং স্বয়ং যস্য ভং
শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্তাবনো ॥১॥

যিনি প্রতিদিন শ্রীভূগবীদেবকে প্রণাম করেন এবং যজ্ঞে সেই ভূগবী-দেবীর পিণ্ডিকা [অর্থাৎ বেদি] লগন করেন, অনন্তর তাঁহার সমুখে অবস্থিত হইয়া আপন ইষ্টযুগলকে স্মরণ করেন এবং স্বয়ংই ইষ্টসেবা নিমিত্ত বহুবিধ পুষ্প-চয়ন করেন, সেই শ্রীরাধারমণ নামে গুরুবরকে অসি ক্ষিতি-বৃষ্টিত হইয়া দর্শনের বন্দনা করিতে পারিবে ॥১॥

মধ্যাহ্নে তু নিজগণ-পদ-কমল-ধ্যানার্চনামার্পণ-
প্রাদক্ষিণ্য-নতি-স্তুতি-প্রণয়িতা নৃত্যং সত্যং সজ্জতিঃ ।

শ্রীগদভাগবতার্থ-সৌধ-মধুক-স্বাদঃ সদা যস্য তৎ

শ্রীরাধারমণং যুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যা বনৌ ॥২॥

যিনি মধ্যাহ্নে প্রতিদিন অষ্টাষ্ট-যুগলের চরণ-কমল-ধ্যান ও অর্চন আর-
নিবেদন, প্রদক্ষিণ, প্রণাম, স্তবপাঠ, প্রণয়-প্রকাশ, নৃত্য, সাধুসঙ্গ ও শ্রীগদ-
ভাগবতার্থের সাধুরা আশ্বাদন করিয়া থাকেন, সেই শ্রীরাধারমণ নামে
গুরুবরকে কর্ষণবে ক্ষিত-লুপ্তিত হইয়া বন্দনা করিতেছি ॥২॥

প্রক্ষাল্যান্তিষ্ণু-যুগং নতিস্তুতি-জয়ং কর্তুং মনোহৃত্বাংসুকং
সংযং গোষ্ঠমুপাগতং বনভূবে-উষ্টুং নিরু-স্বামিনং ।

প্রেমানন্দ-প্রেম নেত্র-পুট-স্বাদীরা চিরং যস্য তৎ

শ্রীরাধারমণং যুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যা বনৌ ॥৩॥

স্বাভাসে স্বামী গোচারণ করিয়া বনভূমি এইতে প্রত্যগত হইলে তাঁহার
পাদযুগল প্রক্ষালন করিয়া প্রণাম, স্তবপাঠ ও জয়-ঘোষণা করিবার ছত্র বঁহার
মন অত্যন্ত ইংস্ক হয় এবং প্রেমানন্দভরে নেত্রযুগল অবিরত অশ্রুধারা প্রবাহিত
হয়, সেই শ্রীরাধারমণ নামে গুরুবরকে ভুলুপ্তিত হইয়া বন্দনা করিতেছি ॥৩॥

রাত্রৌ শ্রীজয়দেব-পদ্ম-পঠনং তদগীত-গানং রসা-

স্বাদো ভক্ত-চরিতঃ সঙ্গীতিভিরঃ সঙ্গীতেন সন্তনং ।

রাধাকৃষ্ণ-বিদ্যাম-কন্যাসু প্রাবদু উনিদ্রতা যস্য তৎ

শ্রীরাধারমণং যুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যা বনৌ ॥৪॥

রাত্রিকালে যিনি শ্রীজয়দেবচিত্ত কবিতা পাঠ করেন এবং তদ্রচিত গীত
গান করেন ও গুরুসমূহের স্তুতি বলাশ্বাদন করেন, কোন সময়ে সঙ্গীতেনে
চতুর্দিকে নৃত্য করেন এবং উদ্বিগ্ন হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিদ্যাস-কেলি অহুভব
করেন, সেই শ্রীরাধারমণ নামে গুরুবরকে আমি ক্ষিত-লুপ্তিত হইয়া কর্ষণে
বন্দনা করিতেছি ॥৪॥

নির্দেহ্যক্ষরয়োদ্বয়ং পরিচয়ং প্রাপ্তং ন যৎকর্ণয়োঃ

সাধুনাং স্তুতিমেব যঃ স্বরসনামাস্বাদয়ত্যবতং ।

বিশ্ব স্ত্রাং জগদেব যস্য ন পুনঃ কৃত্যপি দোষগ্রহঃ

শ্রীরাধারমণং যুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যা বনৌ ॥৫॥

“নিদা” এই অক্ষরযুগই তাহার কর্ণধর সহ পরিচয় করে নাই, যিনি প্রতি-
দিন আপন জিহ্বাকে শাখুগুণের স্তুতি আশ্বাসন করাইয়া থাকেন, যিনি সমগ্র
জগৎকেই বিশ্বাস করেন, কোন স্থলেই দোষ গ্রহণ করেন না, সেই শ্রীরাধারমণ
নামে গুরুবরকে ক্ষিতি-লুপ্তি হইয়া আনন্দের সহিত বন্দনা করিতেছি ॥৫॥

যঃ কোহপ্যস্ত পদাজ্জয়োনিপতিভো যঃ স্বীকরোজ্যেব তং

শীঘ্রং স্বীয়-কৃপা-বলেন কুরুতে ভক্তৌ তুমত্ৰাস্পদং ।

নিত্যং ভক্তি-বহন্য-শিক্ষণ-বিধির্নস্তা নভূতোযু তং

শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যা বনৌ ॥৬॥

যে কেহ পাদপদ্মে নিপতিত হইলেই যিনি তাকে অলীকার করিয়া থাকেন,
সুপাত্র-জ্ঞানে শীঘ্রই তাঁহাকে ভক্তিমাৰ্গে প্রবৃত্তিত করেন, সেই শ্রীরাধারমণ
নামে গুরুবরকে আমি ক্ষিতি-লুপ্তি হইয়া হৃষ্ট-চিত্তে বন্দনা করিতেছি ॥৬॥

সর্বদ্যৈন ত-ভূত্য-মুদ্বি কৃপয়া যস্য স্বপাদার্পণং

স্বিহা চাকু কৃপাবলোক-সুধয়া তন্মানসোদাসনং ।

তৎপ্রমোদয়-হতবে স্বপদয়োঃ সেবোপদেশঃ স্বয়ং

শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যা বনৌ ॥৭॥

কোন ভূত্য সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে যিনি কৃপা করিয়া আপন চরণ তাঁহার
মস্তকে স্থাপন করেন এবং ননোহর দীপ্য হস্ত করিতে করিতে কৃপাদৃষ্টকৃপ-অধা
লকার করিয়া তাঁহার মানসকে বিষয়-বিরক্ত করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রেম
সফারার্থ স্বয়ংই স্বপদের সেবা করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন, সেই শ্রীরাধারমণ
নামক গুরুবরকে আমি ক্ষিতি-লুপ্তি হইয়া হৃষ্টভাবে প্রণাম করিতেছি ॥৭॥

রাধে ! কৃষ্ণ ! ইতি পুত্ৰ-স্বর-যুতং নামামৃতং নাথয়ো-

জিহ্বাগ্রে নটরগ্নিরন্তরমহো ! নো বেক্তি বস্তৃৎ কচিৎ ।

যৎকিঞ্চিদ্ ব্যবহার-সাধকমপি শ্রেয়ৈব মগ্নোহস্তি যঃ

শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যা বনৌ ॥৮॥

যিনি পুত্র-স্বরে স্বামি-যুগলের “হ রাধে ! হে কৃষ্ণ !” এই নামামৃত নিরন্তর
জিহ্বাগ্রে নটরগ্নিরন্তরমহো ! নো বেক্তি বস্তৃৎ কচিৎ ।
অগত হইতে পারেন না, কারণ সর্বদা প্রোমেই মগ্ন থাকেন, সেই শ্রীরাধারমণ
নামক গুরুবরকে আমি ক্ষিতি-লুপ্তি হইয়া আনন্দস্বরূপে বন্দনা করিতেছি ॥৮॥

তৎপদাসুভূজ-সীধু-সুচকভঃ। পত্ন ষ্টকং সর্ব্বথা।
 যাভং যৎপদমাণুভাং প্রভুধর ! শোভাং-কৃপা-বারিধে ! ।
 মচেতভ্রমরোহবগন্য তদদং প্রাপ্যাবিশেষং ভবেৎ-
 সঙ্গং মঞ্জু-নিকুঞ্জ-ধাম্মি মুমতাং তৎস্বামিনাঃ সৌরভম্ ॥৯॥

হে শঙ্কর ! তে পোদ্বেলিত-কৃপাসমুদ্র ! এষ্ট পত্রাঙ্কক সর্ব্বপ্রকারে
 আপনাদের পাদরূপ কমলের মধু হুণা করিতেছি । আমি প্রার্থনা করি আমার
 চিত্ত-ভ্রমর সেই কমলকে অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে ভবৎ-সঙ্গগুণে মনোজ্ঞ-
 নিকুঞ্জ-রঞ্জে শ্রীরাধাকৈশোর সৌরভ লাভ করুক ॥৯॥

সজ্জন-শাস্ত্র (১১)

বৈষ্ণব-অপরাধী সাউরীস সহজিয়াই অশাস্ত্র

শ্রীমদ্ভগবৎ বা সজ্জনই এচমাত্র শাস্ত্র । অনজ্জন হইতে কেহই ইচ্ছা করেন
 না। সত্য, কিন্তু যোগ্যতার অভাবে বৈষ্ণবের পাদপদ্মে অপরাধী হইয়া অসং-
 দ্বভাবকে নিজ-স্বভাব বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া মায়াবদ্ধ অহঙ্কারী ভীষ
 'অশাস্ত্র' নামে আখ্যাত হন । প্রকৃতি চক্রেতে যুক্ত বা মগ্ন হইতে
 অহঙ্কারের উদ্ভব । অনজ্জন বৈষ্ণবাপরাধক্রমে অপ্রাকৃত-দর্শন-বিমুখ হইয়া
 প্রাকৃত রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাযোগে চটু-পটু করিতে থাকায় তাহার
 অহঙ্কারের ক্রিয়াই পরিপূর্ণ হয় । তিনি সেই বিষে একরূপ জর্জরিত হইতে
 অশাস্ত্র হন যে, শ্রীকৃষ্ণভক্ত সজ্জনকেও অহঙ্কারযুক্ত-ভাবপূর্ণ আদোষ-পূর্ব্বক
 তাঁহাকেও নিজ সদৃশ জ্ঞান করেন । প্রাকৃত অহঙ্কার ছাড়িয়া যদি তিনি
 কোন দিন সজ্জন শাস্ত্রের আদর্শ দেখিবার চক্ষু পান, তাহা হইলে বুঝিতে
 পারিবেন যে, সজ্জনই কেবল শাস্ত্র আর সঙ্কীর্ণ জড়বুদ্ধি বৈষ্ণব-পরিচয়
 ভাকাজক্ষী প্রাকৃত সহজিয়াই কেবল অশাস্ত্র ।

জীবের স্বরূপ ও তাহার ক্রমোন্নতি

শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু বলিরাছেন যে—

কেশাশ্র শতক ভাগ পুনঃ শতংশ করি ।
 তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি ।
 তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ ।
 জঙ্গমে ত্রিপাক্ রস স্থলচর বিভেদ ।

তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর ।
 তার মধ্যে স্বেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর ॥
 বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্ধেক বেদ মুখে মানে ।
 বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম নাহি গণে ॥
 ধর্মচারী মধ্যে বহুত কৰ্মনিষ্ঠ ।
 কোটি কৰ্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ॥
 কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত ।
 কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত ॥
 কৃষ্ণভক্ত—নিরাম, অতএব 'শাস্ত' ।
 ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশাস্ত ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯, ১৩৯, ১৪৪-১৪৯)

সাঁউরীর সহজিয়া নীচ শূদ্ধ হইয়াও বৈদিক প্রচার করিতে গিয়া অপরাধবশে সংসারে নিমজ্জিত

যাহারা জড় বিচার অবলম্বনপূর্বক সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব জানিয়াছি মনে করে এবং হরি-সেবা-প্রবৃত্তি হইতে স্বীয় স্বভাবক্রমে দূরে অবস্থান করে তাহাদের অনন্তকোটি জীবনেও অপরাধ চাড়ে না । তাহারা চিরদিনই অপরাধী বা অশাস্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সহিত বিরোধ করিবার বাসনায় পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে । তাহারা কেহ মুখে বেদ মানে, কেহ বা নিজ যোষিৎসঙ্গময় পাপময় জীবনে বেদালোচনা নিষিদ্ধ জানিয়াও নীচ শূদ্ধাভিমানে প্রচারক-নামে প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষু হয় । ক্রোধেচ্ছায়, আপামর সকলেই তাহাদিগকে উপেক্ষা করে ; সুতরাং উপেক্ষিত হইয়া তাহারা বৈষ্ণবাপরাধে অশাস্ত হইয়া উত্তরোত্তর সংসারে নিমজ্জিত হয় । বেদের সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন বুঝিতে না পারিয়া নিজ নিজ অসৎ অশাস্ত বৃত্তিসমূহকে তত্ত্বমানে প্রচার করিয়া বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ লক্ষ্য করে ।

সহজিয়ারা শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজের নিন্দা করিয়া কৰ্ম্মী, জ্ঞানী,
 মিছাভক্ত হয় এবং পরে সজ্জনের পায় পড়িয়া
 ত্যাগী বৈষ্ণব হয়

বেদ মুখে মানিয়া হরি-ভক্তন-বিমুখ বদ্ধ অহঙ্কারী জীব বেদ-নিষিদ্ধ পাপ-সকল করিতে থাকে এবং তীব্র প্রতিবাদে সজ্জন-সমাজকে নিন্দা করে ।

কোটি কোটি তাদৃশ জীবনে অশান্তি পাইয়া ক্রমশঃ পাপক্ষেপে জন্মজন্মান্তরে পুণ্যময় জীবন লাভ করিয়া কর্মী পদবীতে উন্নত হয়। পরে তাদৃশ বিষময় কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড বা মিছাভক্তকাণ্ড অতিক্রম করিয়া সজ্জনের অমল পাদপদ্মে শান্তিলাভ করে। যে-কালপর্য্যন্ত না কৃষ্ণবিমুখ অশান্ত-বৃত্তির বিষময় ফল উপলব্ধি হয়, যে-কালপর্য্যন্ত না শ্রীসজ্জনের অমল পাদ-পদ্মের মাহাত্ম্য সুকৃতিক্রমে লভ্য না হয়, তৎকালাবধি অহঙ্কারী জীব বৈষ্ণবকে নিজের ন্যায় অশান্ত অহঙ্কারী কপটী জীব-বিশেষ বলিয়া চিৎকার করে।

সহজিয়ার প্রতি ত্রিদণ্ডী শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃত্য

শুদ্ধ বৈষ্ণবের ধর্ম এই সকল অনভিজ্ঞ অর্দ্ধাচীন অশান্ত জীবকে কেবল উপেক্ষা করা। শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিদণ্ডী ভাগবত মহোদয় যে-ভাবে অশান্ত অহঙ্কারী জীবগণের দ্বারা নিপীড়িত হইয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন সেই স্থান প্রত্যেক বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডীর অনুক্ষণ আলোচ্য বিষয়। বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডী বা ত্যক্তদণ্ড পরমহংসগণ এই অশান্ত জীবকে তাহাদের অশান্তি হইতে উন্মুক্ত করিবেন না, পরন্তু উপেক্ষা করিবেন মাত্র—ইহাই ত্যক্তদণ্ড বা ত্রিদণ্ডীর ধর্ম।

ঘর-পাংগল্য সহজিয়ারদের শিক্ষার জগু

মহাশ্ৰম্ভুর সম্মুখ ও ত্রিদণ্ড-ব্যাখ্যা

শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু এই ত্রিদণ্ডীর ধর্মকেই 'গৃহি-গৌরান্ধসেনবী' বদ্ধ জীবের সর্বোত্তম বিচার বলিয়া নিরূপিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই এট 'ত্রিদণ্ড-ধর্মের ব্যাখ্যা' তা এবং শ্রীগৌরান্ধসেন স্বয়ং 'সম্মুখ' করিয়া তাহাই ত্রিদণ্ডী বৈষ্ণবের জগু স্বয়ং আশ্বাসন করিয়া দেবাইয়াছেন। ইহাই মর্মার্থ গ্রহণ করিতে পারিলেই জীবের অশান্তিময় ধর্ম অশুভ হইবে। বদ্ধজীব কৃত্রিম সাংস্কৃতিক বিকাশ অথবা বাবাঠাকুরের সম্মান প্রভৃতি অসং পরিচয় ছাড়িয়া সজ্জন হইতে পারিবেন।

সাউরীর সহজিয়ার সম্ভাব ও ত্রিদণ্ডীর সহিষ্ণুতা

"দুর্জয়নগণ" বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডীকে তিরস্কার, অপমান, উপহাস, হিংসা, তাড়না, (রাজদ্বারে) আবদ্ধ ও নানাপ্রকারে বঞ্চনা করেন। কোন সময় ত্রিদণ্ডীকে ঘৃণা করিয়া তাঁহার গাত্রে থুথু ফেলেন, প্রত্নাব করিয়া দেন এবং তাঁহার ভগবদ্ভক্তনে নানাপ্রকার ব্যাধাত করেন। ত্রিদণ্ডী, দুর্জনের কথায় আপনায় ভজন-নিষ্ঠা ত্যাগ না করিয়া স্বয়ং সমস্ত সহ করেন। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে

বলিলেন, ঠাঁহার। দুর্জনের বাক্যে ক্ষুব্ধ না হন, এক্ষণ সাধু জগতে বিরল।
অসঙ্জনের নির্ভর বাক্যবাণ, অরুদ্ধ (ক্লেণদায়ক), কেবল হরিভক্তি থাকিলে
তিনি সহ্য করিতে সমর্থ।

অবস্থানগরের ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর বৈরাগ্য স্বাস্থ্যবিক, কৃত্রিম নহে

অবস্থী দেশে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ নানাপ্রকারে ধন সঞ্চয় করিয়া সমাজে
প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার কণন স্বভাব ও লোভ বশতঃ গ্রামবাসিগণ,
দেবগণ এবং অস্থান্য অনেকেই তাঁহার প্রতিকূল হইলেন। এই প্রতিকূল
আচরণের ফলে তিনি সকল প্রাকৃত বিষয় হইতে অপসারিত হইয়া প্রাকৃত
বৈরাগ্যে উপনীত হইলেন। বৈরাগ্য উদয় হইবামাত্র তিনি বুঝিলেন যে,
তাঁহার প্রতি ভগবানের নিরূপট করুণার উদয় হইয়াছে।

অনধিকারীর সম্মাসদান ও স্বয়ং ত্রিদণ্ডগ্রহণ

তিনি আপনাকে নিত্য কৃষ্ণদাস জানিয়া ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু প্রভৃতি তুর্বাশ্রম-
সংস্কার ‘স্বয়ং’ গ্রহণ করিলেন; যেহেতু কৃত্রিমভাবে তাদৃশ সংস্কার
এক ব্যক্তি অপরকে দিতে অসমর্থ এবং কোন ব্যক্তি অপরকে নিকট
হইতে ছল-বৈরাগ্য গ্রহণ করিতেও অসমর্থ। সম্মাস গ্রহণকালে
আনুষ্ঠানিক পৌরোহিত্যের আদর শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রভৃতি কেহ কেহ প্রদর্শন
করিয়াছেন। পরন্তু তাদৃশ আদর্শের অনুকরণে গুরুর নিকট হইতে কৃত্রিম
বৈরাগ্য-গ্রহণ পন্থাই যে সমাচীন—এক্সপ সঙ্জনগণ বলেন না। বিবিৎসা বা
বৈধ-সম্মাসে আনুষ্ঠানিক পৌরোহিত্য স্বীকৃত আছে।

ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর প্রতি অশাস্ত ব্যক্তিগণের অত্যাচার

আবস্থি = ভিক্ষু মহাশয় লৌকিক নিজ-ভোগ্য সকল পরিত্যাগ করিয়া
গৃহমেধ-বজ্জের সকল আশা ভরসা ছাড়িয়া, যখন হরিভক্তনোদ্দেশে স্বীয় ত্রিদণ্ড
গ্রহণের সদাচার প্রদর্শনে বাহির হইলেন, তখন গৃহমেধী অশাস্ত ব্যক্তিকগণ
তাঁহাকে ‘বৃদ্ধ যুবক’ ও ‘বালক’ হইয়া তাঁহার ত্রিদণ্ডে টান লাগাইলেন, তাঁহার
কমণ্ডলু, কছা, বজ্জমূত্র, মালিকা কাড়িয়া লইতে গেলেন, তাঁহার ভিক্ষালব্ধ
দ্রব্যে অসঙ্জনগণ খুৎকার ও প্রস্রাব করিয়া দিলেন, তাঁহাকে অপমান
করিবার জন্ত মস্তকে পদাঘাত করিলেন, কেহ বলিতে লাগিলেন, এই ত্রিদণ্ডী
চোর, বিষয় রক্ষা করিতে না পারিয়া, ভোগে অসমর্থ হইয়া ত্রিদণ্ডী হইয়াছেন;

লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্ত নানাপ্রকার চলনা বিস্তার করিতেছেন, এই ত্রিদণ্ডীকে ধরিয়া দড়ি দিয়া বাঁধ, ইহাকে সকলে মিলিয়া-বধ কর, ইহার সন্মাসের স্রবাগুলি অপহরণ কর, ইনি ধর্মধ্বজী এবং শঠ, মৌনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বকের দ্বারা কপটাচারী প্রভৃতি নানা দুর্ব্বাক্য বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ডীর ভাগ্যে চিরদিনই ঘটতে থাকিল।

অত্যাচারীর প্রতি ত্রিদণ্ডীর শাস্ত ব্যবহার

ত্রিদণ্ডী ভিক্ষু আপনাকে এই অক্ষত বাকাবাণে অথবা অস্ত্রের নিষ্ঠুর ব্যবহারে সম্মত মনে না করিয়া শাস্ত্রিকী বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তাহার মনে হইল এই, যে-সকল অনভিজ্ঞ অর্ধাচীন বিষয়-মতে প্রমত্ত হইয়াছে এবং ভগবানকে মায়িক অবতার মনে করে, তাহারা কিছু বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডী নহে, তাহাদের ধর্ম, বৃত্তি ও আচরণ পরিবর্তিত করাইয়া আমি কোন পার্থিব শাস্তি চাই না। যেদিন তাহারা বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডী হইবার দৌভাগ্য লাভ করিবে, সেইদিন তাহাদের এই প্রকার অসবৃত্তি আপন হইতেই নিবৃত্ত হইবে। আমি কেন উহাদের প্রচণ্ড রঙ্গ-রসের প্রতিবন্ধক হই ? জীব মাত্রেই যখন স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস তখন তাহাদের প্রচণ্ড বিরূপ-নৃত্য 'একদিন না একদিন' ঘামিয়া যাইবে। আমি বর্ত্তমানকালে আমার শুদ্ধ-নিষ্ঠা ছাড়িয়া দুর্ব্বৃত্তিদিগকে প্রত্যাভ্র-সূত্র অথবা তাহাদের প্রিজ্ঞাসাক্ষর কোতৃহল পরিতৃপ্তির ইন্দ্র-স্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে বুঝাইতে যাইব কেন ? তাহারা অপ্রদদান, কোন কথা তাহাদের বর্ত্তমান প্রস্তুতায় গ্রহণ কবিত্তে পারিবে না।

কার, মন ও বাক্যকে দণ্ডিত বা শাস্ত-করণই ত্রিদণ্ডগ্রহণ

আমি ত্রিদণ্ডী—ভাগবতদাস ; সুতরাং কাষমনোমকো তাহাদিগকে কোন প্রকার উদ্বেগ দিতে ইচ্ছা করি না। আমি বিস্তৃত মহাজনের পথের অনুসরণ করিয়া দুর্ব্বৃত্তগণের চতুর্বিধরূপ অত্যাভিলাষ, কর্ম ও জ্ঞানপথত্রয়ে বিচরণ করিব না। সজ্জন শাস্ত্রগণ যে কঠোর-শরণতা আশ্রয় করিয়া সমগ্র জাগতিক দুর্ব্বৃত্তি ছাড়িয়া চরিত্তজন করিয়াছেন আমিও সেইরূপ করিব। আমি দুর্জ্জন-গণের হিংসা-বহির ইন্দ্র-স্বরূপ হইয়া তাহাদের অশান্তির বুদ্ধি করাইব না।

ত্রিদণ্ডীর গৈরীক-বেষ ঘরপাগলা সহজিয়াদের কোপের

কারণ এবং শাস্ত্রগণের তাহাতে উপেক্ষা

শ্রীগৌরসুন্দর এই গাথা গান করিয়াই নিজাশ্রিত বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডিগণকে শ্রীহরিভজনের যে পথ দেখাইয়াছেন তদনুসরণেই প্রাচীন বেষ-পদ্ধতিগুলিকে

ত্রিদশ গ্রহণের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে। “গৃহী-গৌরাদ্ভের” সেবক গৃহমেধী-
যাজ্ঞিকের এই সকল কথা ভোগময় চিত্তবৃত্তিতে কোমলদিন প্রবেশ করিবে না।
তাহারা সঙ্কীর্ণ মায়াবাদ আশ্রয় করিয়া বৈধ ও অবৈধ প্রাকৃত
সহজিয়া হইয়া জড়ভোগকেই প্রেম বলিয়া জাহির করিবে।
কিন্তু সজ্জনগণ রূপ ঘণিত বৈধাবৈধ দুইপ্রকার প্রকৃত সহজিয়াবাদকে
অন্তরের সক্তি বর্জন করিয়া শ্রীভজবাদী গোষামিবর্গের নির্দিষ্ট শ্রীকৃপাভুগ
ভজনমার্গে অগ্রসর হইবেন। তাহারা সহজিয়াদিগের ঘণিত জড়ভোগময়
হিংসোৎপত্তী প্রতিবাদকে সর্বতোভাবে উপেক্ষা করেন।

—ভগদত্ত ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

ভক্তিতত্ত্ববিবেক—চতুর্থ প্রবন্ধ

ভক্ত্যাধিকার বিবেক

কর্ম-জ্ঞান-বিরাগাদি-চেষ্টাং হিত্বা সমন্ততঃ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যং তং শ্রীচৈতন্যমহং ভজে ॥

প্রথম প্রবন্ধে ‘শ্রদ্ধা ভক্তির স্বরূপ,’ দ্বিতীয় প্রবন্ধে ভক্তির স্থায় প্রকাশ পায়
কিন্তু স্বরূপতঃ ভক্তি নয় যে ‘ভক্তাভাস’ তৎস্বরূপ, তৃতীয় প্রবন্ধে ‘শ্রদ্ধা ভক্তির
স্বভাব’-বিচার করিয়াছি। সম্প্রতি এই প্রবন্ধে ‘শ্রদ্ধা ভক্তি অধিকার’-বিচার
করিতেছি। অধিকার ব্যতীত কাহারও কিছু লাভ হয় না। পুরুষ-যোগ্যতা-
বিচারই সকল কার্যের সাফল্যের মূল। এই বিচারটি বুঝিতে পারিলে আর
প্রাপ্তি-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, আমরা
বহুকাল হইতে গুরুপাদাশ্রয়-করত ভগবান্ন লাভ করিয়া শ্রবণ-কীর্তনাদি
করিতেছি, কিন্তু আমাদের কেন ফলোদয় হয় না? এরূপ মনে করিতে
করিতে ক্রমশঃ সমস্ত ভজনে অবিশ্বাস ও তাচ্ছল্য হইয়া পড়ে। অতএব
অধিকার বিচারটি বুঝিলে ঐ সমস্ত সন্দেহ ওইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়।
সকল লোকের শ্রবণ-কীর্তনাদি ও তজ্জনিত আশ্র-পুলকাদি ভক্তি
নয়। অতএব শ্রদ্ধা ভক্তির আশ্র লাভ করিবার জন্ত অধিকার নির্ণয় করা
সর্বতোভাবে কর্তব্য। কর্মাদিকারী বা জ্ঞানাদিকারীর হরিভজন প্রায়ই কর্ম
বা জ্ঞানই হইয়া পড়ে, এইজন্যই তাহাদের মঙ্গলময় ফল সংজ্ঞে হয় না।

প্রথমে শুদ্ধা ভক্তিতে অধিকার লাভ করিতে পারিলে হরিভজনটী শুদ্ধা ভক্তিরূপে অতি শীঘ্র ভাব-ফলকে উদয় করে। অতএব অধিকার-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলাম।

পণ্ডিতগণ শ্রীমদ্ভাগবতগীতা-শাস্ত্র হইতে এই বচনটী সংগ্রহ করিয়া থাকেন ;—

চতুর্কিঞ্চা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহজুঁন।

আৰ্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ (গী: ৭।১৬)

হে অজুঁন! বহু পুণ্যফলে জীব আৰ্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী বা জ্ঞানী হইয়া আমাকে ভজনা করে। এই চতুর্কিঞ্চ সুকৃতি পুরুষেরাই আমার ভজনের অধিকারী। স্বীয় দুঃখ নাশ করিবার জন্ত যাহার ইচ্ছা জন্মে, সে আৰ্ত্ত। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা যাহার হৃদয়ে উদয় হয়, সে জিজ্ঞাসু। সুখলাভের ইচ্ছা যাহার হয়, সে অর্থার্থী। অপরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি-সহকারে যিনি তত্ত্ব-দর্শন করেন, তিনি জ্ঞানী। আৰ্ত্ত হউন বা জিজ্ঞাসুই হউন, অর্থার্থী হউন বা জ্ঞানীই হউন, সুকৃতি না থাকিলে ভজনে প্রবৃত্তি হয় না। এস্থলে শ্রীজীব গোস্বামী সুকৃতি শব্দের অর্থ 'ভক্তি-বাসনাহেতু মহৎ-সম্পাদিময় কার্য্য' এরূপ লিখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আৰ্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এই তিন জনের সুকৃতি থাকা-নাথাকায় সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী সুকৃতিবশতঃ জ্ঞাতজ্ঞান হইয়া ভজনা করেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন ;—

তত্র গীতা-দি-যুক্তানাং চতুর্গামধিকারিণাম্।

মধ্যে যস্মিন্ ভগবতঃ কৃপা স্নাত্ত্বপ্রিয়ন্ত বা ॥

স ক্ষীণভক্ত্যাবঃ স্নাত্ত্বভক্ত্যাধিকারবান্।

যথেষ্টঃ শৌনকাदिश्च ধ্রুবঃ স চ চতুঃসনঃ ॥

(ভ: র: সিদ্ধ ১।২।১৪)

গীতা-দি শাস্ত্রে যে চারিটী ভক্ত্যাধিকারীর নির্দেশ আছে, তন্মধ্যে যাহার যাহার প্রতি ভগবানের বা ভগবদ্ভক্তের কৃপা হয়, সেই সেই ব্যক্তির আৰ্ত্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থার্থ ও জ্ঞানরূপ ভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া গেলে শুদ্ধভক্ত্যাধিকার লাভ হয়। উদাহরণস্থলে গজেন্দ্র, শৌনকাदि ঋষিগণ, ধ্রুব ও সনক-সনাতনাদির চরিত্র উল্লিখিত হয়। গজেন্দ্র কুন্তীর-দ্বারা আজ্ঞান্ত হইয়া সহজে আৰ্ত্ত হইয়া-ছিগেন। কুন্তীরের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত ভগবান্কে প্রার্থনা করিলে

ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া তাহাকে রক্ষা করেন। তৎকালে ভগবৎ কৃপাবলে তাহার আত্মভাব দূর হইলে সে শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী হইল। শৌনকাদি ঋষিগণ কলির আগমনে ভীত হইয়া কশ্মীর দ্বারা কিছু হইতে পারে না—এরূপ নিশ্চয় করত মহামুভব স্মৃত গোপালীকে জীবের নিতান্ত শ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসা করায় শুদ্ধা ভক্তির উপদেশ লাভ করত স্মৃত-কৃপাবলে শুদ্ধা ভক্তি-লাভ করেন। ঋষ মহাশয় প্রথমে অর্থার্থী হইয়া ভগবানকে উপাসনা করেন, কিন্তু যখন ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রকটিত হইলেন, তাঁহার কৃপাবলে ঋষের অর্থ-যাজ্ঞা দূর হইল এবং শুদ্ধভক্ত্যধিকার উপস্থিত হইল। গনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎ-কুমার এই চারিজনকে চতুঃসন বলে। তাঁহারা প্রথমে নির্বিশেষ জ্ঞান ছিলেন, কিন্তু যখন ভগবান্ ও ভগবন্তকৃষ্ণের কৃপা লাভ করিলেন, তখন ঐ নির্বিশেষবুদ্ধি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধা ভক্তির অধিকার লাভ করিলেন। ফলকথা এই যে, যে-পর্যন্ত আর্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থার্থ ও জ্ঞানরূপ-কষায় তাঁহাদের চিত্তে ছিল, সে-পর্যন্ত তাঁহাদের শুদ্ধা ভক্তির অধিকার জন্মে নাই। অতএব শুদ্ধা ভক্তির অধিকার বিচারে ঈকরূপ এতমাত্র কহিয়াছেন,—

যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোহিস্য সেবনে।

নাতিসঙ্কো ন বৈরাগ্যভাগস্যামধিকার্য্যসৌ ॥

(ভঃ রঃ সিদ্ধ ১২১৯)

সংসারে নিতান্ত আসক্ত না হইয়া এবং সম্পূর্ণ বৈরাগ্য লাভ না করিয়া অবস্থিত ব্যক্তির যখন অতি ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণসেবায় শ্রদ্ধা জন্মে তখন তিনি শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হন। তাৎপর্য্য এই যে, সংসারী পুরুষ নানাপ্রকারে আর্তি, প্রপীড়িত এবং প্রয়োজনীয় পদার্থভাবে ক্লিষ্ট হইয়া সংসারের চরম-গতি বুঝিয়া তাহাতে অনাসক্ত-ভাবে বর্তমান থাকেন এবং চরম জিজ্ঞাসা-দ্বারা ভগবান্ ব্যতীত অন্য গতি নাই,—এই কথাটিতে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া ভগবন্তকৃষ্ণে প্রবৃত্ত হন, তখন সর্বশাস্ত্রের অভিধেয় যে কৃষ্ণভক্তি তদবধারণরূপ শ্রদ্ধা উদ্ভিত হয়। এই শ্রদ্ধাই শুদ্ধভক্ত্যধিকারিণের একমাত্র হেতু। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্বাক্য :—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথানু নির্বিশ্বঃ সর্বকর্ম্মহু।

বেদ ছঃখানুকানু কামানু পরিত্যাগেহপানীশ্বরঃ ॥

ততো ভজত মাং শ্রীতঃ শ্রদ্ধালুদৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

যুযমানশ্চ তান্ কামান্ হুঃখোদকাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥

উক্ত শ্লোকদ্বয় বাখ্যান্তলে ‘ভক্তিসম্বর্ডে’ শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন যে—“ভদেবমন্য-ভক্ত্যাধিকারে হেতুং শ্রদ্ধামাত্রমুদ্ব। স কথা শুনেত তথা শিক্ষয়তি” অর্থাৎ এই শ্লোকদ্বয়ে অনন্য-ভক্তির অধিকার-হেতু একমাত্র শ্রদ্ধা ইহা বলিয়া শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ যেরূপ ভজনা করেন, তাহা কহিতেছেন । ‘আমার কথায় জ্ঞাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি সমস্ত কর্মফলে নির্বিকল হইয়া বৈরাগ্য লাভ করত অপপোকার কামসকলকে জীবের দুঃখ-দায়ক বলিয়া জানিতে পারেন, অথচ দেহযাত্রার নিমিত্ত এবং পুনর্কাসনারূপ অনর্থের কিয়ৎপরিমাণ বশীভূত হইয়া সেইসকল কর্মজাত ও কর্মফল হইতে উদ্ধার হইবার জন্য শ্রদ্ধালু ও দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া সেই সমস্ত কামকে নিন্দা করিতে হ্রিতে ভোগ করিতে থাকেন এবং আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন ।

পুনরায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন.—শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসঃ । শাস্ত্রক তদশরণস্ত ভয়ং তচ্ছরণস্ত্যভয়ং বদতি । অতো জাতায়াং শ্রদ্ধায়াস্তং শরণা-পত্তিরেব লিজমিত ।” শ্রদ্ধার নাম শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস । শাস্ত্র এট বলেন যে, যিনি ভগবানের শরণ লম নাই তাঁহার ভয় আছে, যিনি তাঁহার শরণ লইয়াছেন তাঁহার ভয় নাই । অতএব শরণাপত্তি-লক্ষণ দেখিলেই শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, স্বীকার করা যায় ।

শরণাপত্তি কাহাকে বলি ? শ্রীজীব কহিয়াছেন—“জাতায়াং শ্রদ্ধায়াং সদা তদনুবৃত্তি-চেট্টৈব স্তাৎ”, “কর্ম-পরিত্যাগো বিদীয়তে” অর্থাৎ শ্রদ্ধা জন্মিলে কৃত্যনুবৃত্তি চেট্টা সর্বদা লক্ষিত হয় ও কর্ম স্বরূপতঃ পরিত্যক্ত হয় । ইহাই শরণাপত্তি । ভগবদগীতা-শাস্ত্রে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পৃথক্ পৃথক্ বিচার করিয়া অত্যন্ত গুরুতম উপদেশদ্বারা ভগবান্ শরণাপত্তি শিক্ষা দিয়াছেন ; যথা,—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা স্তচ ॥

সর্বধর্ম-শব্দে বর্ণাশ্রমরূপ কর্মনিষ্ঠা ও দেবতাক্ষর-পূজা ইত্যাদি শরণাপত্তির বাধক ধর্মসকলকে বুঝিতে হইবে । সেই সকল পরিত্যাগপূর্বক তুমি আমার শরণাপত্তির অর্থাৎ ভজন-শ্রদ্ধা স্বীকার কর । সে-স্থলে কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ-প্রযুক্ত কদাচিৎ কৃতপাপের যে প্রায়শ্চিত্তাদির অভাব হইবে তাহাতে ভয় করিবে না । আমি সে-সকল পাপ অবশ্যই মোচন করিব ।

একটি সংশয় হইতে পারে যে, শ্রদ্ধা-শব্দে আদর। কর্ম ও জ্ঞানাদির অনুষ্ঠানেও শ্রদ্ধার প্রয়োজন আছে। অতএব শ্রদ্ধা একা ভক্তির হেতু নয়, কিন্তু কর্ম ও জ্ঞানেরও হেতু। এস্থলে সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রদ্ধা-শব্দে শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসরূপ ভাবকে বুঝায়, তদন্তর্গত আর একটী ভাব অবশ্যই থাকে, তাহার নাম 'কুচি'। বিশ্বাস থাকিলেও কোন কার্য্য প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু কুচির প্রয়োজন। কর্ম ও জ্ঞানে যে শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে কুচিরূপা ভক্তি-পরমাণু আছে। সেই ভক্তির সংশ্রবমাগ্রেই কর্ম ও জ্ঞান নিজ নিজ প্রতিজ্ঞাত ফলদানে সক্ষম হয়। তদ্রূপ ভক্তি সম্বন্ধে যে, শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহাতেও ভক্তির প্রতি কুচিরূপা একটী ধর্ম নিহিত আছে। সেই কুচিযুক্ত শ্রদ্ধাই-ভক্তিলতার বীজ-রূপ জীবহৃদয়ে প্রোথিত হয়। কর্ম-শ্রদ্ধা ও জ্ঞান-শ্রদ্ধায় কর্ম-কুচি এবং জ্ঞান-কুচি থাকে, তাহাতে সেই সেই শ্রদ্ধা ভিন্নাকারে প্রাপ্ত। ভক্তিকুচিই সাধুগণ, ভজন ও অনর্থকৃষ্ণ অবস্থা লাভ করিলে নিষ্ঠারূপী হইয়া শুদ্ধ-কুচি নাম লাভ করে। অতএব ভক্তি হইতে শ্রদ্ধা একটী পৃথক তত্ত্ব। শ্রীজীব ভক্তিদন্দর্ভে লিখিয়াছেন যে,—

“তস্মাচ্ছুদ্ধান ভক্ত্যঙ্গং কিন্তু কর্মণ্যঙ্গমর্থবিবর্তাবদনজ্ঞাখ্যায়াং ভক্তৌ
অধিকারি-বিশেষণমেব।”

অতএব শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নয়, কিন্তু কর্মকাণ্ডে অঙ্গমর্থ-বুদ্ধিধরূপ অনন্ত ভক্তিতে অধিকারের বিশেষণ মাত্র। অতএব ভাগবতে; —

তাবৎ কর্ম্যণি কুর্স্বীত ন নির্বিক্রেত যাবতা।

মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

যে-পর্য্যন্ত কর্মে নির্বিক্রেত না হয়, অথবা আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সে-পর্য্যন্ত কর্মসকল কর। তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধা জন্মিবামাত্র কর্মত্যাগের অধিকার জন্মিল—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

সংশয়-দূরীকরণার্থে ইহাও এস্থলে কথিত হইয়াছে যে, যখন ভক্তির অধিকার-হেতুরূপ শ্রদ্ধাই ভক্তির অঙ্গ হইল না, তখন জ্ঞান ও বৈরাগ্য যদিও শ্রদ্ধাজননের পূর্ব্ববর্তী হইয়া কোম কোম স্থলে প্রকাশ পায়, তথাপি তাহারা ভক্তির অঙ্গ নয়। শ্রীরূপবাক্য; যথা,—

জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োঃ ভক্তির প্রবেশারোপযোগিতা।

ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাস্তদ্ব্যুচিতং তয়োঃ ॥

(ভ: র: সিদ্ধ ১/২/২০)

ফলবিশেষ জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রথমে ঈশ্বর ভক্তিতে প্রবেশের উপযোগিতা করে, তথাপি তাহাদের ভক্ত্যঙ্গ কখনই স্বীকার যায় না।

অতএব শরণাপত্তি-লক্ষণ একমাত্র শ্রদ্ধাই শুদ্ধভক্তির অধিকারের হেতু,— ইহা সিদ্ধান্তিত হইল তবে যে কেহ কেহ বলেন যে, কাহারও স্তূপরূপে কর্ম্মাচরণ করিতে করিতে কাহারও শুদ্ধ আলোচনা করিতে করিতে, কাহারও বা সমস্ত বিষয়-বৈরাগ্য হইতে কল্পকথা শ্রদ্ধা হয়, সে কেবল ভ্রমমাত্র। এমত হইতে পারে, শ্রদ্ধা জন্মের অব্যবহিত পূর্বেই ঐ ঐ বিষয়ের আলোচনা ছিল, কিন্তু ভালরূপে আলোচনা করিতে দেখা যাইবে যে, ঐ ঐ আলোচনা ও শ্রদ্ধার উদয়—এই দুইটি ঘটনার মধ্যে অবশ্যই সংসঙ্গ বিটিয়া থাকিবে। অতএব শ্রীভাগবত-বাক্য যথা ;—

ভবাপবর্গস্ত ভ্রমতো যদা ভবেৎ, জনস্ত তর্হ্যুত-সংসমাগমঃ ।

সংসঙ্গমো বর্হি তর্দৈব সদগতো পরাবরেশে ত্রি জায়তে রতিঃ ॥

হে অচ্যুত ! জীব তোমার প্রতি বহির্গুণ হইয়া-কর্ম্মমার্গে কখন সংসার ও জ্ঞানমার্গে কখন বা অপবর্গ লাভ করিতেছে। এইরূপ চক্রাকারে ভ্রমণ তাহার পক্ষে অনিবার্য। এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কখন সাধুসমাগম হয়, তবে সেই সাধুসঙ্গ অবধি পরাবরেশ ও সদগতিস্বরূপ তোমাতে তাহার মতি জন্মে। অতএব কর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি কখনই শ্রদ্ধাকে উৎপন্ন করিতে পারে না কেবল সাধুসঙ্গ তাহা করিতে পারে। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ নিজ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, “যঃ কেনাপ্যভিভাগ্যোন জাত-শ্রদ্ধাংস্ত সেবনে” ইত্যাদি।

এবজুত শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিই শ্রদ্ধা ভক্তির একমাত্র অধিকারী। এস্থলে আর একটি বিচার আছে। সাধন-ভক্তি দ্বিবিধ অর্থাৎ বৈধী ও রাগানুগা। শ্রীকৃষ্ণবাক্য ;—

বৈধী রাগানুগা চেতি সা দ্বিবা সাধনাভিধা ।

বৈধী ও রাগানুগা সাধন-ভক্তির পার্থক্য এই প্রবন্ধে বিচারিত না হইলেও চলিত, কিন্তু ভক্ত্যাধিকার-বিবেক উক্ত তাত্ত্বিক পার্থক্যের বিচার না করিলে অনেক সন্দেহ থাকিবে, এই জন্যই সংক্ষেপে এই স্থলেই বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির ভেদ বিচার করিতে বাধ্য হইলাম। (ক্রমশঃ)

—কগনুগর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ত্রীশীতার মর্ম্মবাণী

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৫৭ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০২ পৃষ্ঠার পর)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

[ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-বিভাগযোগ]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—৪)

কহে পার্থ জনার্দনে
চাহি জানিবারে ।
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ তত্ত্ব
অতি সবিস্তারে ॥১॥
প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্ব
জ্ঞান তথা জ্ঞেয় ।
বলিতে সমর্থ তুমি
নহে অন্য কেহ ॥২॥

কহিলেন জনার্দন
শরীরকে ক্ষেত্র ।
ক্ষেত্রজ তিনিই নিজে
বিরাজে সর্বত্র ॥৩॥

বশিষ্ঠাদি মুনি ঋষি
কহে বিস্তারিয়া
ব্রহ্মসূত্রে আছে লিখা
কাহিনী ব্যাপিয়া ॥৪॥

বেদেতে লিখিত ইহা
পৃথক্ পৃথক্ ।
গীত ও কীর্ত্তিত ইহা
আনন্দ বর্দ্ধক ॥৫॥

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজে ভেদ
বুঝে যেই জন ।
সেই জন সজ্জন
লভে ত্রীচরণ ॥৬॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৫—৬)

ক্ষেত্রে আছে মন-বুদ্ধি
আর অহঙ্কার ।
কিতি-অপ-তেজ-আদি
পঞ্চম প্রকার ॥৭॥

ক্ষেত্রেতে সুখ-দুঃখ
সংঘাত শক্তি ।
ইচ্ছা দেব আছে তথা
চেতনা ও ধৃতি ॥৮॥
কর্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয়
আছয়ে অব্যক্ত ।

রূপ-রস আছে তথা
গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ ॥৯॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৭—১১)

অহিংসা-সরলতা
আর আত্মজ্ঞান ।
জ্ঞানী রহে স্থিরচিত্তে
দন্তুহীন প্রাণ ॥১০॥
শৌচ-ক্ষমা-সংযম
বিষয়ে বৈরাগ্য ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি
জ্ঞানীর আরাধ্য ॥১১॥

ভোগানন্দ নাহি চাহে
ইন্দ্রিয় আরাণ ।
ব্রহ্মানন্দে মগ্ন রহে
জ্ঞানী জ্ঞানবান ॥১২॥

নাহি মায়া পঙ্কী-পুত্রে
নহে গৃহাদিতে ।

ভালবাসে নির্জনতা
সম ইষ্টানিষ্টে ॥১৩॥

স্থির চিত্তে রয়ে জ্ঞানী
করে গুরুভক্তি ।

তত্ত্বজ্ঞানে প্রিয় মানে
তাহে মতি গতি ॥১৪॥

এই সবে কহে জ্ঞান
জ্ঞানের ভাণ্ডার ।

অম্ব যাঁহা আছে তাহা
অজ্ঞান আধার ॥১৫॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১২—১৫)

অনাদি পরম ব্রহ্ম
সেই ব্রহ্ম জেয় ।

জানিলে সে মহেশ্বরে
যোগী হয় শ্রেয়ঃ ॥১৬॥

নিকটে রহেন তিনি
কভু দূরবর্তী ।

তিনিই আশ্রয় দাতা
সর্বের সমদৃষ্টি ॥১৭॥

সব্বাদি গুণের ভোক্তা
তিনি গুণাতীত ।

ইন্দ্রিয়ে জড়িত নহে
তাহে প্রকাশিত ॥১৮॥

জীবের ধারক তিনি
গহেন নিঃসঙ্গ ।

স্বাধর জঙ্গম তিনি
সদা নিত্যানন্দ ॥১৯॥

অন্তরে বাহিরে তিনি
দৃশ্য অতিশয় ।

চিনিতে না পারা যায়
তিনি যে বিস্ময় ॥২০॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৬—১৮)

প্রলয়েতে ভয়ঙ্কর
স্থিতিতে পালক ।

জ্যোতি প্রদানিয়া তিনি
তিমির নাশক ॥২১॥

অবিভক্ত ব্রহ্ম তিনি
নহেক বিভক্ত ।

সকল হৃদয় মাঝে
প্রভু প্রতিষ্ঠিত ॥২২॥

জ্ঞান-জ্যেষ্ঠ-ক্ষেত্র আদি
জ্ঞাতব্য বিষয় ।

যে জন জানিতে পারে
জ্ঞানী সে নিশ্চয় ॥২৩॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৯—২৩)

অনাদি তাহারা উভে
পুরুষ প্রকৃতি ।

প্রকৃতিতে আছে গুণ
নানান বিকৃতি ॥২৪॥

দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের
যতেক বিকার ।

প্রকৃতি উহার হেতু
মূল সবাकार ॥২৫॥

প্রকৃতি চেতনা হীন
নাহি অনুভূতি ।

জীবে আছে অনুভূতি
করে ভুল ত্রুটি ॥২৬॥

দেহ-অভিমানী জীব

জন্মে বারে বার ।

কড়ু পায় সংযোনী

কড়ু কদাকার ॥১৭॥

পরমাত্মা বিদ্যমান

সকল দেহেতে ।

তিনি সাক্ষী অলুমন্তা

সকল কর্ম্মেতে ॥১৮॥

পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব

বুঝে যেই জন ।

পুনর্জন্ম নাতি হয়

সেই ভাগ্যবান ॥১৯॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৪—২৭)

ধ্যানযোগে দেখে কেহ

আত্মা হৃদয়েতে ।

কর্ম্মযোগী লভে ইহা

নিষ্কাম কর্ম্মেতে ॥২০॥

শুনিয়া হিতোপদেশ

গুরুর সকালেশ ।

উপাসনা করে কেহ

দেখিতে আত্মাকে ॥২১॥

কেহ বা দেখিতে পায়

তত্ত্বের বিচারে ।

সুনির্দিষ্ট পন্থা আছে

আত্মা জানিবারে ॥২২॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৮—৩১)

স্বাবসর জঙ্গম আদি

যাচা হয় দূরে ।

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ-যোগে

হয় সব সৃষ্ট ॥৩৩॥

সর্বভূতে সমভাবে

রহেন ভাস্কর ।

বিনাশ প্রাপ্ত না হয়

পরম ঈশ্বর ॥৩৪॥

চলে কর্ম্ম ধরনীতে

প্রকৃতির রীতি ।

অত্মা রহে উদাসীন

শাস্ত্রত স্থিতি ॥৩৫॥

যেইজন জানে ইহা

তিনি ত মহান ।

তিনিই প্রকৃত দেহী

শ্রীমি জ্ঞানবান্ ॥৩৬॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৩০—৩৩)

বিশাল ধরনী রহে

এক ব্রহ্মে স্থিত ।

এক ব্রহ্ম ভিন্নরূপে

হয়েক সজ্জিত ॥৩৭॥

আকাশ না রহে লিপ্ত

কোন বস্তু সাথে ।

অতি সূক্ষ্ম বলি তাহা

না মিশিয়া থাকে ॥৩৮॥

সেই রূপে শুদ্ধ আত্মা

রহয়ে নির্লিপ্ত ।

বহু কিছু ঘটে দেহে

আত্মা অবিল্লিত ॥৩৯॥

এক রবি করে আলো

ধরা আলোকিত ।

আত্মায় জলিলে আলো

প্রাণী জ্ঞান-দীপ্ত ॥৪০॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল

উদ্ধারের পথ

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৭ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার (৬।৪৬-৪৭) শ্লোকে ভগবান্ কর্মো-তপসী অপেক্ষা ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানী এবং তদপেক্ষা পরমাত্মোপাসক যোগীকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। আবার যাত্রতীর যোগীগণ অপেক্ষা শ্রবণ-কীর্তনাদি-পরায়ণ ভক্তিমান্ যোগীর সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করেছেন। যথা—

“তদ্বিশ্বভোহমিকো যোগী জ্ঞানিতোহপি মতোহমিকঃ।

কস্মিভাষ্চামিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবাজ্জুন ॥

যোগিনামপি মাক্ষ্যং মদগতেনান্তরাত্মনা।

অদ্বাবান্ ভজতে যা মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥”

ভগবদুপাসক বা ভক্তি-যোগী বাতীত কর্মো-যোগী, জ্ঞান-যোগী, অষ্টাঙ্গ-যোগী প্রভৃতি বিভিন্ন যোগীগণ ভগবানের পূজ্যমিত্য ভগবৎ উপলব্ধি করতে পারেন না। ভগবানে ব্রহ্ম-বুদ্ধি বা পরমাত্মা-বুদ্ধি থাকা পর্যন্ত বিশুদ্ধ ভক্তির প্রকাশ হয় না। ভক্তিবশ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির দ্বারাষ্ট লভ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছিলেন, —

“ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তি-সমোজ্জিতা ॥” (ভাঃ ১১।১৪।২০)

অর্থাৎ— “হে উদ্ধব! পদীপ্ত-ভক্তি যেক্ষণ আমাকে সাধন করে অর্থাৎ মন্ত্রপ্রাপক হয়, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যজ্ঞান, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদ-অধ্যয়ন, তপস্যা ও সম্যাস আমাকে সেক্ষণ সাধুতে পারে না।”

কর্ম, জ্ঞান, অষ্টাঙ্গযোগ, যোগাদি চেক্টানমূহ ভক্তি-পথের সোপানও নহে, ভক্তি-পোষকও নহে,— বরং ভক্তির প্রতিকূল। মোক্ষাদি লাভ ভক্তির ফল নয়। যুক্তি স্বরূপে-শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় বলা যায়,— “তৃপ্তির অন্তরই প্রেমের লক্ষণ। সেই প্রেমই ভক্তির ফল। মোক্ষাদি কেবল ভক্তির অবান্তর-ফল-মাত্র। তদবস্থায় আত্মারামতা প্রেমের বাধক বলে সাধুগণের মতে অতি হেয়।” (বঃ ভাঃ তাৎপর্যাঃপূর্ববাদ)

কর্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী, যোগী প্রভৃতির সদ-দোষে ভক্তি হানি হয়ে থাকে। “জনি-দোষাণ্য ভক্তির বধু নহে অঙ্গ”— (চৈঃ চঃ)। অতএব

ভগবানকে লাভ করতে গেলে কর্ম-জ্ঞান-যোগ প্রভৃতি মার্গের সহায়তার প্রয়োজন নেই।

ঐতি শাস্ত্র কহে— কর্ম-জ্ঞান-যোগ ত্যজি'।

ভক্ত্যে কৃষ্ণ-বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥

অতএব ভক্তি— কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায়।

অভিপ্রেয় বলি তাঁরে সর্বশাস্ত্রে গায় ॥” (১৫: ৫:)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ কৃষ্ণকে ভক্ত অর্জুন প্রত্যক্ষ নির্বিশেষ অক্ষর ব্রহ্মের উপাসকগণ ও ভগবানের শ্রামসুন্দর আকারের উপাসকগণের মধ্যে কাঁহারো শ্রেষ্ঠ যোগবিদ্বৎদ্বিবিষয়ে প্রশ্ন করলে ভগবান্ বল্লেন,—

মধ্যাবেষ্ট-মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।

। অদ্বয়া পরয়োপেতাশ্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥” (গীতা ১২:২)

অর্থাৎ, “শ্রীভগবান্ বল্লেন,— যাহারা নিগুণ প্রদ্বার সহিত আমার শ্রামসুন্দর আকারে মনোনিবেশপূর্বক অনন্ত ভক্তি সচকারে আমাকে উপাসনা করেন, তাঁহারো শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ— ইহাই আমার অস্তিত্ব।” এখানে ভগবানে নিগুণ প্রদ্বা অর্থে ভগবানের সেবা-বিষয়িনী প্রদ্বার উৎকর্ষত্ব কথিত হয়েছে। যথা ভাগবতে— “মৎ সেবায়ান্ত নিগুণা” — অর্থাৎ, আমার সেবার যে প্রদ্বা তাহা নিগুণ।

ভগবৎকথায় নিগুণ প্রদ্বাই ভক্তিলতার বীজ। কর্ম এবং কর্মফলে নির্বেদ বা বৈরাগ্য হলে নিগুণ প্রদ্বার উদয় হয়। তখন সাধুসঙ্গের আশ্রয়ে হরিকথায় দৃঢ় প্রদ্বা জন্মায়। হরিকথায় প্রদ্বাজনিত ভক্তির বিকাশ হ'লে কর্মাদি আর ভাল লাগে না। শ্রীমদ্ভাগবত বল্লেন,—

“তাবৎ কর্ম্যাপি কুর্যীত ন নির্বিজ্ঞেত যাবত।

মৎকথা শ্রবণংদৌ বা প্রদ্বা যাবন্ম জাযতে ॥” (ভা: ১১:২০:১২)

অর্থাৎ— “যে-কাল পর্য্যন্ত কর্মফল-ভোগে বিবর্তিত না হয় অথবা ভ্রমিমার্গে আমার (ভগবানের) কথায় প্রদ্বা না আছে, তৎকাল পর্য্যন্তই কর্ম-সকলের অনুষ্ঠান কর্তব্য। তাগী বা ভগবদ্ভক্তের কর্ম্য-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, ইহাই তাৎপর্য্য।”

কৃষ্ণ-সেবার একমাত্র যোগবিদ্বৎ কৃষ্ণভক্তই অধিকারী। কৃষ্ণভক্ত বাতীত ব্রহ্মোপাসক, পরমোপাসক প্রভৃতি যতপ্রকার যোগবিদ্বৎ আছেন, তাঁহারো

কেহই কৃষ্ণ-সেবার অধিকার পান না। মুক্তিকামী মুনিগণের নির্জনে একাকী তপস্বী সার্থপরতার লক্ষণ। শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের স্তবে জানা যায়,—

“প্রায়েণ দেব-মুন্মথঃ স্ববিমুক্তিকামা,

মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থ-নিষ্ঠা।” (ভাঃ ৭।৩৪৪)

অর্থাৎ— “হে দেব, নিজ মুক্তিকামী মুনিগণ নির্জনে মৌন-ব্রত পালন করেন, (কিছু) তাঁহারা পরার্থপর নহেন।”

যোগাজ্ঞসকল কালক্ষেপণের হেতু এবং ভক্তিপথের বিঘ্নস্বরূপ বলে শাস্ত্র দ্বারাও জানিয়েছেন,—

“অন্তরায়ান্ বদন্তোহা যুক্তো যোগমুক্তম্।

ময়া সম্পত্তমানন্ত কালক্ষণহেতবঃ।” (ভাঃ ১১।১৫।৩৩)

অর্থাৎ— এই নিমিত্ত দ্বারা উক্তম যোগ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিসাধনে চিত্ত সম্মিষিত করেছেন, তাঁরা এই সকল চেষ্টাকে ভক্তিপথের বিঘ্নস্বরূপ বলে থাকেন। মদীষ ভক্তগণ আমার দ্বারাই সমস্ত সাধনের ফল প্রাপ্ত হন; সুতরাং তাঁদের পক্ষে ঐ সকল সাধন চেষ্টা কালক্ষেপণের হেতু মাত্র। আমার সেবা ছেড়ে তাঁরা সেক্ষেপ বৃথা কালক্ষেপ করেন না।”

সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বিচার করে শ্রীশ্রীমদ্ বলদেব বিজ্ঞানভূষণ প্রভু বলেছেন,— “সমস্ত উপায়ের মধ্যে একমাত্র মহাবশিষসী শুদ্ধা ভক্তিই অতি শীঘ্র ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়।”

কষ্ট, জ্ঞান, অজ্ঞাভিলাষ, যোগ প্রভৃতিতে স্ব-স্বখাসুস্কান ও ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রলোভন আছে, তাই তাহা অভক্তির পথ বা প্রেয়ঃ পথ; আর ভক্তিতে ভগবৎ সুখাসুস্কান ও ভগবানের অহৈতুকী সেবা প্রার্থনা থাকায় তাহাই শ্রেয়ঃ পথ। শ্রেয়ঃ পথেই স্বার্থ মজল হয়। স্বার্থ; শাস্ত্র-প্রমাণ,—

“শ্রেয়শ্চ শ্রেয়শ্চ মহুয্যমেত-

স্তৌ সম্প্রীত্য বিবিনাক্তি ধীরঃ।

শ্রোয়ো হি ধীরোহভিপ্রোয়সো বৃণীতে

শ্রোয়ো যন্তো যোগক্ষেমান্ বৃণীতে॥” (কঠ ১।২।২)

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ— এত দুইটিই মহুয্যকে আশ্রয় করে থাকে। কিন্তু ধীর ব্যক্তি ঐ দুইটির তত্ত্ব সমাগ্ররূপে অবগত হ'য়ে একটি— মুক্তির কারণ, অপরটি— বন্ধনের কারণ— এইরূপ বিচার করেন। তাঁরা শ্রেয়ঃ পরিত্যাগ

করে প্রেরণকে বরণ করেন, আর বিবেকহীন মন্দব্যক্তি যোগ অর্থাৎ অলঙ্কার বস্তুর লাভ ও ক্ষয় অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ এতদুভয়াক্ষর প্রেরণকে প্রার্থনা করে ।”

কর্মাতির পথে সকল প্রাপ্তির শেষ প্রাপ্তি তথা কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় না। কাজেই ঐ সমস্ত পথে জীব উদ্ধার পেতে পারে না; বরং প্রেরণ পাই হইয়া গিয়ে অস্থির হইয়া পরিণত হয়। কিন্তু ভক্তির পথে জীব অনায়াসে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার ও পারিপাশ্রব লাভ করে। শুদ্ধভক্তের কাছে প্রেরণ ও প্রের্য এক হওয়ায় তৎসং সেবাই একমাত্র সর্বাঙ্গ কৰ্ত্তব্য হয়ে পড়ে,—তখন অহা অপ্রিয়ার, সর্বার্থকামমোক্ষ-বাক্স প্রভৃতি অনর্থের উদয় হয় না। ভগবানের সেবা কর্মী, জ্ঞানী ও যোগীর দ্বারা হয় না। এ’র সঙ্গে জগৎজুড়ে প্রচলিত ভক্তিদর্শন পরস্পর গোঁড়ামী প্রভৃতিদের বহুত: অরণীয়,—“মোক্ষ-কামী ভোগ ত্যাগ করলেই ঈশ্বরের উপাসনা করে না। শুধুই ভগবানের সেবা লাভ করেন। যোগের দ্বারাও ভগবানের তত্ত্ব হয় না—উহাতে অনিমা, লবিমা প্রভৃতি অষ্টাদশসিদ্ধি লাভ হয়। মোক্ষকামীর (Salvationist এর) কথা ছেড়ে দিতে হবে। সে কেবল সংসারের সুখ-তৃপ্তির হাত হ’তে ছুটি চায়; সুতরাং সেও নিজে ভোক্তা (recipient)। যিনি কর্ম, জ্ঞান বা যোগমার্গ গ্রহণ করেছেন, ভাগবত বলেন,—তিনি ভুল-পথ অলম্বন করেছেন। ভক্তি হ’লে সবই সহজ লাভ হ’তে পারে। কর্মীগণ এ জীবনে বা পরজীবনে নিজের ভোগ চায়। ভক্তি নির্মূল আত্মারই বৃত্তি। যদি আমরা আমাদের প্রকৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পারি, তবেই অনায়াসে এই পৃথিবী হ’তে পৃথক হ’তে পারবো।

পৃথিবীর কোন বিষয় আমাদের চিন্তনীয় নয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শুদ্ধ সত্য বস্তু—বাস্তব সত্যবস্তু। সপরিচয় সেই বাস্তব সত্যই আমাদের চিন্তনীয় বিষয়।

সুতরাং চরম কলাগ লাভেচ্ছা-ব্যক্তিগণের পক্ষে নিঃশেষ প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ শুদ্ধভক্তির যোগ-পথ পরিত্যাগ ক’রে কর্ম-জ্ঞান-যোগাদির পথ গ্রহণ করা আদৌ কৰ্ত্তব্য নয়।

“জ্ঞান-কর্ম-যোগমর্মে নহে কৃষ্ণ বশ।

কৃষ্ণ-বশেতু এক প্রেমভক্তি-রস ॥ (চৈ চঃ)

ভক্তিপথই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং জীবোদ্ধারের সহজতম অকুতোভয় পথ

ভজ্ ধাতু হ'তে 'ভক্তি' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। ভজ্ ধাতুর অর্থ 'সেবা' করা; অতএব ভক্তির নামান্তর ভগবৎ-সেবা। বৃন্দাবন-নাথ কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ এবং অনুকূল চেষ্টায় কৃষ্ণ-সেবাই 'ভক্তি'; পরন্তু অসুবিধের ন্যায় প্রতিকূল চেষ্টা 'ভক্তি' শব্দ বাচ্য নহে। শাস্ত্রে সর্বোচ্চিয়ে ভগবৎ-সেবাকেই 'ভক্তি' বলা হয়েছে; যথা,—

“ভজ ইতোহ বৈ ধাতুঃ

সেবায়াং পরিকীর্তিতঃ ।

তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা

ভক্তিসাধনে ভূয়সী ॥ (গকড় পুরাণ)

শাস্ত্র আরও বলেছেন,—

“সর্বোপাধিবিনির্মূলং তৎপরতেন নিৰ্ম্মলম্ ।

হৃষীকেশ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিকৃত্যতে ॥

(ঈশ্বরদ-পঞ্চরাত্র)

অর্থাৎ—“সর্বোচ্চিয়ের দ্বারা হৃষীকেশ ভগবানের সেবাই ভক্তি। এই ভক্তি ভুক্তি-মুক্তি-আদি বাঞ্ছা-শূন্য। ও কৃষ্ণ-সুখানুসন্ধানপরা হ'লেই নিৰ্ম্মল ও শুদ্ধ হয়।”

বিষ্ণুতত্ত্বের নারায়ণে অত্যাশ্রয়রূপে ভক্তি যথোপায়ে নিবদ্ধ, তদপেক্ষা অধিকতর ও পরিপূর্ণরূপে স্বয়ং কৃষ্ণতত্ত্ব নিবদ্ধ। কৃষ্ণকে পেলে প্রাকৃত-অপ্রাকৃত জগতে আর কিছু পাওয়ার বাকী থাকে না। তাই কৃষ্ণ-পাদপদ্মে ভক্তি করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। কৃষ্ণই পরমেশ্বর; কেননা কৃষ্ণের সমস্ত অবতার বা স্বরূপের মধ্যে নন্দ-নন্দন কৃষ্ণস্বরূপ পরম পরিপূর্ণ। শাস্ত্রে উল্লিখিত প্রমাণে পাই,—‘সবিশেষস্বরূপেণৈব মধ্যে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপশ্চৈব পরম-পরিপূর্ণত্বাৎ পরমেশ্বরত্বং জ্ঞাপিতম্’—ঈশ্বিনাথ-টীকা (ভাঃ ৩.৯.১৪)। সকল অবতারের অবতারী বৃন্দাবন-নাথ কৃষ্ণ সকল অবতারের রূপ ধারণ করতে পারেন। ‘ব্রহ্ম-সংহিতা’ শাস্ত্রে ভগবৎ-স্তুতি প্রসঙ্গে সৃষ্টির আধিকারিক দেব আদিকণি ব্রহ্মা বলেছেন,—

“রামাদিমুণ্ডিসু কল্যানিধয়েন তিষ্ঠন্

নানাবতারমকরোদুবনেবু িজ্ ।

কৃষ্ণ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পূমান্ যো।
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥”

অর্থাৎ—“যে পরম-পুরুষ স্বাংশ-কলাদি-নিয়মে বামাদি মূর্তিতে স্থিত হয়ে ভুবনে নানাবতার প্রকাশ করেছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হয়েছিলেন,— সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।” শ্রীউগ্রশ্রবা নৃত শৌনকাদি ঋষিগণকে বলেছিলেন,—

“অবতারা হৃদংখ্যেযা হরেঃ সত্বনিধেব্বিজাঃ ।

যথাবিদ্যাসিনঃ কুলাঃ সরসঃ স্ত্রীঃ সহস্রশঃ ॥”

(ভাঃ ১।৩২৬)

অর্থাৎ—“হে ঋষিগণ, যেরূপ অক্ষয় সরোবর হ’তে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র প্রবাহসমূহ নির্গত হয়। তদ্রূপ সত্ত্ব-সাগর শ্রীহরি হ’তে অসংখ্য অবতারসমূহ প্রকটিত হন।

কৃষ্ণ হ’তেই ব্রহ্মজ্ঞ, পরমাত্মক ও অবতারাদি উদ্ভূত ; তাই কৃষ্ণকে মূল ভগবান্ বা পরমেশ্বর (Unrestricted God) এবং অনাগ্য ঈশ্বর বা অবতারগণকে ভগবান্ (restricted God) বলে জানা যায়। দেব-দেবীগণ ভগবান্ কৃষ্ণের কর্তৃ সচিবের মতো আধিকারিক দেবতা, তাঁহাদের কাহারও কৃষ্ণের ঠিক্কা লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা নাই। অন্যদেব উপাসকগণের বিনাশ আছে। ভক্তাধীন ভগবান্ কৃষ্ণ একদা ভক্ত ভীষণের প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলেন। ভগবানের নিজের প্রতিজ্ঞার অপেক্ষা ভক্তের প্রতিজ্ঞা অধিকতর হৃদয় হবে বলে ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জুনের মুখে প্রতিজ্ঞা করালেন,—“কৌন্তেয় প্রীতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চুতিঃ”—(গীতা ৯।৩১) অর্থাৎ “হে কৌন্তেয়! তুমি (আমার হয়ে) প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার ভক্ত কখনও নাশ-প্রাপ্ত হন না।”

দেব-দেবীগণ তাঁদের উপাসকগণ কর্ত্তক প্রভু কৃষ্ণের মর্যাদা লঙ্ঘন হ’লে তাহা সজ্ঞ করেন না এবং নিজ উপাসকদিগকে প্রীতি করেন না। শাস্ত্রে ‘ন’ প্রসঙ্গে বহু আধ্যাতিকার তথা সত্য ঘটনার বর্ণনা আছে। শিব-ভক্ত শৌণ্ডিক শিবের গারে বলীযান হয়েও কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কৃষ্ণ-কর্ত্তক নিহত হয়।

রাবণ ব্রহ্মার উপাসনা করে ব্রহ্মা কর্ত্তক নিজের মৃত্যুশর প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মা রাবণকে নিজ ভক্ত জেনেও রক্ষা করেন নাই এবং রক্ষা করার

চেষ্টাও করেন নাই; বরং শ্রীরামচন্দ্রকে তার মৃত্যু-শবের কথা বলে দিয়ে বিনাশের চেষ্টা করেছিলেন। তুর্ঘ্যোধন শ্রীবলদেবের শিষ্য হয়েও কৃষ্ণকে লজ্জন ক'রে স্ববংশে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। হিরণ্যাকশিপু ব্রহ্মার বর প্রাপ্ত হয়েও ভগবান্ নৃসিংহমূর্তিতে তাঁকে নিধন করেছিলেন। শিব-ভক্ত বৃক শিবের বর প্রাপ্ত হয়ে বরের সত্যতা পরীক্ষার জন্ত প্রথমেই শিবের মাথায় হাত দিলে শিবের মৃত্যু হয় কিনা দেখতে চেষ্টা করলে শিব মহা ফাঁপড়ে পড়লেন। অবশেষে শিব বিষ্ণুর নিকট এই বিপদ থেকে পরিত্রাণের প্রার্থনা জানালে নিষ্কু ব্রাহ্মণ-বেশে বৃকের কাছে এসে বললেন, —‘শিবের কথায় বিশ্বাস করা কি বুদ্ধিমানের কর্তব্য? সে কথায় আদৌ বিশ্বাস ক'রো না। তুমি নিজের মাথায় হাত রেখে দেখ,—তোমার কিছুই হবে না।’ বৃক তখন নিজের মাথায় হাত দিল ও তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল।

এইভাবে দেব-দেবী উপাসকগণ নিজেদের আরোহ-চেষ্টায় কৃষ্ণকে প্রীতি না করে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত না হলে কোন দেব-দেবীই রক্ষা করেন না এবং রক্ষা কর্ত্তেও সমর্থ হন না। দেবতাগণ তাঁদের উপাসকগণ অপেক্ষা কৃষ্ণ-ভক্তদের বেশী প্রীতি করেন এবং এমন কি কৃষ্ণ-ভক্ত বিদ্রোহী নিজেদের উপাসকগণকে বিনাশ ক'রে কৃষ্ণভক্তকে রক্ষা করেন। উদাহরণ স্বরূপে একটি শাস্ত্রের কাহিনী বিবৃত করছি। কাহিনীটি এই;—পুরাকালে ঋষভদেবের পুত্র মহারাজ ভরত হরিদ্বারে গণ্ডকী নদীর তীরে আরাধনা-কালে নদীর জলে পতিত এক হরিণীর শাবককে বাঁচিয়ে প্রীতিভরে বহু সেবা-যত্নে লালন-পালন করেন। তিনি মৃত্যুর সময় হরিণ-শিশুটির চিস্তায় নিবৃত্ত ছিলেন এবং মৃত্যুর পর হরিণজন্ম প্রাপ্ত হন। তৎপরে হ'বিশ-দেহ ত্যাগ ক'রে একজন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মলাভ করেন। তিনি জাতিগুর থাকায় যাতে আর পতন না হয়, সেজন্ত মৃত্যু, বোবা ও কালার মত হয়ে থাকতেন। লোকে তাঁকে জড ভরত বলত। ঐ জন্মে পিতা-মাতার পরলোক গমনের পর তিনি তাঁর বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের নানা মিথ্যাভিনয় সহ্য কর্ত্তে থাকেন। ভ্রাতাদের আদেশ প্রতিপালন করলেও তাঁকে ভ্রাতারা অবজ্ঞা করত। তিনি মৃত্যুর ভয় ক'রে ভগবচ্চিস্তায় ও ভগবদ্ভ্যাসে বিভোর হয়ে থাকতেন।

একদিন এক ডাকাত-সর্দার ভদ্রকালীর মিকট নরবলি দেবার জন্য একটা লোক খুঁজে পায়। কিন্তু কোন্ ফাঁকে সেই লোকটি পালিয়ে যায়। তখন সেট লোকের অন্বেষণ করিতে করিতে সর্দার ও তার দলবল জড়-ভরতকে একটা ক্ষেতে পাহাড়া দিগে দেখতে পায়। জড়-ভরত তাঁর ভ্রাতাদের নির্দেশে ঐ ক্ষেতে পাহাড়া দিচ্ছিলেন। ডাকাতরা জড়-ভরতকে ধরে দেবী ভদ্রকালীর মন্দিরে বলি দেবার জন্য নিয়ে যায়। সেখানে তাঁকে স্নান করিয়ে ও বস্ত্রাদি পরিয়ে দেবী ভদ্রকালীর সম্মুখে বলির যূপকাঠে প্রবেশ করানো। পরম বৈষ্ণব জড়-ভরত বরাবর নির্দ্বিকার ও কৃষ্ণভক্তি সুধাপানে মত্ত, তাঁহার দেহ ও দেহ-সম্বন্ধীয় বস্তুতে বোধ নেই। তিনি সেই সময় সমাধি-মগ্ন হ'লেন। ডাকাতরা খজা তুলে যে মুহূর্তে বলি দিতে উদ্ভূত হ'ল, মহসা সেই মুহূর্তে মধ্যে বিরাট ভয়াবহ প্রচণ্ড তেজোময়ীকণে ভদ্রকালীদেবী প্রতীমা বিদীর্ণ করে অবিভূত হলেন এবং কৃষ্ণভক্ত জড়-ভরতকে বিনাশোদ্ভূত নিজ উপাসক ডাকাতগণের খজা ছিনিয়ে নিয়ে সেই খজা দ্বারা ডাকাতদের বধ করেন ও জড়-ভরতকে যূপকাঠের ফাঁস থেকে মুক্ত করে রক্ষা করেন। কাঞ্চ বা বৈষ্ণবগণ বিপদে অবিচলিত থাকেন ও কৃষ্ণ-কৃপায় সর্ব বিপদ থেকে পরিত্রাণ পান। কৃষ্ণের শরণাগত ভক্তকে কেই বা বিনাশ করতে পারে? কৃষ্ণভক্তের জয় অবশ্যস্তাবী। শাস্ত্রে এ-সম্বন্ধে সহ দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। যথা—

“সর্ব-দেব মূল তুমি সবার ঈশ্বর।

দৃশ্য দৃশ্য যত— সব তোমার কিঙ্কর ॥

তোমাতে লজিয়া যে শিবা-দেব ভজে।

বৃক্ষমূলে কাটি' যেন পল্লবেরে পুড়ে ॥” (চঃ ভাঃ)

দেব-দেবী পুঙ্কগণ কর্তৃমার্গীয় এবং কর্তৃমার্গের ফল অনিত্য। তাই দেব-দেবী পুঙ্কগণ পরিশ্রমে বিনাশপ্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে ভগবান কৃষ্ণের উপাসকগণ ভক্তিমার্গীয় এবং ভক্তিমার্গের ফল নিত্য; তাই কৃষ্ণভক্ত অনিনশী। সাধারণের অবস্থা দৃষ্ট অসুখদের বিনাশ করার জন্য ভগবানের বৈষ্ণবদোষ হয় না এবং নির্দয়তাও প্রকাশ পায় না। বরং বিযুক্তিতে নিহত ব্যক্তির উদ্ধৃগতি হয়; আবার কৃষ্ণের সন্তোষিত হ'লে তাঁর অচিহ্ন-শক্তিপ্রভাবে নিহত ব্যক্তি মুক্তি লাভ করেন। শ্রীমদ স্বামীপাদ বলেছেন,— “পালনে ভাঙনে মাতৃ-নাশকণাং যথার্থকৈ। ভদ্রদেব মহেশস্ত নিহন্তরুণ দে বয়োঃ।” অর্থাৎ “যে রূপ শিশুপুত্রের লালন ও তাড়নে মাতার দয়াহীনতা প্রকাশ পায় না সেইরূপ গুণ দোষের নিহন্তা পরমেশ্বরেরও নির্দয়তা নাই।

কৃষ্ণ সাধুর্গাময় বিগ্রহ হ'লেও ঐশ্বর্য্য ও সাধুর্ঘোর পরম নিধান। সাধু-পবিত্রাণ, হৃদ্ধ তপাশ, ধর্ম্ম-সংস্থাপন স্বরূপ কৃষ্ণের কার্য্য নহে; উক্ত কার্য্যাদি তাঁর দেহস্থিত অংশ বিয়ুদ্বারাই সংঘটিত হয়।

“অতঃপর বিয়ু তখন কৃষ্ণের শরীরে।

বিয়ুদ্বারে কৃষ্ণ করে অস্তর সংহারে। — (১৫: ৫:)

স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই নিশ্চিত মনে ও সচ্ছন্দে নিরন্তর প্রেমসৌবর্ণের সহিত ব্রহ্মবামে লীলা-বিশাস কর্ত্তে পারেন ও করেন। কৃষ্ণ বাতীত আর কেহই নিশ্চিত নহন।

কৃষ্ণের মত দয়াল আর কে আছে? কৃষ্ণকে না পেলে কি কারও মুক্তি হয়? সমস্ত ভগবদেবী মৃত্যুকালে কৃষ্ণকে ভগবান্‌রূপে নিশ্চয় ধারণা না করে মাছুষ বা অজ্ঞ কোন প্রাণীরূপে ধারণা করেছিল, তাই তাঁরা মুক্তি না পেয়ে কেবলমাত্র উর্দ্ধগতি পেয়েছিলেন। ‘কৃষ্ণ বাণ্যলীলায় বকাসুর-ভয়ী পুতনা রাজদীক নিধন করে ধাত্রৌযোগ্য গতি দান ক’রে গোলোকে স্থান দিয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২।২৩) উক্তর বিহরকে বলেছিলেন,—

“অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াণাময়দপ্যসাধ্বী।

লেভে গতিং ধাক্ষাচিতাং ততোহন্ত্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥”

অর্থাৎ—“অহো! পুতনা অসাধ্বী হয়েও যাঁহার বর্ধ কামনায় স্তনধ্বংসে বিষলেপন-পূর্ব্বক পান করিয়েও পুতনা ধাত্রীর ন্যায় পরমাগতি লাভ করল, তাঁদৃশ, দয়ালু অন্য কে আছে যে, তাঁহার শরণাপন্ন হ’ব?

ভগবান্ কাঙ্ক্ষাকে কখন মিডাবে কণা করেন, কেই বা জানে? ভগবদেবী অস্তরের মুক্তি-প্রাপ্তি ভগবানের অকৌতুকী (cause-less) কৃপার বাণীর। শত্রু অস্তরদের প্রতি ভগবানের যদি এত দয়া হয়, তা’হলে ভক্তের প্রতি তাঁর কিরূপ অসীম দয়া তাহা সহজেই অনুমেয়। ভক্তের প্রতি তাঁর কৃপা সর্ব্বদা অজস্র ধারায় বর্ষিত হচ্ছে। তাঁকে কিছুমাত্র আপন জ্ঞান করলেই তিনি প্রীত হ’ন। তাঁর আশ্রিত ভক্তের প্রতি তিনি এমনই ক্রমার্হ যে অপরাধের বিচার না করেই সংসার থেকে উদ্ধার করেন। “সঙ্কল্প মাত্রেণাপি প্রীতঃ সিদ্ধত্বাৎ”—(চক্রবর্ত্তী-টীকা) অর্থাৎ—“ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করবার ক্ষমতা যত দূরেক কথা, তাঁকে প্রসন্ন করবার ইচ্ছা জাগলেই তিনি প্রসন্ন হয়ে থাকেন। শ্রীহরির এত অপার করুণা!” (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন অণ্ডল্য কবিভূষণ

ঠাকুর শ্রীল বিল্বমঙ্গল

পূর্বকালে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে কৃষ্ণাবেদ্য নদীর তীরে একটি সমৃদ্ধিশালী ক্ষুদ্রপল্লীতে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বাস ছিল। ইনি রামদাস নামক কোনও ঐশ্বর্যশালী ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; চুরদৃষ্টক্রমে ঠাকুর মহাশয় কৃষ্ণাবেদ্য নদীর পূর্ব-পারস্থিত চিত্তামণি নামক একটি বেষ্টার কুহকে পড়িয়া তাহার কাঁমে আসক্ত হন। ইঁহাকে কেহ কেহ শিহ্লনমিশ্র বলিয়াও অভিহিত করেন। কিছুদিন পরে ঠাকুরের পিতা পরলোকগমন করিলে তাঁহার শ্রাদ্ধের বিপুল আয়োজন হয়। জমিদার-বাড়ীতে, মচাগমুদ্রে শ্রাদ্ধের ঘটাইল; নানাদেশ হইতে পণ্ডিতযশস্বী-সকল আসিয়া শ্রাদ্ধ-সভায় শাস্ত্র-বিচার করিতেছেন; ভাতেরা স্বেচ্ছাক্রমে, বন্ধনা, পাঠ করিতে লাগিল; শ্রীগীতা মহাভারত বাখ্যা হইতে লাগিল; সহস্র গজস্র কাক্সাল, দীন, দুঃখী আগিয়া শ্রাদ্ধবাসরে ভোজন করিতে লাগিল। 'দিয়তাং ভুজ্যতাং' শব্দে চতুর্দিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল। পুরোহিতগণ যজ্ঞে স্বাহা-স্ববা বলিয়া অগ্নিতে ঘৃত ঢালিতে লাগিলেন—অগ্নিদেবের শেলিহান ছিহ্ন। চৌদিক্ বিস্তার করিয়া জলিয়া উঠিল; পট-মণ্ডপ নানা পতাকা, কিচিত্ত সজ্জায় সজ্জিত হইল; সবেমাত্র ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী ভোজনে বসিয়াছেন; অর্ধমাত্র ব্রাহ্মণদিগের ভোজন হইয়াছে; ঠাকুরের শেদিকে বিশেষ লক্ষ্য নাই। এহেন শিত্তদেবের শ্রাদ্ধ-বাসরে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর—চিত্তামণির চিত্তায় বিভোর। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া, উন্মত্তভাবে লুচি, মণ্ডা, মাঙ্গণোয়া উৎকৃষ্ট উপকরণাদি একটি বস্ত্রে বাঁধিয়া সেই পুটলী স্তক্ষে বহন করিয়া,—চিত্তামণির কাটীর দিকে ছুটিলেন। তাঁহার আর বাহু জ্ঞান নাই—এমনি কুহকিনী মাথার মোহ; তিনি কোন একটি কর্মচারীর প্রতি শ্রাদ্ধের অবশিষ্ট কার্যাদির ভার দিয়া, দ্রুতবেগে কৃষ্ণাবেদ্য নদীর দিকে অগসর হইতে লাগিলেন।

বেলা অবসান হইতেছে, সূর্য্যদেব রক্তিম আকার ধারণ করিয়াছেন। সমগ্র জীববৃক্ষের আয়ুর্ধারণ করিয়া সূর্য্যদেব অস্ত্রাচলে গমন করিলেন; দৈব-চূর্যোগবশতঃ এমন সময়ে আকাশে নিবিড় মেঘের সঞ্চার হইল। ঘন-ঘটাৎ আকাশ আচ্ছন্ন হইল; অকস্মাৎ বিজলী চমকিয়া উঠিল,—ঝড়, বৃষ্টি, শিলাপাত হইতে লাগিল, চতুর্দিকে বৃক্ষসমূহ বায়ুবেগে সমূলে উৎপাটিত হইতে লাগিল। বজ্র-নির্ঘোষে সকলের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। ঠাকুরের এ-চূর্যোগেও

অক্ষেপে নাই—তিনি খাবার পুঁটদীট সম্বন্ধে বগলে করিয়া নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। সর্বনাশ! তিনি দেখিলেন, নদীতীরে কোনও নৌকা নাট—প্রবল বাড়ের ভয়ে সকলেই নদীর আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহাতে দিনমণি অন্তর্মিত, কি প্রকারে নদী পার হইবেন ভাবিতেছেন; কিছুই কুল-দিনারা পাইলেন না। এমন সময়ে দেখিলেন, একখণ্ড কাষ্ঠের মত কি একটা তাঁহার দিকে ভাসিয়া আসিতেছে! তিনি ‘জয় ভগবান্ তোমার কি দয়া!’ বলিয়া তাহার উপর উঠিয়া বসিলেন। নদীর উত্তাল তরঙ্গে তিনি জীবনের মায়-সমতা পরিত্যাগ করত অতি কষ্টে নদীর পরণারে পৌঁছিলেন।

ঠাকুর ক্রমশঃ চিন্তামণির দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ; চৌদিকে প্রাচীর, ভিতরে প্রবেশ করিবার কোনই পথ নাই। তিনি ‘চিন্তামণি! চিন্তামণি!’ শব্দে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। কবাটে মজোরে করাঘাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু বৃষ্টির শব্দে তাঁহার কোন শব্দই ভিতরে প্রবেশ করিল না, তাঁহার চীৎকার বিফল হইয়া গেল। এমন সময়ে দেখিলেন, প্রাচীর-গাত্রে হইতে লম্বমান একটা দড়ি বুলিতেছে। ঠাকুর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, ‘জয় ভগবান্’ বলিয়া ঐ দড়ি অবলম্বনপূর্বক প্রাচীরের উপরে উঠিলেন। তখন বাড, বৃষ্টি, শিলাঘাতে ঠাকুরের স্তূতের শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; মস্তক বুরিতেছিল, তিনি বাহু-জ্ঞানহার্য হইয়া মশব্দে গৃহের অভ্যন্তরে পড়িয়া মূর্ছিত হইলেন। ভিতরে চিন্তামণি শব্দ শুনিতে পাইয়া তাহার দাসীকে ডাকিয়া বলিল,—“শীঘ্র বাহির যাইয়া দেখদেখি কিসের শব্দ হইল?” সে বাহিরে আসিয়া একটি মৃত্যুৎ দেহ পড়িয়া আছে—দেখিতে পাইয়া ভীতস্বরে দাকুণ চীৎকার করিয়া উঠিল। ঠাকুরাণী! ঠাকুরাণী! শীঘ্র এদিকে এস, একটা মড়ার মত কে ভিতরে পড়িয়া আছে। এই কথা শুনিয়া চিন্তামণি ক্রত দৌড়াইয়া আসিয়া দেখিতে পাইল, সত্য-সত্যই মৃতবৎ কি একটা পড়িয়া রহিয়াছে। সাহসে ভর করিয়া নাড়াচাড়া দিয়া দেখিল,—সে নিঃশব্দ ঠাকুর। তখন ভিতরে যাইয়া চিন্তামণি ও তাহার দাসী অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া ঠাকুরের সর্ব শরীরে শেক দিতে লাগিল। সিন্ধু বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া নূতন শুক বস্ত্র পরিধান করাইল। এইরূপ যত্ন স্তম্ভধার ফলে ঠাকুরের জ্ঞান কিছু ফিরিয়া আসিল। তিনি অর্দ্ধ-নিম্নীলিত লাচনে চিন্তামণিকে দেখিতে পাইয়া মূহুর্তে বলিলেন :—‘চিন্তামণি! আমি কোথায়?’

চিন্তামণি বাজঘরে উত্তর দিল—“ওরে ডাকুরা বামুন! আজ না তোর পিতৃশ্রাদ্ধ? এহেন ভীষণ কাড়-বৃষ্টির দিনে এখানে মরিতে আসিয়াছিস্ কেন?” সমুদয় পুঁটলোটি ধুলিয়া দেখিল, তাহার মধ্যে অনেক মিঠাই মণ্ডা রহিয়াছে। এইসব কাণ্ড দেখিয়া চিন্তামণিও অবাধ্য হইয়া গেল। এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে, চিন্তামণি কিছু পরম হৃৎক পান করাইয়া ঠাকুরকে তৃপ্ত করিল। তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। দিব্য চন্দ্রের আলোকে জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক আলোকিত হইয়াছে। চিন্তামণি ঠাকুরকে বলিল—“তুমি এক্ষণ হৃৎযোগে দ্বিপদে এখানে আসিলে?” ঠাকুর সবিশেষ রুস্তান্ত বলিলে, চিন্তামণি বলিল—“চল দেখিয়া আসি, কি প্রকার দড়ি প্রাচীরে ঝুলিতেছে।” পরীক্ষা করিয়া চিন্তামণি শিহরিয়া উঠিল। উহা দড়ি নহে, একটি প্রায় শুষ্ক সর্প প্রাচীরের একটি গর্তে মুখ দিয়া ঝুলিতেছে। তাহার মদীর তীরে ঘাইয়া দেখিল, সেটী কাষ্ঠ নহে, গাটী মৃত মনুষ্য ভলে ভাঙিতেছে। সেইজন্ত ঠাকুরের সর্বাঙ্গ হইতে বিষম দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে। তাহাকে পুনরায় অগন্ধ তৈল দ্বারা গরম জলে স্নান করাইল।

তখন এইসব দেখিয়া চিন্তামণি আবেগভরে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—“ঠাকুর! তোমার প্রেম আছে, স্নেহ আছে, ভালবাসা আছে সত্য। তুমি প্রকৃতই প্রেমিক পুরুষ; কিন্তু তুমি তাহা নিতান্ত অযোগ্য স্থানে অর্পণ করিয়াছ। আমি ঘৃণ্য বেষ্ট্রা, পতিতা; আমার চায়া স্পর্শ করিলে সুধীগণ স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। তুমি ব্রাহ্মণ হইয়াও পতিত হইয়াছ। এই ভালবাসা, প্রেম যদি ভগবানে অর্পিত হইত, তবে তুমি সার্থক হইতে।” চিন্তামণির এইপ্রকার বহু উপদেশ শুনিয়া বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সহসা ভগবদনুগ্ৰহে জ্ঞানের উদয় হইল। তিনি ঐ রজনীতে আর স্বীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে বাস্ত হইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা কীর্তনে সমস্ত রজনী অতিবাহিত করতঃ প্রাতঃকালে চিন্তামণিকে গুরু-জ্ঞান করিয়া তাহাকে প্রণামপূর্বক ব্যাকুলভাবে শ্রীকৃন্দাবনের দিকে ‘হা শ্রামসুন্দর!! হা শ্রামসুন্দর!! তুমি কোথা’—এইভাবে আর্তনাদ করিতে করিতে ছুটিলেন। পূর্বের ভ্রম-সংস্কার-সমূহ তাহার আগিয়া উঠিল, তিনি সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মণীষপ-সমূহ অরণ্য প্রদেশে ভীত না হইয়া উদ্ভ্রান্তের ছায় শ্রীধাম কৃন্দাবনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পশ্চিমঘো একটি পুষ্করিণীতে জল-পান করিবার নিমিত্ত গমন করিলে, ঠাকুর দেখিতে পাইলেন—একটি পরমাসুন্দরী যুবতী জল তরিবার

জন্ম ভথার আগমন করিয়াছে। ঠাকুর বিলম্বজল যুবতীর ঐক্লপ লাভণ্য দেখিয়া পুনরায় মোহিত হইলেন। ভক্তিপথের কোটি কটকরূপ বহু বিষ আসিয়া পথ রুদ্ধ করিয়া দেয় এবং ভগবান্ অহুগ্রহ করিয়া ভীষণ পরীক্ষাও করেন। তাঁহার ক্রন্দ্য হইলে তবে জীব এই দৈবী মায়া হঠতে উজ্জীর্ণ হইতে পারে। ঠাকুর ঐ যুবতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যুবতীট একটি পুরুষ পিছনে আনিতেছে দেখিয়া সত্বে ঘোমটা দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে যাওয়া তাহার স্বামীকে সমস্ত ঘটনা জানাইলেন।

কঠিনক বণিক তাহার স্বামী। তিনি ধর্ম্মভীরু ছিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া ঠাকুরকে দেখিতে পাইলে, ব্রাহ্মণ বলিয়া বণিক তাঁহার চরণধূলি লইলেন এবং কবচোড়ে বিনয়-মনন্যভাবে ঠাকুরকে বলিলেন,—আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ আপনার মত ব্রাহ্মণকে অতিথি পাওয়া কৃতার্থ হইলাম। বলুন, আমি আপনার কি সেবা করিতে পারি?”

তখন বিলম্বজল ঠাকুর বণিককে বলিলেন,—“তোমার স্বীকে অল্প বয়সীতে আমার সেবায় নিয়োগ করিবে—এট আমার অভিপ্রায়।”

বণিক একটু আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—“ঠাকুর! ফল-দ্রব্যাদি আহার করিয়া এই দুষ্ক-ফেননীভ কোমল শবায় আপনি শয়ন করুন, আমি অন্তঃপুরে যাওয়া আমার পত্নীকে আপনার অভিশাষ পূরণ করিবার জন্ত প্রেরণ করিতেছি।”

বণিক অভ্যস্তরে গিয়া বীর বনিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“আমি তোমার স্বামী। আমার আজ্ঞা পালন করিলে, তোমার কোনই দোষ হইবে না। স্বামীর আজ্ঞা পালন করিলে স্বীর সতীত্ব অটুট ও অক্ষুণ্ণ থাকে; তুমি নানাবিধ অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া, সাজসজ্জা করিয়া ঐ ব্রাহ্মণের মনোভিলাষ পূর্ণ কর।” বণিকপত্নী স্বামীর আজ্ঞায় নানা বেশ-ভূষায় সজ্জিতা হইয়া ঠাকুরের সম্মুখে গমন করিলেন এবং প্রণত হইয়া কবচোড়ে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া ঠাকুরের নির্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি বণিক-বধূকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“মাতঃ! তোমার মস্তক-স্নিত দুইটি লোহার কাঁটা আমাকে প্রদান কর।” পার্থনামত বণিক-পত্নী দুইটি কাঁটা উন্মোচন করিয়া যেমন ঠাকুরকে দিয়াছেন, অমনি ঠাকুর ঐ কাঁটা দুইটি লইয়া নিজের চক্ষু বিদ্ধ করিয়া দিলেন। ঠাকুরের চক্ষু হইতে অবিরত দর দর করিয়া রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি তাহাতে

ভ্রক্ষেপ না করিয়া অতি দ্রুতগতিতে হে বৃন্দাবনচক্ৰ ! তুমি কোথায়, বলিতে বলিতে বৃন্দাবনের দিকে ক্রমশঃ চলিতে লাগিলেন ।

কতক দিবস পবে তিনি বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করত একান্তভাবে আর্দ্রহরে স্নীকস্নকে ডাকিতে লাগিলেন ।

শ্রুতবৎসল ভগবান্ তাঁহার সেই নিদারুণ আৰ্ত্তি দেখিয়া কি থাকিতে পারেন ? ঠাকুর অন্ধ হইয়া কাতরভাবে তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলে, ভগবান্ বালকস্ব ভাঁহার হস্ত ধরিয়া ফেলিলেন । সেট ভগবানের হস্তস্পর্শ-স্বথ অনুভবে, ঠাকুরের আর আনন্দের সীমা নাই । বোমাঞ্চ, কম্প, চৰ্ঘ ইত্যাদি অধৈর্য-সাহিত্য বিকারসমূহ তাঁহার শরীরে আবির্ভূত হইল, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর অজ্ঞপ্রভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । এত স্নেহে সহসা বালকস্ব ভাঁহার হস্ত ছিনাইয়া লইলেন । তাহাতে ঠাকুর দুঃখ পাষ্টয়া কক্ষের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন,—“হে দয়াল ঠাকুর ! আমার হস্ত হইতে তুমি ছোড় করিয়া ছুটিয়া পলাটিলে সত্য, কিন্তু আমার হৃদয় হইতে যদি তুমি পলাইতে পার, তবে জানিব তুমি বীর পুরুষ ।” তখন বালকস্ব ভাঁহার পদহস্ত ঠাকুরের চক্ষুতে বুলাইয়া দিলেন মাত্র । বিল্বমঙ্গল ঠাকুর স্বচক্ষে তাঁহার সম্মুখে অতীষ্ট দেবতাকে দেখিতে পাইয়া অললিত কণ্ঠে ভাঁহার স্তুত করিলেন ;—

“মধুরং মধুরং বপুঃস্ব বিভো মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্ ।

মধুগন্ধি যুগ্মস্থিত মেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥

এই বলিয়া ঠাকুর প্রেম মিমীলিত নেত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন । ক্রীড়নামের হস্তস্পর্শে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের চৈতন্য হইল । ক্রমে তিনি সিদ্ধ দণ্ডার উপনীত হইলে নিম্ন-লিখিত কবিতাটি বর্ণন করিয়া ভাঁহার জীবনের পূর্বাবস্থায় অদ্বৈতজ্ঞানের যে বিশ্বময় ফল তাহার পরিচয় প্রদান করেন ।

অদ্বৈতবীথী-পথিকৈরুপাস্তাঃ আনন্দ-সিংহাসন-অঙ্গদীক্ষাঃ ।

কঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃত্য গোপবধুবিটেন ॥

অর্থাৎ—অদ্বৈত-মার্গের পথিকগণ-দ্বারা উপাস্ত, আর আত্মানন্দ সিংহাসন হইতে দাসীপ্রাপ্ত হইয়াও, আমি কোন গোপবধু-লম্পট, শঠ কতৃক কঠকমে দাসীকপে পরিণত হইয়াছি ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত

শ্রীমদ্বলদেব বিজ্ঞানভূষণ-বিরচিত

সিদ্ধান্তরত্নম্

নং

শ্রী শ্রীগোবিন্দ-ভাষাপীঠকম্

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব দর্শনের ইহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ। মূল, টীকা ও ভাণ্ড্য-সহযোগে বঙ্গভাষায় অভিনব আকারে সম্ভবতঃ এই প্রথম। বিশ্লেষণ-সাহায্যে প্রাক্কল ভাষায় বিরোধমত খণ্ডনপূর্বক “কৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব”—ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ ইহাকে বৈষ্ণব-দর্শন-বিষয়ক পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সর্বভারতীয় আকাশবাণী (All India Radio) কলিকতাকেन्द्र হইতে ইহার সম্পর্কে ‘গ্রন্থ-সমালোচনা’ প্রচারিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে আকাশবাণী ভাণ্ড্য হইতে প্রেরিত পত্রের অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল। তত্ত্ব-পিসংস্পর্গ ইহা সংগ্রহ করিলে ভগবদ্ভক্তি সম্পর্কে অনেক কিছু তথ্য অবগত হইতে পারিবেন।

মূল্য বোর্ড বাঁধাই—২৫.০০ টাকা।

ডাকযোগে লইতে হইলে ৩২.০০ টাকা অগ্রিম প্রেরিতব্য।

GOVERNMENT OF INDIA All INDIA RADIO : CALCUTTA



No. Cal-15 (20/83-PI

Eden Gardens,

সত্যমেব জয়তে Calcutta-700001,

Dated the 18th March, '83

Dear Sir,

This is to inform you that the book Siddhanta-ratnam will be reviewed from our Station on 10th April, 1983 at 8 00 a.m. on Calcutta—

A service.

Yours faithfully.—

To

Sd /-Illegible

Shri Balai Chand Ghosh,

(Kabita Sinha)

9, Tarak Bose lane,

SENIOR PRODUCER

Calcutta-700002

for Station Director

॥ শ্রীশ্রীগুরুগোরাপৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা
আচার্য্যাবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
১৮শ বর্ষপূর্তি নিরুহ-মহোৎসব



নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

* শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গ জয়তঃ *

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ।
ফোন : ২৪৭

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডব্রজতিপূর্বিকেষম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্বিকেষম্—

আগামী ২৯শে পদ্মনাভ, ওরা কার্তিক (ইং ২১।১০।৮৩)
শুক্রবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয়
মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্বদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ঔঁ বিষ্ণুপাদ
পদ্মহংস ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
তিরোভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ এবং তচ্ছাখা
মঠসমূহে ১৬শ বর্ষীয় বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অমুসারে
আপনি সবান্ধব যোগদান করতঃ আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার-
দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা
নিম্নলিখিত ত্রুটি মার্জিতীয়। ইতি—২৮শে ভাদ্র, ১৩৯০ ; ইং ১৪।৯।৮৩

শুদ্ধতত্ত্ব-রূপালেশপ্রার্থী—

সভ্যব্রন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবাসূচী ঃ—

ওরা কার্তিক, ইং ২১।১০।৮৩ শুক্রবার—

প্রাতে—মহাজনপদাবলী-কীর্তন ও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের
অতিমর্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্নে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

নিঃ স্রঃ—পত্র অথবা সেবাতুকুল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিভুজেশ্বরী
শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নামে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

❀	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।	❀
দর্শঃ ধ্বংসিতঃ পুংসাং বিধ্বংসেন-কথায় যঃ ।		নোংপাদয়েদ যদি প্রতিঃ ভ্রম এব হি কেবলম্ ॥
❀	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা স্তপ্রসীদতি ॥	❀

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।

অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিরশুয়া ॥

অন্ত ধর্ম সূচকপে পাণ্ডে যেই জন ।

হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই ভ্রম ।

৩৫শ বর্ষ	২৬ পদ্মনাভ, পহ্লাম, ৪৯৭ গোরাঙ্গ ৩১ আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৯০ ; ইং ১৮৭১-১৮৮৩	৮ম সংখ্যা
----------	---	-----------

সান্ন্যাসানং

স্বপ্নবিলাসামৃতাস্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-বিরচিতম্]

প্রিয় ! স্বপ্নে দৃষ্টা সন্নিদানসুতেষাত্ত পুলিনং

তথা বৃন্দারণ্যে নটনপটবস্ত্রে বহবঃ ।

মৃদঙ্গাত্তং বাত্মং বিবিধমিহ কশ্চিদ্ধিজমণিঃ

স বিদ্যুদগোরাঙ্গঃ ক্ষিপতি জগতীং প্রেমজলধৌ ॥১॥

কোন একদিন নিশাবসানে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণকে বলিলেন,—হে প্রিয়তম !
 আমি অত্ন স্বপ্নে দেখিলাম যে, কোথাও যেন ঠিক যমুনায় ছায় কোন
 একটি নদী অর্থাৎ এই যমুনা যেমন বৃন্দাবন পরিবেষ্টিত, তদ্রূপ সে দেশীয়

সেখানে সেই নদীতে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। এ বৃন্দাবনে যেমন পুলিন সেখানেও তেমন পুলিন, এ বৃন্দাবনে যেমন অনেকেই নৃত্যবিষয়ে পারদর্শী সেখানেও এমনই দেখিলাম। এখানে যেমন মৃদঙ্গাদিবাद्य, সেখানেও এইরূপ বাজ্য দেখিলাম। এখানে যেমন তুমি ও আমি, তদ্রূপ সেখানে এক বিজ্ঞ-মণিও দেখিলাম। বিদ্যুতের ছায়া গৌরাজ সেই বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ যেন এ ব্রহ্মাণ্ডকে প্রেমসাগরে ডুবাইতেছেন ॥১॥

কদাচিৎ কৃষ্ণেতি প্রলপতি রুদন্ কহিচিদমৌ
ক্ব রাধে ! হা হেতি শ্বসিতি পততি প্রোজ্জ্বলতি ধ্বতিন্ ।
নটতুল্লাসেন কচিদপি গণৈঃ সৈ প্রণয়িত্তি-
তুণাদিব্রহ্মাস্তং জগদতিতরাং রোদয়তি সঃ ॥২॥

সেই গৌরাজ কোন সময়ে রোদন—পূর্ব্বক, হে কৃষ্ণ ! বলিয়া প্রলপ করিতেছেন, কখন বা হা হা রাধে ! তুমি কোথায় রহিলে বলিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, কখনও ভূতলে পতিত হইতেছেন কখন বা ধৈর্য্যশূন্য হইতেছেন, কোন সময় আনন্দের সহিত নৃত্য করিতেছেন, কখন কখন নিজ প্রণয়িগণের সহিত প্রলাপ, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করত ভূমিতে পতন, অচেতন, বৃত্তা ও রোদন—এই সকল দ্বারা তুণাদি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে অত্যন্ত রোদন করাইতেছেন ॥২॥

ততো বুদ্ধির্ভ্রাস্তা মম সমজনি প্রেক্ষ্য কিমহো !
ভবেৎ সেহয়ং কাস্তঃ কিময়মহনোবাশ্মি ন পরঃ ।
অহঞ্জেৎ ক্ব প্রেয়ান্মম স কিল চেৎ ক্বাহমিতি মে
ভ্রমো ভূযো ভূয়ানভবদথ নিদ্রাং গতবতী ॥৩॥

এই অন্তত ব্যাণাথ সন্দর্শনে আমার বুদ্ধি ভ্রান্ত হইল। তাঁহাকে হে রাধে ! তুমি কোথায় আছ ইত্যাদিরূপে আমার নাম-গ্রহণাদি করিতে দেখিয়া মনে করিলাম এই পুণ্ড্র কি আমার প্রাণবল্লভ নেই শ্রীকৃষ্ণ ? যদি তাই হয় তবে আমি কোথায় ? এইরূপে হে কৃষ্ণ ! তুমি কোথায় রহিলে ইত্যাদি কথা দেখিয়া ভাবিলাম, এট বিজ্ঞমণি আদিষ্ট, অজ্ঞ কেহ নহে। যদি আমিষ্ট হই, তবে আমার প্রিয়তম মাধব কোথায় ? এইরূপে বারম্বার আমার মন হইতে লাগিল, অনন্তর নিদ্রাভিভূত হইলাম ॥৩॥

প্রিয়ে ! দৃষ্ট্বা তাস্তাঃ কুতুকিনি ! ময়া দর্শিতচরী

রমেশায়া মূর্তীন' খলু ভবতী বিস্ময়মগাৎ ।

কথং বিপ্রো বিস্মাপয়িতুমশকৎ ত্বাং তব কথং

তথা ভ্রান্তিং ধত্তে স হি ভবতি কো হন্ত ! কিমিদম্ ॥৪॥

এইরূপে শ্রীরাধার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে প্রিয়ে ! কুতুকিনি ! আমি তোমাকে অনন্তশায়ী নারায়ণাদি বহুবিধ মূর্তি দর্শন করাইয়াছি, তাহা দেখিয়া তুমি কখনও বিস্মিত হও নাই, এখন সে ব্রাহ্মণ কি প্রকারে তোমার বিস্ময় জন্মাইতে সমর্থ হইলেন ? আর কেনই বা তোমার চিত্ত ভ্রান্তিবৃত্ত হইল ? কি আশ্চর্য্য ! সে বিপ্রই বা কে হয় ? ॥৪॥

ইতি প্রোচ্য প্রেষ্ঠাং ক্ষণমথ পরামুখ্য রমণো

হসন্মাকূতজ্ঞ ব্যাসুদদথ তং কৌস্তভমগিম্ ।

তথা দীপ্তং তেনে সপদি স যথা দৃষ্টিমিব ত-

বিলাসানাং লক্ষ্যং স্থিরচরগণৈঃ সর্ব্বমভবৎ ॥৫॥

[তাৎপর্য্যার্থ এই যে, কোন সময় বাগ্‌ভসিচ্ছলে শ্রীরাধা বলিলেন, হে মাধব ! আমাকে নারায়ণ মূর্তি দেখাও এবং রঘুনাথ দেখাও । এইরূপ প্রিয়ার কৌতুকময় বাক্য শ্রবণান্তে শ্রীকৃষ্ণ, সেই সেই মূর্তি দেখাইয়াছিলেন, এমন কি অত্যাধিক কাম্যাবলে শেষশায়ী নারায়ণ-মূর্তি বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং কোন দিবস কৌতুকবশে পরস্পর কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরাধিকা বলিলেন, হে প্রিয়তম ! যেমন রহস্তলীলাজনিত-সুখাদি পুরুষের চাঞ্চল্যভাব দর্শন করিয়া স্ত্রীগণ জানিতে পারে, তেমন পুরুষগণ স্ত্রীদিগের মনোগত ভাব জানিতে পারে না । তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, প্রিয়ে ! আমি একমূর্তিতে সর্ব্বদাই তাহা অনুভব করিয়া থাকি । তখন শ্রীরাধিকা বলিলেন, প্রাণনাথ ! তুমি সকলই মিথ্যা বলিতেছ । অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি । শ্রীরাধিকা পুনর্ব্বার বলিলেন, তবে আমাকে সেই মূর্তি দর্শন করাও, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে ঘূর্ণে শ্রীমদ্বহুপ্রভুর মূর্তি দর্শন করাইয়াছিলেন ।]

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে হসনা বাক্য বলিয়া তৎপর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ঐবৎ হাস্তপূর্ব্বক স্বীয় অভিপ্রায়ে সেই কৌস্তভ মণিকে সঞ্চালন করিলেন । অনন্তর তৎক্ষণাৎ সেই মণি এইরূপ দীপ্তি পাইতে লাগিল যে,

শ্রীমতী স্বপ্নাবস্থাতে যেরূপ দর্শন করিয়াছিলেন তদ্রূপ স্বাবর-জগন্মের সহিত
তাঁহার বিলাসের চিত্র সকল সম্যকরূপে লক্ষিত হইতে লাগিল ॥২॥

বিভাব্যাথ প্রোচু প্রিয়তম ! ময়া জ্ঞাতমখিলং

তবাকুতং যত্নং স্মিতমতনুথাস্তদ্বমসি সঃ ।

ক্ষুটং যন্মাবাদীর্ঘদভিমরজ্রাপ্যহমিতি

ক্ষুরন্তী মে তস্মাদহমপি স এবত্যকুগিমে ॥৩॥

তৎপর শ্রীরাধিকা স্বপ্নাবস্থায় যাহা দর্শন করিয়াছিলেন, প্রকাশিত কৌস্তভের
প্রভাবে জাগরিতাবস্থাতেও সেই সকল দেখিতে পাওয়ায়, “আহা! প্রাণ-
বল্লভের চাতুর্যের এত প্রাচুর্য যে তাহার পরিসংখ্যা করাও অসাধ্য”—
এইরূপে নানাবিধ জল্পনা করিয়া পশ্চাৎ বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া বলিলেন,
হে প্রিয়তম ! আমি তোমার সকল অভিপ্রায়ই জানিতে পারিলাম। আমি
স্বপ্নে যে গৌরকান্তিধারী দ্বিজমণিকে দেখিয়াছি, সেই দ্বিজোত্তম গৌরানন্দ
সাক্ষাৎ তুমিই, যেহেতু তুমি ঈষৎ হাস্য করিতে সেই গৌরানন্দ তুমিই বলিয়া
অভিমান প্রকাশ করিয়াছ। কিন্তু তাহা আমার নিকট স্পষ্ট কিছুই প্রকাশ
কর নাই, সেই হেতু আমারও দেহে অভিমান ক্ষুণ্ণি পাইতেছে যে আমিও
ঐ গৌরানন্দ। উত্তমের এইরূপ অভিমান হওয়ায় বোধ হয় তুমি ও আমি
উভয়ে মিলিত হইয়াই ঐ রূপ হইয়াছি ॥৩॥

যদপ্যস্মাকীনং রতিপদমিদং কৌস্তভমণিং

প্রদীপ্যাত্রেবাদীদৃশদখিলজীবানপি ভবান্ ।

অশক্ত্যবিভূয় স্বমখিলবিলাসং প্রতিজনং

নিগত প্রেমাকৌ পুনরপি তদাধাস্তসি জগৎ ॥৪॥

হে প্রিয়তম ! যেহেতু তুমি এই কৌস্তভমণিকে প্রকাশিত করিয়া ঐ
মণিতেই আমাদিগের রতিপদ অর্থাৎ রতির স্থান জীবসকলকে বারম্বার
দেখাইয়াছ, এখন বোধ হইতেছে যে, অয়ংই নিজ শক্তিগণের সহিত আবিভূত
হইয়া আপনাকে ও আপনার নিখিল লীলাকে প্রত্যেক লোকের নিকট ব্যক্ত
করিয়া পুনর্বার এই চরাচর জগৎকে প্রেমসাগরে নিমগ্ন করিবে ॥৪॥

যদ্বক্তং গর্গেণ ব্রজপতিসমক্ষং শ্রুতিবিদা

ভবেৎ পীতো বর্ণঃ কচিদপি তবৈতন্ম হি মুখা ।

অতঃ স্বপ্নঃ সত্যো মম চ ন তদা ভ্রান্তিরভব-

স্বমেবাসৌ সাক্ষাদিহ যদনুভূতোহসি তদৃতম্ ॥৮॥

শ্রীমতী বলিলেন,—হে প্রিয়তম! ইতিপূর্বে অবশ্য করিয়াছি যে, তোমার নামকরণকালে বেদজ্ঞ গর্গাচার্য্য মহাশয় শ্রীভ্রজপতি নন্দমহারাজকে বলিয়াছিলেন যে, হে নন্দ! তোমার পুত্র কোনকালে শুক্লবর্ণ ও রক্তবর্ণ হইয়াছিল, এখন কৃষ্ণবর্ণ হইল, পুনর্বার কোনযুগে পীতবর্ণও ধারণ করিবে, এই বাক্য কখনও মিথ্যা হইবার নয়। অতএব আমার স্বপ্নও সত্য এই বিষয়ে আমার কোন ভ্রমও হয় নাই। এই গৌরব সাক্ষাৎ তুমিই অনুভবনীয় হইতেছে, তাহাও সত্য ॥৮॥

পিবৈদ্ যশ্চ স্বপ্নামৃতমিদমহো ! চিন্তমধুপঃ

স সন্দেহস্বপ্নাতুরিতমিহ জাগতি স্মৃতিঃ ।

অবাপুচৈতন্যং প্রণয়জ্জলধৌ খেলতি যতো

ভূশং ধন্তে তস্মিন্নতুলকরুণাং কুঞ্জনুপতিঃ ॥৯॥

যাহার চিন্তাময় এই আশ্চর্য্য স্বপ্নামৃত অর্থাৎ স্বপ্নবিলাসামৃত পান করিবে, সেই স্মৃতি অচিরে এই সন্দেহ স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইবেন। অর্থাৎ শ্রীনন্দনন্দনই শ্রীশচীনন্দন কিংবা এইরূপ সন্দেহ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া পরে শ্রীচৈতন্যকে প্রাপ্ত হইয়া প্রেমসাগরে বিহার করিবেন, যেহেতু সেই কুঞ্জবিকারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি অদীম ধারণা করেন, অর্থাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হয়েন ॥৯॥

সজ্জন—কৃষ্ণকশরগ (১২)

কৃষ্ণকশরগই বৈষ্ণবের মুখ্য লক্ষণ

বৈষ্ণবের যে ২৬টি গুণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণকশরগ ব্যতীত অপর ২৫টি গুণ তটস্থ বলিয়া লক্ষিত। কৃষ্ণকশরগ-গুণই স্বরূপ বা মুখ্য গুণ বলিয়া নির্দিষ্ট। কৃষ্ণকশরগতা যাহার নাই, তাঁহার অপর পঞ্চবিংশ গুণের সম্ভাবনা নাই; অথবা তত্ত্বগুণ লক্ষিত হইলেও এই গুণের অভাবে ঐগুলি নিত্যভাবে অবস্থান করিতে পারে না। অগ্ন্যস্ত্র স্বর্ণ কপটতা করিয়া অসাদুগুণ অপরকে প্রদর্শন করিতে পারে; কিন্তু অসজ্জন কখনই কৃষ্ণকশরগ হইতে পারে না।

পরমেশ্বর কৃষ্ণই পরতত্ত্ব এবং একমাত্র শরণ

সজ্জনই একমাত্র কৃষ্ণৈকশরণ। শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর-তত্ত্বের মূল বস্তু, তাঁহা হইতে শ্রীবলদেব প্রভু, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি ব্যাচতুষ্টয়, পুরুষাবতার-ত্রয় এবং নৈমিত্তিক অবতারাবলী উদয় হইয়াছেন। জীবের পুরুষাবতার-ত্রয়ের জ্ঞান হইলেই তিনি প্রাপঞ্চিক জগতের সকল কথা হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং বৈকুণ্ঠ বস্তুর অমলত্ব উপলব্ধি করিয়া নিত্যদাস্তাই তাঁহার ধর্ম, ইহা বুঝিতে পারেন। সর্বাশ্রয়, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, অনাদি, সর্বাদি, সর্বকারণ- কারণ সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জীবের একমাত্র শরণ্য। তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবের অন্য কোনপ্রকার গতি নাই।

মায়াবাদী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছান্তস্ত্র কখনও

কৃষ্ণৈকশরণ নহে

যে-জীব সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণ পরিত্যাগ করিয়া মায়াবাদ, কর্ম্মকাণ্ড ও অন্যাভিলাষ, মিছা-ভক্তিতে কাল-ক্ষেপ করেন, তিনি কৃষ্ণৈকশরণ হইতে পারেন না। আবার মুখে কৃষ্ণৈকশরণ বলিলেই যে কৃষ্ণ-বিমুখতা ছাড়িয়া যায়, এক্রূপ নহে। যিনি অকিঞ্চন, তিনিই কৃষ্ণৈকশরণ। অকিঞ্চন বলিলে মায়াবাদীকে বুঝায় না, কর্ম্মকাণ্ডী সন্ন্যাসীকে বুঝায় না বা অন্যাভিলাষীর ভাষায় প্রাকৃত দরিদ্রতাকেও বুঝায় না।

অকিঞ্চন ভক্তই কৃষ্ণৈকশরণ

শরণাগত বা অকিঞ্চনের লক্ষণ একমাত্র কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট। কৃষ্ণৈকশরণ হইলেই জীব কৃষ্ণের মায়ায় বাবতীয় মাহাত্ম্যে উদাসীন হন। সেই সকল মাহাত্ম্য বরণ করাতো দূরে থাক, প্রতিষ্ঠার ভয়ে তথা হইতে পলায়ন করেন। বাঁহার দর্শ্যশ্রম-ধর্ম্ম গ্রহণ আছে, তিনি অকিঞ্চন বা শরণাগত হইতে পারেন না। সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেই কৃষ্ণৈকশরণ বলা যায়।

শরণের ছয় প্রকার লক্ষণ

শরণের লক্ষণ ছয় প্রকার ; যথা,—

- (১) আনুকূল্যের সঙ্কল্প,
- (২) প্রাতিকূল্যের বর্জন,
- (৩) কৃষ্ণব্যতীত আমার কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই—এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস,
- (৪) কৃষ্ণকেই গোপ্তা বা পালয়িতা বলিয়া বরণ,

(৫) কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া তৎ-সেবা বাতীত অন্য-চেষ্টা-বাহিত্য,

(৬) জড়ের সকল প্রকার অভিমান ছাড়িয়া নিজকে নিতান্ত দীনবুদ্ধি—
এই চরম প্রকার শরণের লক্ষণে লক্ষণাঙ্কিত হইয়া সজ্জন কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন।

মিছা-ভক্তগণ কপট, হিংসক, মৎসর ও পরচর্চাকারী

কৃষ্ণৈকশরণ সজ্জনের কৃষ্ণৈকশরণতা বাতীত কৃষ্ণোত্তর বস্তুর শরণ গ্রহণে প্ররুতি নাই। তবে যাহারা বৈষ্ণব পরিচয়াকাজ্ঞা লাভের জন্য কপটতা করিয়া আপনাইদগকে কৃষ্ণৈকশরণ বলিয়া পরিচয় দেন এবং ভক্তের শুদ্ধ-ভক্তির অজায়-পূর্বক তীর প্রতিবাদ করাকে কৃষ্ণৈকশরণতা জানেন, তাহারা মিছা-ভক্ত বা কপটী বলিয়া নিশ্চিষ্ট আছেন। ভক্তের স্বভাবে পর-চর্চা নাই, অনর্থক তীর প্রতিবাদ নাই, পর-হিংসা নাই, মৎসরতা নাই। যাহা সজ্জনে নাই, সেইগুলি মিছাভক্ত কপটীর বৈষ্ণব-পরিচয়-হাছে অন্তঃস্থিত সম্পত্তিপুঞ্জ।

কপটী, মিছাভক্ত ও অসাপু—কৃষ্ণৈকশরণ-বৈষ্ণবের

সঙ্গ পাইলে ভক্ত হইতে পারেন

ভগবান ও ভক্তের বিবেচ্য সরাই অসাপুর স্বভাব-জাত ধর্ম্য, উহা কৃষ্ণৈকশরণতা নহে, কৃষ্ণনিমুখতা মাত্র। কপটী মিছাভক্ত যখনই কৃষ্ণৈকশরণ হন, তৎকালে চরিত্তকৃতবৈষ্ণব-দ্রোহিতার অপকারিতা উপলব্ধি করেন এবং স্বীয় অবৈষ্ণবোচিত বৃত্তিসমূহের বশ্ত হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হন। চরিত্তিমুখ জীবের কৃষ্ণৈকশরণতা সুহৃৎ হইলে ও সাধুসঙ্গক্রমে সজ্জনের এই মূলে গুণ বা স্বরূপ-লক্ষণে দৃষ্টি পড়ে। তিনি মৎসরতা ও কপটতা ছাড়িয়া ক্রমশঃ সজ্জনের আদর্শে অগ্রসর হইয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করেন।

সজ্জন—অকাম (১৩)

স্বরূপ-বিশ্মৃত জীব ত্রিবর্গকামী বা মোক্ষকামী

যে-কালে জীব নিজের স্বরূপ বৃত্তিতে অসমর্থ থাকেন, তখনই তিনি জ্ঞাতাবের বশবর্তী হইয়া নানা প্রকার কামনা করেন। ধর্ম্যাধর্ম্য-শূণ্য হইয়া যে-কামনা তাহার নাম বর্থেচ্ছাচার, পুণ্যাময় কামনাকে সংকর্য এবং কামনা-ভাগকে মোক্ষ-কাম বলে। কামনা যুক্ত জীব ত্রিবর্গের অনুসন্ধান করেন এবং কামনা-যুক্ত জীব স্বীয় অপবর্গের জন্য যত্ন করেন। ত্রিবর্গকামী অথবা চতুর্থ বর্গ মোক্ষকামী উভয়েই নিজ নিজ মত কাম্যের দাস। এই ভট শ্রেণীর মধ্যে কামনা বর্জনান প্রকার বাঞ্ছার সজ্জন বা অকাম হইতে পারেন না।

কেবলমাত্র বৈষ্ণব-সজ্জনই অকামী বা নিকাম

সজ্জনই একমাত্র অকাম। সজ্জন এই পৃথিবীর কোন দ্রব্যের কামনা করেন না। তিনি বর্ণ ও আশ্রমসমূহ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণৈকেশরণ। চতুর্দশ ভুবনে এমন কোন লোভনীয় বস্তু নাই যাহার মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া, লোভে লুদ্ধ হইয়া সজ্জন কামনাবিশিষ্ট হইবেন। শ্রীকৃষ্ণই সজ্জনের একমাত্র কাম্যবস্তু এবং শ্রীকৃষ্ণ-কাম্যে তাঁহার সকল কামনা পর্য্যবসিত। নিজেহ্রিয়-প্রীতিকাম সজ্জনের আদৌ থাকিতে পারে না। সজ্জনের সকল হৃদয় সর্বদা কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত, সুতরাং কৃষ্ণেতব বস্তু-কামনার তাহার অবকাশ নাই। ১৫

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশাস্ত।

কৃষ্ণভক্ত—নিকাম, অতএব—শাস্ত।

মিছাভক্ত সহজিয়াগণ অকামী হইতে পারেন না

মিছাভক্ত বৈষ্ণব-পরিচয়াকাজ্ঞা করিলেও তিনি কাম-দাস। মিছাভক্ত কর্ম-জানাবৃত্ত হইয়া যথেষ্টাচারের উদ্দেশ্যে কামনা-হীন হইতে পারে না। ভাড়াটিয়া ভক্ত, বাস্তাশী ভেকধারী ও অবৈষ্ণব-মিছাভক্ত সকলেই কামনাময়। সজ্জনেরও কামনা থাকে বলিয়া মিছাভক্ত বিশ্বাস করে; কিন্তু মিছাভক্ত ও বৈষ্ণব এক জাতীয় নহে। দেব-পিতৃকামী, জড়সেবাত্রস্ত-দয়াদ্রু-হৃদয়, বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, পুণ্যসঞ্চয়ী, শৌক-জাত্যভিমানী মিছাভক্ত অকাম নহেন। ভক্তসহ অভক্তের দাম্যপ্রয়ানী অসংকামী নিকাম-ভক্তের স্বরূপ বুঝিতে পারে না।

—ভগদত্ত ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর

ভক্তিতত্ত্ববিবেক—চতুর্থ প্রবন্ধ

(পূর্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪৬ পৃষ্ঠার পর)

বৈধী সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

যত্র রাগানবাগুত্বাৎ প্রবৃত্তিরূপজায়তে।

শাসনৈর্লৈব শাস্তস্ত সা বৈধী ভক্তিরূচ্যতে ॥

(ভঃ রঃ সিদ্ধ ১২।৫)

জীবের ভক্তিবৃত্তি স্বাভাবিক। তাহার চিৎস্বরূপের অভিন্ন ধর্মবিশেষ জীব বদ্ধ হইয়া ভগবদ্বিহীনুখতা লাভ করিলে সেই স্বরূপ হইতে অভিন্ন বৃত্তি ও মায়া-প্রসূত ভগভের বিষয়গত হইয়া বিষয়-রাগ হইয়া পড়ে। সুতরাং রাগ-বিষয়ে

আবিষ্ট হইলে কৃষ্ণানুগত্য লুপ্তপ্রায় থাকে। যে-কোন ভাগ্যেই হউক, জীবের চিৎস্বরূপগত রাগ উদ্ভিত হইলেই জীব কৃতার্থ হয়। প্রেমোদয় সময়ে ঐ বাগোদয় স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। কিন্তু বিষয়বিষ্ট জীবের যখন রাগ বিকৃত হইয়া তুচ্ছ জড়বিষয়ে কার্য্য করিতে থাকে, তখন কৃষ্ণস্বক্কে রাগের অনবাপ্তি বা অমুদয়। তখন ভাগ্যক্রমে উপদেশ লাভ দ্বারা জীব পুনরায় কৃষ্ণ-সান্ন্যাস লাভ করিতে থাকে। বেদ ও বেদান্তই উপদেশপূর্ণ শাস্ত্র। সেই শাস্ত্রের শাসনক্রমে যে ভক্তি-প্রবৃত্তি হয়, তাহার নাম বৈধীভক্তি।

এখন বাগানুগা ভক্তি সংক্ষেপে আলোচিত হউক। শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন :—

“তত্র বিষয়িণঃ স্বাভাবিকে বিষয় সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ঃ প্রেমা রাগঃ। যথা—
চক্ষুরাদীনাং সৌন্দর্যাদনৌ ; তাদৃশ এবাত্র ভক্তস্য শ্রীভগবতাপি রাগ ইত্যাচাক্তে।

বিষয়ী জীবের স্বাভাবিক বিষয়-সংসর্গের ইচ্ছা প্রবল প্রেমরূপে ধাবমান হয়। তাহার নাম রাগ। সৌন্দর্যাদি বিষয়ে চক্ষুরাদির স্বাভাবিক চেষ্টা। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তের প্রবৃত্তি তাহাকে রাগ বলা যায়। সেই রাগ ঐহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহাদের অমুগত হইতে যে-কিছু জন্মে, তাহাই রাগানুগা ভক্তি। ঐবিষয়ে গ্রন্থে এই পর্য্যন্ত। পরে অমৃত বিশেষ বিচারিত হইবে। এবদ্বিধ রাগানুগা ভক্তিতে কাহার অধিকার আছে তন্নির্ণয়ে শ্রীকৃষ্ণ বর্ণিয়াছেন :—

রাগান্বিতৈকনিষ্ঠঃ যে ব্রজবাসি-জ্ঞানদয়ঃ।

তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুকৌ ভবেদত্যাধিকারবান্ ॥

তত্তত্তাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে দীর্ঘদপেক্ষতে।

নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি-লক্ষণম্ ॥

(ভঃ রঃ সিদ্ধ ১২১১৪৭-১৪৮)

ব্রজবাসী-জ্ঞানাদি কেবল রাগান্বিতা নিষ্ঠা লক্ষিত হয়। তাহাদের তত্তত্তাব-লুক ব্যক্তিরাই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী। সেই সেই ভাবাদি-মাধুর্য্য-বিষয় শ্রবণ করিলেও লোভ বাতীত তাহাতে প্রবেশ হয় না। অতএব লোভেই রাগানুগা-সাধনভক্তির অধিকার চেতু। শাস্ত্র ও যুক্তি ইহাতে অধিকার-হেতু হয় না।

আমরা এখন দেখিতেছি যে, বৈধী ভক্ত্যধিকারে শ্রদ্ধাই যেমন একমাত্র হেতু গুলিয়া উক হইল, রাগানুগা ভক্ত্যধিকারে লোভই একমাত্র হেতু বলিয়া

নির্দিষ্ট হইল। এখানে বিতর্ক এই যে, প্রথম যে-তর্ক শ্রদ্ধাকে শুদ্ধভক্ত্যধিকার-
হেতু বলিয়া নির্দেশ করা গিয়াছে তাহা কি অসম্পূর্ণ? যখন শ্রদ্ধা কেবল
একপ্রকার ভক্ত্যধিকারের হেতু, তখন সমস্ত শুদ্ধভক্ত্যধিকার-হেতু বলিয়া
কিভাবে নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল? এখানে মীমাংসা এই যে, শ্রদ্ধাই কেবল শুদ্ধ
ভক্ত্যধিকারে হেতু, আর কেহই নন। বৈধীভক্তিতে শাস্ত্র-বিশ্বাসময়,
শ্রদ্ধাই একমাত্র হেতু। রাগানুগা ভক্তিতে ভাব-মাধুর্য্য-লোভময়ী
শ্রদ্ধাই একমাত্র হেতু। বিশ্বাস-ময়ী হউন অথবা লোভময়ী হউন,
একমাত্র শ্রদ্ধাই উভয়বিধ শুদ্ধভক্তির অধিকার-প্রদানে সক্ষম।

বৈধী ভক্ত্যধিকারী ত্রিবিধ। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য, —
“উত্তমো মধ্যমশ্চ স্ত্র্যং কনিষ্ঠশ্চেতি স ত্রিধা।” উত্তম্যধিকারীর লক্ষণ, যথা—

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

প্রৌঢ়শ্রদ্ধোহধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ॥

বৈধী ভক্তিতে তিনিই উত্তম ও প্রৌঢ়শ্রদ্ধা। যিনি শাস্ত্র ও যুক্তিতে নিপুণ
এবং সর্বথা দৃঢ়নিশ্চয়। মধ্যমের লক্ষণ, যথা;—

যঃ শাস্ত্রাদিষ্মনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ।

মধ্য শ্রদ্ধাবান্ বাক্তি শাস্ত্রাদিতে নিপুণপ্রাণ অর্থাৎ যখন বন্ধন কুতর্ক
উপস্থিত হয় তাহা সমাধান করিতে সক্ষম হন না। তথাপি মনে দৃঢ়নিশ্চয়তার
সম্বিত শ্রদ্ধাবান্ থাকেন।

কনিষ্ঠের লক্ষণ, যথা;—

যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগন্তে।

কনিষ্ঠ ভক্ত শাস্ত্রাদিতে কিছুনিপুণ। তাঁহার শ্রদ্ধা কোমল। শাস্ত্রযুক্তি-
দ্বারা অন্যে তাঁহার শ্রদ্ধাকে তেদ করিতে পারে। এখানে দৃষ্টব্য এই যে, তিন-
প্রকার শ্রদ্ধাবান্ বাক্তিরই শাস্ত্রবিধ ও তদনুগত যুক্তিমিশ্র-শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়।
রাগানুগা ভক্তির অধিকারিদিগের লোভের তারতম্য অনুসারে তাঁহাদিগকেও
উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ এই তিন বিভাগে বিভক্ত করা যায়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে ভক্তিবিশয়ে নরমাত্তের অধিকার আছে।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সম্রাসী
সকলেরই শাস্ত্রবাক্যে, গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা হইলে ভক্তিতে অধিকার ভ্রমে।
বিজ্ঞানান্ত করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়নপূর্ব্বকই হউক অথবা ভাবজ্ঞানভাবে সাধুমুখে
শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণপূর্ব্বকই হউক, শাস্ত্র-নির্গীত ভক্তির সর্বোত্তমস্ত বোধ হইলেই

শ্রদ্ধা ক্রমিল, বলিতে হইবে। অথবা ভগবন্তীলা শ্রবণ করত শুদ্ধ রাগভক্ত
ব্রজবাসীদিগের অনুগত হইতে যখন লোভমগ্নী শ্রদ্ধা হয়, তখনও শুদ্ধভক্তিতে
অধিকার ক্রমিল বলিতে হইবে। জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিবেক, ধর্মচর্চা, শম-দমাদি
শিক্ষাদ্বারা যোগাভাস ইত্যাদি গুণগণ সাধিত হইলেও ভক্তিতে অধিকার
জন্মে না। সাম্প্রদায়িক দীক্ষা লাভ করিয়াও যে-পর্যন্ত উত্তমাবিকারী না
হওয়া যায়, সে-পর্যন্ত উত্তম ভক্তির উদয় হয় না, কেবল ভক্ত্যাভাসই থাকে।
উত্তমাবিকার লাভ করিবার যত্ন করা নিতান্ত প্রয়োজন। তাহা
কেবল উত্তম ভক্ত সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্তনদ্বারাই লব্ধ হয়। শ্রবণ-
কীর্তনে অত্যন্ত আগ্রহ ও তত্ত্বৎ সময়ে অশ্রুপুলক-মৃত্যুভাব-প্রদর্শনাদি
হইলেই যে উত্তমাবিকার হইয়াছে, তাহা বলা যায় না; যেহেতু তত্ত্বলক্ষণ
ভক্ত্যাভাসেও উদয় হয়। শুদ্ধভক্তির প্রাপ্তিতে যে যৎকিঞ্চিৎ স্বরূপলাভাগ্রহতা
ও আদ্রতা দেখা যায়, তাহা ভক্ত্যাভাসগত চরম লক্ষণের প্রতিফলরূপ
মূর্ছাদি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। অতএব আমরা বিশেষ সতর্কতার সহিত শুদ্ধভক্তি
লাভ করিবার যত্ন করিব। তন্মোভের অধিকারপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা
করিব, নতুবা শ্রীকৃষ্ণ-পদাশ্রয়প্রাপ্তি কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। বিশ্ববৈষ্ণব
দাস নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি প্রচার করিতেছেন,—

শ্রদ্ধা লোভাজ্জিকা যা সা বিশ্বাসস্বরূপিণী যদা ।

জাতয়েহত্ব তদা ভক্তৌ নৃমাত্রস্তাধিকারিতা ॥১॥

ন সাংখ্যং ন চ বৈরাগ্যং ন ধর্মো ন বহুজ্ঞতা ।

কেবলং সাধুসঙ্গে ইয়ং হেতুঃ শ্রদ্ধোদয়ে প্রথম ॥২॥

শ্রীগাদি-বিধানেন সাধুসঙ্গ-বলেন চ ।

অনর্থাপগমে শীঘ্রং শ্রদ্ধা নিষ্ঠাশ্লিকা ভবেৎ ॥৩॥

নিষ্ঠাপি কুচিঁতাং প্রাপ্তা শুদ্ধভক্তাদিকারিতাম্ ।

দদাতি সাধকে নিতামেষা প্রথা সনাতনী ॥৪॥

অসংসঙ্গোহথবা ভক্তাবপরাধে কৃতেশ্চ ত

শ্রদ্ধাপি বিলয়ং য়াতি কথং স্মাজ্জুহুভ ততা ॥৫॥

অতঃ শ্রদ্ধাবতা কার্যং সাবধানং ফলাপ্তয়ে ।

অনুথা ন ভবেদ্বক্তিঃ শ্রদ্ধা প্রেম-ফলাশ্লিকা ॥৬॥

লোভাজ্জিকা বা শাস্ত্র-বিশ্বাস-রূপিণী শ্রদ্ধা যখন উদয় হয়, তখনই নর-
মাত্রেরই শুদ্ধভক্তিতে অধিকার জন্মে। সাংখ্য, বৈরাগ্য, বর্ণাশ্রম-ধর্ম

বা পাণ্ডিত্য প্রদ্বোধয়ের হেতু নয়, কিন্তু কৃষ্ণলীলা-গান-প্রিয় সাধুদিগের সঙ্গই একমাত্র হেতু। প্রদ্বোধমাত্রই ভক্তিতে কনিষ্ঠ অধিকার জন্মে। যখন শ্রবণাদি সাধনভক্তির অঙ্কশীলন ও সাধুসঙ্গ-বলে অনর্থ-রহিত হইয়া শ্রদ্ধা নিষ্ঠাঙ্গিকা হয়, তখন শুদ্ধভক্তিতে মধ্যমাদিকার জন্মে। পুনরায় শ্রবণাদি সাধনভক্তির অহুতান করিতে করিতে এবং সাধক হইতে শ্রেষ্ঠ অধিকারীর সঙ্গবলে নিষ্ঠা রুচিতা লাভ করিলে অর্থাৎ রুচিস্বরূপা হইলে সাধক উত্তমাদিকাবী হইয়া শুদ্ধভক্তি লাভ করেন। ইহাই শুদ্ধভক্তি-লাভের সনাতন প্রথা। কিন্তু যদি এইরূপ ক্রমলাভকালে অসংসঙ্গ অর্থাৎ বিষয় আসক্ত বা নির্বিশেষ-আসক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গ হয় অথবা শুদ্ধভক্তের প্রতি অগজরূপ অশ্রদ্ধা হয়, তবে কোমল শ্রদ্ধা ও মধ্যম শ্রদ্ধা উভয়েই লয় প্রায় হয়। তখন সাধকের আর শুদ্ধভক্তি লাভ হয় না; হয় চায়া-ভক্ত্যাভাসে, নয় অধিক হৃদৈব ঘটলে প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাসে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। অতএব সে-পর্য্যন্ত উত্তমাদিকার লাভ না হয়; সে-পর্য্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ পুরুষের ফলপ্রাপ্তির ক্ষণ বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত, নতুবা প্রেম-কলাঙ্গিকা শুদ্ধভক্তি শাওরা ঘুঘট হইবে। শ্রীকৃষ্ণার্পণমন্ত্ৰ।

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

উদ্ধারের পথ

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমদ্বাহাপ্রভু বলেছেন,—

“কৃষ্ণ তোমার হউ যদি বলে একবার।

“মারাবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করেন পার ॥” (১৫: ৫:)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত ভক্তের প্রতি করুণার মহিমা কীর্তন করে শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৪৮।২৬) স্পষ্ট করে বল্লেন,—

“কঃ শান্তিত্বদ পরং শরণং সমীয়াদ্

ভক্তপ্রিয়াদৃত গিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাং।

সর্বান্ দদাতি গুহ্যদো ভক্ততোহভিকামা-

নাঙ্গনমুশাশচক্ষাপচর্যো ন যত্ন ॥”

অর্থাৎ—“হে ভগবান্ ! ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্, সুহৃৎ ও কৃতজ্ঞ আপনাকে ছেড়ে কোন্ পণ্ডিত অপরের শরণাপন্ন হয় ? আপনি ভক্তনশীল ব্যক্তিগণকে সমস্তকাম এবং আপনাকে পর্যাপ্ত দিয়া থাকেন ; অতঃ আপনার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই ।”

ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের যাবতীয় কামনা পূরণ তো করেনই, আবার এমনকি ভক্তের কাছে নিজেই বিলিয়েদেন । এতো মহৎ মহিমা কি কাহারও আছে ? তিনি সর্ব-দেবেশ্বর । তাঁকে ডাকলে ও ভক্তি করলে সকল দেবতাও প্রসন্ন হ'ন । ‘মহানির্বাণ ভক্তো’ শ্রীশিবজী পার্বতী-দেবীকে বলেছেন,—

বেদান্তবেত্তো ভগবান্ যন্তুচ্ছকোপলক্ষিতঃ ।

তদারাধনতো দেবি সর্বেষাং প্রীগনং ভবেৎ ॥

তরোমূলভিষেকেন যথা তদুৎপল্লবঃ ।

তৃপ্যন্তি তদগুর্জানাং তথা সর্বৈঃ সরাদয়ঃ ॥”

অর্থাৎ—“হে দেবি, বেদান্তবেত্ত ভবানের আরাধনার দ্বারা সকলেই প্রসন্ন হন । বৃক্ষমূলে অলসেচন করলে যেকোন শাখা-প্রশাখা ও পুত্র-পুত্ৰাণি প্রকুল থাকে, তদ্রূপ শ্রীভগবানের আরাধনা করলে দেবতা প্রভৃতি সকলেই সমৃদ্ধ হ'ন ।”

সর্বৈশ্ববেশ্বর ভগবান্ কৃষ্ণের শরণাগত হলে পিতৃগণ পরিশোধের জন্য কর্মকাণ্ডীয় আত্মাদি আবশ্যকতা নেই এবং দেব, ঋষি, পিতৃগণ, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি ঋণ পরিশোধ হয়ে যায় । যথা ভাগবতে (১১।৫।৪১ শ্লোকে),—

দেবষিত্ত্ব ভাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঞ্চরো নায়মগী চ রাজন ।

সর্বাঙ্গনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুহুর্দং পরিহৃত্য কৰ্ত্তম্ ॥”

অর্থাৎ, হে রাজন ! যিনি সংসারের সকল কর্তব্য পরিত্যাগ করে বাসুদেবই সকল—এই জ্ঞানে সেই অখিল লোকশরণা শ্রীমুকুন্দ-পাদপদ্মে সর্বান্তঃকরণে শরণ গ্রহণ করেছেন, তিনি দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, ভূতসকল, আত্মীয়-স্বজন এবং অপর মনুষ্যাগণের কাহারও নিকট দাঁষ্টো বা ঋণপাশে বদ্ধ ন'ন । উক্ত প্রসঙ্গে শাস্ত্র আরও জানিয়েছেন,—

সকল্লং চ তথা দানং পিতৃদেবার্চনাদিকং ।

বিমুগ্ধস্ত্রোপদিষ্টশেন্ন কুর্ঘ্যাৎ কুশধারণম্ ॥”

(ছন্দপুরাণ, রেবাখণ্ড)

অর্থাৎ,—“যদি কোন ব্যক্তি বিয়ুযজ্ঞে উপদিষ্ট (দীক্ষিত) হন, তবে তিনি সঙ্কল্প, দান, পিতৃ-দেবার্চন প্রভৃতি এবং কুশধারণ করবেন না।”

শ্রীহরির সহিত তদধীন অল্প দেবতাদেব সমান মনে করাও পাষণ্ডতা। যথা পদ্মপুরাণ-বাক্য,—

“যন্ত নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।

সমত্বেনৈব বীক্ষেত সঃ পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

বিক্ষৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতর সমাধীর্হন্ত বৈ নারকী সঃ ॥”

অর্থাৎ,—“যে ব্যক্তি ভগবান্ নারায়ণকে ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণের সহিত সমান মনে করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী ও নারকী।”

শ্রীহরিই আমাদের আরাধ্য, ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণ তাঁহার বশতত্ব। ভগবান্ কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি দ্বারাই তাঁকে পা'বার বিধি। কৃষ্ণ তাই ইন্দ্র-পূজা ও বরুণ-পূজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। দেবতাগণ যে কৃষ্ণের পদপ্রান্তে অবলুষ্ঠিত, আমরা কেনই বা সেই কৃষ্ণের চরণে শরণাগত হবো না? দেবতাদের আমরা অবজ্ঞা করি না,—করুবোও না। দেবতাদের যথাযোগ্য সন্মান দিয়ে শ্রীহরির ভক্তনষ্ট আমাদের আকাজক্ষার বিষয়। তাই ‘পদ্মপুরাণ’ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন,—

“হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।

ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাণ্ডা নাবজের্যা কদাচন ॥”

অর্থাৎ,—“সর্বদেবেশ্বর শ্রীহরিষ্ট একমাত্র সর্বদা আরাধ্য। তত্ত্বজ্ঞ-ব্রহ্ম-রুদ্রাদি অল্প দেবতাকেও কখন অবজ্ঞা করবে না।”

সুতরাং ভগবান্ কৃষ্ণ ছাড়া আর আরাধ্য কে আছেন? তাঁর কৃপা যেমন সমস্ত দেবতাগণের কৃপা অপেক্ষা অধিক এবং সুলভ, তেমনি তাঁর প্রাপ্তিও সুলভ। কৃষ্ণের মত ক্ষমাশীল ও কৃপালু আর কেহ নাই।

“কৃষ্ণের স্বভাব-ভক্তের না লয় অপরাধ।

অল্প সেবা বহু মানে, আত্ম পর্যন্ত প্রসাদ।” (চৈঃ চঃ)

এমন পরম করুণাময় কৃষ্ণের কৃপা একমাত্র ভক্তির দ্বারাই পাওয়া যায়, পরন্তু কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি চেষ্টায় পাওয়া যায় না।

ষড়দর্শনের পণ্ডিতরা শাস্ত্রের সহজ অর্থ ত্যাগ করে ভগবন্তত্বকে জানুতে পারেন নি। তাঁদের সম্পর্কে ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে’ উক্ত হয়েছে,—

পরম-কারণ দেখ্বর কেহ নাহি মানে।

স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে।

তা'তে ছয় দর্শন হইতে তত্ত্ব নাহি জানি।

‘মহাজন’ যেই কহে সেই সত্য মানি ॥”

কাজেই জৈমিনী, অগ্নিবংশজ নিরীশ্বর কপিল, গৌতম, কণাদ, অষ্টাবক্র, পতঞ্জলি প্রভৃতি দার্শনিকদের মতামত নির্দোষ নয় তজ্জন্ম তাহা গ্রহণযোগ্য নহে; পরন্তু শাস্ত্রে বাদের ‘মহাজন’ বলে স্থির করেছেন তাঁদের প্রদর্শিত পথই নির্দোষ ও আমাদের অবশ্য গ্রহণীয়। ধর্মের পথ খুবই জটিল,—কোনটি সূপথ আর কোনটি কুপথ তাহা ধারণা করা খুবই কঠিন। ষাট হাজার ঋষিদের মনে চিন্তামল থাকার তাঁদের মত পৃথক্ পৃথক্ ছিল। মহাভারতের বনপর্বে কথিত হয়েছে,—“মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা”। এস্থলে ষাট-হাজার ঋষিদের ‘মহাজন’ বলা হয় নি। পারমাধিক রাজ্যে কেবলমাত্র দ্বাদশ মহাজনের উল্লেখ আছে। যথা,—

“ব্রহ্মসুনারদঃ শত্ৰুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।

প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলিবৈষ্ণামকিবর্যম ॥” (ভাঃ ৬।৩।২০।)

অর্থাৎ,—“ব্রহ্মা, নারদ, শিব, সনৎকুমার, দেবহুতিপুর কপিল, মনু, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব, প্রহ্লাদ ও বর্যম—এই দ্বাদশ মহাজন।”

উক্ত মহাজনগণ অপ্রাকৃত জ্ঞানে যে সৎ সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়েছেন, তাহাই শুদ্ধভক্তিমার্গ। তাঁদের আচার-বিচার সবই হরিসেবাময়। “ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ” —(ভাগবত), “ভক্তা মাম অভিজানাতি” —(গীতা) প্রভৃতি শাস্ত্র-বাণী অমূল্যে ভক্তিই একমাত্র পথ বলে নির্দেশিত হয়েছে।

ভক্তি শুদ্ধা ও বিদ্যা নামে দ্বিবিধ। শুদ্ধা ভক্তিই জীবের স্বরূপের বৃত্তি এবং তাহাই প্রকৃত ভক্তি-পদবাচ্য। ভক্তির বিষয় যখন বিফুতত্ত্ব-ব্যতীত অথ কিছু হয় তথা অন্য দেবতা স্বর্গাদি উচ্চমার্গ, ধর্মার্থকামমোক্ষ (নৈকৈতব পুরুষার্থ), অনিমাди সিক্তি, কৈবল্য প্রভৃতি উদ্দেশ্য করে, তখন সেই ভক্তি বিদ্যা হয়। বিদ্যাভক্তিকে ভক্তি বলা যায় না। কেন না বিদ্যা ভক্তিতে ভুক্তি ও মুক্তি স্পষ্টা বিভ্রম। হৃদয়ে ভুক্তি ও মুক্তি-বাঞ্ছা থাকাকালীন শুদ্ধাভক্তি-স্থলের উদয় হয় না।

“ভুক্তি-মুক্তি-আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।

সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥” —(১৫: ৫:)

শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ ‘শ্রীভক্তিসন্যাসতসিদ্ধিঃ’ গ্রন্থে লিখেছেন,—

“ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ নিশাচী হৃদি বর্ততে ।

তাবৎ ভক্তি সুখস্রোতঃ কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥”

অর্থাৎ,—“ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারূপ নিশাচী যতদিন হৃদয়ে বর্তমান থাকে ততদিন তথায় ভক্তি সুখের অভ্যুদয় কিরূপে হবে? অর্থাৎ ভক্তি অভিলাষের আবরক ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসা হৃদয়ে বর্তমান থাকলে তথায় ভক্তিসুখ উদ্ভিত হ’তে পারে না। ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা ভক্তিপথের অন্তরায়।” শ্রীভগবান্ কৃষ্ণকে প্রাপ্তির ও সেবার অভিলাষ না ক’রে স্ব-সুখ-কামনায় অল্প অভিলাষ ও কর্ম-জ্ঞানাদিতে আকৃষ্ট হ’য়ে বিদ্বাভক্তির আশ্রয় নিলে শুদ্ধভক্তির পথ থেকে দূরে সরে যেতে হয়। নিদ্বাভক্তি অভক্তিরই নামান্তর এবং তাহাই মায়া। শুদ্ধভক্তি ও মায়া পরস্পর বিরুদ্ধ; যেখানে শুদ্ধভক্তি সেখানে মায়া থাকতে পারে না। আবার যেখানে মায়া, সেখানে শুদ্ধভক্তি থাকেন না। আলো ও অন্ধকার কি কখনও একসাথে থাকতে পারে? কর্ম্মীগণের চরিত্র্যাম কীর্তন ও পঙ্কোপাসনা বাহ্য নিজেদের ও অপরের জড় সুখের উল্লাস কৃত হয়, তাহা মায়া বই আর কিছু নয়,— তাহাতে শুদ্ধভক্তি থাকতে পারে না। ভগবদপিত কৰ্ম্মাদিও শুদ্ধভক্তি পদবাচ্য নয়। কর্ম্মী মানুষ টাকা বোদগার ক’রে খুব ধনী হয়ে গেলে সে কি আর ধনার্জ্জনের জন্য পৃথিব্যে পরিশ্রম কর্তে ইচ্ছা করে? দিঘার্থী অনেক ডিগ্রী লাভ ক’রে মোট মাহিন্দর উচ্চ পদে চাকুরী পেয়ে গেলে আর কি বিদ্যার্জ্জনের উল্লাস যত্ন করে? যাজ্ঞিক যজ্ঞের ফল পেয়ে গেলে আর কি যজ্ঞের কষ্ট কর্তে রাজী হয়? যোগী অনিমাди কোন সিদ্ধি লাভ করলে আর কি যোগের পরিশ্রম তার ভাল লাগে? কিন্তু শুদ্ধভক্ত কোন অবস্থাতেই ভক্তিকে ছাড়তে পারে না; এমন কি ভগবানকে লাভ করেও নিত্যকাল আরও অধিকতর ভাবে ভগবৎসেবার নিয়োজিত থাকেন।

কর্ম্মী, জ্ঞানী, অছাভিলাষী প্রভৃতি সম্প্রদায়ী আত্মার উন্নতি সাধনে যত্নপর না হয়ে জড় স্থূল-সূক্ষ্ম উপায় নিয়েই বাস্তব থাকে। মায়িক উপায়ের দ্বারা কি মায়া থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব? কেহ কারাগার থেকে অসময়ে অছায-ভাবে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে যেমন তাঁকে পুনরায় বদ্ধ করে কারাগারে রেখে আরও কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়, তেমনি ঐ সব অন্তরূপের সম্প্রদায়ী সংসার থেকে পরিত্রাণের জায়া উপায় শুদ্ধভক্তিমার্গ অবলম্বন না করে নানা-

প্রকার ক্রেশ সঙ্কল্পে বাধ্য হয় ও আত্মবাহী হয়ে পড়ে। শুদ্ধভক্তি আশ্রয় না নিয়ে ভগবানকে পাবার জন্য যে কোন অপচেষ্টা যেমন নিষ্ফল হয়, তেমনি আবার শুদ্ধভক্তির বাধ্যস্বরূপ হয়। অভক্তি না বিদ্বাভক্তি এবং বিদ্বাভক্তির আশ্রিত মোক্ষাদি বাঞ্ছা—শুদ্ধভক্তির প্রতিবন্ধক।

“অজ্ঞানতমের নাম কতিয়ে কৈতব।

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব ॥

তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।

যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অসুদীর্ঘ ॥

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাসুভ কর্ম।

সেহ এক জীবের অজ্ঞানতম ধর্ম ॥

যাহার প্রসাদে এই তম হয় নাশ।

তম নাশ করি করে তবুর প্রকাশ ॥

তত্ব বস্তু কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ।

নাম সঙ্কীর্ণতম সব আনন্দ স্বরূপ ॥” (চৈঃ চঃ)

শুদ্ধভক্তির দ্বারা তথাকথিত কর্ম্মা, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বুল-বুদ্ধ উপাধির নাশ হয় ও আত্মা পবিত্র হয়। আত্মারাম যোগিগণও শুদ্ধভক্তির আশ্রিত হ’লে আত্মারামত্ব ভেড়ে কৃষ্ণরামত্বে আকৃষ্ট হয়। ভগবৎপাদপদ্মের শরণাগত হয়ে ভক্তির অস্ত্র যত যত্ন করা হবে, ততই উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ পাবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

“ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরহস্ত চৈষ ত্রিক এককালঃ।

প্রপত্তমানসো যথাক্রমঃ স্যাস্তষ্টিঃ পুষ্টিঃ সূদপারোহনুবাসম্ ॥”

(ভাঃ ১১।২।৪২)

অর্থাৎ,—“ভোজনকারী পুরুষের প্রতিগ্রাসেই যেকোন তুষ্টি, উদরপূরণ এবং সুখা-নিবৃত্তিরূপ কার্যাত্মক একসঙ্গে ঘটে থাকে, সেইরূপ শরণাগত পুরুষের ভক্তমকালে একসঙ্গেই প্রেমলক্ষণা ভক্তি, প্রেমাস্পদ ভগবৎ-স্বরূপ-সুষ্টি এবং ইতর বিষয়-বৈরাগ্যরূপ ভাবাত্মক অনুভূত হয়।

ভক্তি গুণাতীত ও এইজন্য তার ধ্বংস নাই। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি শেষ পর্য্যন্ত যথায় যত্ন নাই হ’লে ফল হয় না। ভক্তি অঙ্গহীন হলেও বা তল্ল কৃত হলেও তাহা ব্যর্থ হয় না। অর্থাৎ, ভক্তির কি অপূর্ণ মতিমা! শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ভবকে বলেছেন,—

“নহ্যসোপক্রমে ধ্বংসো মদ্বর্গস্তোদ্ধবোধপি ।

ময়া বাবসিতঃ সমাঙ্ নিঙ্গনত্বাদনাশিষঃ ॥”

(ভাঃ ১১।২৩।২০)

অর্থাৎ,—“হে উদ্ধব, তত্ত্ব অগ্ন্যাদি করলেও নিঙ্গন বলে কদাপি তাহা ধ্বংস বা বার্থ্য্য ত’ হয়ই না, উপরন্তু তাহা পূর্ণকল দান করে থাকে ।”
গীতাতে উক্ত হয়েছে,—

“নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিজ্ঞতে ।

বল্লমপ্যস্তা ধর্ম্যস্য ত্রাহতে মহতো ভয়াৎ ॥” (গীতা ২।৪০)

অর্থাৎ,—“এই ভক্তিয়োগে অহুষ্ঠান আবৃত্তি নাত্রেয় নিষ্ফলতা নেই বা ইহাতে প্রত্যবায়ও নেই । ইহার অল্প অহুষ্ঠানও অহুষ্ঠান-কারীর সংসাররূপ মহাভয় হ’তে ত্যাগ করে থাকে ।”

শুদ্ধভক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শাস্ত্র-বাক্য, যথা;—

“ক্লেশগ্রী শুভদা মোক্ষলঘুতাকুৎ সত্বজ্ঞতা ।

সাম্প্রানন্দ বিশেষায়্যা শ্রীকৃষ্ণাধিপে চ সা ॥”

(ভঃ ২ঃ সিঃ পুঃ লঃ ১।১৭)

অর্থাৎ,—ভক্তি (১) ক্লেশগ্রী বা পাপ, পাপবীজ ও অবিচাররূপ সর্বপ্রকার ক্লেশনাশিনী, (২) শুভদা বা সর্বমঙ্গলদায়িনী, (৩) মোক্ষলঘুতাকুৎ তথা ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয় তুচ্ছবুদ্ধিকারিণী, (৪) সত্বজ্ঞতা তথা বহু সাধনেও অত্যন্ত তুচ্ছতা, (৫) সাম্প্রানন্দবিশেষায়্যা বা সুগাঢ়-আনন্দধরূপ, (৬) শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী তথা প্রিয়বর্গ সহিত শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণী ।

ভক্তির উক্ত হয় প্রকার বৈশিষ্ট্য ও চমৎকারিতা থাকায় ভক্তিই সমস্ত সাধনের মধ্যে উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ । শুদ্ধভক্তির অপর নাম উত্তমভক্তি । উত্তমভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ লিখেছেন,—

“অন্যভিলাষত্যাগঃ জ্ঞান-কর্ম্মাভিনাবৃত্তম্ ।

আহুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলঃ ভক্তিরত্তমা ॥”

অর্থাৎ,—“অন্য অভিলাষ-শূন্যতা, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান বা নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, যোগ, তপস্বী প্রভৃতি দ্বারা অনাবৃত এবং অহুকুল্যভাবে কৃষ্ণের অনুশীলনই উত্তম ভক্তি । (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিন্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

শ্রীশীতার নন্দাবলী

চতুর্দশ অধ্যায়

[গুণত্রয়-বিভাগযোগ]

(পূর্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪০ পৃষ্ঠার পর)

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—৫)

(শ্লোক-সংখ্যা : ৫—১০)

লভিয়া যে মহাজ্ঞান

মাহুয়ের সাথে রয়ে

সাধু সন্তজন ।

সত্ব, রজ, তম ।

পাইয়াছে মোক্ষধাম

ফিরিতেছে সাথে সাথে

পরম উত্তম ॥১॥

যেন ছায়া সম ॥৭॥

সেইসব ব্রহ্মবাণী

কভু পায় তম বুদ্ধি

কহিলেন কৃষ্ণ ।

নহে সত্ব রজ ।

ব্রহ্মজ্ঞান মহাজ্ঞান

সত্ব কভু বুদ্ধিপ্রাপ্ত

অর্জুনের কৃত্য ॥২॥

অন্তেরা নিস্তেজ ॥৮॥

প্রলয়ের বিভীষিকা

কভু রজ বুদ্ধিপ্রাপ্ত

হয় ত্রিয়মান ।

হয় সত্বহীন ।

ভবজ্বালা দূরে যায়

এইরূপে ত্রাস বুদ্ধি

পায় পরিত্রাণ ॥৩॥

চলে চিরদিন ॥৯॥

সৃষ্টির মূলেতে তিনি

সত্বগুণ সুনির্মল

প্রভু বিশ্বপিতা ।

সদা প্রফুল্লিত ।

প্রকৃতি হন জননী

দেহাতীত সুখ তাহে

জীবের খারিকা ॥৪॥

আনন্দে বর্জিত ॥১০॥

দেবতা মানব আদি

রজোগুণী করে আশা

যাহা দৃশ্যমান ।

তীব্র অভিলাষ ।

অপর প্রকৃতি ক্রোড়ে

কর্ম্যে রয়ে দাস্তিকতা

পায় সবে স্থান ॥৫॥

অতৃপ্ত প্রয়াস ॥১১॥

সত্ব, রজ, তমগুণ

তমগুণী অবিবেকী

প্রকৃতি আশ্রিত ।

রহয়ে বিমর্ষে ।

আবদ্ধ করয়ে তাহা

কর্ম্য না করিতে চাহে

জীব অগণিত ॥৬॥

কাটায় আলস্যে ॥১২॥

রজোগুণী সদা বাস্ত
 সত্ত্ব প্রসন্নিত ।
 তমোগুণী ভ্রান্তিযুক্ত
 আলম্বে ব্যস্ত ॥১৩॥
 (শ্লোক-সংখ্যা : ১১—১৩)
 কহিলেন জনার্দন
 করি বিশ্লেষণ ।
 সত্ত্ব রজ তমোগুণে
 যে-সব লক্ষণ ॥১৪॥
 অন্তর বাহির যবে
 হয় পুলকিত ।
 জানিবেক সেইক্ষণ
 সত্ত্বগুণে স্থিত ॥১৫॥
 পরজব্য গ্রহণেতে
 হয় যবে লোভ ।
 যত পায় তত চায়
 রহে মনে ক্ষোভ ॥১৬॥
 সর্বদা অশান্ত রহে
 কর্মে সদা বাস্ত ।
 রজোগুণে অবস্থানে
 ইহা পরিদৃষ্ট ॥১৭॥
 তমোগুণে আচ্ছাদিলে
 হয় বুদ্ধিনাশ ।
 কর্ম না করিতে চাহে
 অকর্মে প্রয়াস ॥১৮॥
 (শ্লোক-সংখ্যা : ১৪—১৮)
 সত্ত্বগুণী যায় যবে
 ছাড়ি ইহ ধাম ।

শ্রীচরণে পায় ঠাই
 রমণীয় স্থান ॥১৯॥
 রজোগুণী তমোগুণী
 মুক্তি নাহি পায় ।
 মরণের পরে তাই
 আসে এই ধরায় ॥২০॥
 রজোগুণী জন্ম হয়
 কর্ম কোলাহলে ।
 বন্ধনে আবদ্ধ হয়
 রহে সেইস্থলে ॥২১॥
 তমোগুণী জন্ম লয়
 মোহময় পক্ষে ।
 নতুবা আরও নীচে
 পশুপক্ষী অক্ষে ॥২২॥
 (শ্লোক-সংখ্যা : ১৬—২০)
 সত্ত্বগুণী জ্ঞানবান
 রজোগুণী লোভী ।
 তমোগুণী মোহাচ্ছন্ন
 জ্ঞানের বিরোধী ॥২৩॥
 সত্ত্বগুণী উর্দ্ধগামী
 গুণমধ্যে শ্রেষ্ঠ ।
 রজোগুণী মধ্যগামী
 তমো যে নিকৃষ্ট ॥২৪॥
 ত্রিগুণে করেছে কর্ম
 আত্মা ধীর শাস্ত ।
 জানে তত্ত্বজনে
 ইহার বৃত্তান্ত ॥২৫॥

আত্মার স্বরূপ যবে
হয় উপলব্ধি ।
গুণত্রয়ে হয় মুক্ত
ব্যক্তি হয় স্তব্ধ ॥২৬॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ২১—২৫)

জিজ্ঞাসেন ধনজন
কৃষ্ণ জনার্দন ।
গুণাতীতের লক্ষণ
জানিব কেমনে ॥২৭॥

কহিলেন জনার্দন
যতেক লক্ষণ ।
পার্থ তাহা মন দিয়া
করিল শ্রবণ ॥২৮॥

ত্রিগুণ প্রভাবে কর্ম
হয় অহুমৃত ।
এই জন্ম উদাসীন
রহে গুণাতীত ॥২৯॥

মুক্তিকা প্রসূর স্বর্ণ
ভাবে সমতুল্য ।

সুখ দুঃখে সমভাব
রহয়ে প্রফুল্ল ॥৩০॥
গুণাতীত অচঞ্চল
নিন্দা অপমান ।
শত্রু মিত্র ভেদ মিছা
বৃথা বলি জানে ॥৩১॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৬—২৭)
যেইজন অতিক্রম
সত্ত্ব, রজ, তম ।
মোক্ষধাম হয় প্রাপ্তি
সে-ধাম উত্তম ॥৩২॥

অমৃত স্বরূপ ব্রহ্ম
ধর্ম্য সনাতন ।
নির্মল আনন্দ লভে
সেই গুণীজন ॥৩৩॥

লভিবারে শ্রীচরণ
চাহি শুদ্ধভক্তি ।
সেই ভক্ত লভে তবে
কৃষ্ণপ্রেম-রক্তি ॥৩৪॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল

দেবাসুর

দৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ।

বিষ্ণু-ভক্তঃ স্মৃতৌ দৈব আসুরস্তদ্ বিপর্যায়ঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

এই লোকে দৈব ও আসুর স্বভাব-বিশিষ্ট দুই প্রকার জীব দৃষ্ট-হইয়া থাকে। যাহারা বিষ্ণুভক্ত তাহারা দৈব এবং যাহারা বিষ্ণু-বিরোধী তাহারা অসুর শ্রেণীভুক্ত। এই অসুরগণের শ্রেণী বিভাগ করিতে গেলে বহু প্রকার পরিলক্ষিত হয়। যাহারা শুধু শক্তিমান্ কৃষ্ণকে মানেন এবং শক্তিকে মানেন না, তাঁরা এক শ্রেণীর অসুর যারা শুধু শক্তি স্বীকার করিয়া শক্তিমানকে

অস্বীকার করেন তাঁরা আর এক প্রকার অসুর। আমরা রাম অবতারে লক্ষ্য করি রাবণ শ্রীরামচন্দ্রকে জীবিত রাখিয়া তাঁর শক্তি সীতাকে হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য সে অসুর আখ্যা লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণকালে দেখা যায় কংস শক্তিগণকে রাখিয়া শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণকেই ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছে। শক্তি থাকে থাকুক তাতে ক্ষতি নাই, শক্তিমানকে শেষ করিতে পারিলেই তাহার কার্য্য সিদ্ধি। সুতরাং কংসকেও অসুর আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ ‘কেবল শক্তি অস্বীকার করিয়া শক্তিকে বাদ দেওয়া’ এবং ‘কেবল শক্তিমানকে স্বীকার করিয়া শক্তিকে বাদ দেওয়া’ এই উভয়ই আসুরিক চিন্তাস্রোত।

বাহারা শক্তি ও শক্তিমানকে অভেদ জানিয়া বৃগল রাধা-কৃষ্ণের উপাসনা করেন তাঁহারা ই দৈবশ্রেনীভুক্ত। যেহেতু বিষ্ণু কখনও তাঁর শক্তি রহিত হইয়া অবস্থান করেন না।

বিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্তগণের প্রতি অসুরগণের চিরকালই বৈরী-ভাব লক্ষ্য করা যায়। অসুরগণের উদ্দেশ্য ভগবানকে এই জগৎ হইতে উচ্ছেদ করিয়া দেওয়া। যদি ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়, তাহলে তাহারা ভগবানের ভোগ্য বস্তুগুলি ঘোলআনা ভোগ করিতে পারিবে। তাহারা মনে করে—আমাদের আসুরিক খাণ্ড ত আছে, আরও কিছু সাম্প্রিক বিষ্ণু-ভোগ্যদ্রব্য পাইলেও ভাল হয়। আমরা নানাবিধ ফন্দি-ফিকির আটিয়া, ছলনার আলসৃষ্টি করিয়া জগতের লোককে বঞ্চনা করিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে পারিব। ইহাই প্রকৃত আসুরিক চিন্তা। লোকের বিষয় এই যে—রাবণের গৃহদেবতা শ্রীচণ্ডিকা দেবী (শক্তি), রাবণ তাঁহার উপাসনা করিতেন। সেই চণ্ডিকাদেবী ভগবান্ রামচন্দ্র ও তাঁর ভক্তগণের প্রতি রাবণের দুর্ব্ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া রাবণকে পরিত্যাগ করিয়া লঙ্কা হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং ভক্ত ও ভগবানকে বাদ দিলে কোনও দেবতাই কোন পূজা গ্রহণ করেন না, বা সেখানে কোন দেবতা স্থায়ী ভাবে অবস্থানও করেন না। অসুরগণের মধ্যে প্রায় সকলেই শক্তিপূজা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের পরিণাম দেখা যায় সেই শক্তিমাতা নিস্তারিণী কুপিতা হইয়া বিষ্ণুবৈষ্ণবের-বিদ্বৈষকারী অসুরগণকে বিনাশ করিয়া দেবতা ও বৈষ্ণবগণকেই রক্ষা করিয়া থাকেন। নিস্তারিণী দেবতাগণের পক্ষই অবস্থান করেন—অসুরের দ্বারা পূজিতা হইলেও তাহাদের পক্ষে থাকেন না। যেহেতু তাহারা শক্তি-শক্তিমানকে অভেদ জ্ঞান

আত্মার স্বরূপ যবে
হয় উপলব্ধি ।

গুণত্রয়ে হয় মুক্ত
ব্যক্তি হয় শুদ্ধ ॥২৬॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২১—২৫)

জিজ্ঞাসেন ধনজন
কৃষ্ণ জনার্দন ।

গুণাতীতের লক্ষণ
জানিব কেমনে ॥২৭॥

কহিলেন জনার্দন
যতেক লক্ষণ ।

পার্থ তাহা মন দিয়া
করিল শ্রবণ ॥২৮॥

ত্রিগুণ প্রভাবে কৰ্ম্ম
হয় অনুসৃত ।

এই জন্ম উদাসীন
রহে গুণাতীত ॥২৯॥

মৃত্তিকা প্রস্থর স্বর্ণ
ভাবে সমতুল্য ।

সুখ দুঃখে সমভাব
রহয়ে প্রফুল্ল ॥৩০॥

গুণাতীত অচঞ্চল
নিন্দা অপমান ।

শত্রু মিত্র ভেদ মিছা

বৃথা বলি জানে ॥৩১॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৬—২৭)

যেইজন অতিক্রম
সত্ত্ব, রজ, তম ।

মোক্ষধাম হয় প্রাপ্তি
সে-ধাম উত্তম ॥৩২॥

অমৃত স্বরূপ ব্রহ্ম
ধৰ্ম্ম সনাতন ।

নির্মল আনন্দ লভে
সেই গুণীজন ॥৩৩॥

লভিবারে শ্রীচরণ
চাহি শুদ্ধভক্তি ।

সেই ভক্ত লভে তবে
কৃষ্ণপ্রেম-রতি ॥৩৪॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল

দেবাসুর

যৌ ভূতনর্গো লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ।

বিষ্ণু-ভক্তঃ স্তুতো দৈব আসুরস্তদ্ বিপর্যায়ঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

এই লোকে দৈব ও আসুর স্বভাব-বিশিষ্ট দুই প্রকার জীব দৃষ্ট-হইয়া থাকে। যাহারা বিষ্ণুভক্ত তাহারা দৈব এবং যাহারা বিষ্ণু-বিরোধী তাহারা আসুর শ্রেণীভুক্ত। এই আসুরগণের শ্রেণী বিভাগ করিতে গেলে বহু প্রকার পরিলক্ষিত হয়। যাহারা শুধু শক্তিমান কৃষ্ণকে মানেন এবং শক্তিকে মানেন না, তাঁরা এক শ্রেণীর অসুর যারা শুধু শক্তি স্বীকার করিয়া শক্তিমানকে

প্রবেশ করিল এবং কতকগুলি লোকের ভিতরে নানা প্রকার নাস্তিক চিন্তা অধিকার লাভ করিল। এক চতুর্থাংশ লোক আসুরিক ভাবাপন্ন হইল। এই প্রকার সমাজের ভিতর পাণ্ডু প্রবেশ করায় শস্ত্রাদি আর সেট ভাবে উৎপত্তি না হওয়ায় খাড়াদির অভাবও কিছু কিছু আবস্ত হইতে লাগিল। ধান-ধারণা করিবার মেধা, শক্তি ও পরমায়ু প্রভৃতি কিছুটা কমিয়া গেল। ধানের অযোগ্যতায় তখন যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বর বিশ্বর পূজা ও আহুতি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেই কালের সমাজের শ্রেষ্ঠ যতাপুরুষ মুনি-ঋষিরূপ ভগবৎ প্রেরণার দ্বারা লোকের ক্রটি পরীক্ষা করিয়া, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারিবর্ণের বিভাগ আরম্ভ করিলেন। এই বর্ণ বিভাগ দ্বারায় যুগেই পূর্ণতা লাভ করে। কহা বলিলেন,—‘চাতুৰ্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকৰ্ম্ম-বিভাগশঃ।’ দ্বাপরে ত্রিপাদ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে সমাজকে নানা প্রকার ক্রিয়া ও স্বভাবের সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণের যজ্ঞন, যাজ্ঞন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি—ক্ষত্রিয়ের রাজকাৰ্য্য প্রভা পালন এবং ব্রাহ্মণের ধর্ম ও যজ্ঞ নষ্টকারী অসুর প্রকৃতির লোকগুলি হইতে তাহাদিগকে ও দেশকে রক্ষা করা; বৈশ্যের—কৃষি, বাণিজ্য, গো-রক্ষা; শূদ্রের ত্রিবর্ণের সেবা করাট স্বাভাবিক কৃত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। সেই কালে মুনি, ঋষি, ব্রাহ্মণ, সজ্জনগণ এই এক হংস বর্ণ হইতে যাহাদের ব্রাহ্মণোচিত গুণ ছিল তাঁহাকে ব্রাহ্মণ, যাহার ক্ষত্রিয়োচিত গুণ ছিল তাঁহাকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগুণসম্পন্ন লোকগণকে বৈশ্য এবং শূদ্র গুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে শূদ্রবর্ণে চিহ্নিত করিলেন। তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ বর্ণে ও ভোগ্য বিষয়ে আসক্তিবশতঃ সেই প্রকার উপাসনায় মগ্ন হইলেন। তখন নিজ বর্ণে প্রীতিবশতঃ শৌক্য অভিমান প্রবল হওয়ায় এবং গুণগত অভিমান পরিত্যাগ করায় ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পুত্র বৈশ্য এবং শূদ্রের পুত্র শূদ্র—এই ভাবে আসুরিক বর্ণে আসক্ত হইয়া দৈববর্ণ ক্রমশঃ উঠাইয়া দিল। গুণের আদর আর রহিল না। ব্রাহ্মণের পুত্র শূদ্রের আহার গ্রহণ ও শূদ্রের কর্ম করিলেও ব্রাহ্মণ থাকিবেন; শূদ্রের পুত্র ব্রাহ্মণ গুণসম্পন্ন হইলেও শূদ্রই থাকিবেন—এই প্রকার আসুরিক বর্ণস্রোত ক্রমশঃ চলিতে লাগিল। পরে কলিযুগ আসিয়া উপস্থিত হইলে ত্রিপাদ ধর্ম লুপ্ত হইয়া কেবলমাত্র দান ধর্মরূপ একপাদ ধর্ম বর্তমান রহিল। তখন এক ভাগ দৈব-ভাবাপন্ন লোক, বাকি তিন ভাগ আসুরিক হইল। তাই অসুরের উৎপত্তি ও পাপভারে মাতা

বসুমতী শুকাইয়া পড়িয়াছেন। ক্ষেত্রে শস্ত নাই, বৃক্ষের ফল নাই, গাভীর দুগ্ধ নাই, নদীতে জলাভাব, দেবতার। কষ্ট হওয়ায় অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি এবং শীত ও উত্তাপাদি নানা প্রকার অসুবিধা আরম্ভ হইল। এই কলিকালে জীব-সমূহ নানাভাবে অভাবগ্রস্ত, অল্পাঙ্গু, হীনবীৰ্য্য এবং নানা ভাবে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় ধানে অযোগ্য, যাগ-যজ্ঞে অযোগ্য, পূজা অর্চনে অযোগ্য—এই প্রকার নানা অযোগ্যতায় পরিপূর্ণ ও দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং আঙ্গুরিক চিন্তা ও ধারা পরিপূর্ণ হইয়াছে।

এই কলিযুগে হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তনের দ্বারা ভগবানের কৃপা লাভ করা যায়—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

ইহাই কলিযুগের উদ্ধারের মহামন্ত্র।

কৃষ্ণে যজ্ঞায়তো বিষ্ণুং ত্রেতারায় যবতো মৰীচঃ।

দ্বাপরে পরিচর্য্যায় কলৌ তদঙ্গরিকীৰ্ত্তনাং।

সত্য যুগে ধান, ত্রেতারায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চন, কলিতে হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তনের কথা শাস্ত্রকারগণ উপদেশ করিয়াছেন।

কলেন্দোষনিধে রাজমস্তিহ্নেকো মহান্ গুণঃ।

কীৰ্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্ত মুক্ত সঙ্গ পরং ব্রজেন ॥

কলি সমস্ত দোষের আকর হইলেও কলিকালের একটি মহৎ গুণ আছে, তাহা কেবলমাত্র কৃষ্ণ-কীৰ্ত্তনের দ্বারাই জীব মুক্ত হইয়া পরা ভক্তি লাভ করেন। তাই কলিযুগে অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন ক্রীশীগৌরহরি কলি-সমস্ত জীব-গণের উদ্ধার করিবার জন্ত আপনি আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। অঙ্গুরগণ চিরকালেই বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবের প্রতি আক্রমণশীল। কলি যুগের প্রভাবে আঙ্গুরিক চিন্তা-স্রোত প্রবল হওয়ায় তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া দৈব-ভাবাগ্নর লোকসমূহকে কোণঠাসা করিবার চেষ্টায় আছে। সুতরাং কল্কিদেব আদিয়া এইসব দুৰ্দ্ধৃত্তকে সংহার না করা পর্য্যন্ত ইহাদের উৎপাত কমিবার নয়।

য়েচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।

ধুমকেতুমিব কিমপি করালম্ ॥

কেশব ধৃতকঙ্কিশরীর জয় অগদীশ হরে।

হে কল্কিরূপ ধর কেশব। হে জগদীশ, হে হরে, আপনি জয় যুক্ত হউন। আপনি ত্রেচ্ছগণের সংহারকার্যে ধুমকেতুর স্থায় ভয়ঙ্কর ও বিচিত্র খড়্গ ধারণ করিয়াছেন।

যদা যদা হি ধর্মশ্চ লানির্ভবতি ভারত।

অতুখানমধর্মশ্চ তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ তুচ্ছতাম্।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তবামি যুগে যুগে ॥

যখন যখন ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি আবির্ভূত হই। সাধুদিগের রক্ষার জন্ত, দুর্কর্মপরায়ণগণের বিনাশ জন্ত এবং ধর্মস্থাপনের জন্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। যখন পৃথিবী অত্যধিক পাপে পরিপূর্ণ হয়, পুংসার নানা প্রকার পাপিষ্ট অশুভবৃত্তির লোকদ্বারা ভারাক্রান্ত হয়, তখন ভূভারহারা ভগবান্ এই ভারাক্রান্ত পৃথিবী হইতে ভূভার হরণ করেন। যুগধর্ম প্রবর্তন ভগবদ্ অংশের দ্বারা হইতে পারে, কিন্তু ব্রজের নির্মল প্রেম সম্পত্তি স্বয়ং ভগবান্ ছাড়া অজ্ঞ কেহ দিতে পারে না। তাই ভগবান্ কনক ও নিজে আসিয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-পদ দান করেন, যখনই এই প্রকার ভগবান্ বা তাঁর শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ এই ভূভার হরণ কার্য আরম্ভ করেন, সেই সময় দেখা যায়, ঐ প্রকার আত্মরিক বৃত্তির রাক্ষসগুলি প্রমাদ গম্বিতে থাকে। পাছে তাহাদের বহু দিনের মকিত ভোগগৃহটি ধ্বংস হইয়া যায়, এই চিন্তায় তাহাদের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। তাঁহার ঐ মহাপুরুষের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত বহু প্রকার চলনার জাল সৃষ্টি করিয়াও বিফল মনোরথ হইয়া থাকে। যখন ভগবৎ প্রেরিত কোন মহাপুরুষ এই জগতে আসিয়া বৈকুণ্ঠের চেতন বাণী প্রচার করিতে থাকেন, তখন ঐ বৃত্তির লোকগুলি তাঁহাকে নানাভাবে উৎপীড়ন করিয়া ভয় দেখাটয়া মুখবন্ধ কবিবার চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু তাঁহাতে ও ঐ মহাপুরুষের মুখবন্ধ না হওয়ায় তখন প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করিতে থাকে।

মোটের উপর আত্মরিক বাস্তব ও দৈব বৃত্তির পার্থক্য এই—দৈব ভাবাপন্ন ব্যক্তিকল সর্বশক্তিমান্ পূর্ণ ভগবান্ বিষ্ণু ও তাঁর শক্তির উপাসনা করিয়া থাকে। এবং বিষ্ণুকেই সর্ব-দেবেশ্বর বলিয়া জানেন। আত্মরিক বৃত্তির লোকগুলি ভগবান্ বিষ্ণু হইতে শক্তিকে খণ্ডিত করিয়া তাঁহার পৃথক্ সত্তা স্বীকার করে ও অংশস্বরূপ দেবতাগণকে পৃথক্ ভগবান্ মনে করিয়া বিষ্ণুর সহিত সমান জ্ঞান করে। ইহারা স্বাধীন শ্রেণীভুক্ত। শক্তির উপাসকগণ

শক্তিমান হইতে শক্তিকে পৃথক্ করিয়া পূজার অভিনয় করিয়া সাধক অবস্থায় তাঁহাকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিলেও পরিণামে শিব হইয়া তাঁহার শক্তিকে কামরূপে কল্পনা করে। মূলে ভোগবাসনার চরিতার্থতাই লক্ষ্য করা যায়। “পাশবন্ধো ভবেদজীবঃ পাশমুক্তো ভবেৎ শিবঃ”। এই প্রকারে বাহ্যতঃ মাতৃভক্তির চেষ্টা দেখাইলেও উহা একটা ভোগবৃত্তি পূর্ণরূপে চালাইবার একটি বিরাট কন্দি-ফিকির মাত্র। তাই মা স্নেহপরবশ হইয়া গলায় অর্ঘ্যের খাঁড়া দিয়া বিষ্ণু হইতে শক্তিকে খণ্ডনকারী অক্ষরগুলির মুণ্ড ছেদন করিয়া মুণ্ডমালা ধারণ করিয়া থাকেন। তজ্জন্ম দেবীর মুণ্ডমালায় ত্রিপুণ্ড্রধারীদের মুণ্ড দর্শন করা যায়, ইহাই অক্ষরগণের পরম গতি। অতরাং দৈব-বলের সহিত অক্ষরগণ চিরকাল পরাজিত। এই অক্ষরগণের উৎপাতে স্বর্গের দেবতারূপ পর্য্যন্ত স্বর্গ ছাড়িয়া ক্ষীরসাগরের তীরে গিয়া বিষ্ণুর অবতারগণের অগ্ন্য তপস্তা করিয়া থাকেন। ভূভারহারী ভগবান্ বিষ্ণু আসিয়া চিরকাল ভক্তের রক্ষা ও অক্ষর-মিগ্রহ করিয়া থাকেন।

— ত্রিদশিস্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ

যুগধর্ম

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবের নিত্যসিদ্ধ পার্শ্বদ ষড়্গোস্থামীর অনুভূতম শ্রীশ্রীল জীবগোস্থামিপাদ-কৃত শ্রীতি-সম্বর্ত-পাঠে আমরা জানিতে পারি,— সুখই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। একজন্ম সকলেই সুখ চায়। কিন্তু আমরা সুখ লাভের উপায় জানি না বলিয়া প্রকৃত সুখ পাই না। এই প্রকৃত সুখ কি করিয়া লাভ করবে? ইহার উত্তরে শাস্ত্র বলেন,—যেখানে ধর্ম, সেখানেই সুখ। যেখানে ধর্ম নাট, সেখানে সুখ থাকিতে পারে না। এখন প্রশ্ন,— ধর্মের মূল বা উৎপত্তি-স্থান কোথায়? এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে জগদগুরু শ্রীনারদ গোস্থামী বলিতেছেন—

ধর্মমূলং হি ভগবান্ সর্ববেদময়ো করিঃ।

স্বতন্ত্র তদ্বিধাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি ॥ (ভাঃ ১।১১।৭)

সর্ববেদময় ভগবান্ শ্রীহরিই ধর্মের মূল বা উৎপত্তি-স্থান। সেই শ্রীহরির সেবা-দ্বারাই আত্মা প্রসন্ন অর্থাৎ জীব সুখী হইয়া থাকে।

ভগবৎ-পার্বদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—
 “ধর্মস্য মূলং কারণং প্রমাণঞ্চ হি নিশ্চিতং ভগবানেব যতঃ সর্ববেদেতি ।
 তত্ত্বজ্ঞা বিনা ধর্মো নৈব সিদ্ধান্তীতি ভাবঃ । ভক্তিরহিতো ধর্মস্তু গ্রাহ্য এব । তে
 “ক্রতি-স্বৃতি-সদাচারঃ স্বস্ত চ প্রিয়মানস । সম্যক্ সঙ্কল্পঃ কামো ধর্মমূল-
 মিদং স্মৃতম্ ॥” ইতি যাজ্ঞবল্ক্যোক্তেঃ, “বেদোহিখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলো চ
 তদ্বিদাং । অচারণ্যচাপি সাধুনাগান্ননস্তপ্তিবৈব চ ॥” ইতি মনুভূক্তেরপি সকাশাৎ
 ধর্মমূলং হি ভগবানিতি নারদোক্তিরেব শ্রেয়সী । যতুজ্ঞং নারসিংহে—
 “সনকাদযো নিবৃত্তাখো তে চ ধর্মো নিয়োজিতাঃ । প্রবৃত্তাখো মরীচাত্মা
 মূর্ত্তেকাং নারদং মুনিম্ ॥” ইতি নারদশৈব তেভ্য উভয়েভ্যঃ শ্রেষ্ঠং সর্বধর্ম-
 সারবিজ্ঞত্বঞ্চ ধ্বনিতম্ ।

শ্রীহরিশ্রী ধর্মের উৎপত্তি-স্থান বা জন্মদাতা বলিয়া যেখানে হরি, সেখানেই
 ধর্ম, সেখানেই স্বর্গ । ‘এ’ তিনটি এক সজ্জই থাকিবে । একটিকে বাদ দিয়া
 আর একটি থাকিতে পারে না । অতরাং যেখানে ভগবান্ বা ভগবৎ-সম্পর্ক
 বা ভগবৎসম্ভাব-বিধান নাই, সেখানে প্রকৃত ধর্মও নাই, মঙ্গল বা সুখও নাই ।
 তাই পংমহৎসকুল-চূড়ামণি শুকদেব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

তপস্বিনো দানশ্রী যশস্বিনো, মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ ।

ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং, তস্মৈ স্তম্ভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ।

(ভাঃ ২।৪।১৭)

তপস্বী, দানী, যশস্বী, যোগী, বেদজ্ঞ এবং সদাচার-পরায়ণ কেহই স্তম্ভদ্রশ্রব
 শ্রীহরির পাদপদ্মে স্ব-স্ব কর্ম সমর্পণ না করিয়া অর্থাৎ তৎসম্পর্ক-রহিত হইয়া
 মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হন না—স্বর্গী হইতে পারেন না ।

অগদগুরু শ্রীনারদের উক্তি তেও আমরা পাই—

নৈকর্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাব-বজ্জিতং, ন শোভতে জ্ঞানমগ্নং নিরঞ্জনম্ ।

কৃতঃ পুনঃ শ্বশদভ্রমীশ্বরে, ন চাপিতং কর্ম যদপ্যকারণম্ ॥

(ভাঃ ১।৫।১২)

কর্ম-বালনাশূন্য নির্মূল জ্ঞানও যদি অচ্যুতভাব-বজ্জিত হয় অর্থাৎ হরিভক্তি-
 রহিত হয়, তাহা লইলে তাহা মঙ্গল দান করিতে সমর্থ হয় না । হরিভক্তি-
 রহিত জ্ঞানেই যখন এই অবস্থা, তখন নিকাম কর্ম বা সকাম কর্ম যে ভগবৎ-
 পাদপদ্মে অর্পিত না হইলে মঙ্গল দান করিতেই পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য ।
 অতএব বাহাতে বাদ দিলে ধর্ম, মঙ্গল বা সুখ বলিয়া কিছুই থাকিতে পা

না, সেট নিত্যানন্দময় শ্রীহরির আরাধনাই প্রকৃত ধর্ম নহে কি ? শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র জগদ্বারাধনাই উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

শ্রুতিমাতা পৃষ্ঠা দিশতি জগদারাধন-বিধিং

যথা মাতুল্লীঙ্গী স্মৃতিরপি তথা ভক্তি ভগিনী।

পুরাণাচ্চা যে বা নহত্‌নিবহান্তে তদনুগা

অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানের শরণম্ ।

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭ ধৃত মুনিবাক্য)

মাতৃস্বরূপা শ্রুতি শ্রীভগবানের আরাধনাই উপদেশ করিতেছেন। স্মৃতি ভগিনীস্বরূপ হইয়া তাহাই উপদেশ করেন; ভ্রাতৃস্বরূপ পুরাণাদি শাস্ত্রও শ্রুতিমাতার অনুগত হইয়া সেই কথাই বলিতেছেন। অতএব মুরহর শ্রীহরিত সকলের শরণ অর্থাৎ আশ্রয়-স্থল।

সকলের একমাত্র আশ্রয় শ্রীহরির সেবা বাতীত যে কেহই অন্য উপায়ে নিত্যসুখ বা চিরশান্তি লাভ করিতে বা মৃত্যু জয় করিতে পারে না, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন—

তপস্ত ত্যাগৈঃ প্রপতন্ত পরিত্যজ্যততস্ত তীর্থানি পঠন্ত চাগমান্ ।

যজন্ত মাতৈর্বিবদন্ত বাদৈর্হরিং বিনা নৈব মূর্তিং তরন্তি ॥

(ভাঃ ১০।৮৭।২৭ ভাবার্থ-দীপিকা)

বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া তপস্তাই করুন, পরিত্যজ্যততস্ত হইতে পড়িয়া দেহত্যাগই করুন, বহু তীর্থ ভ্রমণই করুন, বেদসমূহ অধ্যয়নই করুন, বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানই করুন, তথাপি হরি-সেবা বাতীত কেহই সংসার-হুঃখ বা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না। গীতায় শ্রীভগবান্ এই কথাই বলিয়াছেন—

দেবী হোষা গুণময়ী মম মায়া ছরত্যায়া ।

মামেব যে প্রপদন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে । (গীতা ৭।১৪)

অনিত্যধর্মের অর্থাৎ পুণ্যে ফণিক সুখ, আর নিত্যধর্মের—পরমধর্মের নিত্যসুখ বা পরম-সুখ লাভ হয়। আমরা সকলে নিত্যসুখ অর্থাৎ অক্ষরসুখ স্বেচ্ছা ভিক্ষারী। অতএব নিত্যধর্ম বা পরমধর্মই আমাদের আচরণীয়। নিত্যানন্দময় পরমেশ্বর শ্রীহরির আরাধনাই যে পরমধর্ম, এ সম্বন্ধে মহাভারতে যুধিষ্ঠির-ভীষ্মসংবাদে আমরা জানিতে পারি—পিতামহ ভীষ্মের নিকট হইতে সমস্ত ধর্মের কথা শ্রবণ করিয়া ধর্মরাজ শ্রীযুধিষ্ঠির পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

কো ধর্মঃ সর্বধর্মাণাং ভদ্রতঃ পরমো মতঃ ? (বর্ণারোহণ পর্ব)

অর্থাৎ সমস্ত ধর্মের মধ্যে পরমধর্ম কি ? তদন্তরে শ্রীভীষ্মদেব বলিয়াছেন—

এষ মে সর্বধর্মাণাং পুণ্যোদ্ধিকতমো মতঃ ।

যন্তুজ্ঞা পুণ্ডরীকাকং তুবৈবর্চয়তঃ সদা ॥

তমেব চার্চয়ন্তি তাং ভক্ত্যা পুরুষমব্যয়ম্ ।

ধায়ন্তু বসমস্তাংশ্চ যজমানস্তমেব চ ॥ (বর্গারোহণ পর্ব)

অর্থাৎ কায়-মনোবাক্যে পুণ্ডরীকাক হরির পূজা-ধ্যান ও শুণ-কীর্তনরূপ ভক্তিই সমস্ত ধর্মের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ।

একসত্রে অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতও বলিতেছেন—

ন বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যযাত্মা প্রপ্রসাদতি ॥ (ভাঃ ১২।৬)

নিষ্কামা ভগবন্তুজ্ঞিহ মানবের পরম ধর্ম । এই ভগবন্তুজ্ঞিরূপ পরম-ধর্মের দ্বারাই জীব নিত্যসুখ লাভ করিতে পারে ।

এতাবানেব লোকেহস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্যঃ পরঃ স্মৃতঃ ।

ভক্তিযোগো ভগবতি তন্মামগ্রহণাদিভিঃ ॥ (ভাঃ ১২।২২)

শ্রীহরির নাম-কীর্তন শ্রুতি দ্বারা ভগবানের যে ভক্তিযোগ, তাহাই মানবের পরম ধর্ম ।

জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া পরম-করণাময় শ্রীভগবান্ স্বভক্তিরূপ পরমধর্ম প্রত্যেক যুগে একটি করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । যথা—

কৃতে যজ্ঞাঘতো বিযুৎ ত্রেতায়াং যজতো মথৈঃ ।

দ্বাপরে পরিচর্য্যামাং কলৌ তদ্ধারিকীর্তনাং ॥ (ভাঃ ১২।৩৫২)

ধায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহর্চয়ন্ ।

যদাপোতি তদাপোতি কলৌ সঙ্কীর্তা কেবলম্ ॥ (পদ্মপুরাণ)

সত্যযুগের ধর্ম কৃষ্ণের ধ্যান, ত্রেতাযুগের ধর্ম যজ্ঞ, দ্বাপরযুগের ধর্ম শ্রীহরির পূজা ও কলিযুগের ধর্ম শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্তন । অতএব অতীত যুগে তত্তদধর্ম পালনের দ্বারাই যে নিত্যসুখরূপ পরম ফল লাভ হইত, কলিযুগে যুগধর্ম শ্রীহরিনাম কীর্তন দ্বারাই তাহা লাভ হইবে ।

কলিযুগের ধর্ম—হরিনাম-সঙ্কীর্তন । সুতরাং ইহা কোন ব্যক্তি-বিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্ম হইতে পারে না । ইহা যুগবাসী প্রত্যেকেরই ধর্ম । বনী, আশ্রমী, পণ্ডিত, মুখ, ধনী, নির্ধন, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, যবন, খ্রীষ্টান্, ধার্মিক, অধার্মিক, কন্নী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত, অভক্ত, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব সকলেরই ধর্ম । এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

এতন্নির্বিকৃতমানানামিচ্ছতামকুতে'ভয়ম্ ।

যোগিনাং নৃপ নির্ণীত হরেন'নামাহকীৰ্ত্তনম্ ॥ (ভাঃ ২।১।১১)

শ্রীশ্রীল বিখ্যাত চক্রবর্ত্তিগাদ এই শ্লোকের টীকা বলিয়াছেন—

ভক্ত্যঙ্গেষু মধ্যে মহারাজ-চক্রবর্ত্তিবৎ কিমেকং মুখ্যত্বেন নির্ণীয়তে ? তত্রাহ—নামানুকীৰ্ত্তনম্ । সৰ্ব্বেষু ভক্ত্যঙ্গেষু মধ্যে শ্রবণ-কীৰ্ত্তন-স্মরণানি ত্রীণি মুখ্যানি । তেষু ত্রিষপি মধ্যে কীৰ্ত্তনম্ । কীৰ্ত্তনেহপি নাম-রূপ-গুণ-লীলা-সম্বন্ধিনি তন্নিম্ন নাম-কীৰ্ত্তনম্, তত্রাপি অনুকীৰ্ত্তনং স্বভক্ত্যানুরূপ নাম-কীৰ্ত্তনং নিরন্তর নাম-কীৰ্ত্তনং বা শ্রেষ্ঠং । নির্ণীতং পূৰ্ব্বাচার্য্যৈরপি, ন কেবলং ময়ৈবাবুনা নির্ণীয়তে । তেনাত্ৰ প্রমাণং ন প্রষ্টব্যমিতি ভাবঃ । কীদৃশম্ ? অকুতোভয়ম্ ; কাল-দেশ-পাত্রোপকরণাদিশুদ্ধাশুদ্ধি-গত-ভয়াভাবস্তা কা বার্ত্তা, ভগবৎসেবাদিকমসহমানা স্নেহা অপি যত্র নৈব বিপ্রতিপদ্যন্তে । কিঞ্চ, সাধকানাং সিদ্ধানাঞ্চ নাতঃ পরমধিকং শ্রেয় ইত্যাহ—নির্বিকৃতমানানামেকান্তভক্তানাং ইচ্ছতাং স্বৰ্গ-মোক্ষাদি-কামিনাং যোগিনামাত্মারামাণাঞ্চ এতদেব নির্ণীতম্ ।

সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে মহারাজ চক্রবর্ত্তীর ন্যায় কোনটী মুখ্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—নামানুকীৰ্ত্তন মুখ্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে । সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে 'শ্রবণ', 'কীৰ্ত্তন', ও 'স্মরণ'—এই তিনটী প্রধান । এ তিনটির মধ্যে 'কীৰ্ত্তন' প্রধান । নাম-রূপ-গুণ-লীলা সম্বন্ধীয় কীৰ্ত্তনের মধ্যে নাম-কীৰ্ত্তন প্রধান । তাহার মধ্যে পুনঃ 'অনু'-কীৰ্ত্তন অর্থাৎ স্বভক্ত্যানুরূপকীৰ্ত্তন বা নিরন্তর (অনুক্ষণ) কীৰ্ত্তন সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ । শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—হে পরীক্ষিৎ ! এই ভগবান্নামাহ-কীৰ্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল আমিই নির্ণয় করিতেছি না ; পূৰ্ব্বাচার্য্যগণই ইহাই নির্ণয় করিয়াছেন । এ নামানুকীৰ্ত্তনের পথ অকুতোভয় । ইহাতে ভয় বা হতশার কিছু নাই । এই পথে কাল, দেশ, পাত্র ও উপকরণাদির শুদ্ধাশুদ্ধির জন্ত ভয় নাইই, এমন কি ভগবৎসেবাদি অসহনীয় স্নেহগত এ-পথ আশ্রয় করিয়া নির্বিঘ্নে সিদ্ধিলাভ করে । কাম্য (ধর্ম্মার্থ কাম-কাম্য বা স্বর্গকাম্য, ভোগ্য), জ্ঞান্য (মুক্তিকাম্য বা ভ্যাগ্য), যোগ্য (অর্থাৎ সিদ্ধিকাম্য) বা শুদ্ধভক্ত সকলেরই অনুক্ষণ হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তনই করণীয় ।

‘আবৃত্তিরসকল্পদেপাং,’ ‘অনাবৃত্তিঃ শব্দাং’—এই বেদান্তসূত্রদ্বয়ও পুনঃ পুনঃ হরিনাম কীর্তনের উপদেশ করিয়াছেন এবং ইহাতেই নিত্যস্থান লাভ হইবে, জানাইয়াছেন। যুগধর্ম্য শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ণন ব্যতীত কলিকালে যে অস্ত্র কোন ধর্ম্য নাই, এ সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরানন্দদেবও বলিয়াছেন,—
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্য।

সর্বশাস্ত্র-সার নাম,—এই শাস্ত্রধর্ম্য ॥ (চৈঃ চৈঃ আঃ ৭।৭৪)

ধর্ম্যই যখন শাস্ত্রলাভের উপায় এবং যুগধর্ম্যই যখন একমাত্র ধর্ম্য, তখন যুগধর্ম্যই হরিনাম-সঙ্কীর্ণন বাদ দিয়া যুগবাসীর শাস্তি হওয়া সম্ভব কি? এটি জিজ্ঞাস্যই বলিতেছি, বাহারা প্রকৃত স্থখ চান, কলিকালে হরিনাম ব্যতীত তাহাদের অন্য গতি নাই। যুগধর্ম্য সম্বন্ধে বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলিতেছেন,—

হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরমুখা ॥

ভগবান্ শ্রীগৌরানন্দদেব এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন,—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।

নাম হৈতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার ॥

দার্ঢ্য লাগি ‘হরেন্নাম’ উক্তি তিনবার।

জড়লেক বুঝাইতে পুনঃ ‘এব’-কার ॥

‘কেবল’ শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।

জ্ঞান-যোগ-তপাদি কৰ্ম্ম-নিবারণ ॥

অমুখা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।

নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত ‘এব’ কার ॥

(চৈঃ চৈঃ আঃ ১৭।২২-২৫)

এই হরিনাম-কীর্তনের দ্বারাই লোক সংসার হইতে মুক্ত হইয়া নিত্যানন্দময় শ্রীভগবানকে লাভ করিতে পাবে। এসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

বলেদৌষনিধে রাঞ্জনস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।

কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্ত মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫১)

[হে রাজন্! সর্বদৌষাশ্রয় কলিযুগের ইহাই একমাত্র মহাগুণ যে মানবগণ এই যুগে কৃষ্ণনামসকীর্তন হেতুই মুক্তসঙ্গ হইয়া পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।] (ক্রমশঃ)

শ্রী রথযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতিবৎসরই শ্রীবেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ সমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে ইহার বিশেষ অনুষ্ঠান করিলেও চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠে ও শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গোড়ীয় মঠেও বিশেষ আড়ম্বরের সহিত ইহা উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন। গতবছরীত এই বৎসরে উভিযা প্রদেশের অঙ্গগত শ্রীগোপালজী গোড়ীয় প্রচারকেন্দ্র, আসামস্থ শ্রীবাসুদেব গোড়ীয় মঠে নবনির্মিতমান রথে প্রথম শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার প্রচলন করা হয়।

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-অ্যাচার্গা নিতালোলাপ্রবিন্দ ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তক্লিপ্রসন্ন কেশব গোস্বামী মহারাজ এত উৎসব সমিতির তদানিন্তনকালের মূলকেন্দ্র শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত প্রচলন করতঃ উদ্‌যাপন করিয়া আসিতেন। পরবর্ত্তিকালে অভিন্নব্রজ গুপ্তবন্দাবন শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা ও মূলকেন্দ্র স্থাপন করায় এখানেও শ্রীরথযাত্রার প্রচলন করেন। সমিতির বিভিন্ন কেন্দ্রে এই উৎসবের বিশেষ প্রচলন রয়েছে। শ্রীমতী রাধাকালীর গিরহে কাতব হইয়া মাধুর্য়ারস-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকায় অবস্থান-কালিম ব্রজবাসী-গণের স্নেহপ্রীতি-ভালবাসার কথা চিন্তা করিতে করিতে যে-ভাবে আত্ম হইয়া গিয়াছিলেন এবং তৎসহ অগ্রজ শ্রীবলদেব ও কনিষ্ঠা শ্রীসুভদ্রাদেবীও যেক্রপ অবস্থা ধারণ করিয়াছিলেন সে-রূপের বিগ্রহই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র শ্রীনীলাচল-ধামে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। প্রেমাবতারী অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি শিষ্য পুত্রীতে স্বাস্থ্যবশতঃ শ্রীনীলাচলিনাথকে দর্শন করিয়া তাই তিনি শ্রীশ্রীমহাদেব বিভূজমুরলীধর অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-রূপমাধুর্য় পান করতঃ ভাবে বিস্তার হইতেন। শ্রীগৌরজনগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে পরম প্রেমিক পুরুষোত্তম অভিন্ন ব্রজব কানাইকৃষ্ণই দর্শন করিয়া থাকেন।

সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক মহারাজের সেবা-অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া উজ্জলরস-রসিকশেখর চুড়ামণি লীলাপুরুষোত্তম বৃষভানুন্দিনীপ্রাণ-নবনামণি ব্রজবিহারী গোপীকনকপ্রভ শ্যামসুন্দরেব রথযাত্রা চিত্তনই এই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য।

ভক্তজনস্বদয়ে 'কৃষ্ণ লইয়া ব্রজে যাই'—এভাবে অন্তরা। তাহারই অভিব্যক্তরূপে শ্রীনীলাচলক্ষেত্র বাতীতও বিভিন্নস্থানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার প্রচলন। এমনকি পুনর্যাত্রাকালেও সেই ভাবেই পুনরবৃত্তি ঘটতে

দেখা যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—পুণ্ড্রবোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবগম্ভীর লীলায়। ত্রজরসংরনিকশেখর প্রেমপরাংকাষ্ট। নবযশস্শ্রাম দুর্জাদলকাঙ্ক্ষি ভক্তাধীন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-আশ্বাদনই রথযাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য।

“রথে তু বায়নং দৃষ্ট্বা পুনঃ স্মৃণু ন বিভ্রতে।”—শাস্ত্রোক্ত-বাণীও জ্ঞানমিশ্র।

ভক্তগণের প্রয়োজনাত্মক প্রীতি।

এতদ্ব্যতীত আধুনিক শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সংস্কৃতির নবদ্বিগন্তের আশোক-বর্জিত প্রদানকারী শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আত্মসমোপন-লীলা-তিলিবিদ্যাক কেন্দ্র করিয়া বিরহাতুর প্রাণের মাঝে মিলনের দুর্দমনীয় আকাজক্যের যে-ভাবধারা তাহারই উন্মেষণা এনে দেয় এই উৎসবে। অমানিশার জাঁধারে আমরা যেমন চারিয়ে ফেলি চক্ৰমাকে—সেক্ষপই অজ্ঞানরূপ-জাঁধারের মাঝে গিঁথ চারিয়ে ফেলিয়াছেন। সেই প্রেমামৃত ধারার সন্ধানকারী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদে। নিতালীলায় প্রতিষ্ট হইয়া তিনি যে-অনন্ত-লহরীতে উদ্বেলিত রহেছেন, তারই স্মৃতিচারণের পরিপ্রেক্ষিতে পরদিবসে হৃদয়-মন্দিরকে মার্জনের অস্ত্র গুণ্ডিচা-মার্জন। শ্রীগুণ্ডিচা-মার্জনাতে যেমন শ্রীশ্রীজগন্নাথকে সেই মন্দিরে গুণ্ডবিজয় করান হয়—আমাদের হৃদয়-মন্দিরের কলুষতাকে ধুয়ে-নুছে মজ্জন করে হৃদয়নাথ আঁখিপাতিকে তথায় সমাসীন করিতে হইবে। তবেই রথযাত্রার স্বার্থকতা—তবেই বিরহাতুর প্রাণের নির্মূল আঁশ্তি পরপূরিত হইবে।

এই বৎসর ২৪শে আষাঢ় (ইং ১০৭৮৩) শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে বিরহ-মহোৎসব, ২৬শে আষাঢ় (ইং ১০৭৮৩) শ্রীশ্রীগুণ্ডিচা-মার্জন এবং ২৭শে আষাঢ় (ইং ১০৭৮৩) শ্রীশ্রীরথ-যাত্রানুষ্ঠান উদ্ঘাটিত হয়। এতদ্ব্যতীত ৩১শে আষাঢ় (ইং ১০৭৮৩) হেরা-পঞ্চমী ও ৩রা শ্রাবণ (১০৭৮৩) শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্বাাত্রা উদ্ঘাটন হইয়াছিল। তদুপলক্ষে ২৪শে আষাঢ় হইতে ৩রা শ্রাবণ পর্য্যন্ত একাদশ দিবস-ব্যাপী শ্রীমত্তাগবত পাঠ, সচ্চাজন গীতিকীর্তন, ধর্ম্মতত্ত্ব-সম্পর্কে বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্তন, টাইগোষ্ঠী (শাস্ত্রপরিচালনা), শ্রীবিগ্রহের বিশেষ সেবাপূজা, ভোগরাগ্য, আধ্যাত্মিক ও জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতিরও সুরভি বাবস্থা ছিল।

—শ্রীবৈষ্ণবদাস ব্রহ্মচারী

যিনি শ্রীহরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তনে মন্দ মন্দ আনন্দ হাস্য করিলে দন্তকিরণে দিগ্-
বহুগণের সুখমণ্ডল প্রোজ্জ্বলিত হইতে থাকে এবং তৎকালে ধর্ম ও নয়ন-নীর-
ধারায় যিনি স্নান করিয়া থাকেন, সেই শ্রীল-নরোত্তম প্রভুবরকে আমি
পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ২ ॥

মুদঙ্গনাদ-শ্রুতিমাত্র-চঞ্চল-পদাম্বুজামন্দ-মনোহরায় ।

সত্ৰঃ সমুদ্র-পুলকায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥৩॥

যিনি মুদঙ্গধ্বনি শ্রবণ করিবামাত্র চঞ্চল পাদপদ্ম-দ্বারা সকলের মনোহরণ
করেন, শ্রীহরিসঙ্কীৰ্ত্তনে প্রবেশ করিবামাত্রই যাহার গাত্রে পুলক সঞ্চার হয়,
সেই শ্রীমন্ নরোত্তম ঠাকুরকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

গন্ধর্ব্ব-গবর্ব-ক্ষপণ-স্বল্যাস্ত্র-বিস্মাপিতাশেষ-কুন্তিলজায় ।

স্বসৃষ্ট-গান-প্রথিতায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥৪॥

যিনি নৃত্য-নৈপুণ্যে গন্ধর্ব্বগণের গবর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া অশেষ সুধীবর্গের
বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছেন এবং স্বরচিত মধুর গীতমূলদ্বারা সর্বত্র খ্যাতিলাভ
করিয়াছেন, সেই শ্রীল-নরোত্তম প্রভুবরকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

আনন্দ-মূর্ছাবনিপাত-ভাত-ধূলিভরালঙ্কৃত-বিগ্রহায় ।

যদর্শনং ভাগ্যভরেণ তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥৫॥

প্রেমানন্দ-ভরে মুচ্ছিত হইয়া ভুলুপ্তিত হইলে ধূলিরাশিতে যাহার সর্বাঙ্গ
অলঙ্কৃত হয় এবং বহুপুণ্যবলে যাহার সাক্ষাৎ দর্শনলাভ ঘটে, সেই শ্রীমন্
নরোত্তম ঠাকুরকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

স্তলে স্তলে যস্ত কুপা-প্রপাতিঃ কৃষ্ণাশ্রুতৃষ্ণা জনসংহীতনাম্ ।

নির্মূলিতা এব ভবন্তি তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥৬॥

যিনি স্তানে স্তানে কৃপাক্ষপ জলসত্র স্তাপন করিয়া লোকসমূহের শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন
অপর-তৃষ্ণা অর্থাৎ বিষয়বাসনা সমূলে নির্মূল করিয়া থাকেন, সেই শ্রীল-
নরোত্তম প্রভুবরকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

যদ্ব্যক্তিনিষ্ঠোপল-রেখিকৈব স্পর্শঃ পুনঃ স্পর্শমণীব যস্ত ।

প্রামাণ্যমেবং শ্রুতিবদ্ যদীয়ং তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥৭॥

যাহার ভক্তিনিষ্ঠা পাষণ্ডরেখার ন্যায় প্রতীয়মান হয়, যাহার পাদস্পর্শ
স্পর্শমণির দ্বায় অশ্রীকৃষ্ণদ এবং যাহার বাক্য বেদবৎপ্রামাণ্য হয়, সেই শ্রীমন্
নরোত্তম ঠাকুরকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

মূর্ত্তেব ভক্তিঃ কিময়ং কিমেষ বৈরাগ্যসারসুচুমান্ লোকে ।

সংভাব্যতে যঃ কৃতিভিঃ সदैব তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥৮॥

এই মনুষ্যলোকে যাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বিচক্ষণগণ সর্বদা ‘এই পুরুষ কি মূর্ত্তিমতী ভক্তি, অথবা বৈরাগ্যের সারাংশ ?’—এইরূপ জল্পনা করেন, সেই শ্রীল-নরোত্তম প্রভুবরকে আমি নমস্কার করি ॥৮॥

শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ-বিলাস-সিন্ধৌ নিমজ্জতঃ শ্রীল-নরোত্তমস্ত ॥

পঠেদ য এবাস্তকমেতদুচ্চৈ-রনৌ তদীয়াং পদবীং প্রযাতি ॥৯॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসসাগরে যিনি সর্বদা নিমগ্ন থাকেন, সেই ঠাকুর শ্রীল-নরোত্তমের এই অষ্টক যিনি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলেন, তিনি অবশ্যই তৎপদবী লাভ করিবেন ॥ ৯ ॥

কারণ্যদৃষ্টি-শমিতাশ্রিত-মন্তকোটি-

রম্যাধবোত্তমস্তিসুন্দর-দন্তকাস্তিঃ ।

শ্রীমন্নরোত্তম-মুখাস্তুজ-মন্দহাস্তং

লাস্তং তনোতু হৃদি মে বিতরং-স্বদাস্তম্ ॥১০॥

রম্য অধর চইতে নিঃসৃত অতি সুন্দর দশনকাস্তিস্থজ, আশ্রিতজনের কোটি-অপরাধ নাশকারী ও রূপাদৃষ্টিবিশিষ্ট সেই শ্রীমন্নরোত্তম-মুখপদ্মের শিতহাস্ত স্বদাস্ত প্রদান করিয়া হৃদয়ে নৃত্য করুন ॥ ১০ ॥

রাজন্দুদঙ্গ-করতাল-কলাভিরামং

গৌরাজগান-মধুপান-ভরাভিরামম্ ।

শ্রীমন্নরোত্তম-পদাস্তুজ-মঞ্জুনতাং

ভূতাং কৃতার্থযতু মাং ফলিতেষ্টকৃত্যম্ ॥১১॥

স্রমধুর মৃদঙ্গ-করতাল-ধ্বনিতে অতিশয় উন্মত্ত শ্রীগৌরাজ-গুণগানের মধুপানভরে অতি মনোহর শ্রীমন্নরোত্তম-পাদপদ্মের মনোহর নৃত্য, এই ভূতাকে ইষ্টকল প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন ॥ ১১ ॥

সজ্জন—নিরীহ (১৪)

সজ্জন 'নৈকর্ম্য' অর্থাৎ জড়কর্ম-চেষ্টা-শূন্য বলিয়াই নিরীহ

গ্রীমস্তাগবতে সজ্জনের জীবনে নৈকর্ম্যের আবিষ্কার কথিত হইয়াছে।
নৈকর্ম্য বলিলে কর্ম-চেষ্টা-রাহিত্যকে বুঝায়। ফললাভের চেষ্টাই কর্মচেষ্টা।
ভগবদ্বাক্তে কর্ম-চেষ্টা নাই, সুতরাং সজ্জন—নিরীহ।

সজ্জন কর্মকাণ্ডীর ব্যায় স্থূল-সূক্ষ্ম-ভোগে বিরত,

তিনি জীবমুক্ত

ফলভোগ-বাসনাই কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য। জীবের স্বাস্থ্য-শরীরে ও স্থূলদেহে
কল্যাণের পরিবার অবসর হয়। যে-কালে জীব বদ্ধাভিমানে ফলকামী হইয়া
জীবন-বাণশ করেন, সেই সময় তাহার কর্মমার্গটি প্রকট হইয়া পলায়নীয়। বদ্ধ-
অবস্থায় জীব স্বীয় স্থূল ও স্বক্ষ্ম-শরীরের দ্বারা অচিৎবস্ত্র ভোগ করেন। চিৎ-
বস্ত্রই অচিৎ ভোগক্ষেই কর্মকাণ্ডীয় স্থূল-ভোগ বলে। স্বক্ষ্ম-শরীরের দ্বারা
অচিৎতের স্বপ্নাংশ ভোগেও কর্ম-বাসনা। সজ্জন বদ্ধাবস্থায় স্বীয় আত্মাহুশীলন-
পর অপ্রাকৃত মনদ্বারা কর্মফল-ভোগবাসনা হইতে মুক্ত থাকেন। তখন বদ্ধ-
অবস্থায় সজ্জনকে অপ্রাকৃত বা জীবমুক্ত অভিমানে সংজ্ঞা হয়।

বুভুক্ষু ও মুগুক্ষুর অনাত্ম-চেষ্টার সহিত সজ্জনের

হরিসেবা-চেষ্টার পার্থক্য

'দৈহ্য' শব্দের অর্থ চেষ্টা। খণ্ডকালের অস্থিত স্থূল ও অচিৎপর মন যে
অনুষ্ঠানের আবাহন করেন, তাহার ভুক্তিমার্গ। ভুক্তি ও মুক্তি—এই ফলদ্বয়ের
উদ্দেশ্যে বাহ্য কিছু অনুষ্ঠিত হয়, সকলগুলিই বদ্ধাভিমানে চেষ্টা অথবা অনাত্ম-
চেষ্টা। তাহার ভুক্তি ও মুক্তিকে শেষ ফল জ্ঞান করেন না, তাহারাই
হরিশরণ না সজ্জন। ভগবান্ হরি নিত্য অপ্রাকৃত বস্ত্র, তাহার লীলা
নিত্য ও সেবক নিত্য। কর্মকাণ্ডীয় চেষ্টায় ফলভোগ-কামনা থাকায় হরির
উদ্দেশ্যস্বত্রেও এই চেষ্টা নির্মল নহে। যে-কালে কেবলমাত্র ভগবানের উদ্দেশ্যে
জীবের চিন্ময় প্রবৃত্তি উদয় হয়, তাহা স্বক্ষ্ম ও স্থূলদেহে প্রকাশমান হইয়া
কর্মী বা জ্ঞানিগণের ক্রিয়ার সঙ্গিত সমভাবে দৃষ্ট হয়; কিন্তু স্বক্ষ্মভাবে তাদৃশ
কার্য্য বিচার করিলে বুভুক্ষু ও মুগুক্ষুর চেষ্টার সহিত সজ্জনের চেষ্টায় সঙ্গতো-
ভাবে বৈষম্য দৃষ্ট হয়। বুভুক্ষু ও মুগুক্ষুর চেষ্টা চিরদিনই সজ্জনের হরিসেবা-
চেষ্টার সঙ্গিত পার্থক্য দ্বাৰে।

কর্ম-জ্ঞানচেষ্টা-রহিত সজ্জন কার-মনোবাক্যে কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাবিশিষ্টে

সজ্জন—নিরীহ, একপ্ৰভাব প্রকাশিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, সজ্জনের কৃষ্ণার্থের কোন চেষ্টা নাই। কৃষ্ণ-চেষ্টাময় সজ্জন জড়ে উদাসীন। তাঁহার অখিল চেষ্টাতেই সপারিকর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই লক্ষ্যের বিষয়। সেইজন্য সজ্জনের কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা একটী প্রধান সেবার অঙ্গ। কারমনোবাক্যে সকল অবস্থাতে কৃষ্ণের জঙ্ঘা নিরুপস্ট চেষ্টা হইলেই তাঁহাকে জীবন্ত বা অপ্রাকৃত সজ্জন বলা যায়। সজ্জন—নিরীহ, এই কথা বলায় তাঁহার কৃষ্ণ-চেষ্টায় বাধা দেওয়া হয় নাই, প্রাকৃত বাজোর চেষ্টায় তাঁহার অধিকার নাই—এই কথাই বলা হইল। অদ্বৈতভাবে অচিদ্বন্দ্বের অনুশীলনই কর্ম-চেষ্টা এবং ব্যতিরেক ভাবে অর্চন বস্তুর প্রতি উদাসীন হইলে উহাও জ্ঞান-চেষ্টা বা বৈরাগ্য। বিরক্ত পুরুষ ঘেঁহুলে হরিসেবা-বিশেষ হইয়া ভোগফল নিরসনে বাস্তব, সেই সময়ে তিনি মুমূক্ষু বা হরিসেবা-ধর্মরহিত, স্বার্থপর, অতন্নিসন-রত ভক্তিবিমুখ চেষ্টামুক্ত। সজ্জনের এই-সকল চেষ্টা কোনদিন নাই ও তাদৃশ চেষ্টা তাঁহার বাঞ্ছনীয় নহে।

হরিবিমুখ মুক্ত হরিসম্বন্ধি-বস্তুত্যাগ ভগবচ্চরণে অপরাধী,
আর হরিলেবকের মুক্তবৈরাগ্যাবলম্বন

হরিবিমুখ মুক্ত ও হরিসেবক উভয়েই কর্ম-চেষ্টা-রহিত। হরিবিমুখের আশ্রয় ও নির্বিশেষভাবে তাঁহাকে ভগবানের চরণে অপরাধী করাইয়াছে সেইজন্য তিনি জড়ালম্বকেই পরম উপাদেয় জ্ঞান করিয়া হরিসম্বন্ধী বস্তু-মাত্রকেও প্রাপঞ্চিক বোধে ভেদ জ্ঞান করেন। এইরূপ ভক্তিবিমুখ চেষ্টা মুমূক্ষুর আছে বলিয়া তিনি জড়ে চেষ্টাবিশিষ্ট, অচিদ্বন্দ্বের উদাসীন হইতে পারেন নাই। জ্ঞানীর অতিরিক্ত জ্ঞান-চেষ্টা বা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান তাঁহার জ্ঞানকে পরম উপাদেয় ভগবদ্ভজ্ঞান হইতে হরিবিমুখ-শক্তি মায়াকর্তৃক বিক্ষিপ্ত করাইয়াছে। এইরূপ মায়িক চেষ্টা সজ্জনের নাই বলিয়া তিনি নিরীহ। মুমূক্ষু কর্ম-চেষ্টাবলম্বনে অর্চন বাজোর সহায়তার মুক্ত হইতে মর্চেয়, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাদৃশ কোন মায়িক চেষ্টার আবাহন করেন না।

অজ্ঞাভিলাষী, কাম্য, জ্ঞানীর বৃত্তি অবলম্বন না করায় সজ্জনের
সকলই আশ্রয়চেষ্টাময় হরিসেবাপর অনুষ্ঠান

অজ্ঞাভিলাষী, যথেষ্টচারী, কর্মফলভোগী এবং কর্মফলত্যাগী জ্ঞানী সকল সুপ ও স্বপ্নদেহের চেষ্টায় পিতৃত, কিন্তু সজ্জন তাদৃশ বৃত্তি মায়ার উদ্দেশ্যে পরিচালনা না করায় তিনি নিরীহ। আবার আশ্রয়চেষ্টায় নিত্য হরিসেবাপর অনুষ্ঠান দেখা গেলেও তিনি জড়ে উদাসীন।

সজ্জন—স্থির (১৫)

দেহ-মনের ধর্ম-পরিণামশীল, অতএব অনিত্য

আত্মার ধর্ম—অচঞ্চল। মন ও দেহের ধর্ম—পরিণামশীল। অনিত্য পরিণামশীল বস্তু কখনই স্থির নহে। পরিবর্তনশীল বস্তুর প্রতি আত্মা স্থাপন করা বাস্তবে পাবে না। দেহ নিত্য নহে, মনও অনিত্য বস্তু হইতে যৌথ অমুশীলন বৃত্তি সংগ্রহ করে, সুতরাং তাহারা উভয়েই অস্থির।

সজ্জন স্থির-বস্তু ভগবানের উপাসক, তিনিও স্থির-প্রকৃতি

তাত্ত্বিক বৃষ্টির তাড়নায় দেহ ও মন নানা প্রকার প্রারম্ভের আবাহন করে। চাক্ষুশ-বাহিত হইলে নিত্যধর্মের স্থিতি। অজ্ঞায় উপলব্ধি হয়। ভগবন্তের পরিণামশীল অসং বস্তুতে প্রবৃত্ত হয় না। ভগবৎসেবার চিত্তবৃত্তি নিযুক্ত না হওয়া পয্যন্ত জীবতে অস্থির ধর্ম পরিত্যাগ করে না। যে-কালে মনোরথ অস্থির বস্তুতে সেবার ধারিত হয়, তৎকালীন তাহার নিত্যত্বের বা স্থিরতার সন্ধান নাহি। হরিসেবার সজ্জন সকল সময়েই স্থির। স্থির-বস্তু ভগবান্ স্থির-প্রকৃতি সজ্জনের অমুকুল অমুশীলনের বস্তু।

শম-দমাদি-যোগাভ্যাস ভগবদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হইলে

প্রকৃত স্থিরতা বা চিত্তবৃত্তি-নিবোধ সম্ভবপর নয়

পতঞ্জলি-স্থির যোগদর্শন খালোচনা করিয়া কেহ মনে করিতে পারেন যে, কৃত্রিম উপায়দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইতে পারে। আবার ঈশ্বর-প্রতিধান-ফলে চিত্ত স্থির হয়। শম-দমাদির অভ্যাস-ফলে যে স্থিরতার উদ্দেশ্য করা হয়, তাহা পরিণামশীল ও অস্থিরতার পূর্ববৃত্ত। বাস্তবিক স্থিরতা, নিত্যবস্তু ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হইলে অল্প অনিষ্ঠা-বৃত্তি যোগে সম্ভবনীয় হয় না।

সাধন-সাধ্য বৈষম্য এবং উপায়-উপেষ্টে পৃথক্ বুদ্ধি

নিত্যত্বের ব্যাঘাতকারী

অজ্ঞানভাবী, কর্মী বা জ্ঞানী কেহই স্থির নহেন। তাহারা নিজ নিজ অভাবে সর্বদাই অস্থির হইয়া স্থির হইবার জন্য বিভিন্ন কাল্পনিক অনিত্য অস্থিরতার আবাহন করেন মাত্র। আপনাদিগকে অস্বাভাবিক দুঃখী-জ্ঞানে স্ব-বাহিত বস্তু-লাভের আশায় ঘুরিয়া বেড়ান। বিশেষতঃ সাধন ও সাধ্য বৈষম্য থাকিলে অস্থিরতাই শেষ ফল হয় অর্থাৎ উপায়-উপেষ্টের পার্থক্য নিত্যত্বের ব্যাঘাত করে।

সজ্জনগণ ইষ্টলাভে দৈর্ঘ্যশীল, অতএব ধীর ও স্থির

শ্রীগৌরচন্দ্র একদিন শ্রীরাঘুনাথ-দাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

“স্থির হইয়া ঘরে বাও, না হও বাতুল।

ক্রমে ক্রমে পায় লোক অবসিদ্ধ-কুল ॥”

সকল কার্যেই স্থিরতার প্রয়োজন আছে। ধৈর্য্য-বিশিষ্ট না হইলে ভুক্তি সন্তুতা লাভ করে না। অনান্য-ধর্ম্মে অনিত্য ও অস্থিরতা আছে। সজ্জনগণ তাহাতে প্রসন্ন নহেন। সজ্জনগণ সকল অহুতামেই ধীর। সজ্জনগণকেই একমাত্র বিশ্বাস করা যায়। তাঁহাদের দৃঢ়তাই জগতের আদর্শ।

—জগদ্বন্ধুর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র নিম্নলিখিত হওয়া চাই

ঐশ্বর্য্যহাশ্রয় এতরূপ উপদেশ করিরাছেন। এত উপদেশ অনুসারে সমস্ত বৈষ্ণবগণ আপন আপন চরিত্র পবিত্র করিবেন। বিশেষতঃ বৈরাগী বৈষ্ণবগণ এ-বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকিবেন। চৈতন্যচরিতামৃত—

সুত্রবস্ত্রে মণি-বিন্দু যৈছে না লুকায়।

সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্ব লোকে গায় ॥ (মঃ ১২।৫১)

প্রভু কহে,—পূর্ণ যৈছে ছন্দের কদম।

স্বরাবিন্দু-পাতে কেহ না করে পরশ ॥ (মঃ ১২।৫৩)

বৈষ্ণব দুই প্রকার, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী। মন্ত্রাচার্য্য গোস্বামিগণ এবং ভগবদ্ভক্তপ্রাপ্ত গৃহস্থ সকলেই বৈষ্ণব। তাঁহারা গৃহস্থ-বৈষ্ণব। যাহারা ভেক গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হন, তাঁহারা সন্ন্যাসী-বৈষ্ণব। বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসী হউন, অন্য সকলের পূজনীয়। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হউন বা চণ্ডাল হউন, সকলেরই আদরণীয়। এত জগুই বৈষ্ণবগণকে জগদ্বন্ধুর বলা যায়।

বৈষ্ণবগণ যেক্রপ উচ্চ-পদস্থ হইল, তাঁহাদের চরিত্র তদ্রূপ উচ্চ ও অনুকরণ-যোগ্য হওয়া আবশ্যিক। বৈষ্ণবদিগের চরিত্র মন্দ হইলে অসংখ্য দুর্কল জীব ক্রমে সচরিত্রতা শিক্ষা করিবে। এ-সকল কথা বিবেচনা করিয়া আদৌ মন্ত্রাচার্য্য গোস্বামী মহোদয়গণ নিজ নিজ চরিত্র নির্দোষ করিতে বিশেষ যত্ন করিবেন। পরজী, পরেব ধন, পরের সম্পত্তি—এই সমস্ত বিষয়ে কিছুমাত্র লোভ করিবেন না। যাহারা যথার্থ বৈষ্ণব, তাঁহারা স্বভাবতঃ এইসকল কার্য্য কখনই রত হন না। ভগু গুপতী ও বৈড়াল ব্রহ্মগণেরাই মন্ত্রাচার্য্যপদের চলে নানাবিধ পাপকার্য্য করেন। গুরুদিগের কর্তব্য যে, তাঁহারা শিষ্যগণকে নিজ সন্তানের ছায় স্নেহ করিবেন। অর্থ-লালসায় পাকে-চক্রে তাহাদিগকে বিব্রত করিয়া না ফেনেন। শিষ্যগণের পরিবারদিগকে নিজ

কল্পাবলম্ব্য পবিত্র চক্ষে দেখিবেন। সাধারণ গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ সর্বদা নিম্পাপ চরিত্রে, গ্রাসদ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া কৃষ্ণের সংসার নির্বাহ করিবেন। মন্ত্রাচার্যাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিবেন। নিকটস্থ প্রতিবেশীদিগকে সহুপদেশ ও উপকার-দ্বারা ভ্রাতৃত্বং ব্যবহার করিবেন।

ভেকধারী বৈষ্ণব পবিত্র থাকিলে তাঁহাকে যথোচিত বৈষ্ণব-সংসার করিবেন। অবকাশ পাউলে বৈষ্ণব-শাস্ত্রের আলোচনা করিবেন। ভেকধারী বৈষ্ণবগণ মাধুকবী বৃষ্টি দ্বারা মাগিয়া-মাগিয়া শরীরযাত্রা নির্বাহ করিবেন। কোন স্ত্রীলোকের সচ্ছিত সম্ভাষণ করিবেন না। স্ত্রীলোক, রাজা ও কাল-সর্পকে সম্মান দেখিয়া ঐ তিনের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবেন।

যদিও সকল প্রকার বৈষ্ণবকে সচ্ছরিত্র থাকিতে আশু হইবে, তথাপি ভেকধারী বৈষ্ণব বিশেষভাবে সচ্ছরিত্রতা অবলম্বন করিবেন। ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা। ভেকধারী বৈষ্ণব সংসার ত্যাগ করিয়া সম্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার চরিত্রে যদি কোন-প্রকার দোষ দেখা যায়, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হয়।

কতকগুলি ভেকধারীদের দোষে আজকাল ভেকধারী বৈষ্ণবসম্প্রদায়েরই মন্দা হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ইচ্ছা করি যে, বিস্তৃত ভেকধারী বৈষ্ণবগণ পতিত ভেকধারীদের সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া জগৎকে মংশিক্ষা দিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। পতিত ভেকধারী সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

ভেকধারী বৈষ্ণব সম্ভাবতঃ বিরল। কেননা সমস্ত সংসার-পুথ পরিত্যাগ করিয়া সচ্ছরিত্রের সচ্ছিত অহংকৃত্ব চরিত্র না করিতে পারিলে ভেকধারী পদ পবিত্র রাখা যায় না। অতএব ভেকধারী বৈষ্ণব-সংখ্যা বাড়িলে অবশ্যই আশঙ্কা করিতে হইবে যে, কলি কোন প্রকার দুষ্টকায়া ইহাতে আছে। আজকাল ভেকধারী সংখ্যা বাড়িবার কারণ এই যে, ভেক গ্রহণ-কালে অধিকাবিচার করা যায় না। অনধিকারীব্যক্তিকে ভেক দিলে শেষে উৎপাত বড় আর কি হইতে পারে? এ-বিষয়ে সাধারণের একটু যনোযোগ না হইলে আর বৈষ্ণব-ধর্ম চক্ষা হয় না।

— জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

স্মৃতি ও পুরাণ ত্রিবিধ

ভগবান্ শত্ৰু নিজশক্তি পার্শ্বভীদেবীর অভিল্যায়ানুসারে “পাষণ্ডী” বাক্তির লক্ষণ কি এই প্রশ্নের উত্তরে (শ্রীপদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড, ৯৩ অধ্যায়ে) বলিয়াছেন,—

যেহতং দেবং পবত্বেন বদন্ত্যজ্ঞানমোহি নঃ ।

নাবায়ণাজ্জগন্নাথাক্তে বৈ পাষণ্ডীনস্তথা ॥

কপালভক্ষ্যাস্তিধরা যে হুৈবৈদিকলিঙ্গিনঃ ।

ঋতে বনস্তাশ্রমাচ্চ জটাবঙ্কলধারিণঃ ॥

অবৈদিকক্রিয়োপেণোপান্তে বৈ পাষণ্ডিস্তথা ।

যন্ত নারায়ণং দেবং ব্রহ্মকৃদ্দৈদৈবতৈঃ ।

সমভ্যেতৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী তবৈব সদা ॥

অর্থাৎ যাহারা অজ্ঞানমোহিত হইয়া জগন্নাথ নারায়ণ ব্যতীত অপর দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীৰ্ত্তন করে, তাহারাই পাষণ্ডী । আর অবৈদিক চিহ্ন-স্বরূপ কপালভক্ষ্যাস্তি-নারণকারী বাক্তিগণও পাষণ্ডী ; বনিপ্রস্তাশ্রমী ব্যতীত জটাবঙ্কলধারী বাক্তিও পাষণ্ডী । আর যে বাক্তি নারায়ণকে ব্রহ্মা-কৃদ্দাদি-দেবতার সঙ্গে সমপর্যায়ে দর্শন করে, সে সর্বদাই পাষণ্ডী হইয়া থাকে ।

পরমার্থাধা শত্ৰুশ্রিয়ঃ পতির বাক্য শ্রবণে পুনরায় প্রশ্ন করেন,—

ভগবান্ পরমং গুহ্যং পৃচ্ছামি সুবসন্তম ।

ময়ি প্রীত্য সঙ্গাচ্ছ সংশয়ো বর্ততে ভদ্রম ॥

কপালভক্ষ্যচন্দ্রান্তিধারণং শ্রুতিনিষিদ্ধম ।

তত্ত্বং সার্য্যাকে দেব গঠিতং কেন হেতুনা ॥

হে ভগবান্ ! সুবশেষ্ট আপনাকে পরম গুহ্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি । আমাতে প্রীতিহেতু এই সংশয়ের অপনোদন করুন । কপালভক্ষ্যচন্দ্রান্তি-ধারণ যদি শ্রুতিনিষিদ্ধ কার্য্যই হইয়া থাকে, তবে আপনি কি-নিমিত্ত এইরূপ গঠিত আচরণ প্রদর্শন করিতেছেন ?

তদ্বত্তরে মহাদেব বলিতেছেন, হে দেবি ! আমার নিকট পরম গুহ্য কথা শ্রবণ কর । তুমি আমার নিজ-শরীরের অভিন্ন বলিয়া তোমার নিকট আমার এই রহস্য আচরণ বর্ণন করিতেছি,—

সমুচ্যাম্য মহাদৈত্যঃ পুত্রা স্বাহভূমেহত্বরে ।

মহাংশা মহাবীৰ্য্যা মহাবীরা মহাজনঃ ।

সর্বৌ বিষ্ণুং তাতাঃ শুকঃ সর্বপাপবিবর্জিতাঃ ॥

অমীধর্মযুতাঃ সর্কে ভগ্না ইন্দ্রপুরোগমাঃ ।
বিক্ষোঃ সমীপমাগম্য জয়ার্ত্তাঃ শরণং গতাস্তে ॥

দেব। উচুঃ—

অজ্ঞান্ সর্কদেবানাং ভণোনিধুঁতকল্মাষান্ ।
ভ্রমৈবৈতান্মহাদৈতান্ ভ্রতুমহঁসি কেশব ॥

কুদ্ৰ উবাচঃ—

ইত্যাকর্ণ্য হরিকীক্যং দেবানাঞ্চ ভয়ানকং ।
তানবধ্যান্ বিদিত্বাপ মামাহ পুরুষোত্তমঃ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

ভুং হি কুদ্ৰ মহাবাহো মোহনার্থে সুবদিসাং ।
পাষাণ্ডাচরণং ধর্মং কুরুষ্বরসত্তম ॥
তামসানি পুণ্যানি কথয়স্ব চ তান্ প্রতি ।
মোহনানি চ শাস্ত্রানি কুরুষ্ব চ মহামতে ॥
ময়ি শুক্যাস্তি যে বিপ্রা ভবিষ্যন্তি মৎস্বয়ং ।
ত্বচ্ছ্রুত্বা তান্ সমাদিশ্য কথয়স্ব চ তামসান্ ॥
কণাদং গোতমং শক্তিমুপমহাঞ্চ জৈমিনীং ।
কপিলং চৈব দুর্কাসং মৃকতুঞ্চ বৃহস্পতিম্ ॥
ভার্গবং অমলগ্নিক দশৈতান্জামসানুধীন্ ।
ভব শক্যো সমাবিশ্য কুরুতে জগতে হিতম্ ॥
ত্বচ্ছ্রুত্বা সন্নিবিষ্টোক্তে তমসোদ্ভিক্কা ভুং ।
তামসাস্তে ভবিষ্যন্তি সর্বাদেব ন সংশয়ঃ ॥
কথয়িষ্যন্তি তে দিশ্রাস্তামসানি জগজ্জয়ে ।
পুণ্যানি চ শাস্ত্রানি ত্বয়া সত্যেন বেদিতাঃ ॥
কপালচর্মভস্মান্তিচ্ছিত্বাত্তপি হি সর্কশঃ ।
ভ্রমেব হৃতবাল্লোকান্ মোহয়স্ব জগজ্জয়ে ॥
তথা পাণ্ডিতং শাস্ত্রং ভ্রমেব কুরু পুত্রত ।
কঙ্কালশৈবশাশ্বতমহাশৈবাদিভেদতঃ ॥
অবলক্ষ্য মতং সমগ্গ্বেদবাহুং দ্বিভাধমাঃ ।
ভস্মান্তিধারিণঃ সর্কে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥
ত্বাং পরন্তেন বক্ষ্যন্তি সর্কশাস্ত্রেবু তামসাঃ ।

তেষাং ময়মধিষ্ঠায় সর্বে দৈত্যাস্তাঃ সনাতনাস্তাঃ ॥

ওবেদ্যন্তে মদিমুখাঃ কণাদেব ন সংশয়ঃ ।

অহমপ্যবতারেষু ভাষ্করুদ্র মহাবল ॥

তামসানাং মোহনার্থং পুজয়ামি যুগে যুগে ॥

মহাদেব উবাচ,—

তচ্ছ্রদ্ধাং যথোক্তং তু বাসুদেবেন ভামিনি ।

সমুদ্বিগ্নমনা দীনো বভূবাত্র বরাননে ॥

নমস্তুভ্যর্থং তং দেবমন্ত্রং পরমেশ্বরং ।

ত্বয়োদিতমিদং দেব করোমি যদি ভূতলে ॥

তস্মান্নাশো হি মে নাথ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।

ন শকাং হি ময়া কৰ্ত্তুমৈতৎ কৃতাং হরেবধূনা ॥

ঐদাজ্জাপি চ নোল্লভ্য । এতদ্দুঃখং ত্বং মহৎ ।

এবমুক্তস্ততো দেবি সমাধ্বাস্ত চ মাং পুনঃ ॥

আত্মনাশায় তে নাত্র ভবতিতাহ নো হরিঃ ।

দেবতানাং হিতার্থায় কুরুষ্ব বচনং মম ॥

তবাপুঞ্জীবনোপায়ং কথয়ামি অরোস্তম ।

নিত্যং জপ মহাবাহো মম নামসহস্রকম্ ॥

হৃদয়ে মাং সমাধ্যায় জপ মন্ত্রং সমাব্যহং ।

ষড়ক্ষরং মহামন্ত্রং তারকং ব্রহ্ম উচ্যতে ॥

ভাঃপৰ্য্য এই যে,—নমুনি প্রভৃতি কতকগুলি মহাবল দৈত্য বৈদিক ক্রিয়া-
দ্বারা বিষ্ণুপাদনা করত মহাবলবান্ হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতাকে রাজ্যচ্যুত
করিয়া ফেলিলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ভীত হইয়া ত্রিনিমুপাদপদ্মে শরণাগত হন ।
দেবতাগণ বলেন, হে কেশব! আপনি এই সমস্ত তপোবলসম্পন্ন নিম্পাপ
দৈত্যগণকে সংহার করুন । তখন দেবদেব পুরুষোত্তম দৈত্যগণকে ইন্দ্রাদি
দেবগণের অঙ্কেয় জানিয়া আমাকে আদেশ করেন—“হে সুরশ্রেষ্ঠ! তুমি
অম্বরগণকে মোহন করিবার নিমিত্ত পাষাণচরণ-ধর্ম ও তামস-পুরাণাদি
কীৰ্ত্তন কর এবং মোহন-শাস্ত্রসকল রচনা কর । আমার ভক্ত ব্রাহ্মণ কণাদ,
গৌতম, শক্তি, উপমহা, জৈমিনী, কপিল, হর্ষাশা, মৃকগু, বৃহস্পতি, ভার্গব
ও জমদগ্নি—এই দশজনের নিজশক্তিকে তমোভাবাপন্ন করিয়া তাহাদের
দ্বারাও তামস শাস্ত্রাদি প্রচার করাও । আর তুমি অম্বরগণের মোহনের

নিমিত্ত কপালভঙ্গ্য, চর্ম্মস্থি ধারণ করিয়া ত্রিঙ্গগতে ভ্রমণ কর। আরও বলি—কঙ্কাল, শৈব, পাশণ্ড, মহাশৈবাদি-ষেদে পাণ্ডপত শাস্ত্র সকল রচনা কর। ঐ সকল বেদবহিভূত গতবাদে মুগ্ধ হইয়া দ্বিজাধমগণ ভ্রমাস্থি-ধারণকারী হইবে সমেদহ নাই। সকল তামস-শাস্ত্রে তোমাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্তন করিবে। ঐ সকল মত গ্রহণ করিয়া দৈত্যগণ অবিশেষে হরিবিমুখ হইয়া পড়িলে তাহাদিগকে বধ করা সহজ হইবে। আমিও তামস-প্রকৃতির ব্যক্তিগণের মোহনার্থ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া তোমার পূজা করি।”

ভগবান্ বাসুদেবের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে আমি অত্যন্ত উত্ত্বিগ্ন হইয়া পরমেশ্বরকে নমস্কার করত বলিলাম—ছে দেব! আপনার আদিষ্ট বাক্য পালন করিলে আমার নাশ অবশ্যম্ভাবী, আমার আপনার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করাও অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তখন মনোদুঃখগ্রস্তকারী হরি আমাকে বলিলেন যে, “দেবতাগণের হিতার্থে আমার বাক্য পালন কর। তজ্জন্ত আমার অপরাধ ক্ষালনার্থ উপায় নির্দেশ করিতেছি : য, তুমি আমাকে ক্রতয়ে ধ্যান করিয়া আমার সহস্র-নাম ও বড়ুকর তারকত্রয় মহামন্ত্র জপ কর। তাহা হইলে কোন প্রত্যাবায় হইবে না।”

অতঃপর মহাদেব দেবতাগণের হিতার্থে বিষ্ণু-আজ্ঞা পালন করিলে সমস্ত অসুরগণ ভগবদ্বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে এবং ভ্রমাস্থি ধারণপূর্ব্বক মাংস, রক্তচক্ষুনাদি দ্বারা আমার পূজা করিয়া আমার নিকট হইতে বর গ্রহণপূর্ব্বক নির্দোষ হইলে দেবতাগণ তাহাদিগকে পরাজিত করেন। এসম্বন্ধে গমুপুরাণের উক্তি—

ঈদং মতমবষ্টতা মাং দৃষ্ট্বা সর্ব্বরাক্ষসঃ ।

ভগবদ্বিনুখাঃ সর্কৌ বভূবুস্তমসাবৃতাঃ ॥

ভ্রমাদিধারণং কুংহা মতোগ্রকরসাবৃতাঃ ।

মাংসেব পূজয়াৎকুর্দ্ভাংসাস্থক্চক্ষুনাদিভিঃ ॥

মন্তো ববপ্রদানানি লব্ধ্বা মদবলোক্ততাঃ ।

অত্যন্তবিষয়ামক্তাঃ কামক্রোধসমস্থিতাঃ ।

সন্তুঃসীনাঙ্গ নির্দোষা জিতা দেবগণৈস্তদা ।

মহাদেব পুনরায় বলেন,—

যে যে মতমবষ্টতা চরন্তি পৃথিবীতলে ।

সর্ব্বধর্ম্মৈশ্চ রহিতাঃ পশুস্তি নিরয়ং সদা ॥

এবং দেবহিতার্থায় বৃত্তির্শ্বে দেবি গর্হিতা ।

বিষ্ণোরাজ্যং পুরহত্য কৃতং ভস্মাঙ্ঘিধারণম ॥

বাহুচিহ্নমিদং দেবি মোহনার্থায় বিদ্বিষাম্ ।

অতএব, হে দেবি ! যাহারা আমার এই মত অবলম্বন করিবে, তাহার। সর্ব্বশ্রমরহিত হইয়া সদা নরক দর্শন করিবে । এই প্রকারে আমি বিষ্ণুর আজ্ঞাক্রমে দেব-হিতার্থ ভস্মাঙ্ঘি ধারণরূপ গঠিত পাষণ্ড আচরণ করিয়াছি । ইহা আমার বাহুচিহ্ন যাত্র ।

অতঃপর পার্বতীদেবী তামস পুরাণাদির বিষয় জ্ঞানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শত্ৰু কহিলেন,—

শূণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানাং যথাক্রমং ।

যেষাং অরণমাত্রেণ পাতিতাং জ্ঞানিন্যামপি ॥

প্রথমং হি যথা চোক্তং শৈবং পান্তুপতাদিকং ।

মচ্ছক্রাবেশিতৈঃ বিটৈঃ প্রোক্তামি চ ততঃ শূণু ॥

কণাদেন তু সম্প্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ ।

গৌতমেন তথা জায়ং সাস্ত্রাস্ত্র কপিলেন বৈ ॥

দ্বিধেন তথা প্রোক্তং চার্বাকমতিগর্হিতং ।

দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধকপিণা ॥

বৌদ্ধশাস্ত্রমসংপ্রোক্তং ন্যমীলপটাদিকম্ ।

মায়াবাদমসচ্ছাত্তং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে ।

মটৈব কথিতং দেবি কণৌ ব্রাহ্মণরূপিণা ॥

অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ন্ লোকগর্হিতং ।

কর্নুষরূপতাজাস্ত্রমত্র বৈ প্রতিপাদ্যতে ॥

সর্ব্বকর্নুষপরিভ্রষ্টং বৈষম্যাস্ত্রং তদুচ্যতে ।

পরেণ জীব্যোঃ বৈক্যং যথা তু প্রতিপাদ্যতে ॥

ব্রহ্মণোহস্ত স্বয়ং রূপং নিগুণং বক্ষ্যতে ময়া ।

সর্ব্বস্ত জগতোহপাত্র মোহনার্থং কণৌ বুগে ॥

বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়য়া যদবৈদিকং ।

মটৈব বক্ষ্যতে দেবি অগতাং নাশকারণাং ॥

হে দেবি ! আমি যথাক্রমে তামস-শাস্ত্রসকল বর্ণন করিতেছি । এই সকল শাস্ত্রের অবগমাত্রে জ্ঞানিগণেরও পতন হইয়া থাকে । আমি প্রথমে পান্তুপতাদি

শৈব-শ্রদ্ধকল কীর্তন করিয়াছি। পরে আমার শক্তাবিষ্ট ব্রাহ্মগণের দ্বারা যাণী কথিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করা। কনাদ-কর্তৃক বৈশেষিক দর্শন, গোতম কর্তৃক জ্ঞান, (অগ্নিবংশীক) কল্কি-কর্তৃক সাংখ্য, ব্রহ্মস্পতি-কর্তৃক অতিগণিত চার্বাক-মত, দৈত্যাগণের ন্যায়জন্তু বুদ্ধজলী-নিয়ু-কর্তৃক অসং বৌদ্ধশাস্ত্র এবং আমি স্বয়ং প্রচ্ছদ-বৌদ্ধ এবং মায়াবাদ-শাস্ত্র কতিয়ছি। শ্রুতি-শাকোর লোক-নির্মিত মন অর্থাৎ লোকের কথিতা কর্মস্বরূপের সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য প্রদর্শন করিয়াছি। সর্বকর্ম পরিত্যাগ নিঃশেষেই (শূন্য) স্বরূপ। ইন্দ্র ও ক্ষীরের একত্ব এবং স্বয়ংরূপ ব্রাহ্মের নিঃস্বর্ণিত্ব আমা-কর্তৃক কথিত হইয়াছে। জগতের মোক্ষমার্গ ও জগৎপ্রবেশের বৈদার্ষন্য মায়াবাদ-শাস্ত্র আশ্রিত বলিয়াছি।

অতঃপর কামদ পুরাণ ও কামদ স্মৃতিসকল কতিয়ছি, তাহা যথাক্রমে শ্রবণ করা,—

বৈষ্ণবঃ নারদীকঃ তথা জংগলঃ কুং ।

গাকুডক তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে ।

সাস্তিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ ।

ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ ।

অবিষ্ণুং কামদং বাক্ষ্যঃ বাজসানি নিবেদয়ে ॥

মাংজং কৌর্মুং তথা লৈলং তৈলং স্কান্দং কথৈব চ ।

স্বায়েকং যন্তেকানি তানসানি নিবেদয়ে ॥

সাস্তিক্য মোক্ষদাতাঃ পোক্ষা বাজসানি সর্গদাতাঃ শুভাঃ ।

কৌর্মুং তানসানি নিবেদয়ে প্রাপ্তিহেতবঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, নিয়ুপুাণ, ললুপাণ ও বরহপুাণ, নারদীয়পুাণ ও গাকুডপুাণ — এই ছাটী শুভফলজনক সাস্তিক-শাস্ত্র। ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, ব্রাক্ষ, মার্কণ্ডেয়, অবিষ্ণু ও বাজস— এই ছাটী বাজস-পুরাণ এবং মাংজ, কৌর্মু, লৈল, স্কান্দ ও কথৈবপুাণ— এই ছাটী ভাগবত-পুরাণ। সাস্তিক পুরাণসকল মোক্ষদাতা, বাজসিক পুরাণসকল সর্গকল-কামদকারী এবং কামদ পুরাণসকল মরকপ্রাপ্তির হেতু। অর্থাৎ এই ত্রিবিধ পুরাণের পাঠ্য শ্রবণ বা তদুচ্চায়ী কার্য্য করিলে যথাক্রমে মোক্ষ, সর্গ ও মরক-প্রাপ্তি হইবে প্রত্যেক। অতঃপরে জগদ্গুরু ভগবান্ শঙ্ক স্বয়ং উদ্ভূত নিয়ুপুাণের (শিবপুরাণ, নিয়ুপুাণ নিব) শিক্ষা করিতেছেন। এইসকল ভাগবত-পুাণ শিবের শ্রেষ্ঠ ও মাংসা-অদিক কীর্তিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি নিজে ইহা-পুাণের স্বন্দফল বর্ণন করিয়া বিষ্ণুর মহাত্ম্য-স্বচক

সাত্তিক পুরাণ সকলেরই শ্রবণ-কীর্তনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।
অতএব ইহাতেই যদি আমাদের চৈতন্য না হয়, তবে আমরা নিতান্ত
মন্দভাগ্য জ্ঞানিতে চইব।

তপৈব স্মৃতয়ঃ প্রোক্তা ঋষিভিঃশ্রুতান্বিতাঃ ।

সাত্তিকা রাজসাত্তৈব তামসা শুদ্ধদর্শনে ॥

বাদিষ্টকৈবকারীতং বাসং পরাশরং তথা ।

স্বায়ংবাকং কাম্যপঞ্চ সাত্তিকা মুক্তিদাঃ শুভাঃ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যং তথাক্রৈয়ং তৈত্তির্যং দাক্ষমেব চ ।

কাত্যায়নং বৈষ্ণবঞ্চ রাজস্যাঃ স্বর্গদাঃ শুভাঃ ॥

গৌতমং বৃহস্পতিঞ্চ সাধর্ভঞ্চ যমং স্মৃতং ।

শাঙ্খ্যং চৌশংসং দ্বিবি তামসা নিরয়প্রদাঃ ॥

ত্রিগুণান্বিত স্মৃতিসমূহের কদাচ এতৎ করা বলিষ্ট, হারীত, বাস, পরাশর,
ভরদ্বাজ কাম্য-লিখিত স্মৃতিসকল মোক্ষদায়ক সাত্তিক-স্মৃতি। যাজ্ঞবল্ক্য অত্রি,
তৈত্তিরি, দক্ষ, কাত্যায়ন ও বিষ্ণু-কথিত স্মৃতিসমূহ স্বর্গপ্রদ রাজস-স্মৃতি এবং
গৌতম, বৃহস্পতি, সাধর্ভ, যম, শঙ্খ ও শুক্রাচার্য্য-কথিত স্মৃতিসকল নরকপ্রদ
তামস-স্মৃতি।

কিমত্র বহুনোক্তেন পুৰাণেষু স্মৃতিষণি ।

তামসা নরকাতৈব বর্জয়েত্তান্ বিচক্ষণাঃ ॥

এতলে অধিক বক্তব্যের প্রয়োজন কি? স্মৃতি ও পুরাণসকলের মধ্যে
তামস-শাস্ত্রগুলি নরকেই হেতু। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তির তাহা পরিত্যাগ
করা কর্তব্য।

মার্কঃ প্রয় পুরাণানুগত চণ্ডী রাজসি কাম্যল—স্বর্গ দান করে অর্থাৎ চণ্ডীপাঠ
বা চণ্ডীর উপাসনা দ্বারা স্বর্গলাভই শেষ ফল। কেহ কেহ চণ্ডীকে মোক্ষদায়িকা
কল্পনা করিতে পারেন, কেহ বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া রাজস-প্রকৃতির
লোকসকলকে মুক্ত করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে কেবল লোকবঞ্চনা
হয় যাত্র।

আমরা ভবিষ্যৎ শাস্ত্র-উল্লিখিত শাস্ত্রসকলের বিশেষ বিচার প্রদর্শন করিব।

—ত্রিদিবসমী ত্রীমন্ত্রিত্তিভুদেব জ্যোতী মহারাজ

শ্রী রথযাত্রা-দর্শন

সুখে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিজ্ঞতে ।

ইহা শুনি অনেকে যান রথযাত্রা দেখিতে ॥

কিরূপ দর্শনে হয় সংসার মোচন ।

বিচার করিয়া দেখ সাধু ভক্তগণ ॥

ভক্তি বিনা তত্ত্বদর্শন ক'ভু নাহি হয় ।

বেদে ভাগবতাদিতে পুনঃ পুনঃ কয় ॥

সাধারণ দর্শনে হয় শুকুতি অর্জন ।

তাত্ত্বিক দর্শনে হয় সংসার মোচন ॥

তাত্ত্বিক দর্শন অর্থে 'স্বরূপ দর্শন' ।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—তত্ত্ববস্তু হন ॥

জগন্নাথ-বিষ্ণু-কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।

পুরীতে বিজয়মূর্তি কবেন প্রমাণ ॥

“ঈশ্বরতত্ত্বে ভেদ মানিলে অপরাধ হয় ।

শ্রীমদপ্রভু বেক্ষটভট্টে এ সিদ্ধান্ত কয় ॥”

(চৈঃ চঃ মঃ ৯। ১৫৫)

বামন গৌর জগন্নাথ ভিন্ন ত'হ নন ।

যা'যাবল্ল সদা যাচে তাত্ত্বিক দর্শন ॥

ঐ তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি

স্বরয়ঃ দিবীং চক্ষুরাততম্ ।

তদ্বিপ্রাসো বিপশ্যতো জাগ্ৰবাসঃ

সমিধতে বিক্ষোষং পরমং পদম্ ॥ (ঋগ্বেদ ১।২২।২০)

অনুবাদ—আকাশে অবাদে স্বর্গালোক লাভে চক্ষুঃ যেমন সর্বত্র দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়, জ্ঞানিভক্তগণ তেমন পরমেশ বিষ্ণুর পরমপদ সর্বদা প্রত্যক্ষ করেন । ভ্রম-প্রমাদাদিদোষবর্জিত ভগবদ্বিষ্ট সাধুগণ শ্রীবিষ্ণুর যে-পরমপদ দর্শন করেন, তাহা সর্বত্র প্রকাশ করেন ।

“ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি

ভক্তিৰশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী । (মাধ্বশ্রুতি ৩।৩।৫৩)

অনুবাদ—ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান; সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ, ভক্তিই সর্গশ্রেষ্ঠা।

বদন্তিতত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ঞজ্ঞানমদ্বয়ম্ ।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্নিত্তি শব্দ্যতে ॥ (ভাঃ ১।২।১১)

অনুবাদ—তত্ত্ববিদগণ অবয়বজ্ঞানে তত্ত্ব বলেন। সেই অবয়বজ্ঞানের প্রথম প্রতীতি ব্রহ্ম দ্বিতীয় প্রতীতি পরমাত্মা ও তৃতীয় প্রতীতি ভগবান্ ।

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্লুশঃ

স্মরন্তি নন্দন্তি তর্বেহিতং জনাঃ ।

ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ ভাবকং

ভবপ্রবাহোপরমং পদাসুজম্ ॥ (ভাঃ ১।৮।২৬)

অনুবাদ—যে সকল ব্যক্তি তোমার চরিতকথা বারবার শ্রবণ, কীর্তন, উচ্চারণ কিম্বা অস্ত্রে কীর্তন করিলে আদর করেন, তাঁহারা ই জন্মপরম্পরা-নিবর্তক তোমার চরণারবিন্দ অবিলম্বে দর্শন করেন ।

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সত্যম্ ।

ভক্তিঃ পুনাতি মল্লিষ্ঠা স্বপাকানপি সন্তুবাৎ ॥

(ভাঃ ১।১।১৪।২১)

অনুবাদ—শ্রদ্ধাজনিত অনন্ত ভক্তিপ্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগণের লভ্য হইয়া থাকি । একাগ্রদেহ-সম্পন্ন ভক্তি চণ্ডালগণকেও পবিত্র করিয়া থাকে ।

যথা যথাত্মা পরিমূঢ়্যতেহসৌ, মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ ।

তথা তথা পশ্যতি বস্ত্র সূক্ষ্মং, চক্ষুর্যথৈবাজনসম্প্রযুক্তম্ ॥

(ভাঃ ১।১।১৪।২৬)

অনুবাদ—মানবচিত্ত মদীয় পুণ্যচরিত শ্রবণ-কীর্তন-দ্বারা যে-পরিমাণ বিভক্তি লাভ করে, অজ্ঞান-প্রয়োগযুক্ত চক্ষুর ন্যায় ততই সূক্ষ্মবস্ত্র অর্থাৎ অধোক্ষজ-তত্ত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হয় ।

ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিত্তে সর্বসংশয়াঃ ।

কীমন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেহখিলায়নি ॥

(ভাঃ ১১।২০।৩০)

অনুবাদ—সর্বান্তর্গামী পরমাত্মরূপী আমার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে
জীবের অঙ্কার নিমিষ্ট, সর্ব সংশয় ছিন্ন এবং কর্ম্মরাশি ক্ষীণ হইয়া থাকে ।

ভক্ত্যাভ্যাসনায় শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন ।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরম্পর ॥ (গীতা ১১।৫৪)

অনুবাদ—ও অর্জুন ! এতাদৃশ রূপগণিক আমি কিন্তু অন্য প্রকারে
দূর্বভদর্শন হইলেও ঐকান্তিকী ভক্তিদ্বারা শুদ্ধ ভক্তগণ আমাকে যথার্থরূপে
জানিতে ও দেখিতে এবং আমার লীলায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় ।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান যচ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।

ততো গাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

(গীতা ১৮।৫৫)

অনুবাদ—সেই পরাভক্তি-প্রভাবে আমার ঐশ্বর্যময় ও মাধুর্যময় স্বরূপ-
দ্বয় সম্যক জানিতে পারেন এবং তৎপর স্বরূপগত সম্বন্ধজ্ঞান উপলব্ধি করিয়া
আমার অভিন্নস্বরূপ অন্তরঙ্গ পরিকরণের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেন ।

প্রেমাজনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন ।

সন্তঃ সর্দৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।

যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যত্বগস্বরূপং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩৮)

অনুবাদ—প্রেমাজনদ্বারা বঞ্জিত ভক্তি-চক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্য-
ত্বগবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর রূপকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ
গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ।

(পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিবাসী)

শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবিচার বাবাবর মহারাজ

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রী গুরুনাথপদ্য নিত্যগীতাংশিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী

শ্রীমন্ত্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

প্রভুবরের পঞ্চদশবর্ষপুন্তি বিরহ-বাসরে

প্রার্থনা

জয় জয় গুরুদেব শ্রীমন্ত্তিপ্রজ্ঞান ।

জয় জয় ঙ্গদগুরু করুণা নিদান ॥

তব তিরোভাব-তিথি এসেছে আজিকে ।

এ' তিথি পূজনে মোরা মিলেছি শ্রীমঠে ॥

বছরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দামোদর মাস ।

তৎ প্রারম্ভে পূর্ণিমাতে শ্রীকৃষ্ণের রাস ॥

পঞ্চদশ বর্ষ আগে হেন পূর্ণিমা-রাত্রে ।

মোদেরে ত্যজিয়া তুমি গিয়াছো গোলোকে ॥

সেথা রসরাজ-সাথে রাসমঞ্চ' পরে ।

খেলিছ প্রাণের খেলা সদা প্রীতিভরে ॥

হেথা তব অদর্শনে মোরা কাঁপি ত্রাসে !

হৃদ্দিন-মেঘ ভরে উঠে চারিপাশে ॥

তুমি নাই যেথা প্রভু সেথা অন্ধকার ।

তোমা'বিনা এ জীবনে শূন্য চারিধার ॥

কোথা যাব, কা'রে ক'ব, আমার এ' বেদনা !

কোথা' এ' তাপিত প্রাণে পাইব সান্ত্বনা !!

তব অন্তর্দ্বানে মোরা অনাথ, অসহায় ।

বিরহ-আগুনে মোদের হৃদি জ্বলি' যায় ॥

এ ভৌম প্রপঞ্চে তুমি আসিবে না আর ।

—হেন ভাবনায় আজি করি হাহাকার ॥

তব বিচ্ছেদগত ভাব শ্রেষ্ঠ ভজন ।

ইথে মোদের আকর্ষিতে কৈলে অন্তর্দ্বান ॥

বিরহের মর্মান্তিক বেদনা-মাধ্যমে ।
 তব পূর্বস্মৃতি জাগি' আনন্দ প্রদানে ॥
 তব গুণ মহিমার বৈশিষ্ট্য কীর্তন ।
 এ' তিথি পূজার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ন ॥
 গোলোক হইতে তুমি আসি' এ' নৃলোকে ।
 গুরুরূপে দেখা দিলা মোদের সম্মুখে ॥
 তোমার বৈভব ভূ-ভারতে বিস্তারিল ।
 মোদের অন্তরে তব প্রভাব পড়িল ॥
 নিত্য হরিকথামৃত করিয়া বর্ষণ ।
 অসংখ্য জীবের চিত্ত করিলা শোধন ॥
 'বৈদান্ত সমিতি' নামে স্থাপিয়া মিশন ।
 ভজন-প্রণালী তথ্য কৈলে সংরক্ষণ ॥
 দেশে দেশে বহু মঠ করিলা স্থাপন ।
 শ্রীহরি-সবার সুযোগ করিলে প্রদান ॥
 ত্রয়োদশ প্রকার যত অপসম্প্রদায় ।
 তোমার সিদ্ধান্ত শুনি' ভয়েতে লুকায় ॥
 তব সম নাহি দেখি বৈদান্তিক পণ্ডিত ।
 শ্রীমদ্ভাচার্য্য-সম খণ্ডিলে মায়াবাদ ॥
 দুর্ব্বার, হুজুয় তুমি—নিঃশঙ্ক হৃদয় ।
 প্রভুপাদের দাসরূপে তব পরিচয় ॥
 শ্রীল গুরুদেব সত্য, সবার উপরে ।
 গুরুভক্তি-দ্বারা তাহা জানালে সবারে ॥
 একদা শ্রীপ্রভুপাদ পড়িলে সঙ্কটে ।
 নিজ-প্রাণ তুচ্ছ করি' রক্ষিলে তাঁহাকে ॥
 তব গুণ-বর্ণিবার মোর শক্তি নাই ।
 পূজ্যপাদ বৈষ্ণব-মুখে শুনিবারে চাই ॥

এ' বিরহ-বাথা হোক আরও তীব্রতর ।
 তব স্মৃতি স্মরি' জাগুক আনন্দ প্রচুর ॥
 গোড়ীয় ভাস্কর তুমি, সুসিদ্ধান্ত-ভূপ ।
 তব অসমোদ্ধ দান আজো সঞ্জীবিত ॥
 ভগবানু আছে সত্য, কে দেখেছে তাঁরে ?
 তোমার আশ্রিত শিষ্যই দেখিবারে পারে ॥
 তোমার দেবত্ব যীর সুদৃঢ় বিশ্বাস ।
 সেই উদ্ধারিতে পারে জিহ্বা' মায়াপাশ ॥
 তুমি মোর কর্তা-কর্তা তুমিই মালিক ।
 কৃপা করি মোর অনর্থ কর দূরীভূত ॥
 পিতার সম্পত্তি যেমন পুত্র পেয়ে থাকে ।
 তেমনি তোমার কৃষ্ণে দিও গো আমাকে ॥
 আত্মসমর্পিত আঞ্জি তোমার চরণে ।
 নিজগুণে উদ্ধারহ এ দীন অভাজনে ॥
 তোমার অর্চন ও মনোহভীষ্ট পাশন ।
 —এই ছই সেবায় তব হয় সন্তোষণ ॥
 কৃপা কর যেন তব আনুগত্যে থাকি' ।
 তব প্রীতিময়ী সেবা করি দিবারাতি ॥
 ভক্তিপুষ্পে ও তদগতচিত্ততা-চন্দনে ।
 তোমার চরণ পূজে শুদ্ধভক্তগণে ॥
 এ' ভক্তিহীনের তাহা নাহি তো সম্বল ।
 সাধন-ভজনে আমি বড়ই দুর্বল ॥
 অশ্রুজলে পাছ-অর্ঘ্য করি নিবেদন ।
 প্রণমি' তোমায়, দাস্য মাগি সর্বক্ষণ ॥

শ্রীগুরুবিরহ-বাসর

২৯ পদ্মনাভ, ৪৯৭ গৌরাক

ইং ২১/১০/১৯৮০

ভবদীয় পাদপদ্মের কপায়েণু-প্রার্থী—
 শ্রীচিন্তরঞ্জন মণ্ডল,
 গ্রাম—বড়বহরকুলি (বর্ধমান)।

একটি পত্র

। শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ ভবন : ॥

নিশিগঞ্জ (কোচবিহার) ।

তাং ৫/৯/৮৩ ইং

শ্রী শ্রী বৈষ্ণবচরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডমুখিতিপূর্ব্বকৈঃ—

পূজাপাদ শ্রীল ভক্তিবোদ্ধা আচার্য্য মহারাজ ! আপনার শ্রীচরণে এ অধমের সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম রূপা করে স্থান দিবেন। মহারাজ ! আমার সংশয় সংশোধনের জন্য অনশ্রুই দয়া করিয়া এই পত্রোত্তর দিবেন—এই প্রার্থনা জানাই।

সংস্কৃত শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াও দেখা যায় যে, কেহ কেহ বাসপূর্ণিমা পালন করতঃ প্রতিবৎসব আড়ম্ববে সজ্জিত বাজি জাগরণ ও নিশিরাত্রিতে (রাত ১২ টার) ঠাকুরের ভোগ দেন—ইহা কি শাস্ত্র-সম্মত ? আবার কেহবা উথান একাদশীতে জাগরণ করিয়া বাতের চাব প্রভরে চাববার ঠাকুরকে নৈবেদ্য দিতে গিয়া অনাচারী তথাকথিত পুরোহিতের দ্বারা অর্চন-পূজন করান। যিনি বা যাহারা শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি বা তাঁহার উক্ত কার্য্য ঐভাবে করা শি শাস্ত্র সম্মত ? এতদ্বাতীত যাহারা মাদক-দ্রব্য বা মেশা খায় তাহদের দ্বারা পাচিত অন্ন ঠাকুরকে নিবেদন করিলে তাহা কি যথার্থক প্রসাদ হয় ? সেই কথিত প্রসাদান্ন শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করেন কি ? আমরা যথাশ্রিত ভক্তগণ সেইরূপ প্রসাদ গ্রহণ করিলে ক্ষতি হইবে কিনা, দয়া করে পত্র পাঠ জানাইলে বিশেষ প্রার্থনা। আশাকরি আপনি আমার উপেক্ষা না করিয়া নিশ্চয়ই যথাযথভাবে জানাইবেন। এর দ্বারা আমরা এখানে সেই বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিব। নিবেদন ইতি—

প্রণত দাসাধম—

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসাধিকারী,

গ্রাম—শিকটীবাড়ী ;

পোঃ—নিশিগঞ্জ (কোচবিহার) ।

পত্রোত্তর

॥ শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিগাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জিলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

ফোন : এন্-ভি-ডি—২৪৭

তাং—২২/১২/৩০ ইং

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্দিতপূর্বিকৈধম্—

শ্রীপাদ প্রভুজী! পত্রে এ অধমের দণ্ডবৎ অঙ্গীকার করিতে প্রার্থনা। আপনার কৃপালিপিকথানি আমার হাতে পৌঁছিতে বিলম্ব হওয়ায় উত্তর দিতে কিছু বিলম্ব হইতেছে। কারণ আমি গত ১৭/৮/৩০ তারিখে আসামের দিকে অর্থাৎ সেখান হইতেই মেঘালয় প্রভৃতিস্থানে ভ্রমণ করিয়া শ্রীরাধাষ্টমীর পূর্বদিন এখানে প্রত্যর্জুন করি। এসে এত ব্যস্ত হইয়া পবি যে, উত্তর দিতে স্বল্প বিলম্ব হইল। আপনি কৃপাপূর্বক এ অধমের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করিবেন—প্রার্থনা জানাই।

শ্রীরাঙ্গপূর্ণিমা উপলক্ষে রাত্র ১২ টার সময় শ্রোগ দেওয়ার নিয়ম আমাদের শ্রীমাদ্ভবত গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে দৃষ্টি গোচর হয় না। বিশেষতঃ অনধিকারী বা অনর্থ-নিপীড়িতের পক্ষে স্বাস-পঞ্চাষায পদস্পর্শ আলোচনা করা যথাযথ বিধেয় নহে। তবে কোন দৃঢ়নিষ্ঠ শ্রদ্ধালু ব্যক্তি পরম ভাগবতগণের শ্রীমুখে সেই শীলা স্মরণ সম্বোধনে আন্তরিক সহিত করিয়া থাকেন মাত্র। তাহা কোন প্রতিষ্ঠা বা জড়ীয় আশা র বশবর্তী হইয়া নহে। এতদ্ব্যতীত ঐরূপ আচরণ আমাদের স্ত্রী স্বামীর ব্যক্তিগণের কল্যাণ অপেক্ষা অনর্থগ্রস্ত হওয়াই সম্ভাব্য। কেননা চিল্লাল বা অপ্ৰাকৃতরস বা সেই আনন্দ কথা প্রাকৃত বা জড়রস-গ্রন্থের স্থান নহে। প্রাকৃত রসাপাদন—উচা প্রেম নহে—“কাম” নামে আখ্যাত হইয়াছে এবং উচ্চ জীবের পক্ষে বিড়ম্বনার প্রদীপ্ত সরণি।

অংগেন্দ্রিয়-প্রীতিবাহু—তারে বলি ‘কাম’।

কৃৎসেন্দ্রিয়-প্রীতিবাহু ধরে ‘প্রেম’ নাম ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪:১৬৪)

তবে শ্রীরাঙ্গমাত্রা উপলক্ষে বিবিধ বাজনাদি বা উপকরণাদি শ্রীরাঙ্গা-গোবিন্দকে যথারীতি নিবেদনে দোষণীয় নহে পরন্তু তাহা করাট উচিত। কিন্তু রাত্র ১২টার সময় দিতে হইবে ঐরূপ বিধান বা নির্দেশ আমরা গুরুবর্গের নিকট হইতে পাই নাই। অতএব পাকামো করিতে গিয়া উচা অতিবাড়ী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

শ্রীঊর্ধ্বানেকাদশীতে জাগরণে দোষ নাই। কেননা সকল একাদশীতে শ্রীহরিনাম কীর্তনমুখে জাগরণের বিধান আছে। কিন্তু রাত্রির চারি-প্রহরের মধ্যে প্রতিপ্রহরে ঠাকুরকে জাগরিত করা ইহা স্মার্তাচার মাত্র। কারণ আমার ভক্ত ঠাকুরকেও কেণে থাকতে হইবে ইহা দেবাপ্রাণ ঐচ্ছান্তিক ভক্তের লক্ষণ নহে। স্মার্তাচার কখনই শুদ্ধা ভক্তিদান করিতে পারেনা। কেননা ইহার লক্ষ্য দেবের প্রীতির অন্তরালে দেবকের কিছু লাভাকাঙ্ক্ষা বয়ে থাকে। যেখানে লাভাকাঙ্ক্ষা, তাহা কখনও কর্মমিশ্রা, কখনও জ্ঞানমিশ্রা এবং কখন বা হৃদভক্তিহীন পরিণত হয়। কিন্তু প্রকৃতে তাহা দ্বারা কখনই প্রেমভক্তি লাভ হয় না। সাধারণ জগতের লোক ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি কাহাকে বলে সেটা বুঝিতে না পারিয়া সবগুলিকে একাকার করিতে গিয়া অনর্থগ্রস্ত হইতে বাধ্য হয়। জড়ীয় রসাস্বাদন দ্বারা অপ্রাকৃত রস কখনই আস্বাদন যোগ্য নহে। সুতরাং যদি কেহ ভক্তিগুরে শ্রীনায়ে মাতোয়ারা হইয়া শ্রীহরিবাসর-তিথিতে রাত্রি জাগরণ করেন (উপবাসী থাকিয়া)— তাহা নিশ্চয়ই ফলাগ্নপদ—তিনি নমস্। এতদ্ব্যতীত অঙ্গুলি চলনা বিভ্রাট হওয়ায় বাতুলতা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

যাহারা শুদ্ধবৈষ্ণবচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তিনি সর্বদাই তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মে তথা পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দের আনুগত্যেই আনুষ্ঠানিকাদি করিবেন। আনুষ্ঠানিক দীক্ষা গ্রহণ করিলেই শেষ নহে, পরন্তু শ্রীগুরুপ্রদত্ত আদেশ-নির্দেশ পালন করিলে তবেই তাহার সুফল লভ্য হইয়া থাকে। নচেৎ শুধু স্কুলে ভর্তি হইলাম কিন্তু পড়াশুনা না করিলে যেমন পণ্ডিত হওয়া যায় না সেইরূপই অবস্থা হয়। পরন্তু যখন পড়াশুনার চাপ আসে বা আগ্রহ থাকিলে উচ্চ শিক্ষা লাভের আশা থাকে। সেইরূপ দীক্ষা লইলে তাঁহার চরিত্র বা জীবন গঠনের সোপানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেবামূলে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব আত্মকল্যাণকামী যিনি, তিনি সেব্যের প্রীতি-বিধানের ক্ষুদ্র সেবার ত্রুটি চাইবেন। লৌকিক, কৌলিক, সামাজিক এমন কি কর্মকাণ্ডীয় বৈদিক-নীতিকে বর্জমান করিবেন না; বিশ্রুত সেবক-গণের ইহাই বৈশিষ্ট্য।

যিনি শুদ্ধভক্তের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কখনই পতিতা-শ্রীলাষী কর্মকাণ্ডীয় তথাকথিত পুরোহিতের দ্বারা প্রহরে প্রহরে পূজার ব্যবস্থা করিবেন না। কেননা যাহারা পতিত অর্থাৎ অনর্থ পিপাসী সেইরূপ ভাড়াটিয়ার দ্বারা আত্মাত্মিক অর্থাৎ নিভামঙ্গল কখনই লাভ তো হইবেই না;

উপরন্তু ভগবচ্চরণে অপরাধী হইতে হইবে। তাই দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত নিজেই প্রভুর সেবায় উৎসর্গীকৃত হওয়া সর্বদাই কল্যাণপ্রদ।

যাহারা শুদ্ধাচারী নহে তাহার দ্বারা সাত্ত্বিক হইবে কোথেকে? পাথরের 'সোনার বাটী' তওয়া কখনও কি সম্ভব? পাথর ত পাথরই বটে, সুতরাং উহা আবার স্বর্ণ হয় কি করিয়া? অতএব অনাচারীর পাতিতদ্রব্য কল্যাণযুক্ত অর্থাৎ অপবিত্র। সুতরাং হুধি-সমাজে ইহা অবশ্যই বিচার করিয়া থাকেন।

মাজক-দ্রব্যাদি কলির প্রিয়স্থান। সুতরাং সাত্ত্বিকগণ কি করিয়া তাহা অনুমোদন করিতে পারেন? এসিড খেয়ে স্বাস্থ্য করার কল্পনা যেমন—উহাও তদ্রূপ অবাস্তব। অনেক সময় হুদিধাবাদী তথাকথিত ভক্তগণ বলে যে, "দেবাদিদেব মহাদেব তো গাঁজা-ভাং গ্রহণ করেন,—সুতরাং আমাদের গ্রহণ করিতে দোষ কি? এর দ্বারা সে যেন প্রতিপন্ন করিতে চায় যে, সেও "শিব" তুণ্য হইয়াছে। কিন্তু সেট বেকুব ভাবেনা যে, শিবের অধিকার বা ক্ষমতা যেক্রপ তাহার এককণা মাত্রও সে-অধিকার কি নিজে লাভ করিয়াছে?

সাধকজীব ও মুক্তজীবের অবস্থা এক নহে। শুদ্ধভক্ত কি গ্রহণ করিতে পারিবেন আর না পারিবেন তাহা বলিবার অধিকার মানুষ অধমের নাই। তবে শুদ্ধভক্তগণ যদিও বিধি গ্রহণে বাধা নন, কিন্তু তাই বলে তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খল বা বিধি লঙ্ঘনকারী—এমন নহেন। পরন্তু তথাকথিত ব্যক্তির বা কর্মকাণ্ডীষণ বিধির কথা কপচাউয়া অবিধি করিয়া বসেন। ভগবৎ সেবার অনুকূল যাহা—তাহাই যথার্থ বিধি। এতদ্বাতীত সবই অবিধি জানিবেন। সাধক জীবগণ সর্বদাই পরম ভাগবতের অনুসরণ করেন। তাঁহারা দৃঢ়ভাবে বিধি-নিষেধ মানিবার চেষ্টা করেন। সুতরাং তাঁদের পক্ষে তো আরও সাপধান তওয়া যুক্তিসূক্ত। সাধক অবস্থাতেই যদি দিচ্চ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া হয় তবে তাহা অবশ্যই হর্ভাগ্যজনক।

এমতাবস্থায় আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিবার চেষ্টা করিলাম, শ্রীপ গুরুপাদপন্থের ও বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে যাক। শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাহা নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া বাক্ত করিলাম যাত্র। কাহারও প্রতি কোন আক্রোশ বা ঈর্ষাবশত্ব নহে। আপনারা দয়া করিয়া শুদ্ধভক্তি-যাজনে ব্রহ্মী থাকিবেন এবং অধমের প্রতি অশ্রদ্ধা কৃপা রাখিবেন ইহাই বিনীত প্রার্থনা। অত্রস্থ বৈষ্ণববৃন্দ কুশলে আছেন। তত্রস্থ সঙ্কল বৈষ্ণববৃন্দকে দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইতেছি ইতি—

(ত্রিদিগ্ভিক্ষু) শ্রীভক্তিবেদান্ত আচার্য্য

মানবজীবনের সার্থকতা কোথায় ?

বহু বড় জন্ম-জন্মান্বয়ের পর এই সুহৃৎ মনুষ্য-জন্ম লাভ হয়। “এই সুহৃৎ মনুষ্যজন্মের সার্থকতা কোথায় ? তাহা মনুষ্যজন্মেরই বিবেচনা করা একান্ত কর্তব্য। এই ভাবটীতে আগমন করত নিম্নলিখিত মায়াকর্তৃক আশিষ্টিত হইয়া জীব মায়িক বস্তুর সেবায় আত্মবলিদানপূর্বক তদ্বিষয়ে কর্তব্য-সাধন-তৎপরতাকেই মনুষ্য জীবনের একমাত্র সার্থকতা বলিয়া মনে করে এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে করিতে কালের স্রোতে ভাগিতে থাকে।

মায়াদেবীর বিচিত্রতাপূর্ণ রাজত্বে নখন ও মনোমুগ্ধকর বস্তুর বিচিত্রতা দর্শন করিয়া নিত্য নবনবায়মান ভোগ করিবার স্পৃহা বদ্ধজীবের হৃদয়-অন্তঃপুরে গুপ্তভাবে লুক্কায়িত থাকিয়া তাহার ঐশ্বর্য্য ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করাকেই মানবজীবনের সার্থকতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাচ্ছে। ঐশ্বর্য্য ভোগরূপ বঞ্চককে পরমাত্মীয়বোধে তাহার মধুপুষ্পিত বাক্যগুলিই অর্থাৎ তাহার বঞ্চনাময়ী প্রেরণাগুলি একমাত্র পালনীয় মনে করিয়া “কর্ত্তাচিন্তিত মনুষ্যে” এই বিচারে মনুষ্য যে-কোন কার্য্য করিতে যায়, তাহাতে মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য সাধনের পরিবর্তে মূলে আত্মাস্থিরিক ভোগ-স্পৃহাই থাকিয়া যায়। তখন দেহ-সম্বন্ধীয় স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয়স্বজনের ভরণ-পোষণাদি মাত্র মনুষ্যজীবনের সার্থকতারূপে প্রতিপন্ন হয়। এষ্ট প্রতিপন্ন বিষয় স্বচারণরূপে পালনের নিমিত্ত মনুষ্য তখন উর্দ্ধনিঃশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে মাহার দ্বারে অতিথি হইয়া দরজায় দাক্তা দিতে থাকে এবং আর্তনাদেব সজ্জিত ডাকিতে থাকে—কে আহ, শ্রীমদ্রজ্ঞা পোহ, আমি বিপন্ন। তখন মায়াদেবী মোহিনীমূর্ত্তিতে তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিতে থাকেন, “কে তুমি, তোমার প্রয়োজন কি ? কি জন্য তুমি এখানে আগমন করিয়াছ ?” তাহার উত্তরে ঐ জীব বলিতে থাকে,—অমি অর্থের প্রয়াসী হইয়া তোমার দ্বারস্থ হইয়াছি। তুমি আমার প্রতি সদয় হইয়া আমাকে কিছু অর্থ প্রদান কর। কেননা আমার ঐ অর্থের দ্বারা স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজনের সেবা করিয়া আমার এই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা করিব। মায়াদেবী তখন তাহার উত্তরে বলিতে থাকেন,—তুমি যদি কনকের প্রয়াসী হও, তাহা হইলে তোমাকে নিজ স্বাক্ষর ছাড়িয়া আমার নিকট আসিতে হইবে অর্থাৎ তোমার নিজের নিজেকে বলিদান করিয়া অমি যখন বাস্তব আদেশ করিব, সেই মুহূর্ত্তে তুমি অবনত মস্তকে পালন করিবা আমার

চিরকৃতদাস থাকিতে চাইবে—এই মর্মে প্রস্তুত থাকিলে কনক পাইতে পারিবে। তাতাও সুছল্লভ। তখন সেই জীব কাতর-স্বরে কবলোড়ে নিবেদন করিতে থাকে,—“আপনি যখন যাহা আদেশ করিবেন, তাহা আমি অবনতমস্তকে পালন করিব। ইচ্ছাতে আমার বিন্দুমাত্রও ত্রুটি হইবে না।”

কিন্তু হায়! হৃদৈবের ফের এমনট যে, ঐ জীব বিষয়-মোহ-মদিরায় প্রমত্ত হইয়া স্ব-স্বক্লেশের গুপ্তদাসত্বের কথা বিস্মৃত হইয়া পূর্তী, কপটী ভগ্নেশী, কয়াল-বদনী মাষার কর্কশ বাতাসগুলিও অতি আদরের মনে করিল; অমনি সে মাষার দাসত্বের ডোরে চিরতরে বন্দী হইয়া কনকভোগকেই জীবনের ব্রত করিয়া বসিল—কনক-কামিনী যে বাধিনী-স্বরূপ, তাহা তাহার বোধগম্য হইল না। ঐ অর্থ তখন তাহার জীবনকে অনর্থ বিজড়িত করিয়া জন্ম-জন্মান্তরের দুর্গিপাকে ফেলিয়া দিয়া পরম বা শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন যাহা, তাহা হইতে শতকোটি যোজন দূরে অবস্থান করাইল। বস্তুতঃপক্ষে ভড় অর্থের প্রয়াস ভাগ করিয়া পরমার্গ অর্জনের স্পৃহা জাগিলে নিত্যমঙ্গল বা শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন লাভ হইতে পারে।

কেহ কেহ ঐ প্রকার বিচারকে বহুমানন না করিয়া কর্মমার্গে নিজের জীবন উৎসর্গ করাকেই জীবনের যথাযথ কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু কর্মের নাগরদোলায় আরোহণ করত ভ্রমতে কর্মবীণে সাজিবার অজিলাষই কি মানব জীবনের সার্থকতা ?

কীবৎ কর্ম্মাণি কুর্ষ্যন্ত ন নির্বিঘ্নেত যাবত।

মৎসর্যশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাঃ জায়তে ॥ (ভৃঃ ১১।২০।৯)

অর্থাৎ যে-কাল পূর্বকর্তৃফলভোগে বিব্রত না হয় অথবা ভগবৎকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্রও না জন্মে তৎকাল পরীক্ষিত কর্ম্মসকলোই অহুষ্ঠান করিবে। কিন্তু বাহারা প্রস্তুত কর্তব্য সাধনের জন্য অর্থাৎ মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহারা ঐ প্রকার দৈহিক বা মানসিক সেবাকে চরম প্রয়োজন বিবেচনা করিবেন না। কেন না, এই যে পঞ্চভূতাত্মক দেহ, ইহা অনিত্য, কুকুর-শৃগালের ভক্ষ্য এবং এতমন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক; এই ভাল এই মন্দ, সব মনোবর্জ্য—হন যে-বিচারটিকে এক মিনিটের পূর্বে অতি উত্তম বলিয়া গ্রহণ করে, আবার পর মুহূর্ত্তে তাহা চূরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া দেয়া বাহারা নিজ নিজ জীবনের সার্থকতা সত্য করিতে চাছেন, তাঁহারা একবার সরল অন্তঃকরণে শীতৈতৎচরিতানুভূতের এই বাক্যটি বিচার করিবেন।

“ভারতভূমিতে হৈল মহাশয় জন্ম যার ।

জন্ম পার্থক্য করি’ কর পর উপকার ॥” (চঃ চঃ আঃ ২।৪১)

শ্রীমদ্বাহুপ্তে পরের উপকার করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু সে-উপকারের মুখ্য তাৎপর্য্য কি, তাহা মহাশয়জ্যেষ্ঠই বিচার করা কর্তব্য,—

“চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার ।

বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥”

চৌরাশীলক্ষ বোনি ভ্রমণ করিবার পর এই ভারতভূমিতে জন্মলাভ পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কেন না, এই ভারতভূমি তপোবন সদৃশ, এইখানে কত মুনি, ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়া আরাধনার দ্বারা শ্রীভগবদ্দর্শন লাভ করিয়াছেন এবং শ্রীভগবানও—

“পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সত্ত্বয়ামি যুগে যুগে ॥” (গীতা ৪।৮)

—এই বাক্য সফল করিবার জন্য যুগে নানা অবতাররূপে মাদৃশ পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য সাদোপাঙ্গ ও ধামসহ এই তপঃক্ষেত্র বা ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষেই আবির্ভূত হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন। এবং বিষ্ণুপাদোদক গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী প্রভৃতি যাবতীয় পুতা স্রোতঃস্রোতী প্রবাহিত হইয়া ভারতবর্ষকে সর্জনদা পবিত্র করিয়া জীবের পাপ নাশ করত শ্রীভগবানের পাদপদ্মে রতি উৎপন্ন করাইতেছেন। সুতরাং আমরা যাহারা এই প্রকার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে জন্মলাভ করিয়াছি তাহাদের পরম উপকার করা স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

বদ্ধজীবসমূহ নিজের ভোক্তার ভাসন গ্রহণ করিয়া ভোগবুদ্ধিতে ভগবানের বস্তুসমূহ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইতেছে। দৈনন্দিক ও মানসিক পুষ্ক-শান্তিই তাহাদের চরম কাম্য ; “ভজন্ত্য তং হাব্য নৈমিত্তিকং ধর্ম্ম প্রতিপালনে যত্নপর। স্বরূপ-জ্ঞান-সমক্ষে শাস্ত্র-কথিত আত্মধর্ম্মসমক্ষে তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। স্বরূপে অবস্থিত হইলে জানা যায় “জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস”— জীবের স্বরূপের বৃত্তি—কৃষ্ণের নিত্যদাসত্ব। এই অবস্থ্য লাভ হইলে আমাদের বোধগম্য হইবে যে,—

দৈশ্যবাস্তমিদং সর্ব্বং মৎ কিঞ্চ জগতাং জগৎ ।

তেন তাক্ষেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্তা সিদ্ধনমুঃ” (দৈশ্যোপনিষৎ ১।১)

“একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভূত ।

যাযে যৈছে নাচার, সে তৈছে করে নৃত্য ॥” (চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৪২)

একমাত্র প্রভু—শ্রীকৃষ্ণ, আর সব তাঁহার দাস ; তাঁহার দাসিত্ব করাই মানব-জীবনের সার্থকতা । স্বামী সেবাতে যেমন সন্তী জ্ঞার জীবনের সার্থকতা সেই প্রকার ভগবানের সেবাই সমস্ত শাঙ্কর মূল উপদেশ ।

“ন তে বিহঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং ছরাশায়া যে বহিরর্থমানিনঃ ।

অন্ধা স্বার্থকৈক্লপনীয়ামনাং হুপীশতন্ত্রামুরুদাম্মি বন্ধাঃ ॥” (ভাঃ ৭।৫।৩১)

গৃহকে যাহারা ত্রস্ত করিয়াছে, তাহাদের চিত্ত অমদগুণ হইতে অথবা আপনা হইতে বিদ্রা অন্যের দ্বারা কোনপ্রকারে ক্রোধে নিযুক্ত হয় না । তাহারা অজ্ঞানোন্মিয় হুণ্ডিয়া পুনঃ পুনঃ এই প্রকার ত্রিতাপময় সংসারে প্রবেশপূর্বক চরিত বিবয় চর্চণ করিতে থাকে ; যাহারা শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্য বিষয়সমূহকে বহু মানন করে, তাহারা সেইসকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া সকল স্বার্থের একমাত্র গতি যে বিষ্ণু তাহা জানিতে পারে না । অন্ধ যে-প্রকার অন্ধ অন্ধ-কর্তৃক চালিত হইয়া গর্তে পতিত হয়, প্রকৃত পথ জানিতে পারে না, সেইরূপ কর্মীগণ ভগবানের বেদ-রূপ দীর্ঘ রজুতে আবদ্ধ হইয়া কামা-কর্মে নিযুক্ত হয় ।

তাই নিজে অন্ধ হইয়া অপরকে পথ প্রদর্শন করিতে না যাইয়া সর্বাগ্রে নিজের জীবনকে স্বার্থের গতি যে একমাত্র বিষ্ণু, তাঁহার সেবায় সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করত নিজের আচার-প্রচারময় জীবনদ্বারা ভারতবাসীকে—শুধু ভারতবাসী কেন, সমস্ত পৃথিবীর জীবসমূহকে মায়া-পিশাচীর ক্রোড় হইতে ছিনাইয়া লইয়া ভগবানের অন্তর চরণারবিন্দের সেবায় লাগাইয়া দিতে পারিলে প্রথম উপকার করা হয় ।

অনেকে কর্ম হইতে নিকৃতি পাইবার জন্য শুদ্ধজ্ঞান অবলম্বন করিয়া ‘ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিশেষ’—এই প্রকার ধারণাপূর্বক ‘অহং ব্রহ্মাস্মি,’ ‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদি প্রাদেশিক বাক্যকে বহুমানন করত ত্রতনির্লীণ বা সাধুজ্য মুক্তিকে অভিলাষ করিয়া নিজকে মুক্ত মনে করেন । কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

যেহজ্ঞেরবিন্দ্যাক্ বিমুক্তমানিন-

স্বযাস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।

আকুহ্য কচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ

পতন্ত্যধোহনাদৃতযুদ্ধদজ্জয়ঃ ॥ (ভাগবতঃ ১০।২।৩২)

বাহার্য ভগবানের সেবাকে চরম বলিয়া বরণ করিয়াছেন—এই প্রকার ভক্ত বাতীত অঙ্গ যাহারা নিজদিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করে, শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিহীন অর্থাৎ তিনি দেখে, আমি তাঁহার ভক্তা এই প্রকার জ্ঞানহীন হইয়া যে ব্যক্তি ত্রিপুটী বিনাশ করত অর্থাৎ সেবা, সে'ক, সেবা—এই তিনটীকে বিসর্জনপূর্বক নিজে অস্তিত্ব গোপন করিতে চেষ্টে, তাহাদের যে বুদ্ধি বা জ্ঞান তাহা শুদ্ধ নয়, তাহাদের জ্ঞান শুদ্ধ। তাহারা শূন্য-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্র-সাধনের ফলে নিজদিগকে জীবমুক্ত বোধ করিয়া সকলের আশ্চর্যরূপ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম অনাদর করার অধঃপতিত হয়, অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর চীন অবস্থা লাগে হয়।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্ত্র নমস্ত এব

জীবন্তি সন্মুখরিতাঃ ভবদীয়বার্ত্তাম্।

স্থানে স্থিতাঃ প্রতিগতাঃ তদুবাচনোত্তি-

র্থে প্রায়শোহজিত-জিতোইপ্যসি তৈজিলোক্যাম্ ॥ (ভাঃ ১০।১৪৩)

যিনি জ্ঞানের প্রয়াস দূরে পরিত্যাগ করিয়া নিজের জীবন সার্থক করিবার আশায় ভগবদ্পরায়ণ সাধুসঙ্গ করত তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত বীৰ্য্যবতী ভগবদ-বাণী শ্রবণপূর্বক যে-কোন অবস্থায় থাকিলেও কায়মনোবাক্যে দ্বারা তাঁহার সেবায় রত থাকেন, ভগবান অজিত হইয়াও সেই প্রকার ভক্তের নিকট জিত হন। ঐশ্বর্য্যাস্ত্র সমগ্রস্ত বীৰ্য্যাস্ত্র যশসঃ শ্রিয়ঃ।

জ্ঞান-বৈরাগ্যযোগৈশ্চৈব যদ্বৈ ভগ উভীজনা ॥

(বিষ্ণুপুৰাণ ভাঃ ৪৯)

ভগবান্ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীৰ্য্য, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য এই প্রকার সমুদ্রবিধ ঐশ্বর্য্যময়। অদ্বৈতজ্ঞান পুরুষ নیرাকার নির্বিশেষ মন, তাঁহার যে বিশেষত্ব আছে তাহা আমার জ্ঞান কুণ্ঠমণ্ডকের দায়ণার অতীত। এই প্রকার অবাশ্তব বিচারকে পরিত্যাগপূর্বক নিজের সত্তাকে বিসর্জন দিবার বুদ্ধি না করিয়া শুদ্ধমতময় শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত হইলে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সার্থকতা সাধিত হয়।

ভক্তিস্বয়ি পিরতরা-ভগবান্ যদি জ্ঞাৎ

দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমুক্তিঃ।

মুক্তিঃ স্বাৎ মুকুণ্ডিতাজ্জলি সেবতেহস্মান্

ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥ (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক)

শ্রীভগবানে যাহার স্থিরতা, নিশ্চয়, অটল-ভক্তি অর্থাৎ “তিনি সেবা আমি সেবক, তাঁহার সেবাই আমার নিত্যধর্ম” এই প্রকার বিচার-পরায়ণ ব্যক্তির নিকটে শ্রীভগবানের দিবাকিশোর-মূর্ত্তি প্রকাশিত হন,—যাহারা “আমি ব্রহ্ম” এই প্রকার উচ্চারণকারী মহা-অপরাধী ব্যক্তিদিগের নিকট নয়। জন্মার্কি ব্যক্তি যে-প্রকার স্বার্থের মহিমা বুঝিতে সমর্থ নয়, সেই প্রকার মায়ামোহে অন্ধ ব্যক্তি শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি কি-প্রকারে দর্শন করিবে?

ভোগ-ত্যাগাক্ষ ব্যক্তিগণ নতজের জ্ঞান অধিষ্ঠিত নিজের প্রাণ বিসর্জন করে মাত্র, আর ভগবন্তের নিকট মুক্তিদায়ী করযোড়ে কৃতাজলিপুটে তাঁহার সেবা করিবার জন্ত অপেক্ষা করিতে থাকিবে। স্বার্থ, অর্থ, কামের কি কথা, ভক্তের সেবা করিয়া নিজেকে বঞ্চিত করিবার জন্ত মুক্তি পর্য্যন্ত আজ্ঞার অপেক্ষায় বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান থাকে।

বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিষয়-কোলাহলে মগ্ন বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্ত পরম দয়ালু নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম মধ্যে মধ্যে ইহ জগতে উদ্ভিত হইয়া প্রতি-জীবের দ্বারে দ্বারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনর্গলচর প্রেমের পশরা লইয়া শ্রদ্ধা-মূলে অযাচিতভাবে, অকাতরে বিতরণ করিয়া থাকেন। এই প্রকার মহাদানকারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম পাইয়াও তাঁহাতে যাহাদের মনুষ্যবুদ্ধি বর্তমান থাকে, তাঁহার সেবার অভিনয়ে যাহারা লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠাকে অভীক্ষিত মনে করেন তাঁহাদের মঙ্গল জুড়রপরাহত। পতিতপাবন শ্রীগুরু-দেবের নিকট আমাদের প্রার্থনা—

ন ধনং ন জনং ন জ্ঞানয়ী

কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে

ভবতাক্তজিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ (শিক্ষাক্ষেপ, ৪র্থ শ্লোক)

হে শ্রীগুরুদেব ! আমি ধন, জন বা জ্ঞানয়ী কবিতা কামনা করি না, আমি এইমাত্র কামনা করি যে, জন্মে জন্মে যেন আপনাতে অহৈতুকী ভক্তি থাকে। এই প্রকার আন্ত্রিক সহকারে যিনি শ্রীগুরুদেবে আত্মসমর্পণ করত শ্রীহরিতত্ত্বনে নিয়োজিত হন, তিনিই প্রকৃত মানবজীবনকে সার্থক করিবেন।

শ্রীমেন্নালন্দ গোড়ীয়া মঠে

শ্রীবুলনযাত্রা ও শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব

সাবুগনকে যক্ষণ ও তুষ্ণতিকাগীণকে বিনাশপূর্বক ধর্মের প্রাণি মোচন করিবার ছলে জীবের হৃদয়-গুহার অন্ধকার দূরীভূত এবং লীলারদ আশ্বাদন করিবার ক্ষমতা লাভ-পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বোহিণী নক্ষত্র সংযুক্ত অষ্টমী তিথিতে, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে, মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারময় নিশীথে ত্রৈলোক্যমণ্ডিত বিগ্রহ বাহুদেব কৃষ্ণরূপে মথুরায় কংস-কারাগারে আবদ্ধিত হইয়াছিলেন, আর মাধুর্য্য বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণরূপে গোকুলের নন্দালয়ে মা যশোদার পুরুরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুত-জন্ম-জয়ন্তি এবং তৎসহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের বুলনযাত্রা বাৎসরিক অহুষ্ঠান হিসাবে মেঘালয়ের গারো পাহাড় জেলার অন্তর্গত তুবা শহরের কোলে অবস্থিত শ্রীগোড়ীয়া বেদান্ত সমিতির শাখাকেন্দ্র শ্রীমেঘালয় গোড়ীয়া মঠে প্রত্যেক বৎসর মহাসমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। অষ্টাষ্ট বৎসরের মতো এই বৎসরও বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, দুরাগত ও তুরাঙ্গ ভক্তবৃন্দের সমাগমে উক্ত উৎসব বিপুল সমারোহে পালিত হইয়াছিল।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের বুলনযাত্রা বহু বৈষ্ণববৃন্দের সমাগমে আকর্ষণীয় এবং প্রদর্শনী সহযোগে ২৪০ ভাদ্র হইতে ৫৫ ভাদ্র পর্যন্ত অহুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীর সাজসজ্জার দ্বারা শ্রীপাদ নরনারায়ণ ব্রহ্মচারী, গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী ও দামোদরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভৃৎগণ দর্শকের মনকে মোহিত করেন। প্রদর্শনীর প্রথম প্রকোষ্ঠে গিরিরাঙ্গ গোবর্দ্ধন সকলের মনোভীষ্ট পূরণের জন্ত বাবুল আগ্রহ প্রতীক্ষমান। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে সখীবৃন্দ তাঁহাদের প্রিয়সখী রাধিকাকে কৃষ্ণের সঙ্গে একাসনে কুলিয়ে বিষয়-জাতীয় লুপ্ত উপভোগ করছেন। তৃতীয় প্রকোষ্ঠে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সখ্যবৃন্দের সহিত গোচারণ-লীলা প্রদর্শিত হয়। বুলনযাত্রার প্রথম চারদিন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ যতি মহারাজ শ্রীরাধাকৃষ্ণের বুলনযাত্রা সম্বন্ধে সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের তৃপ্তি প্রদান লাভ করেন। সমাপ্তি অর্থাৎ বলদেব-পূর্ণিমাও দিনে তিনি শ্রীবলদেব তত্ত্ব-সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন এবং বলেন,—“যিনি বিষয়-বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়-বিগ্রহের অভিনয় করেন সেই বলদেব প্রভুর কৃপাই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে দর্শনের একমাত্র উপায়-স্বরূপ।”

যুগনযাত্রা সূর্য্যভাবে সম্পন্ন হওয়ার পরে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর দিন ঘনিজে আসিলে ভক্তবৃন্দের সমাগমে শ্রীমেঘালয় গোড়ীয় মঠ মুখরিত হইয়া উঠিল। ইং ২৬.৮.৮৩ বৈকালে সমিতির আচার্য্যাদেব ত্রিদণ্ডিয়ানী শ্রীশ্রীমুক্তিবেদান্ত বানম গোস্বামী মহারাজ সদলবলে ট্যাক্সি সহযোগে ফরিদগঞ্জ হইতে ত্রুয়ায় গোড়ীয় মঠে শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গে জননমুদ্রের চেটে মঠের আজিমার আছড়ে পড়িতে লাগিল। ১৪টো ভাত্র (৩১শে আগস্ট) ব্রাহ্মমূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিক ও তুলসী-পত্রিকমা সমাপ্তির পবেট সুসজ্জিত রথে শ্রীগোড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীমুক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ, শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীমুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের আগোষা স্থাপন করিয়া চতুর্দশখানে এক দর্শনো গোভাযাত্রা মহামন্ত্র কীর্ত্তন-মুখে শহরের মুখা মুখা পথগুলি অতিক্রম করিবার সময় মাননীয় সর্ব্বশ্রী কিশোরী লাল দ্বাজোরিয়া, নিমটাদ শর্মা, যতীনচন্দ্র চন্দ, মেঘাবাবু প্রমুখ ব্যক্তিদের সহিত হাজার হাজার ব্যক্তি যোগদান করেন। উক্ত দিবস সমস্তদিন মঠে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভরঙ্গিনী পারাধন হয় ও বৈকাল ৫টা হইতে মহাঞ্জন পদাবলী কীর্ত্তন শুরু করা হয়। সর্ব্বশ্রী কানাটলাল ব্রহ্মচারী, গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, শ্রীদামসখা ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, বলরাম ব্রহ্মচারী প্রমুখ সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়া সবাইকে মুগ্ধ করেন। কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিয়ানী শ্রীমৎ যতি মহারাজের ব্যবস্থাপনায় উদ্বোধনী সভায় আচার্য্যাদেবের সভাপতিত্বে মহতী ধর্ম্মদণ্ডার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

অন্যত্র দিনের আলোচ্য বিষয় “ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার দর্শন”। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত কবেম মেঘালয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাননীয় মিঃ সেনফোর্ড মারাক। মাননীয় নিমটাদ শর্মা হিন্দী ভাষায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণ শ্রীকৃষ্ণ-কেদ্রিক সমাজ গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তদনন্তর প্রধান অতিথি মিঃ সেনফোর্ড মারাক ইংরাজী ভাষায় তাঁহার নাতিদীর্ঘ ভাষণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ সম্বলিত গ্রন্থ ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে’ শ্রেষ্ঠ দর্শনরূপে শাস্ত্র-আখ্যা দিখে গীতোক্ত ধর্ম্মকেই বৈদিকধর্ম্ম বা সনাতনধর্ম্ম বলিয়া শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। প্রধান বক্তা হিসাবে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকার প্রকাশক ত্রিদণ্ডিয়ানী শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ অতি প্রাজ্ঞ ভাষায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত সমস্ত দেব-দেবীর য,

ঐত্রেয়ভূতোর সম্পর্ক তাহা বিভিন্ন পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক-উদ্ধৃত করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট তুলিয়া ধরেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতই যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ তাহাও বর্ণন করেন।

সভাপতির ভাষণে শ্রীশ্রী আচার্য্যদেব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ যে অবয়বজ্ঞান তত্ত্ব; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম প্রকাশ তাহা নানায়ুক্তির উদ্ধৃতি দিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট প্রকাশ করেন। 'যত্র জীব তর শিব'— কথাটির শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট তিনি এমন সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেন যে,



ভাষণরত মেঘালয়ার স্বাহ্যামন্ত্রী মিঃ সেনগুপ্ত বাবাক, সভাপতির আসনে পরিব্রাজকআচার্য্য ত্রিদণ্ডিধামী শ্রীমদ্ভক্তিবেন্দ্রোত্তর বামন মহারাজ, তাঁহার বামে যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিধামী শ্রীমদ্ভক্তিবেন্দ্রোত্তর বিষ্ণু মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিধামী শ্রীমদ্ভক্তিবেন্দ্রোত্তর যতি মহারাজ এবং নক্ষ দক্ষিণে উপবিষ্ট ত্রিদণ্ডিধামী শ্রীমদ্ভক্তিবেন্দ্রোত্তর আচার্য্য মহারাজ।

সবট এক বাক্যে স্বীকার করেন, ইতিপূর্বে উক্ত বাক্যটির সহজে তাহাদের যে বঙ্গমূল ভুল ধারণা ছিল, তাহা আচার্য্যদেবের বক্তৃতায় সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া নতুন আলোকের সম্মান প্রদান করিল। আচার্য্যদেব সবাইকে ঐকমত্যকল্পিত প্রকৃত সাংসারিক ধর্ম্মযাজন এবং ঐকমত্যের দর্শন অমূল্যলব্ধ করিতে উৎসাহিত করেন।

সভাস্থে মর্মানন্দ পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা কীর্তন করিয়া শোনাৎ বিখ্যাত বেতার শিল্পী শ্রীশ্রীমঙ্গলকৃষ্ণ দাসাধিকারী, রাগভূষণ। তাঁহার

সুশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষর এমনভাবে শ্রোতৃগুণীকে মোহিত করেন যে সবাই মন্ত্রগুণ্ডের
স্বায় হ্রি হইয়া অগ্নির আগ্রহে কীৰ্ত্তনের শ্বেষাবধি শ্রবণ করেন। সৰ্ব্বশেষে
শ্রীপাদ কমলাপতি ব্রহ্মচারী চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যথুরা ও বৃন্দাবনের বিভিন্ন
মঠাদি ও শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্বলী দর্শন করিতে দর্শকের প্রচুর আনন্দ প্রদান
করেন। চলচ্চিত্র দেখিবার দর্শকবৃন্দের শ্রীকৃষ্ণের চিত্রায়িত স্মৃতিংকু লীলাস্বলী
দেখিবার লোভ ও লালসা বুদ্ধি পাইতে থাকে।

পরদিবস (ইং ১৯৮৩) নবোৎসবে ত্রিদিগুপামী শ্রীমৎ যতি মহারাজ
সৰ্বশ্রী শ্রীদামসখা ব্রহ্মচারী, কমলাপতি ব্রহ্মচারী, রঘুনন্দন ব্রহ্মচারী ও
অত্রত মঠরক্ষক সারথিকক ব্রহ্মচারীর তত্ত্বাবধানে আতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্কির্শেষে
নবী জন্মদায়কের মদ্যে অরুণ হস্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই
মহোৎসবে প্রায় ৮ হাজার ভক্ত-পন্থাদ গ্রহণ করিয়া নিজেদের ধন্যত্ব
মনে করেন। এদিনও যদ্যসময়ে কীৰ্ত্তন আরম্ভ হয়। সৰ্বশ্রী কানাইলাল
ব্রহ্মচারী, গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, ভাগবত ব্রহ্মচারী, পরমানন্দ ব্রহ্মচারী ও
ললিতমাধব ব্রহ্মচারী প্রমুখ প্রভুগণ এদিনও মহাজন পদাবলী কীৰ্ত্তন করিয়া
সবাইকে আনন্দ দান করেন। কীৰ্ত্তনান্তে চিত্ররঞ্জন (পুষ্টিমণ্ড) হইতে
আগত শ্রীকৃষ্ণপ্রভু প্রভৃতি ভূমসীদাসের 'রামচরিত নামস' হইতে ভগবান্
শ্রীরামচন্দ্রের নাম, লীলা, ঋণ ও গুণ-মতিমা কীৰ্ত্তন করেন।

রামাষ্ট্র পাঠান্তে ধর্মপত্রা শুরু হয়। অত্রকার আলোচ্য বিষয় "সনাতন
ধর্ম ও বিশ্ব সমস্তা বা বিশ্ব সমস্তার সমাধানে সনাতন ধর্ম"। প্রধান অতিথির
আসনে অত্রকৃত বি. এস. এফ এর অ্যাসিষ্ট্যান্ট কমান্ডার মিঃ ডি. এন.
অ'রিয়্য তাঁহার নাতিদীর্ঘ কালধে দৈনিক ধর্ম অর্থাৎ জীবন্যার ধর্মকে
সনাতন ধর্মের আধার আখ্যায়িত করিয়া বিশ্ব সমস্তার সমাধানে এই ধর্মের
প্রবর্তন করি বক্তব্য করেন। অঃপর প্রধান বক্তা হিসাবে তুরা গবর্নমেন্ট কলেজের
অধ্যাপক শ্রী গণেশচন্দ্র দাস বলেন,— "ব্রীষণ নিত্য অর্থাৎ আগ্নার ধর্মই
সনাতন ধর্ম এবং অন্যন্য সকল প্রকার ধর্মই নৈমিত্তিক। শুধু জড়বিজ্ঞানের
উন্নতির মাধ্যমে এখনই বিশ্বের সমস্ত সমাধান সম্ভব নহে। জগতে সবাই যখন
আজিও ধর্ম দীক্ষিত হইবে, তখনই বিশ্বসমস্তার সমাধান সম্ভব।" 'হরেকৃষ্ণ'
মহামন্ত্র কীৰ্ত্তন যুগে তিনি তাঁহার বক্তব্য সমাপ্ত করেন। তদনন্তর স্থানীয়
গারো-সম্প্রদায় হইতে আগত শিক্ষিত যুবক মিঃ আজিমের বাংলা ভাষায় প্রদত্ত
বক্তব্য হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, ধর্মশাস্ত্রের উপর তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে।

পরে ত্রিদণ্ডিবামী শ্রীমৎ ভক্তিবাদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ সনাতন ধর্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে তত্ত্ব-শিক্ষান্ত সম্পর্কে বিশেষ রেখাপাত করেন। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিবামী শ্রীমৎ ভক্তিবাদান্ত বিষ্ণু মহারাজেব মনোগ্রাহী বক্তৃতা শ্রোতৃবৃন্দের ভ্রূসী প্রাংশসা লাভ করেন।

সর্বশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার বক্তব্য বলেন,— “যে-ধর্ম্মে আত্মা, পরমাত্মা বা জগদানু অবিনাশী এবং ত্রিশাস্ত্রির পণের কথা উল্লিখিত তাহাট সনাতন ধর্ম্ম।” সনাতন ধর্ম্মের সকল কথা বেদান্ত দর্শনের অকুণ্ঠিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভগবতের মধ্যে চমৎকারভাবে লিপিবদ্ধ থাকায় এই ধর্ম্মে অপার নাম ভাগবত-ধর্ম্ম। বিশ্বের বহু রাষ্ট্রনায়ক এবং জড় বিজ্ঞানীরা বিশ্বভ্রাতৃত্বের দোঁহাই দিখে নিজেদের সনাতনিক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাতিলেও উচ্চাদের ধর্ম্ম অনিত্য—ভ্রমধর্ম্মেরই নামাস্বর। অশ্রদ্ধ ব্রহ্মেশ্বরনন্দন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যেই সনাতন ধর্ম্মের মাধ্যমে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সবাইকে বন্ধন করেছিলেন সেই ধর্ম্মই বিশ্বসমস্তার সমাধান করিতে সক্ষম।” শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতার সারমর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বুকিতে পারিলেন, সনাতন ধর্ম্মই যথার্থ উদার, আত্মকল্যাণকারী ও শাস্ত্রত শাস্ত্রির পথ-প্রদর্শক।

এদিনও শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ দাসাদিকারী, রাগভূষণ প্রভু তাঁহার সুললিত কণ্ঠে রামায়ণ-গান কীর্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে উত্তরোত্তর বেশী মুগ্ধ করেন। সর্বশেষে শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাদিকারী প্রভুর চলচ্চিত্রের মাধ্যমে উড়িষ্যার পবিত্র তীর্থস্থানগুলি দেখাইয়া দর্শকবৃন্দের অকুণ্ঠ প্রাংশসা কুড়ান। শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষ অছরোবে শ্যামলকৃষ্ণ দাসাদিকারী প্রভু নবোৎসবের পরেও ছুটদিন মনোমুগ্ধকাবী রামলীলা কীর্তন করেন।

মঠের ডেকোবেলন্ ও প্রবেশ-পথের তোরণদ্বার নিরুপায়ে সর্বশ্রী গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, হরেকৃষ্ণ দাসাদিকারী, নরনারায়ণ ব্রহ্মচারী, জয়গোপাল ব্রহ্মচারী ও পুলিনচন্দ্র বর্ম্মণের সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। উৎসবের সেবার আত্মকূল্য সংগ্রহে পূজাপাদ শ্রীমৎ যতি মহারাজ, শ্রীদামসখা ব্রহ্মচারী, শ্রীধনেনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীদামোদরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রমুখের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। সন্ধ্যোপরি শ্রীপাদ স্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুর প্রদর্শনী নিরুপায়ে উদ্দীপনা প্রশংসার যোগ্য। মঠবাসী বৈষ্ণববৃন্দের সেবা-প্রচেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমদ্ব্যহাপ্রভু ও নৃসিংহ অবতারের বৈজ্ঞাতিক যন্ত্রচালিত লীলামূর্ত্তির প্রদর্শনী।

প্রতিদিন অগণিত দর্শনার্থিগণ প্রাকৃতিক ও স্থানের বিপদ সঙ্কুল ও
 হিতকুলতা উপেক্ষা করিয়াও দুর্দমনীয় গতিতে মঠের মহানন্দ আশ্বাদনে
 ছুটিয়া আসিতেন। এই অনুষ্ঠানে জনসমাগম দেখিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর
 কথাটি বার বার মনে হইত—“পৃথিবীতে যত আছে নগবাণি গ্রাম। সর্বত্র
 প্রচার হইবে মোর নাম।” সত্যিই, সাধু-সম্মাদিগণ মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট
 পূরণ করিবার জন্য নানা বাধা-বিপত্তি যন্তকে ধারণ করিয়াও পাহাড়-পর্বতে
 ঘেরা জঙ্গলপূর্ণ তুর্গমস্থান তুরাতে গোড়ীযমঠ স্থাপনপূর্বক মঠের বাৎসরিক
 অনুষ্ঠানে অগণিত মরনারীকে আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণনাম-গান পান করাইয়া
 উৎসবটিকে ভরা বা গারো হিলসের জাতীয় উৎসবে পরিণত করিয়াছেন
 এবং সমস্ত মেঘালয়ার গৌরব বাড়িয়েছেন। তাই সর্বশেষ মুক্তকণ্ঠে
 ভক্ত ও ভগবানের জয়গান করি। “জয়তু ভগবান্ ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ !
 জয়তু ভক্তবৃন্দ” !!

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত

“শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা”

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত গীতাভূষণ-ভাষ্য

৩

শ্রীমদ্ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত

বিদ্বদ্ভগবদ্গীতা-ভাষ্য সমন্বিত।

উত্তম বাঁধাই—২০.০০ টাকা

ঐশীভার মন্মথাবী

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যার পর)

পঞ্চদশ অধ্যায়

[পুরাণোক্তম-যোগ]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—৭)

সংসাররূপী বৃক্ষ

বডই নিশ্চয় ।

কহয়ে পণ্ডিতগণ

ইহার বিষয় ॥১॥

বৃক্ষ অতি স্তম্ভান

মূল উর্দ্ধ গত ।

শাখাগুলি উর্দ্ধে নিয়ে

চতুর্বেদ পত্র ॥২॥

অশ্বখ বৃক্ষের সাথে

ইহার সাদৃশ্য ।

কিছু কিছু বোগী বুঝে

সে ঘোর রহস্ত ॥৩॥

এই বৃক্ষ পরিপুষ্ট

সম্বাদি গুণেতে ।

বিষয়রূপী পল্লব

শোভিতে বৃক্ষেতে ॥৪॥

বৃক্ষের স্বরূপ জানে

সাধু সন্তজন ।

বৈরাগ্যের সহায়তে

হয়েক সক্ষম ॥৫॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৫—৬)

নাহি সেথা মায়াময়

নাহিক কামনা ।

পুত্র-কন্যা-ভার্যা লাগি

না রহে ভাবনা ॥৬॥

সুখাদিতে সমভাবে

রহে সেইজন ।

মনে মনে হরষিত

কহে সুবচন ॥৭॥

চিত্ত যেথা ধীর শাস্ত

রহে আত্মজ্ঞান ।

লভয়ে অব্যয়-পথ

সেই পুণ্যবান্ ॥৮॥

প্রকাশিতে নাহি পারে

অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য ।

পুণ্যবান্ যায় তথা

সে-স্থান আশ্চর্য্য ॥৯॥

তথা যদি যায় কেহ

লভি দিব্যজ্ঞান ।

নাহি ফিরে এ ধরাতে

রহে দিব্যধাম ॥১০॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৭—১১)

অবিচার বশে যবে

জীব সনাতন ।

মন-সহ ইন্দ্রিয়কে

করে আকর্ষণ ॥১১॥

প্রকৃতির সাহচর্য্য

ভোগের আশায় ।

সনাতন শুদ্ধমত

নিজকে হারায় ॥১২॥

বিষয় ভোগের শেষে

প্রাণ বাতিরায় ।

জীবাত্মা ছাড়িয়া দেহ

অন্ত দেহে যায় ॥১৩॥

যবে যায় সাথে লয়
 স্পৃহা ইন্দ্রিয়াদি ।
 মন চলে সাথে সাথে
 হইবারে সাথী ॥১৪॥
 দেহ থেকে দেহান্তর
 জ্ঞানী দেখা পায় ।
 অজ্ঞ জনে নাহি পায়
 আবদ্ধ মায়ায় ॥১৫॥
 যোগীজন পায় দেখা
 আত্মা দেহান্তর ।
 মালিন্য রহিলে চিত্তে
 হয়েক বঞ্চিত ॥১৬॥
 (শ্লোক-সংখ্যা : ১২—১৫)
 অগ্নির মধ্যে তেজ তিনি
 সূর্য্যের কিরণ ।
 চন্দ্রালোকে মধুহাসি
 আলো বিকীরণ ॥১৭॥
 সর্বগুণে গুণাকর
 জীবের ধারক ।
 শস্য হয় তিনি পুষ্ট
 তিনি সহায়ক ॥১৮॥
 সেই শস্যে বাঁচে প্রাণী
 বাঁচে জীবকুল ।
 দয়াময় হরি তিনি
 নাহি সনতুল ॥১৯॥
 প্রাণাপান বায়ু তিনি
 জঠরের অগ্নি ।

পরিপাকে সহায়ক
 শক্তি সঞ্জিবনী ॥২০॥
 বেদার্থের জ্ঞাতা তিনি
 জ্ঞাতব্য বিষয় ।
 বেদান্তের প্রবর্তক
 জানিবে নিশ্চয় ॥২১॥
 সর্বহুদে অবস্থিত
 স্মৃতির আগার ।
 কভু স্মৃতি পায় ধোপ
 জীবন বেকার ॥২২॥
 (শ্লোক-সংখ্যা : ১৬—২০)
 উত্তম পুরুষ তিনি
 পরমাত্মা নাম ।
 অব্যয় অক্ষয় তিনি
 পুরুষ প্রধান ॥২৩॥
 অক্ষরের উর্দ্ধে তিনি
 ক্ষরের অতীত ।
 পুরুষ উত্তম নামে
 বেদে বিনির্দিষ্ট ॥২৪॥
 ইহাই পরম তত্ত্ব
 রহস্যে আবৃত ।
 জ্ঞানি সে জানিতে পারে
 তাঁহার মাহাত্ম্য ॥২৫॥
 মাহাত্ম্য জানিলে হয়
 সেজন কৃতার্থ ।
 কৰ্ম্মী হয় উপযুক্ত
 লভে পরমার্থ ॥২৬॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল,

কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্ত-বিভাগের পদস্থ অফিসার,
 নিউদিল্লী ।

দর্শনাথী র মন্তব্য

“শ্রীকৃষ্ণ”

শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপস্থ দেবালয় গোড়ায় মঠে আমরা
এনে ৩ কয়েক দিন অবস্থান করে অপূর্ব আনন্দ
ও ভজন-লাভ করে গেলাম। “প্রদ্বাদ্য” লাভে
ভজনম্—অঙ্গ-বিনয় না থাকিলে ভজন লাভ করা
যায় না! আমি ভারতের বহু মঠ-মন্দির ও পুত
আশ্রমসমূহে গিয়াছি। হরিদ্বার, বৃন্দাবন, পুষ্কর,
কাশী, এলাহাবাদ, পুরীবেঙ্গ, মাদ্রাজ, এডেনব্রাম,
রামেশ্বর, পণ্ডিতেরী, মাদুরা, কন্যাকুমারী, তিরুপতি
প্রভৃতি স্থান। কিন্তু অতীতপূর্ব বিনয়-মিশ্রিত ধর্মিক
ব্যবহার ও বহু এ’ আশ্রমের প্রতিটি ভক্ত ও মনোমো-
হনকারী মহারাঙ্গণ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা
ঐশ্বর্যের মনোমুগ্ধ ব্যবহারে আনন্দে বিমগ্নরাভিভূত
হইয়াছি। ওদ্বাদ্য শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রার্থনা—এই
মঠের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক এবং বর্তমান-কালে
দেশের যুব-সমাজের যে-অবস্থা লক্ষিত হইতেছে,
তাহাতে এই মঠের আশ্রমিকদের সদাশয় বিনোদ
ব্যবহার ও গরম জীবন-ব্যয়ন দিয়া উদ্দেশ্য
নিবেদিত ভারতের কল্যাণ উদ্ধারে এক মহান
ধর্মিক গ্রহণ করিবে। ইতি—২০/১০/৮৩ ইং

বিনয়াবনতঃ—

(স্বাঃ) শ্রীচুনীলাল গোস্বামী,

অ্যাডভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট

ও

সম্পাদক, শ্রীমা কেশব, দি’থি

❀	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।	❀
❀ ধর্মঃ স্ফুটতিঃ পুংসাং বিধক্‌সেন-কথাহ যঃ ।		❀ নৌৎপাদয়েৎ যদি রতিঃ শ্রম এব হি কেবলম্ ।
❀	অহৈতুক্যপ্রতিহতা বয়ান্মা সুপ্রসীদতি ॥	❀

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আশ্র-পরসম ।

অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্বশ্চত্ ।

অশ্র ধর্ম স্ফুটলপে পালে যেই জন ।

হরি-কথায় রতি নৈলে গও সেই শ্রম ।

৩৫শ বর্ষ	২৬ কেশব, গর্ভোদশায়ী, ৪২৭ গৌরান্দ ২৯ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৯০ ; ইং ১৬/১২/১৯৮৩	১ম সংখ্যা
----------	---	-----------

সান্দুনাঙ্গ

শ্রীশ্রীমদ্ব্যহা প্রভোরষ্টকম্

[শ্রীস্বরূপ চরিতামৃতম্]

(শ্রীল-বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-বিরচিতম্)

স্বরূপ ! ভবতো ভবতুগামতি স্মিত-স্নিগ্ধয়া

গিরৈব রঘুনাথমুৎপলকিগাত্রমুদ্রাসয়ন ।

রহস্যপদিশক্তি-প্রণয়-গুঢ়-মুদ্রাং স্বয়ং

গিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥১॥

হে স্বরূপ ! 'এই রঘুনাথ তোমার অধিকারে' থাকুক'—এটুকু সত্য-সত্য

মধুরবাক্যে রঘুনাথ-দাসকে বিনি অহ্লাদিত ও পুলকিত-গাত্র করিয়াছিলেন

এং যিনি স্বয়ং নিজেই নিজ প্রণয়-মহিমার গুণ-প্রখ্যাতী তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্ত বিরাজ করুন ॥১॥

স্বরূপ ! মম হৃদয়ে বত ! বিবেদ রূপঃ কথং
লিখ্যে যদয়ং পঠি ত্বমপি তালপত্রে হৃদয়ম্ ।
ইতি প্রণয়-বেল্লিতং বিদধদাপ্ত রূপান্তরং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥২॥

হে স্বরূপ ! রূপ কি প্রকারে আমার মনে বাধ্য আনয়িত হইল ? যেহেতু এই 'রূপ' আমার মনোগত ভাব লিখিয়াছে, তুমিও তালপত্রে লিখিত এই শ্লোক পাঠ কর,—এই প্রকারে যিনি কখন প্রেম প্রকাশ, কখন বা আত্মগোপন করেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্ত বিরাজ করুন ॥২॥

স্বরূপ ! পরকীয়-সং প্রসং-বস্ত্র-নাশেচ্ছতাং
দধজ্জন ইহ ত্বয়া পরিচিতো নবেতীক্ষয়ন ।
সমান্তনমুদিত্য বস্ত্রিতমুখং মহাবিস্মিতং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥৩॥

হে স্বরূপ ! এখনে পরকীয় নিত্যসিক সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্রনাশে অভিলাষী কোন ব্যক্তি বিরাজ করিতেছে, তুমি তাঁহাকে চিনিতে পারিবাছ কি ?—এইরূপে যিনি, মহাবিস্মিত ও আত্মদত্তবে হাস্যবুজ, লজ্জায় অবনত-রদন শ্রীসমান্তনকে সমস্ত প্রদর্শন করান, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকাল বিরাজ করুন ॥৩॥

স্বরূপ ! হরিনাম যজ্জগদবোধয়ং তেন কিং
ন বাচয়িতুমপ্যথাশকমিমং শিবানন্দক্রম্ ।
ইতি অপদ-লেহনৈঃ শিশুমচীকরং যং কবিং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥৪॥

হে স্বরূপ ! আমি সমগ্র জগৎসদীকে হরিনাম উচ্চারণ করাইলাম, কিন্তু ইহাতে আমার কি ফল হইল ? কারণ অবশেষে এই শিবানন্দ-পুত্রকে হরিনাম উচ্চারণ করাইতে পারিলাম না;—এই বলিয়া যিনি আপন চরণ-লেহন

করাইয়া সেই শিক্তকে কবিশ্রেষ্ঠ করিরাছেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥৪॥

স্বরূপ ! রসরীতিরমুজদৃশাং ব্রজে ভগ্নতাং
ঘন-প্রণয়-মানজা ক্রতিযুগং সমোৎকর্ষতে ।
রমা যদিহ মানিনী তদপি লোকয়েতি ক্রবন্
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥৫॥

হে স্বরূপ ! ব্রজে কমলাক্ষীগণের গাঢ়-প্রণয়-মান-জনিতা রস-পরিণাতি বর্ণনা কর, আমার কর্ণযুগল শুনিবার জন্য উৎকর্ষিত হইতেছে । দেখ, এই প্রণয়-মর্যাদা লাভ করিতে না পারিয়া লক্ষ্মী মানিনী হইরাছেন ;—এইরূপে যিনি স্বরূপ-সমনে নর্মোদ্বাটন করেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥৫॥

স্বরূপ ! রস-মন্দিরং ভবসি মদামানুস্পদং
ভ্রমত্র পুরুষোত্তমে ব্রজভূবীষ মে বর্ত্তসে ।
ইতি সপরিরন্তনৈঃ পুলকিনং ব্যধাৎ তঞ্চ যো
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥৬॥

হে স্বরূপ ! তুমি আমার প্রিয়পাত্র এবং রস-মন্দির-স্বরূপ । তুমি এই শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থান করাতে এই শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রকেও আমার শ্রীবৃন্দাবন বলিয়া প্রতীতি হইতেছে,—এই বলিয়া সাগ্রহে কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে যিনি পুলকিত করিয়াছেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥৬॥

স্বরূপ ! কিমপীক্ষিতং ক হু বিভো ! নিশি স্বপ্নতঃ
প্রভো ! কথয় কিমু তন্নবযুবা বরান্ভোধরঃ ।
ব্যধৎ কিময়মীক্ষ্যতে কিমু ন হীত্যগাৎ তাং দশাং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥৭॥

হে স্বরূপ ! আমি কি দেখিলাম ? স্বরূপ বলিলেন,—হে প্রভো ! কখন দেখিগেন ? প্রভু বলিলেন,—রাত্রিতে স্বপ্নযোগে । স্বরূপ বলিলেন,—প্রভো ! কিপ্রকার সে ? প্রভু বলিলেন,—নবীন-নীল-সদৃশ তরুণ যুবা । স্বরূপ বলিলেন,—তিনি কি কবিত্তেছিলেন ? আর কি তাঁহার দর্শন

পাওয়া যাইবে? প্রভু বলিলেন,—আর দর্শন পাওয়া যাইবে না।—এই বলিয়া যিনি শোকভরে অপূৰ্ণ দশাপ্রাপ্ত হইলেন, সেই শ্রীগৌরচন্দ্র প্রভু আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥৭॥

স্বরূপ! মম নেত্রয়োঃ পুরত এব কৃষ্ণো হস-
ম্পৈতি ন করগ্রহং বত! দদাতি হা! কিং সখে!
ইতি স্থলতি ধাবতি স্বসিদ্ধি ঘূর্ণতে যঃ সদা
বিরাজতু চিরায় মে জদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥৮॥

হে স্বরূপ! আমার নয়ন-মণ্ডুখে কল্ল হস্ত করিয়া পলায়ন করিলেন, ধরা দিলেন না। তাহ হায় সখে! কি উপায় হইবে?—এই বলিয়া যিনি সর্বদা ভূপতিত হইলেন, ইত্যন্তঃ ধাবিত হন, দীর্ঘনিঃশ্বাস তাগ করেন, কখনও বা ঘূর্ণিত হন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥৮॥

স্বরূপ-চরিতামৃতং কিল মহাপ্রভোরষ্টকং
বহুশ্রুতমমদুতং পঠতি যঃ কৃতী প্রত্যহম্।
স্বরূপ-পরিবারতাং নয়তি তং শচীনন্দনো
যন-প্রণয়-মাধুরীং স্বপদয়োঃ সমাস্বদয়ন ॥৯॥

যিনি এই অদ্ভুত বহুশ্রুতম স্বরূপ-চরিতামৃত নামক শ্রীমদ্রহস্যপ্রভুর অষ্টক পাঠ করিবেন, শ্রীশচীনন্দন মহাপ্রভু তাঁহাকে গাঢ় প্রেমের মাধুর্য্য আশ্বাদন করাইয়া স্বরূপের পরিকর রূপে গ্রহণ করিবেন ॥৯॥

সজ্জন—বিজিত-ষড়্গুণ (১৬)

ষড়্গুণ কি কি এবং তৎসম্বন্ধে মতভেদ

ষড়্গুণ বলিতে ক্ষুদ্রা, নিপাসা, লোভ, মোহ, ভরা ও মৃত্যুকে বুঝায়। কেহ কেহ বলেন,—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতা—এই ছয় বিরোধী গুণটী ষড়্গুণ।

ষড়্গুণ অনাত্মার ধর্ম্ম, মহাপুরুষগণ উহার অধীন নহেন

এই ছয়টি গুণ অনাত্মার ধর্ম্ম। অনাত্মা বলিতে দেহ ও মনকে বুঝায়। চেতন-বৃত্তি বা আত্মবৃত্তি যেকালে জড় বা অনাত্মার অধীন

প্রভু করে, সেইকালে তাদৃশ চেতনকে 'মন' বলিয়া সংজ্ঞা দেওয়া হয়। মন জড়বস্তুতে অস্থিতির সহায়তায় মমত্বারোপ করে। প্রকৃতির রাজ্যে তিনটি গুণের বিক্রম দেখা যায়। গুণসমূহ হইতে সকল অনিত্য কর্মের উদয় হয়। চেতনবুদ্ধি গুণেন দ্বারা চালিত হইলে কর্মফলের ভোক্তা হন। যেকালে মন কর্মফলের বাধ্য থাকেন, তখন তাহাকে ষড়্গুণ-জিত বলা যায়। ফলভোগ-রাহিত্যে বা কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিলে তিনি সাধু হইতে পারেন। সেকালে তাঁহার জড়ভোগ-স্পৃহা আদৌ থাকে না। ত্রিগুণাতীত মহাপুরুষ চয়নগুণের অধীন নহেন। ঐ আগন্তুক গুণগুলি অনায়াস-বস্তুর উপর বিক্রম প্রকাশ করে। সজ্জনের উপর ষড়্গুণের আধিপত্য নাই।

সজ্জনের বুদ্ধি হরিসেবাময়ী, তিনি কন্মি-জ্ঞানীর ন্যায়
দেহ-মনোধর্ম্মে আসক্ত নহেন

সজ্জন অজ-কর্ম্মকণ্-ভোগী মানবের ছায় জড় দর্শনে একই রকম পরিদৃষ্ট হন, কিন্তু তিনি আত্মবিশ্ব কুস্মাঙ্গ্যাবুদ্ধি দ্বারা ভোগে অসংস্পৃষ্ট। তাঁহার বুদ্ধি সিতা চরিত্যেবাময়ী। কর্ম্মী বা জ্ঞানী উভয়কেই ষড়্গুণের বাধ্য হইতে হয়, কিন্তু সজ্জন কখনও ষড়্গুণের বাধ্য নন। সজ্জন জানেন যে, আত্মা নিত্যধর্ম্ম-বিশিষ্ট, আগন্তুক অনিত্য ধর্ম্ম তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দেহ ও মনকে যে গুণসমূহ বিকার উৎপন্ন করায়, তাহা সজ্জনের বুদ্ধি স্পর্শ করে না, তিনি ঐ ছয় গুণ হইতে স্বয়ং নিলিপ্ত থাকেন।

সজ্জন কৃষ্ণৈকশরণ, তাই তিনি ষড়্বেগজয়ী গোস্থামী

যেখানে সজ্জন পরিচয়ে কাম-ক্রোধাদির বিকট নৃত্য দেখা যায়, সেখানে দ্রষ্টৃ সাধারণের দৃষ্টিতে দৃশ্যের প্রতি সজ্জন-বিষয়িনী অন্ধার হ্রাস হয়। আবার তাদৃশ হিংসা-দ্বেষের তাণ্ডব নৃত্যের চলনায় শুক্লদেবী জনে সজ্জনের তাদৃশ ব্যবহার—বিজিতষড়্গুণ সজ্জনের উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত-কারক নহে। গুণগুলি দেহ ও মনের বিকার উৎপন্ন করে বলিয়া আত্মবিশ্ব সজ্জনের সম্পত্তি নহে। জ্ঞানীর শাস্ত্র অথবা ঐ গুণঘটক অব্যক্ত থাকিলেও পুনঃ পুনঃ দূর হইয়া প্রাকৃত বিকৃতি উৎপন্ন করে। সজ্জন কৃষ্ণৈকশরণ বলিয়া কোন বিকার তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

পারমহংস্ত-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত নির্ভ্রংশর

সজ্জনগুণের ধর্ম্ম-প্রকাশক

তজ্জাত পারমহংসের গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত বা পারমহংস্ত-সংহিতা সজ্জন.

নির্ম্মলসবগণের বা বিজিত-বড়ুগণের বর্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। সজ্জন বিজিত-বড়ুগণ—একথা জানা হইলেই বদ্ধজীবও সজ্জন হইতে পারেন। যেকালে তিনি সজ্জনের ধারণা সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধিতে বিচার করেন, তৎকালাবধি বিজিত-বড়ুগণ কি অবস্থা, বুদ্ধিতে সমর্থ হন না। বিজিত-বড়ুগণ সজ্জন-গণের অমল পাদপদ্ম দেখিবার যোগ্যতা হইলে জীবও সজ্জন হন।

সজ্জন—মিতভুক (১৭)

‘মিতভুক’-শব্দের তাৎপর্য—

ভগবৎপ্রসাদ ভোজীই প্রকৃত মিতভুক

অধিক বা নূন এই দুই অবস্থা না হইলে তাহাকে পরিমিত বলে। সজ্জন পরিমিত ভোজন করেন। যিনি অধিক বা নূন ভোজন করেন, তিনি বৈষ্ণব হইতে অসমর্থ। অপ্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে সজ্জনের ভোজন হয়। সজ্জন কখনও অমেধ্য দ্রব্য গ্রহণ করেন না। মায়াবাদীর দ্বারা তিনি ফলুর্বেরাগের আবাহন করেন না, কঠযোগীর দ্বারা প্রসাদ গ্রহণে বিরত হন না। তিনি কৃষ্ণ-প্রসাদের মিতভোজী।

সুন্দ-সুন্দ শরীরে শুদ্ধাশুদ্ধি-বিচারে যাহা গৃহীত হয়,

তাহা মিতভোজন নহে

আত্মপ্রসাদ সেবায় অমিত-ভোজন নাই। সুন্দ-শরীর মনের দ্বারা যে ভোজন গৃহীত হয়, তাহা অনিত্য। দেহের দ্বারা শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করিয়া যে ভোজনাদি হয়, তাহা গ্রহণ করা বৈষ্ণবের পক্ষে নিষিদ্ধ। সজ্জনের নিত্য স্বভাবে নিত্যভোজন একটি বিশিষ্ট পরিচয়।

আধিক্য ও নূনতা সর্ববিষয়েই ভক্তি-হানিকর;

শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামি-বর্ণিত পরমার্থ-বিরোধী ছয়টি দোষ

শ্রীমদ্ভগবত বলেন,—অত্যন্ত আসক্ত অধিক ভোজী এবং ভোজন-বিরত বিরক্ত, উভয় অবস্থাই বৈষ্ণবের অদরশীয় নহে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—“আধিক্যে নূনতায়ক চাবতে পরমার্থতঃ।” শুদ্ধ বৈরাগী যাহাকে কন্ম্যা ও জানী বলে, তাহার মিতভোজী নহে। শ্রীমদ্ভগবৎ গোস্বামী বলেন,—

“অত্যাহারঃ প্রদাসশ্চ প্রজ্ঞো নিম্নগ্রহঃ।

জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ বড়ুভির্ভক্তির্বিনশতি ॥

ষড়্বেগ-প্রাপ্ত আমিষ ভোজী ও মাদক-সেবীগণ

‘গো-দাস’ অসজ্জন

“জিহ্বার গাংগিয়া যেই ইতি উতি যায়।

শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥”

জিহ্বা-বেগ ও উদর-বেগ প্রত্যেক সজ্জনেরই প্রশমন কর্তব্য। অসমর্থ হইলে তিনি গোশ্রমী হইতে পারেন না। অত্যন্ত শোভের বশবস্তী হইয়া বাহ্যরাশ্রমিক আহার করেন অথবা প্রতিষ্ঠার তাড়নায় বিনি প্রয়োজনীয় প্রসাদ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হন, তাহারাও সজ্জন হইতে পারেন না। পণ্ড-ভোজন, মৎস্য-কুর্মাদি ভোজনকারীকে মিতভোজী বলা যায় না। মাদক-দ্রব্যাদি-সেবীকে মিতভোজী বলা যায় না। গোশ্রামিগণ অহিফেন ও ধূম্র-পানাদি করেন না। গোদাস অসজ্জনগণের তাহাই স্বভাব।

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম

ভারতবর্ষীয় চাতুর্ধর্মস্থিত আশ্রমগণ চারিটি আশ্রমে অবস্থিত। এই আশ্রম-বিভাগ বর্ণবিভাগের সহিত উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানশ্রম ও তিষ্ঠু—এই চারি আশ্রমের যে-কোন একটীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া বর্ণ-ধর্ম সংরক্ষিত হয়। তাহাদের বর্ণ আছে, পরিচয় আছে, তাঁহাদেরই আশ্রমের প্রয়োজন। বর্ণ-ধর্ম ও আশ্রম-ধর্ম সামাজিক বিধানের অন্তর্গত। বাহ্য সামাজিক বর্ণের ও আশ্রমের নিকট কিছু প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণ আশা করেন, তাহাদের সর্বতোভাবে প্রাচীন-নিবদ্ধ বিধি-নিষেধ, পালন-বর্জন দ্বারা সনাতন-ধর্ম রক্ষণ করা কর্তব্য।

সামাজিক মানবের দুইটি স্বাভাবিক উদ্দেশ্য সমাজের কল্যাণার্থ প্রযুক্ত হয়। সমাজে বাহাতে কোন-প্রকার অপ্রীতিকর উদয় না হয়—একটি উদ্দেশ্য সামাজিক আর্থ্যগণ বিধি-নিষেধ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাদের এই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতে যে-সকল ব্যবস্থা ও আচার প্রতিপালিত হয়, তাহার ফল-স্বরূপ স্বর্গাদি লাভ ও পুণ্য সঞ্চয়াদি গৌণ উদ্দেশ্যও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। মানবের কৰ্ম্মাত্মিক বৃত্তির জন্ত যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম, পিতৃাদি তর্পণ,

সংস্কারাদি আচার, ব্রত, পুণ্যতীর্থ-বাস, 'পবিত্র' সলিলে স্নান প্রভৃতি বিধি ও জ্ঞানাত্মিক বৃত্তির জন্তু দেব-বিপ্রাদির পূজা, গুরুজনের সম্মান, আচার-বানের জ্ঞানপ্রাপ্তি প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রসমূহে নিবদ্ধ আছে। তাঁহারা এই বৃত্তিষয়ের চরিতার্থতার বাসনায় আয়ত্থ, ব্রহ্ম প্রভৃতি নিবৃত্তি-অভাবসকলের প্রাপ্তি লোভে ক্রিয়া করেন, তাঁহারা সমাজের নীর্বন্ধনীয়।

সমাজের অভাবলো থাকিয়া শুধু জামী-সম্প্রদায় বিপ্রের ভোজন করত সমাজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সিদ্ধান্ত করেন। যোগী-সম্প্রদায় 'স্ব-স্ব অভাব মোছাচ করিয়া সুখ লাভ সম্ভবপর'—জানাইয়া সাংসারিক জীবনগণের ত্যাগ-জ্ঞানিত সুখ-ভোগের আসক্তি বৃদ্ধি করেন। স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক দার্শনিকগণ স্ব স্ব প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সুখ-প্রধানীকে আহ্বান করেন এবং ক্রিয়াজনিত ফলে সুখী করিয়া সমাজের কল্যাণ করেন।

বর্ণ-ধর্মশাস্ত্রিত বাক্যগণের দ্বারা শ্রীবৈষ্ণবের ব্যবহারের সাদৃশ্য থাকিলেও তাঁহারা 'সমাজকে পোষণ করা বা ত্রাহিত কল্যাণের জন্য সচেষ্টতা করা'—উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের ক্রিয়াদ্বারা 'সমাজ পূর্ত হউন বা সমাজের সর্বনাশ হউক'—এ-চিন্তা ছদয়-আশাকে পূর্ণ করেন না। শ্রীবৈষ্ণব বর্ণ-চতুষ্টয় ও আশ্রম-চতুষ্টয়ের নিকট নিষ্ক-প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্তু-বাস্তব নন। তাঁহার ক্রিয়া 'বর্ণবিধি অতিক্রম করিল বা আশ্রম-নিষেধ মানিল না'—এজন্ত তিনি কাহারও নিকট মনোহত নহেন; যেহেতু ভগবন্ত বৃত্তির একমাত্র উদ্দেশ্যই তাঁহার ক্রিয়াসমূহ জন্ত। শ্রীবৈষ্ণব 'ব্রাহ্মণ হউন বা শ্রেষ্ঠ-চণ্ডাল হউন'—একই কথা; গৃহস্থ হউন বা তিস্ত হউন—তাঁহার গৌরব বা অগৌরব নাই। ভগবদ্-ভক্তির জন্য 'শ্রীবৈষ্ণব নরক লাভ করুন বা স্বর্গ লাভ করুন'—একই কথা। ভগবৎ প্রাপ্তিতেও তাঁহার যে প্রেম, ভগবদ্-বিরহেও সে প্রেমের খর্ব্বতা নাই। শ্রীবৈষ্ণব কিছু আশা করেন না; তাঁহার কিছুই অভাব নাই। ব্রহ্ম-কামীর অন্তঃস্বর্গে তিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ের উৎকর্ষে মুগ্ধ। প্রাপ্তি হইলেই তাঁহার চিরবাপ্তিত ব্রহ্মরূপ চমৎকারিতা হেয়তা লাভ করে। ব্রহ্ম-কামী মায়িক নিগড়ে মিতান্ত অস্তির। শ্রীবৈষ্ণবের তাহাতে ধৈর্য-চ্যুতি নাই। শ্রীবৈষ্ণবের আবির্ভাব, ক্রিয়াকলাপ সমস্তই মায়িক কাম-ফলপ্রসূ ক্রিয়া-কারীগণের মত হইলেও বস্তুতঃ অত্যন্ত পৃথক।

শ্রীবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবেতরের পার্থক্য নাই জানিয়া মধো মধো অনেকে শ্রীবৈষ্ণবকে তাঁহার বর্ণ চিত্রিতা করেন ও সামাজিকগণের দ্বারা তাঁহাকে চারি

আশ্রমের একটীর মধ্যে প্রোথিত করিতে চেষ্টা করেন। এ-চেষ্টা নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত, সামাজিক চেষ্টাবিশেষ।

জগতের একমাত্র পরমন্তর পতিত-পাবন শ্রীগৌরোদয়ের চিন্ময় আবির্ভাব-লীলা দর্শন করিলে আমাদের সর্ব সংশয় বিদূরিত হয়। পরবিজ্ঞা-শাস্ত্র বেদে লিখিত আছে,—

ভিত্তিতে হৃদয়গ্রহিচ্ছিত্তস্তে সর্বসংশয়াঃ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

ভগবচ্চরিত্র দর্শন করিলে আমাদের সর্ব সংশয়ের হেদন হয়, কৰ্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, হৃদয়-গ্রহি ভেদ হইয়া সত্য উপলব্ধি হয়। সদাচার-পরায়ণ দণ্ডসংস্কারবৎস্পন্ন ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও পরাংশর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের চিন্ময়-চরিত্র অবলোকন করিবার পূর্বে সংশয়হীন হইতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্য-চরিত্র পরাবর, যিনি দর্শন করিয়াছেন তিনিই জানেন যে,— শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহেন। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী নহেন। তিনি ঐগুলি হইতে পৃথক্, গোপীজনধল্লভের দাসামুদাস। তাঁহার আর স্বতন্ত্র পরিচয় নাই। ‘আগি ব্রহ্ম বা ভগ্ন’ ইত্যাদি অনিত্য মায়িক বিচার তাঁহাকে স্পর্শ করে না। ঘটাকাশ, মটাকাশ, বজ্র-সর্প, প্রতিবিম্ব প্রভৃতি অনিত্য যুক্তিগুলির স্বরূপ-প্রাপ্তির পর কোন প্রয়োজন থাকে না।

আজকাল কতকগুলি ব্যক্তি ‘শ্রীবৈষ্ণব’ শব্দকে এরূপ ঘৃণা ও বিপতীত অর্থ সংযোগদ্বারা সামাজিক করিবার চেষ্টা করিয়া ক্রমশঃ অবৈষ্ণবতাচরণ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিতে কষ্ট বোধ হয়। তাহারা মায়িক অনিত্য পরিচয়ে শ্রীবৈষ্ণব-বপু কলুষিত করিয়া সামাজিক প্রতিপন্ন-হইবার প্রয়াস করিয়াছেন মাত্র।

শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে ব্রাহ্মণ করিবার চেষ্টা, শ্রীঈশ্বরপুরীকে শূদ্র বা ব্রাহ্মণ বর্ণাভিমাণে ভূষিত করিবার প্রয়াস, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর বর্ণের শ্রীবৈষ্ণব-শিক্ষা প্রদানের অক্ষমতা বা ক্ষমতা প্রভৃতি স্থাপনের নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত সামাজিক উদ্দেশ্য-বিশেষ। এই সকল উদ্দেশ্য ভক্তি-বুদ্ধির সহায়তা করে নাই, যতএব ভক্ত বৈষ্ণবের এ-সকল ক্রিয়া আদরণীয় নহে।

শ্রীবৈষ্ণবের সর্বদা এটী অরণ রাখা কর্তব্য যে, তিনি শ্রীগোপীবল্লভ-দাসানুদাস পরতন্ত্র, স্বাধীন নহেন। স্বাধীনতা তাহাতে সম্ভবপর নহে, যেহেতু তাহার তদীকৃতরূপ স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম বিক্রম-দ্বারা তিনি কৃষ্ণদাস লাভ করিয়াছেন একথা যদি বৈষ্ণবরা স্বীকারে স্মৃতিগুণে আগ্রহক থাকিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ বিতর্কসকল হৃদয়ে স্থান পায়, তাহা হইলে তাহার কেবল কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম কণ্ঠতাবশতঃ কৃষ্ণের নিকট বিক্রান্ত হইয়াছে; বস্তুতঃ তদীকৃত-ধর্ম মাযার নিকট বিক্রয় করিয়া মায়াদাস হইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের জন্ত ব্যস্ত। কৃত্রিম কৃষ্ণদাস, শ্রীবৈষ্ণব হইতে বহু দূরে অবস্থিত। তিনি প্রেমভক্তি সাধনের পরিবর্তে কামের সাধনে অনিত্য দুঃখ নিবৃত্তি করিতেছেন মাত্র। এই শ্রেণীর ব্যক্তির জন্তই সামাজিকগণ বিধি-নিষেধ সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন।

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

উদ্ধারের পথ

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৮য় সংখ্যা, ২৮৪ পৃষ্ঠার পর)

যদি আত্মেন্দ্রিয় সুখ-বাস্তা পরিত্যাগ করে কৃষ্ণকে সুখ দেবার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ প্রতিকূলতাপূর্ণ হয়ে অনুকূল হয়, তবেই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ তথা “আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্” সার্থক হয়। কৃষ্ণ সেবার অস্ত্রাভিলাষ তো থাকবেই না, এমন কি অস্ত্রাভিলাষের প্রবৃত্তিও ত্যাগ কর্তে হবে, তবেই ভক্তির তটস্থ লক্ষণ তথা “অস্ত্রাভিলাষিতাপূত্বে জ্ঞানকর্মাভ্যনাবৃত্তম্” অনুসারে অন্ত্রাভিলাষিতা শূন্য বলা যাবে। ভক্তির আবরক কর্মজ্ঞানাদি বর্জন করে সর্বেল্লিয়ে অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তি বা শুদ্ধাভক্তি। উত্তমা ভক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অস্বদীয় পরমপূজ্যপাদ শ্রীল গুরুপাদশ্রী ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ বলেছেন,—শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি এই উত্তমা ভক্তির আকর। এই সাধনভক্তি একমাত্র ভগবৎ স্নেহসম্বন্ধান তৎপর হয়ে যাজন করলে সাধক অনায়াসে শীঘ্র সাধনের ফল কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে পারেন এবং প্রেম প্রাপ্তির পর উত্তরোত্তর প্রেমের পরবর্তী অবস্থা লাভ করতে পারেন। একজ্ঞ শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—“ভক্তি-যোগো ভগবতি তরাম গ্রনাদিভিঃ।” এখানে ‘ভক্তিযোগো’ বলিলেই হয়। ‘ভগবতি’ বলিবার তাৎপর্য এই যে, নামগ্রহণ স্মরণাদি ভক্তির যে-

অর্থাৎ—“অতএব, তুমি অনিত্য ক্লেশপূর্ণ এই মনুষ্যলোক লাভ করে, আমার ভজনা কর ।”

গুহ্যভক্তির দ্বারাই কৃষ্ণের সাংখ্য লাভ করা যায়, তাই ভক্তিকে অভিধেয় বলা হয়েছে । কৃষ্ণ-প্রাপ্তিই সমস্ত প্রাপ্তির মধ্যে মুখ্য-প্রাপ্তি ; তাই কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় মুখ্য অভিধেয় নামে খ্যাত । ভগবান্ কৃষ্ণকে পা'বার একমাত্র উপায় সম্পর্কে শাস্ত্র জানিয়েছেন,—

“ভগবান্ প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায় ।

শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণ-প্রাপ্তোর সহায় ॥

সেই সর্ববেদের অভিধেয়-নাম ।

সাধন ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম ॥”—(১৫: ৮:)

গুহ্যভক্তির বহু অঙ্গ,—তন্মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে শাস্ত্রে ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের উল্লেখ আছে । ৬৪ প্রকার ভক্ত্যাঙ্গের সাব-সংক্ষেপ নয়টি ভক্ত্যাঙ্গ ;—যথা—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্ত, সখা ও আত্মনিবেদন । উক্ত নববিধা ভক্তিই সমস্ত প্রকার ভক্ত্যাঙ্গের মধ্যে প্রধান । প্রেমের দিক্তি বিষয়ে নববিধা ভক্তিই অন্তরঙ্গ সাধন । নববিধা ভক্তিই উত্তম শিক্ষা ও গুহ্যভক্তি তথা অভিধেয় । নববিধা ভক্তির মধ্যে শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ শ্রেষ্ঠ । শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা—এই চারিটি বিষয়ের শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ হ'লে অল্প সমস্ত ভক্ত্যাঙ্গ ব্যঞ্জিত হ'য়ে থাকে । শ্রবণের দ্বারা শ্রবণ ও কীর্তন অন্ত-মুখী হয়, কিন্তু অপরের মঙ্গল সাধিত হয় না । একমাত্র কীর্তন মাধ্যমে নিজের ও অন্তের হৃদয়-কর্ণ-মন কৃতার্থ হয় এবং সমস্ত ভক্ত্যাঙ্গ ব্যঞ্জিত হয় । তাই শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণের মধ্যে কীর্তনই মুখ্য । বহু লোকের সম্মিলিত কীর্তনের নাম সঙ্কীর্ণন । শ্রীমদ্বহুপ্রভু ‘শিক্ষাষ্টকে’ বলেছেন, “পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ণনম্”—অর্থাৎ, “শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ণনই অবশ্যজ্ঞাবো ।” শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা বিষয়ক সঙ্কীর্ণনের মধ্যে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ণনই শ্রেষ্ঠ । শ্রীনাম-সঙ্কীর্ণনই মুখ্য ভজন । যথা,—

‘শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-বাণী’—

“ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নব-বিধা ভক্তি ।

‘কৃষ্ণ-প্রেম,’ ‘কৃষ্ণ’ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ণন ।

নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥

উক্ত গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত—“নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হইতে হয়।” ‘প্রেম-বিবর্ত’ গ্রন্থে উক্ত হয়েছে,—

“নাম ময়ং পুরুষার্থ ভক্ত্যঙ্গ প্রদান।

শ্রুতি-স্মৃতি শাস্ত্রে আছে বহুত প্রমাণ।

কল্পনামই সমস্ত ভক্তনাঙ্গের অঙ্গী এবং কল্পনামেই প্রেম-সম্পত্তি লাভ হয়।
নাম-সঙ্কীর্ণনেই ভক্তনের যাবতীয় অঙ্গ পূর্ণ হয়ে থাকে; যথা,—

“মন্ত্রতন্ত্রতচ্ছিন্নং দেশকালার্হবস্তুতঃ।

সর্বং কেরোতি নিচ্ছিন্নমঙ্গলসঙ্কীর্ণনং তব।”

—ভাঃ ৮:২৩:১৬

অর্থাৎ,—“(গুরুাচার্য্য বল্লভেন) মন্ত্র হইতে (অরণাদি অংশদ্বারা), তন্ত্র হইতে (কৈমবৈশ্বরীতাদ্বারা) এবং দেশ-কাল-পাত্র তথা বস্তু হইতে (দক্ষিণাদি-দ্বারা) যে যে নুন্নিতা হয়, আপনার নাম সঙ্কীর্ণনমাত্র সে সকলকে নিচ্ছিন্ন অর্থাৎ, পরিপূর্ণ করে।” শ্রীকৃষ্ণই গোলোক হইতে ভুলোকে নামক্লপে অবতীর্ণ। নাম লভুর করুণায় নামী শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবার সৌভাগ্য লাভ হয়। মহাজন-গীতিতে পাওয়া যায়,—

“পড়িলে শুনিলে কছু কৃষ্ণ-প্রীতি নয়।

ভজিলে বিগুহভাবে তবে কৃষ্ণ পায়।”

শ্রীনাম-ভক্তনের অধিকার কার কাছে পাওয়া যাবে এবং শ্রীনাম ভক্তনের ফল কৃষ্ণপ্রেম লাভ কি করে হবে? ৬৪ প্রকার ভক্তাঙ্গের মধ্যে প্রথমেই ‘গুরু-পদাশ্রয়’ উল্লেখ থাকায় ভক্তি-পথের পথিকের ভক্তনারস্তের পূর্বে সর্বপ্রথমে গুরু-পদাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। প্রেমোদয়ের ক্রম বলা হয়েছে,—

“আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া।

ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্তান্ততো নিষ্ঠা কচিস্তুতঃ।

অধাসক্তিস্তুতো ভাবস্তুতঃ প্রেমাভ্যদধতি।

সাধকানাময়ং প্রেমঃ প্রাহুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।”

—ভঃ রঃ সিঃ ৪:১৬

অর্থাৎ, “প্রথমে শ্রদ্ধা—সাধুসঙ্গে শাস্ত্র-অবগণ-দ্বারা শাস্ত্রের অর্থ বিধান।
তৎপরে সাধুসঙ্গ—ভক্তনরীতি শিক্ষার জন্ত ইহাই গুরুপদাশ্রয়। তাহার পর

ভজন-ক্রিয়া—গুরু ও সাধুগণের উপদেশক্রমে শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ ভজন ; তৎপরে অনর্থ নিবৃত্তি—তত্ত্বভ্রম, অসংভূষণ, হৃদৌর্বল্য ও অপরাধরূপ অনর্থ-সমুদয় ভজন দ্বারা ক্রমশঃ বিনষ্ট হয় ও নিষ্ঠাদি পরবর্ত্তীক্রম উদ্ভিত হয়। নিষ্ঠা—চিন্তাবিক্ষেপশূন্য নিরন্তর ভজন ; তৎপরে রুচি—বুদ্ধিপূর্ব্বক ভজনে ও ভজনীয় বিষয়ে অতিলাষ ; তৎপরে আসক্তি—ভজনে বা ভজনীয় বিষয়ে স্বাভাবিকী রুচি ; তৎপরে ভাব ও ভাব হ'তে প্রেম উৎপন্ন হয় ।”

“শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় ।

কৃষ্ণভক্তি কৈলেন সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয় ॥”

ভাগ্যক্রমে সাধু-সঙ্গ হ'লে সাধু-কণায় কৃষ্ণ-কথা শ্রবণে সূত্র নিশ্চয়ান্বক বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধার উদয় ব্যতীত ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশ হয় না। শুদ্ধভক্তিই সাধন অবস্থায় শ্রদ্ধামূল্য। সাধনভক্তি, পরিপক্ব হ'য়ে ভাবাবস্থায় রতিমূল্য ভাবভক্তি এবং ক্রমে প্রীতি পূর্ণাঢ় হ'লে প্রেমভক্তিরূপে প্রকাশ পায়। সাধন-ভক্তি আবার দ্বিবিধ—বৈধী ও বাগমায়া। বিধি-মার্গে শ্রবণ-কীর্তন দ্বারা ভজন কর্ত্তে কর্ত্তে সাধন অবস্থায় ভক্তি-সুখ উদয় হয় এবং আত্মার স্বাভাবিক রতির উদয় হলে বাগমার্গে ব্রজের মধুস্বর আসাদান হয়। সাধুর নিকট হ্রমনোযোগ সহকারে একান্ত সেবোন্মুখ হ'য়ে কৃষ্ণ-কথা শুন্তে শুন্তে ক্রমে কৃষ্ণ-কথায় রুচি জন্মায় ও আহার-ভুক্তি, একাদশী ব্রতাদি পালন প্রভৃতি বৈষ্ণব-সদাচার পালনে প্রবৃত্তি হয় এবং শমাদি গুণসকল বয়ং উপস্থিত হয়। গুণবানের কাছে প্রার্থনা জানালে তাঁর কণায় সঙ্গীত লাভ হয়। সাধু-গুরুর সঙ্গ হ'তেই ভজনক্রিয়া আরম্ভ হয়। সাধু-সঙ্গের সাহায্য সম্পর্কে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন,—

“সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ।

সবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥”

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অন্ততঃ বলেছেন,—

“সাধু-শাস্ত্রে কণায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয় ।

সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য় ॥”

শ্রী শঙ্করাচার্য্য মোহমুদগবে বলেছেন,—

“কৃণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা ।

ভবতি ভবান্নবতরণে নৌকা ॥” (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্যসঙ্গ মণ্ডল, কবিভূষণ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্টে ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
বিরহতিথি-বাসরে ভক্তিগুণাঞ্জলি

নিকুঞ্জ-যুনো-রতি-কেলি-সিদ্ধৈ

যা যালিভি মুক্তিরপেক্ষণীয়া ।

তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্ত

বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্ ॥

দীর্ঘ পনেরো বছর, বিরহ-স্মৃতি-আখর,

ঘুরে এল, মরমের কোণে ।

জ্যোৎস্নাভরা চাঁদুনী রাতে, মাজলিক ধ্বনি-সাথে,

জাগায় মুরতি-প্রেমঘনে ॥

হাস্যভরা আশ্রুধানি, যা'তে মাতে বিশ্বপ্রাণী,

লাস্য দেখি মুগ্ধ সর্ববজন ।

কিবা সে-নর্দনভঙ্গী, আছে কত দিব্য সঙ্গী,

মনে লয় গোলোকের ধন ॥

বিরহের নহে তিথি, ইথে ক্ষুরে নষ্ট স্মৃতি,

যাঁর লাগি' ভূরি আয়োজন ।

বিশ্রান্ত ভকতদলে, আনন্দের কোলাহলে,

আজি মাতার মর্ত্যভুবন ॥

(হে গুরো !) ভক্তরূপ অঙ্গীকরি, আসি এ ভূতলোপরি,

প্রকটি' আদর্শ-গুরুনিষ্ঠা ।

দ্বিতীয় কুরেশসম, গরিমায় নিরুপম,

ধরাধামে স্থাপিলা প্রতিষ্ঠা ॥

আনন্দময়: অভ্যাসাৎ, সে-বেদান্তসূত্রসাথ,

ছিল তব চির পরিচিতি ।

(তেঁই) 'কৃতিরত্ন'-আখ্যাদান, করিলেন গুণবান,

ভকতি সিদ্ধান্তসরস্বতী ॥

শ্রাবণাদি নব ভক্তি, প্রকাশিণী যথাশক্তি,
(মন্দিরের) নবচূড়া তাহারই প্রতীক ।

প্রগাঢ় ভক্তিয়াজনে, যেবা রত দৃঢ় মনে,
হন তিনিই পরমার্থদৃক ॥

কর্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষয় ভাণ্ড,
শিখালে মঠাংশ খণ্ড করি ।

হেন গুণ আছে য়ার, গগনে না পাই পার,
(যেন) তাঁর পদ চিরদিন স্মরি ॥

(হে দেব) বৈষ্ণববিজয়-গান, মায়াবাদ খান্ খান্,
করি হ'ল তব অন্তর্দান ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-নভঃ, হইল এবে নিপ্রভ,
উজ্জল করহ মতিবান্ ॥

বৈরাগ্য-বিষয়কর্ম, জুইই বিরুদ্ধ ধর্ম,
যুগপৎ তোমাতেই সম্ভব ।

সাধিতে আপন ব্রত, রহি স্বীয় কার্যে রত,
এ জগতে দেখালে বৈভব ॥

অতুল ঐশ্বর্য ছাড়ি, সেবিবারে গৌরহরি,
ক'রেছিলে গুরুপদ সার ।

স্বষ্টবেদান্তসমিতি, তব অভিনব কীর্তি,
রাখি' গেলে অবনী মাঝার ॥

বিরহে অমৃতধারা, সদা পানরত তাঁরা,
যাঁহাদের হৃদয় কাতর ।

আমি অতি অভাজন, বঞ্চিত অমৃত-ধন,
অর্ঘ্য লহ করুণাসাগর ॥

শ্রীগুরুকৃপাকাজী—

(ত্রিদিগ্ভিম্বামী) শ্রীভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্ত্রী (মহারাজ)

যুগধর্ম

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২২৮ পৃষ্ঠার পর)

পূর্ব শ্লোকের টীকায় শ্রীশ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেন,—ইদানীং কালেঃ সর্কোভ্যোহপি যুগেভ্যঃ শ্রেষ্টায়াহ। দোষণাং নিধেরপি কলেবরেকো মহান্ গুনোহস্তু। যথা এক এব রাজা অসংখ্যানপি দত্ত্বান্ হস্তি, তথৈবৈক এব গুণঃ সর্কানপি উত্তলক্ষণান্ দোষান্ হস্তি। স এব কণ্ডুজাহ—কীর্তনাদেবেতি। নাত্র ধ্যানাদেবপেক্ষা। যদ্বা কীর্তনাদেব কিমুত কীর্তনসহিত-ধ্যানাদিত্যঃ। পরং সর্কোংকষ্টপুরুষার্থং প্রেমানং।

কলিযুগ দোষের সমুদ্র হইলেও তাহার একটা মহাশুণ আছে বলিয়া কলিযুগ সমস্তযুগ হইতে শ্রেষ্ঠ, সেই গুণটি কি? কেবল হরিনাম কীর্তনের দ্বারাই কলিযুগবাসী জনগণ সংসার হইতে মুক্ত হইয়া পরম পুরুষার্থ প্রেম লাভ করিতে পারে। কীর্তনে স্মরণাদির কোন অপেক্ষা নাই। কেবল কীর্তনের দ্বারাই সব লাভ হইবে। স্মরণ সহিত কীর্তন করিলে ত কথাই নাই। এইটাই কলিকালে মহাশুণ। এখন প্রশ্ন, অসংখ্য দোষের মধ্যে একটা গুণ কি করিবে? তদুত্তর এই যে, যেরূপ একজন প্রবল পরাক্রম রাজা অসংখ্য দত্ত্বকে বিনাশ করে, এক চন্দ্র যেরূপ সমস্ত পৃথিবীর অন্ধকার দূর করে, তরূপ একটা গুণই কলিযুগবাসীর সমস্ত দোষ নষ্ট করিয়া থাকে।

এখানে আর একটা প্রশ্ন—অশেষ দোষহই কুমতি-পরায়ণ কলির জীব কিক্রমে কীর্তনের আদর করিবে? ইহার উত্তরে শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু তাহার ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় বলিয়াছেন—“কংসাদেনারদাদয় ইব”। অর্থাৎ কংস প্রভৃতি রাজগণ মহারুষ্ট হইয়াও যেরূপ ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদকে আদর করিতেন, সেইরূপ কলিকালে লোক কুমতিপরায়ণ হইলেও হরিকীর্তনের আদর করিবে।

কেহ যদি বলেন,—ডাকার মত ত ডাকা চাই। ইহার উত্তর এই যে,—প্রথমেই ডাকার মত ডাকা হয় না। লেখার মত লেখা, পড়ার মত পড়া, হাঁটার মত হাঁটা একদিনে সম্ভব নয়। যেরূপ লিখিতে লিখিতেই লেখা হয় পড়িতে পড়িতেই পড়া হয়, হাঁটিতে হাঁটিতেই হাঁটা হয়; সেইরূপ নাম করিতে করিতেই নামে রুচি হইবে, ডাকার মত ডাকা হইবে। উপরি-উক্ত শ্লোকেও এই কথাই আছে—‘কীর্তনাদেব’।

এই যুগধর্ম হরিনাম-সঙ্কীৰ্তনের দ্বারাই যে বাবতীয় পুণ্যার্থ লাভ হয়, তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

কলিং সভাজয়ন্তার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ ।

যত্র সঙ্কীৰ্তনেনৈব সৰ্ব্বার্থার্থোহভিলভ্যতে ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৬)

সারগ্রাহী সজ্জনগণ কলিযুগেয় প্রশংসা করিয়া থাকেন । কারণ, কলিযুগে কেএল হরিনাম-সঙ্কীৰ্তনের দ্বারাই সমুদায় স্বার্থ অর্থার্থ-ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ও প্রেম লাভ হইয়া থাকে ।

নিজ ইষ্ট-মন্ত্ৰ জপ করিয়াও কলিকালে যুগধর্ম হরিনাম কীর্তন ব্যতীত যে জীবের প্রকৃত শান্তি হইতে পারে না, শ্রীচৈতন্যভাগবতে তারার একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তও আমরা দেখিতে পাই । শ্রীগৌরাজদেব গৃহে থাকাকালে যখন অধ্যাপনার্থ পুর্ব্বাহ্নে শুভ-বিজয় করেন, তখন এই ঘটনাটি ঘটে—

ধেনই সময়ে এক স্মৃতি ব্রাহ্মণ । সেইক্ষণে চলিলেন প্রভু দেখাইয়া ।
অতি সারগ্রাহী নাম মিশ্র তপন । বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর ।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নিরূপিতে নারে । শিষ্য-গণ-সহিত পরম মনোহর ॥
হেনজন নাহি তথা, জিজ্ঞাসিবে যারে ॥ আসিয়া পড়িল বিপ্র প্রভুর চরণে ।
নিজ-ইষ্ট-মন্ত্ৰ-সদা জপে রাত্রি দিনে । জোড়-হস্তে দাণ্ডাইলা সবার সদনে ॥
সোয়াস্তি নাহিক চিন্তে সাধনাপ্ন বিনে ॥ বিপ্র বলে—“আমি অতি দীন হীনজন ।
ভাবিতে চিন্তিতে একদিন রাত্রিশেষে । কৃপা-দৃষ্টো কর মোর সংসার মোচন ॥
সুখ দেখিলা নিজ নিজ ভাগ্যবশে ॥ সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কিছুই না জানি ।
সম্মুখে আসিয়া এক দেব মূর্তিমান । কৃপাকরি’ সব তত্ত্ব কহিবা আপনি ॥
ব্রাহ্মণেরে কহে গুপ্ত চরিত্র আখ্যান ॥ বিষয়াদি-সুখ মোর চিন্তে নাহি ভায় ।
নিমাই পণ্ডিত-পাশ করহ গমন । কিসে জুড়াইবে প্রাণ কহ দয়াময় ॥”
তিহো করিবেন তোমা সাধ্য-সাধন ॥ প্রভুবলে, “বিপ্রতোমার ভাগের কি কথা ।
মহুঘ্য নহেন তিহ নর-নারায়ণ । কৃষ্ণ ভজিবারে চাহ সেই সে সর্ব্বথা ॥
নররূপে লীলা তাঁর জগত-কারণ ॥ ঈশ্বর-ভজন অতি দুর্গম অপার ।
বেদ-গোপ্য এসকলনা কহিবে কারে । যুগধর্ম স্থাপিয়াছে করি’ পরচার ॥
কহিলে পাইবে হৃৎক জন্মজন্মান্তরে ॥ চারি যুগে চারিধর্ম রাখি ক্ষিতি-তলে ।
অন্তর্জ্ঞান হৈলা দেব, ব্রাহ্মণ জাগিলা । স্ব-ধর্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজ ধাম চলে ,
সুখ দেখিলা বিপ্র কান্দিতে লাগিলা ॥ কলিযুগ-ধর্ম হয় নাম সঙ্কীৰ্তন ।
‘অহোভাগ্য’ মানি’ পুনঃচেতন পাইয়া । চারি যুগে চারিধর্ম জীবের কারণ ॥

কুতে যক্ষায়াতো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মথৈঃ ।

দ্বাপরে পরিচর্য্যয়াং কলৌ তদ্বিকীর্ণনাং ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫২)

অতএব কলিযুগে নাম যজ্ঞ দার। কুটি নাটি পরিহরি একান্ত হইয়া ।
আর কোন ধর্ম্য কৈলে নাহি হয় পার। রাত্রি দিনে নাম লয় খাইতে উইতে ॥
শুন মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপা-যজ্ঞ। তাহার মহিমা দেবে নাহি পারে দিতে ॥
যেই জন কহে ভদ্রে তার মহাভাগ্য। সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল ।
অতএব গৃহে তুমি কক্ষ ভজ গিয়া। হরিনাম-সঙ্কীর্ণনে মিলিবে সকল ॥

হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্তথা ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১১৬-১৪৮)

শ্রীগৌরাজদেব অস্ত্রতন্ত্র ভক্তগণকে এই কথাই উপদেশ দিয়াছেন—

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে। ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ
কৃষ্ণনাম মহাযজ্ঞ শুনহ হরিয়ে ॥ ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । সর্ববন্ধন বল ইথে বিধি নাহি আর ॥
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
প্রভু কহে,—কহিলাম এই মহাযজ্ঞ। অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে ॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৭৫-৭৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও শ্রীগৌরাজদেবের উক্তিতে যুগধর্ম্য লক্ষ্য এইরূপ

লিখিত আছে—

হর্ষে প্রভু কহেন—শুন বরুণ-রামরায় ।

নাম-সঙ্কীর্ণন-কলৌ পরম উপায় ॥

সঙ্কীর্ণন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন ।

সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাক্ষং সাজে।পাজাপ্তপার্বদম্ ।

যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ণনপ্রার্নৈর্ধজন্তি হি জন্মেধনঃ ॥ (ভাঃ ১১।৪।৩২)

নাম সঙ্কীর্ণন হইতে সর্বানর্থ নাশ ।

সর্ব-শুভোদয় কৃষ্ণ প্রেমের উল্লাস ॥

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্দীপনং
 শ্রেয়ঃকৈবল্যচন্দ্রিকাবিতরণং বিভাবধূজীবনম্ ।
 আনন্দানুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
 সর্বাস্বপ্ননং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসকীর্্তনম্ ॥ (শিলাইক-১)
 সকীর্্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন ।
 চিত্ত-তত্ত্বি, সর্বভক্তি সাধন উৎসব ॥
 কৃষ্ণ-প্রেমোৎসব, প্রেমামৃত আবাদন ।
 কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।৮-১৪)
 নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তি-
 স্তোত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্রবণে ন কালঃ ।
 এতাদৃশী তব কৃপা জগবন্ মমাপি
 হৃদৈবমীদৃশমিহাজনি নামুরাগঃ ॥ (শিলাইক-২)
 অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার ।
 কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥
 খাইতে শুইতে যথ্য তথা নাম লয় ।
 কাল-দেশ-নিয়ম নাহি, সর্বসিদ্ধি হয় ।
 সর্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ ।
 আমার হৃদৈব, নামে নাহি অহুরাগ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।১৬-১৯)
 তৃণাদপি স্তনীচেন তরোরিষ সহিযুনা ।
 অমানিনা মানদেন কীর্্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ (শিলাইক-৩)
 উত্তম হঞা আপনাকে মানে কৃপাধম ।
 জুই প্রকাবে সহিযুতা করে বৃক্ষসম ।
 বৃক্ষ যেম কাটিলেহ কিছু না বোলয় ।
 শুকাঞা মৈলেহ পারে পানি না মাগয় ॥
 যেই যে মাগয়ে, তাবে দেয় আপন ধন ।
 ঘর্য-বৃষ্টি লহে, আটনের করয়ে রক্ষণ ॥
 উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান ।
 জীবে সম্মান দিবে আনি 'কৃষ্ণ' অধিষ্ঠান ।
 এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয় ।
 শ্রীকৃষ্ণ-চরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।২১-২৬)

শ্রীসত্তাগবতাদি শাস্ত্র হইতে এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরানন্দদেবের উক্তিতে আমরা পাইলাম—শ্রীহরিনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনই কলিকালের একমাত্র ধর্ম এবং এষ্ট হরিসঙ্কীৰ্ত্তনের দ্বারা ই যুগধর্ম সাধিত হয় এবং নিত্যশান্তি বা পরিশান্তি পাওয়া যায়। হরিনাম-কীৰ্ত্তনরূপ যুগধর্মকে বাদ দিয়া আর যাচাই করি না কেন, তাহাতে প্রকৃত শান্তি অক্ষুণ্ণ সুখ বা নিত্য-আনন্দ লাভ হইবে না। অতএব যুগধর্ম হরিনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন ব্যতীত যে কলিকালে আমাদের অল্প কোন গতি নাই, তাহা নশাই বাছিয়া।

এখন প্রশ্ন—যখন হরিনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনই একমাত্র যুগধর্ম এবং যুগধর্ম ব্যতীত সুখ হইতে পারে না, তখন বাচাদের গৃহে বা মঠে শ্রীবিষ্ণুপূজা আছে, তাঁহারা কি করিবেন? ইহার উত্তরে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামীপ্রভু শ্রীভক্তিসম্বর্ভ-গ্রন্থে বলিয়াছেন—

“বসন্তানি ভক্তিঃ কৰ্ণে কৰ্ত্তব্যে, তদা কীৰ্ত্তনাখ্য-ভক্তি-সংযোগেনৈব কৰ্ত্তব্যে”। অর্থাৎ, যদি কলিযুগে সম্যক্তত্ত্বজ্ঞের অল্পষ্ঠান করিতে হয়, তাহা হইলে কীৰ্ত্তনাখ্য ভক্তি-সংযোগেই তাহা করিতে হইবে। নচেৎ তাহা সম্যক ফলপ্রদ হইবে না। সমস্ত তত্ত্বজ্ঞের মধ্যে ভক্ত্যত্মসম্রাট্ শ্রীহরিনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনই প্রধান। হরিনাম-কীৰ্ত্তন কেবল সর্কশ্রেষ্ঠ ভক্তি বা সাধন নহে, তাহা ভক্তি ও ভগবান্ যুগপৎ। হরিনামই সাধন, হরিনামই সাধ্য। হরিনামই উপাসনা, হরিনামই উপাস্ত। যেই নাম সেই কৃষ্ণ। কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণাবতার। ভগবান্ শ্রীগৌরানন্দদেবও বলিয়াছেন,—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।

নাম চৈত্বে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার ॥

জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ বলিয়াছেন,—“চৌষটি প্রকার ভক্ত্যজ্ঞের মধ্যে শ্রীনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনেরই সর্কশ্রেষ্ঠতা। নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারা ই সর্কমঙ্গল সাধিত হয়। নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের মধ্যে নবধা ভক্তি সমস্তই আছেন। একমাত্র নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন হইতেই সর্কসিদ্ধি হয়,—

ভক্তনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।

‘কৃষ্ণপ্রেম,’ ‘কৃষ্ণ’ দিতে ধরে মহাশক্তি।

তার মধ্যে সর্কশ্রেষ্ঠ ‘নামসঙ্কীৰ্ত্তন’।

নিরপরাধে নাম লৈলে পার প্রেমধন ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৭০, ৭১)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অতঃ বলিয়াছেন,—“নিরপরাধে শ্রীনাম কীৰ্ত্তন ব্যতীত পৃথিবীতে থাকাকালে আমাদের অল্প কোন সাধন-ভজন নাই।’

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবচাৰ্য্য শ্রী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩০,৪৪ শ্লোকের টীকায় জানাইয়াছেন,—“ভগবদ্বর্ণনে তৎকারুণ্যমেব হেতুঃ, তৎকারুণ্যে চ তৎসঙ্কীৰ্ত্তনমেব হেতুঃ।” শ্রীহরিনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন দ্বারা ই শ্রীহরির কৃপা হইবে এবং হরির রূপাতেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। সুতরাং শ্রীহরিনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনই মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়, ইহাট পাশ্চর্য্যকা।

গীতা বা নিত্যানন্দময় শ্রীহরির চরণকমল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন—চির-শান্তি কামনা করেন,—তাঁহাদের সকলেরই শ্রীহরিনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম আচরণ করা অবশ্য কর্তব্য। কারণ ইহার দ্বারা সাবিতীয় সুখ লাভ হইবে। জগদগুরু শ্রী কৃষ্ণা ভক্তিবিদ্যোদ ঠাকুরও বলিয়াছেন—‘নাম বিদ্যা বিছু নাহিক আর চৌদ্ধভূবন মনো’। ‘ভক্ত মঙ্গলগণ’। হরিনাম বাকীও জীবের অল্প সম্বল নাই। হরিনাম ব্যতীত জীবের আশ্রয় নাই। হরিনামই সাক্ষাৎ ভগবান্। হরিনামাশ্রয়ই ভগবচ্চরণাশ্রয়। এই হৃস্তর ভবসমুদ্রে ভাসমান হইয়া জ্ঞান-কর্ম্মাদির আশ্রয় গ্রহণ কেবল তৃণধারণপূর্ব্বক মহাসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার বাজার ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক। অতএব আপনারা হরিনামরূপ মহাপোত অবলম্বনপূর্ব্বক এই হৃস্তর সমুদ্ররূপ সংসার পার হউন।’

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-উপলক্ষে

জগদগুরু ঐ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮-শ্রী

শ্রীমদ্বক্তিবদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের

দ্বিতীয়া দিনেন্দ্র অভিভাষন

স্থান—শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, তুরা।

তারিখ—১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩

বিষয়—সনাতনধর্ম্ম ও বিশ্বসমস্যা

সর্বপ্রথমে মণীয় গুরুপদগদ্য জগদগুরু নিতালীলাশ্রয়িত ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের চরণে অনন্তকোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম; তদনন্তর সমাগত বৈষ্ণববৃন্দ, জুধী-সজ্জাবৃন্দ ও মাতৃমণ্ডলী।

আজ আমরাই আশোচ্য বিষয় সনাতনধর্ম্ম ও বিশ্বসমস্যা বা বিশ্ব সমস্যার সমাধানে সনাতন ধর্ম্ম; এতরূপ ধরে আমরা বিবিধ জুধী দলগণের নিকট

থেকে সনাতন-ধর্ম-তত্ত্ব গ্রহণ করলাম। সনাতন ধর্ম-তত্ত্ব আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথমে এইটাই মনে হবে জগতে অজ্ঞান যত কিছু ধর্ম চলছে, এর প্রায়গুলিই প্রাকৃত, জড় ও ধ্বংসশীল। 'পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম নামে চলে, ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে।' জগতের যে ধর্মকথা সে' গুলোতে প্রাকৃত স্বভাবের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সনাতন ধর্ম-তত্ত্ব নির্দেশ করছেন আত্মধর্ম কি? যে ধর্মে আত্মার বিনাশ নাই, যে-ধর্মে পরমাত্মা বা 'স্বর্গ'বাদের বিনাশ নাই তাহার কথা বলা হয়েছে। জীবাত্মা যখন বহুদশা লাভ করেছে তখন এতটা গবেষণা নেওয়া হয়েছে যে, তাৎসেই বহুদশা কি করে সূচবে? এর কোন ব্যবস্থা আছে কি না? এত কথাটা আচার্য্যপাদ জীহ্বত তাঁর এক প্রোগ্রামে হুমুসারের মাধ্যমে জানিয়েছেন,—

॥ ७१ क॥ ७॥ ७॥ ७॥ ७॥

সংস।রোহমমতীঃ বিচিত্রঃ ।

କଥା ହୁଏ ବା କୃତ ଆସ୍ଥାତଃ,

तद्युः चिह्नं तदिदं प्रतः ॥

“হে ভাই! তুমি এ জগতে কোথা থেকে এলে? মৃত্যুর পর আবার কোথায় তুমি ফিরে যাবে? এ জগতে তোমার যে আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন এদের কি তুমি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলে বা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে? তোমার অবস্থিতি এখনে কতদিন? তুমি এই তত্ত্বদর্শন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর।” ঠিক এই জিনিসটাই আমাদের বুঝবার বিষয় ও সাধনার ক্ষেত্র। কে তুমি, কোথায় ছিলে, কি করিতে হেথা এলে, কিবা কাজ করে গেলে, পাবে কি স্থব জীবনে?

শাস্ত্র এই প্রার্থিত জিজ্ঞাসা কবেছেন, এ সংসারে আমাদের জন্ম আর মৃত্যু এই দুটিই যেন সম্বল, যাবাখানে যা কিছু কণে যাচ্ছি সেটা যেন ছুদিনের। সেটা কোন এক কবি বলেছেন, *World is a stage and we are actors.* অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা হয়েছে,—

যা বহুজনমঃ ত্রি বিন্দুদগঃ

তানজুৎন-শীর্ষক্রে শয়নম্ ।

হাও সংসারে স্মৃতিভরদেবঃ ;

କଥାମିହି ଯାନିବ ତୁ ନ ସନ୍ତୋଷଃ ।

হে মানব! তুমি এ জগতে এসেছ ফলিক সময়ের জন্য, এখানে পূর্ণতা
 পাই করে পুনরায় তোমাকে চলে যেতে হচ্ছে, জগতের যে সুখ শান্তি

যেটা আমরা আশা করি, তাহা ঠিক সুখ শান্তি ও বাস্তব নয়। আর্থিক বিপণন
সনাতন শাস্ত্রে তাই বলেছেন,—

বালস্তাবৎ ক্রীড়াগচ্ছ,

তরুণস্তাবৎ তরুণীরকঃ ।

বৃদ্ধস্তাবচ্ছিত্তামগ্নঃ,

পরমে ব্রহ্মণি কোহপি ন মগ্নঃ ॥

সংসারের থেকে আমরা পাওয়া পরা থাকে এই নিয়ে যে সময়টা কাটিয়ে
দেছি সে সময়টা আমাদের Fixed Deposit-এ আছে কিনা সেটা
বিচার করা প্রয়োজন, পরব্রহ্ম, প্রেমাম্পদ ভগবানকে ভালবাসাই হল
সনাতন ধর্মের মূল তত্ত্ব ও সূত্র। এতক্ষণ ধরে সেই কথাই আলোচনা করা
হয়েছে, দেহ ও মনের ধর্ম অনিত্য, কিন্তু আত্মধর্ম নিত্য ও সনাতন।

আজ সমগ্র বিশ্বে ধারা চিন্তাশীল মনিস্বী তাঁরা সবাই দাবী করছেন যে,
এই বিংশ শতাব্দীর যুগ হল বৈজ্ঞানিক যুগ। অপর ভাষায় প্রধান অর্থাৎ
Mr. Arya বলেছেন যে এটা হল বাস্তব যুগ। যন্ত্রেতেই সব কাজ হচ্ছে,
কিন্তু তাতেই কোনো শান্তি নেই। যদি এটা বৈজ্ঞানিক যুগ হয়, তবে মানুষ
কেন শান্তি পাচ্ছে না? পশ্চাত্তা দেশের একটি কথা আমাদের দেশের
সকলের মুখে মুখে আছে, "Science ends in philosophy and
philosophy ends in religion." এই Science হল Material
science. যেখানে জড়বিজ্ঞান তার বিচার শেষ করছেন, সেখানে থেকে
দর্শন শাস্ত্রের বিচার আরম্ভ হয়েছে, দার্শনিক বিচার যেখানে শেষ, সেখানে
থেকে আরম্ভ হল ধর্মজগৎ। সেই ধর্মজগতের কথাই আমাদের বর্তমান
সমস্যা আলোচ্য বিষয়। সেই ধর্ম সমস্ত পৃথিবীর মোড় ঘুরাতে পারে।
একদিন এক পশ্চাত্তা ধর্মসম্ভার Pope বলেছিলেন, "India guided
by God can lead the whole world back to sanity." বর্তমান
যে-সমাজ তাহা কাণ্ডা-বিবাদ, বিসম্বাদে পরিপূর্ণ রাজ্যবিশুদ্ধ সমাজ। এই
সমস্যার মোড় ঘুরাতে পারে অধ্যাত্ম ভারত, দার্শনিক ভারত। স্মরণ
ভারতবাসীদেরকে, ভারতের যে অন্তরাত্ম তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সমগ্র
বিশ্ব। কিন্তু আমরা এমনি বোকা ও হতভাগা, আমরা মনে করছি আমাদের
বোধহত কিছুই নাই। সবকিছু সম্পদ লাভ করেও আমরা সেটাকে utilise
করতে পারছি না বা তার সবাবহার করিতে পারছি না। কৃষিগণের যে অধিদান

তাহা আমরা মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারছি না। এইটাই হলো বর্তমানে আমাদের অত্যন্ত দুঃস্বপ্নের বিষয়। সেই দুঃস্বপ্ন যতদিন না কাটিয়ে উঠছে আমাদের কল্যাণ ও শান্তি কোথায়? বিজ্ঞান যদি আমাদের শান্তি দিতে পারত, তাহলে কিছু এঁচোঁতা তারা নিতই।

কিস্ত কোথায় শান্তি? আমার পূর্ববর্তী বক্তৃ মহোদয় তিনি উল্লেখ করে গিয়েছেন U. N. O. অর্থাৎ United Nations of Organisation, আবার দেখা যাচ্ছে U. N. O. যে-ব্যবস্থা নিয়েছেন তাতে আমাদের কি কিছু কল্যাণ হয়েছে? শান্তি কি কিছু তাঁরা আনয়ন করতে পেরেছেন? যেখানে রাজনীতি সর্বস্ব, সেখানে কি কিছু আশা করতে পারি আমরা? বর্তমান দুনিয়া দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে। দুই দলে দুইটা যেন শিবির তৈরি হয়েছে। তারা দুজনেই চাচ্ছে, আমার পদানত থাক, তবে তোমায় কিছু সাহায্য দেব। যেখানে এইভাবে রাজনীতি প্রচলিত সেখানে শান্তির সমাধান কি করে হয়? শান্তি আমরা পেতে পারি না। তাই বৈজ্ঞানিক জগৎ ও পাশ্চাত্য দেশ অজ্ঞ চিন্তা ভাবনায় পড়েছেন। অনন্ত সমস্তাগ্রস্ত আমাদের শান্তি কিরূপে সম্ভব? Peace, peace বলে চীৎকার হলেও তাহা আমরা কিরূপে লাভ করব? সনাতন আৰ্য্যঋষিগণ এই শান্তির সন্ধান দিয়েছেন। যদি আমরা সবাই একেধার ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও ভালবাসতে পারি তবে একটা জাতি হিসাবে সমগ্র বিশ্বে, পরিচিতি হইবে। সেই জাতি হলো মানব জাতি। গতকাল আমি আপনাদের সামনে উত্থাপন করেছিলাম মানব বা মনুষ্য কাকে বলে। মানবত্ব বা মনুষ্যত্ব নিয়ে সনাতন আৰ্য্য-ঋষিগণ বহু তত্ত্ব-চিন্তা করেছেন। মানবত্ব বা মনুষ্যত্ব কাকে বলব? একজন কবি তিনি লিখে গেছেন, More than man you can not be. সবার উপরে মানুষ সত্য, তারার উপরে নাই। কবি কি বুঝতে চেয়েছেন? তিনি কি শুধু মনুষ্যের চেতনাটাকেই লক্ষ্য করেছেন? তা নয়। যেখানে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় নাই সেখানেই মানবকে দানব বলা হয়েছে। আর যেখানে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ প্রকাশিত হয়েছে, সেখানেই তাঁতাকে যথাযথভাবে মানব বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। সেই মানবত্বই দেবত্ব।

প্রথমত যে ভগবান্, যার কেউ সমান বা উর্দ্ধে নাট, তাকে কেন আমরা ভালবাসতে চেষ্টা করি না? জগতে বহু প্রথা প্রচলিত আছে, আমাদের দর্শনপ্রণালী মধ্যেও আমরা 'স.স.' স্বাধীনতা' ও 'মৈত্রী' তিনটি শব্দের

ব্যবহার দেখতে পাই। কিন্তু আলোচিত ঐ তিনটি আসবে কি করে? সাম্যবাদ আমরা কি করে প্রমাণ করতে পারি? মানুষের সঙ্গে মানুষের যে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রমাণ করব কিসে? বহু ব্যক্তি আজকাল বলছেন—আমরা সবাই মানুষ। কিন্তু প্রমাণ কি যে—আমরা মানুষ। তার প্রমাণটাই হলো নীতি-আদর্শপরায়ণ ব্যক্তিই মানুষ। যদি আমরা ভগবানকে সমানভাবে ভালবাসতে পারি তবেই প্রত্যেক জীবাত্মাকে ভালবাসতে পারব। যে মানুষ নিজের পিতা-মাতা-অভিভাবককে ভালবাসতে পারে না, সে বিশ্বভ্রাতৃত্ব কি করে প্রচার করবে?

বহু ব্যক্তি আজ সমাজে বলতে চাচ্ছেন, সবাইয়ের শরীরে একই রক্ত প্রবাহিত। কিন্তু যদি কোন Medical Scientist সেখানে বসে থাকেন তিনি বলবেন, ওটা ভুল ও বাজে কথা। Blood-রও gradation আছে, যেমন A, B, C, D, gradation, সবাইকে সব রক্ত দেওয়া যাবে না। এখানেও পার্থক্য স্থাপিত হলো, পার্থক্য জগতের যত কিছু দুনিয়াপারীর জিনিসে আমরা বিশ্বভ্রাতৃত্ব বা সাম্যবাদ প্রমাণ করতে পারি না। তবে প্রমাণিত চর কিসে? আত্মকল্যাণ-চিন্তায় আত্মদর্শনে প্রমাণিত হয়েছে সুষ্ঠুভাবে। সমাজের আর্থিকবিগণ সেই সাম্যবাদের কথা বলেছেন, যে সাম্যবাদ আমাদেরকে বিশ্বভ্রাতৃত্ব অর্থাৎ মৈত্রীতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এই জগতের প্রচেষ্টার দ্বারা আমরা শান্তি লাভ করতে পারি না। যদি আমরা গীতা আলোচনা করি তাহলে দেখব, ভগবান অর্জুনকে লক্ষ্য করে আত্মদর্শন উপদেশ করছেন। অর্জুনকে উপদেশ করার ভগবানের কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে তার প্রিয়মথ্য অর্জুনকে উপদেশ করে সমগ্র জগদ্বাসী আমরা যে-রোগে ভুগছি সেই রোগের চিকিৎসার জন্ত তিনি এই উপদেশ করছেন। শান্তি আমরা কি করে লাভ করতে পারি, সেখানে বলছেন। অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে দীক্ষিত বলেছেন—

“আপুর্ণ্যামলচলপ্র’তষ্টং,

সমুজ্জমাণঃ প্রবিশক্তি যদ্বৎ।

তদ্বৎ কামঃ যং প্রশিশস্তি সর্গে

স শান্তিমাশ্নোতি ন কামকামী চ (গী: ২, ৭০)

এই জগতে আমাদের আশা থাকুক আর শেখ নাট। এই সমুদ্রায় জর্জরিত এই পৃথিবীতে আমাদের কামনা-বাসনা সীমায়িত হওয়া উচিত, তা নয় হলে আমাদের রক্ষা নাট। আজ বিশ্বে যে হাহা মাব ও অভাববোধ তাহা বহুতর

ক্ষেত্রে আমাদের সৃষ্ট। এখন থেকে ২৫।৩০ বৎসর পূর্বের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, তখন যে-ভাবে সম্ভট তিলাম এখন সে-ভাবে বিস্তৃত থাকতে পারছি না। আমাদের অভাববোধ কোটিগুণ বেড়ে গেছে। শাস্ত্র শিখাচ্ছেন, তুমি তোমার এই কাল্পনিক অভাববোধটাকে কমিয়ে আন, তাহলে তুমি শান্তি পাবে। কিন্তু জগৎটাকে অশান্তি দিয়ে গড়া হয়েছে, শান্তি দিয়ে তো গড়া হয় না। তবে আমরা শান্তির সন্ধান করি কিরূপে? তার সূর বের করেছেন শাস্ত্র,—

তমেব শরণং গচ্ছ স্বর্গীভাবেন ভারত ।

তৎপ্রশাদাৎ পুণ্যং শান্তিং স্থানং প্রাপ্সামি শাশ্বতম্ ॥

ভক্তকে শিক্ষা দিয়েছেন ভগবান, ‘তমেব শরণং গচ্ছ’ অর্থাৎ তুমি আমার শরণ গ্রহণ কর। আত্মদম্পণ বিনা কখনও শান্তি লাভ করা যায় না। যতদিন পর্যন্ত আমরা ভাদি, আমাদের সমস্যা আমরা নিজেরাই সমাধান করে নিজে পারব ততদিন কোন সমস্যার সমাধান হবে না। যেখানে সমাধান আছে, সেখানেই সংবিধান নিজে হচ্ছে। Full surrender-এর কথা গীতা, ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-সমূহে শিক্ষা দিয়েছেন। অতরাং যেন এটি শিক্ষার কথা কখনও ভুলে না যাই।

বিশ্ব যে অনন্ত সমস্যা আছে (যেমন অন্ন সমস্যা, বস্ত্র সমস্যা, বাসস্থানের সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা প্রভৃতি) তার সমাধান হতে পারে যদি আমরা মূল কেন্দ্রটাকে ঠিক রেখে চলি, সেই মূলকেন্দ্র হচ্ছে ভগবানের প্রতি আমাদের বিশ্বাস, অস্থা ও ভক্তি প্রভৃতি স্থাপন করা। সেই ভগবান কে, তাহা কাল সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা কবেছি। তিনি অনন্ত বিশ্বাত্মা; নিরাকার, নিজগুণ, নির্বিণেয়। নিঃশক্তিক মন, Positive side-এ তাঁর সব আছে। তিনি সর্বশক্তিমান, সাকার, সত্ত্ব গতিদানন্দ শ্যামসুন্দর বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই সেই প্রেমময় ভগবান্ অনন্ত জীবকে ভালবাসতে পারেন এবং তাঁদের ভালবাসা গ্রহণ করতে জানেন।

আমরা অগুণেতন জীব তাকে যদি ভালবাসার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের আত্মদর্শন পূর্ণভাবে আগ্রহিত হয়েছে বুঝতে হবে, আমাদের কর্তব্য আমরা সর্বদা পালন করতে পারলাম জানতে হবে। সমান্তর আর্ধ্য কৃষ্ণিণের এবং সনাতন আর্ধ্য শাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণের পথেই বিশ্ব-সমস্যার সমাধান সম্ভব।

.. সংগ্রাহক : শ্রীবল্লভদ্রাস জগদারী

ত্রিগীতার মর্মবাণী

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩৯ পৃষ্ঠার পর)

ষোড়শ অধ্যায়

[দৈবাত্মর সম্পদ-বিভাগযোগ]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—৩)

দৈবী গুণী রহে শুদ্ধ

হয় অভিজ্ঞানী ।

নাহি রহে ভয় ক্রোধী

নহে অভিমানী ॥১॥

দৈবীগুণী সংযমী

জ্ঞানে বেদবাণী ।

যজ্ঞ করে, তপ করে

যথাযথ দানী ॥২॥

প্রাণীকে না দেয় ব্যথা

যড়ই সরল ।

ত্র্যাণী হয় দৈবীগুণী

সন্তোষ সঙ্গী ॥৩॥

ন হি করে পরমিলা

হয় শান্তশিষ্ট ।

অশ্বকে সাস্থনা দেয়

কহিয়া সুমিষ্ট ॥৪॥

নাহি লোভ ভোগা জ্ঞেয়া

মহে লজ্জা ধৃতি ।

ক্ষমা করে দোষী জনে

মানে শৌচ বিধি ॥৫॥

অভিমানী নাহি হয়

দৈবীগুণী লোক ।

নিজগুণে ধরা করে

আলোকে আলোক ॥৬॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৪—৭)

এ জগতে জুই জ্ঞেয়ী

হয় পরিদৃষ্ট ।

কেহ হয় অভিমানী

কেহ শান্তশিষ্ট ॥৭॥

দৈবীগুণী শুদ্ধাচারী

লভে উর্দ্ধগতি ।

অদৈবী অশুচি রহে

জড়লোকে স্থিতি ॥৮॥

আসুরী জনেতে হয়

রুদ্ধ অভিমানী ।

দর্পী দন্তী ক্রোধী হয়

আসুরী অজ্ঞানী ॥৯॥

বহেনা প্রবৃত্তি ধর্ম

নহে সদাচারী ।

অধর্ম্যে নিবৃত্ত নহে

জানিবে আসুরী ॥১০॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৮—১২)

কাম হেতু হয় সৃষ্টি

নাহি ভগবান্ ।

ইচ্ছাই আসুরী মত

ধর্ম্যে নাহি স্থান ॥১১॥

চরিতার্থ করিবারে

ইন্দ্রিয় নিচয় ।

লালসার পিছে ধায়

আত্মরী হৃদয় ॥১২॥

নাহি মানে ভগবানে

তাহারি পিধান ।

দ্রব্ধ বিধীন ভাবে

করে অবস্থান ॥১৩॥

লভয়া অঙ্কুচি বচ

কামনার পূর্ণ ।

কবে কর্ম স্বীকৃত

প্রবৃত্তি জঘন্ত ॥১৪॥

করয়ে বিষম চিন্তা

সারাটি জনম ।

কামনাতে রয়ে রত

ভোগ পরায়ণ ॥১৫॥

করিবারে চরিতার্থ

আশা অগণিত ।

চাহে শুধু বিত্তঅর্থ

নহে পরিতৃপ্ত ॥১৬॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৩—১৮)

ঈশ্বর বিদ্বৈষী জম

হয় অহঙ্কারী ।

হইয়া তাহাতে মত্ত

করে বাড়াবাড়ি ॥১৭॥

ভাবে সে প্রধান নিজে

বড়ই কুলীন

শ্রেয়ঃ দানী মানী শ্রেষ্ঠ

শীর্ষে সমানীন ॥১৮॥

ভাবে অতি বলবান

অতিশয় সুখী ।

ক্ষণে ক্ষণে প্রাণ হানে

হয় মার-মুখী ॥১৯॥

এইরূপে বৃদ্ধি পায়

প্রবল লালসা ।

অহরহ করে গ্রাস

মিটে নাকো আশা ॥২০॥

অকারণে দেয় ক্রোধ

সাধু সন্ত জনে ।

গায় বষ্ট নিজে সদা

পরমাত্মা সনে : ২১॥

নিজের নামের লাগি

করে অলুষ্ঠান ।

নিষিদ্ধাস্ত্র নাহি মানে

গর্বে গরীরান ॥২২॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৯—২০)

ক্রুদ্ধমতি নরাধম

না মানে ঈশ্বর ।

অধর্ম করয়ে বহু

কুর্কর্ম বিস্তর ॥২৩॥

নরাধম লয় জন্ম

ব্যস্ত সর্পাদিতে ।

পরে যায় নিম্ন কারো

পতঙ্গ শ্রেণীতে ॥২৪॥

ভগবান নাহি আসে
পরিভ্রাণকারী ।
ভাসিয়া বেড়ায় তাই
কুল না নেহারী ॥২৭॥
(শ্লোক- সংখ্যা : ২১—২৪)
নরকের তিন দ্বার
কাম-ক্রেধ-লোভ ।
ইহারা আনয়ে সাথে
নারকীয় ভোগ ॥২৬॥
ত্রিদোষ হইলে মুক্ত
লভে শ্রেষ্ঠ গতি ।

দ্বিমত নাহিক ইথে
ইহা সত্য অতি ॥২৭॥
কোন কৰ্ম করণীয়
কোনটি উচিত ।
কহে তাহা ভক্তিশাস্ত্রে
অব্রাহ্ম সঠিক ॥২৮॥
কামনা জাগ্রত রাখি
যেবা করে কৰ্ম ।
নাহি হয় সিদ্ধিলাভ
কামনার জন্ত ॥২৯॥
(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল

সাধুনঙ্গ দক্ষিণভারত পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত ১৩৯০ সালের দক্ষিণভারত
পরিক্রমা; বার্তাগণের মিলনস্থল কলিকাতাস্থ শ্রীশ্রীবিনোদবিহারী গোড়ীয়
মঠ। ২৮শে অক্টোবর, ১৯৮৩; ১০ই কাশিক, ১৩৯০; শুক্রবার সকাল ৬-৩০
মিনিটে আমরা সঙ্গীত্রে মন্দির পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ, সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পরমগুরু-
পাদপদ্ম নিতালীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান বৈষ্ণব গোস্বামী মহারাজ
জগদগুরু শ্রীশ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, সমিতির আরাধ্য
শ্রীশ্রীগৌর-বাধা-বিনোদবিহারীজীউ, ভক্তবিঘ্নবিনাশনকারী শ্রীনৃসিংহদেব ও
সর্বমঙ্গলময় বৈষ্ণবগণের জয়ধ্বনি ও বন্দনা-মুখে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া তাঁহাদের
অর্হেতুকী কৃপা প্রার্থনা করি। পরিক্রমা-পার্টি পরিচালনার দায়ীত্ব পূজাপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত আচার্য মহারাজের শারীরিক অসুস্থতার দরুন তিনি
পরিচালনার দায়ীত্ব কৃপাশীর্বাদরূপে শ্রীপাদ কমলাপতি ব্রহ্মচারী প্রভুকে
অর্পণ করিয়া নির্ঝিল্পে প্রত্যাবর্তনের উপদেশ দেন। পার্টির পরিচালনায়
পূজাপাদ শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী প্রভু সর্বতোভাবে পরামর্শ দান ও সাহায্য-
সহায়ভূতিশীল প্রধান সহায়ক। পরিচালনার অচ্ছাদ্য সদস্যবৃন্দ যথাক্রমে
শ্রীব্যাসদেব ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীনিবাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকান্তি
ব্রহ্মচারী, শ্রীভরুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

সেদিন প্রাতে সারহত গোড়ীও বৈষ্ণবগণের অপরিসীম শ্রীধাম নায়াপুরে
 গীতৈতচ্চ মণাং ভূঃ অংবর্তাৎস্থগীর সর্বোচ্চ মন্দির নির্মাণকারী শ্রীশ্রীমদ্ সখী-
 চরণদাস ববাজী মহারাজের পুষ্পাশ্রমের (বায় বাতীর) সম্মুখে আমাদের
 Shri Kirsha Travels নামক বাস উপস্থিত হয়। যাত্রীগণের আসন
 সংগ্রহের নিয়মানুসারে পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট যথাযথ স্থানে বসিলে আমরা
 গুণ্যাত্রা করি। সকালের জলযোগের জন্ত ছিল লুচি তরকারী। বৈকালে
 ২টার সময় আমরা রেমুণায় (বালেশ্বরে) পৌঁছি। রেমুণায় সেবিত
 ক্ষীরচোরা শ্রীশ্রীগোপীনাথকে দর্শন করিয়া সকলেই মুগ্ধ হন। এই গোপীনাথ-
 জীউ একদিন অস্বাচিৎ বৃত্তিপরাষণ শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের জন্ত ক্ষীরচুরি
 করিয়াছিলেন। ভক্তের জন্ত শ্রীভগবান্ কী না করিতে পারেন! গীতৈতচ্চ
 মহাপ্রভু এখানে উপস্থিত হইয়া ভক্তগণের নিকট শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের
 ও শ্রীগোপীনাথের চরিত্র বর্ণন করেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ শ্রীগোপী-
 নাথের সেবা সৌষ্ঠব দর্শনে মুগ্ধ হন। পূজারীকে এখানকার ভোগরাগের কথা
 জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারা যায় যে, গোপীনাথকে প্রত্যহ দ্বাদশটি মৃৎপাত্র
 ভক্তি ক্ষীরভোগ দেওয়া হয়। আজও পৃথিবীতে এমন ভোগের ব্যবস্থা
 আর কোথাও নাট। পুরীপাদের মনে টেঁছা হয় কেমন এই ক্ষীর,
 একটু আশ্বাদন করিলে তিনিও তাহার গোপালকে সেইভাবে ভোগ
 লাগাইতেন। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীভগবান্ একটি ক্ষীরভাণ্ড দ্বারা আড়ালে
 লুকাইয়া রাখেন। পূজারীজী ঠাকুরকে শয়ন দিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন,
 সেই সময় স্বপ্নাদিষ্ট হন গোপীনাথের চুরিকরা ক্ষীরভাণ্ড মাধবেন্দ্রপুরীকে
 দেওয়ার জন্ত। পূজারী দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখেন সত্যই এক ক্ষীরভাণ্ড।
 তিনি ক্ষীর-পাত্র লইয়া বাহিরে উচ্চস্বরে আহ্বান করিলেন,—“ক্ষীর লহ কে
 হও মাধবেন্দ্রপুরী। তোমা লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি।” শ্রীমাধবেন্দ্র
 পুরীপাদ ক্ষীর সেবা করিয়া গোপীনাথের ভক্তবাৎসল্য দর্শনে ভাবে বিস্তার
 হইলেন। তাহার মহিমা শ্রবণে লোক-সংঘট হইবে, তাই প্রতিষ্ঠার ভয়ে
 শীঘ্র স্থানান্তরে গমন করিলেন। “প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী যান পলাইয়া।
 প্রতিষ্ঠার স্বভাব, পাছে যান ত গড়াইয়া।”

অপরাত্ন ৫টার সময় রেমুণা হইতে যাত্রা করিয়া রাত্রি ৮-৩০ মিঃ আমরা
 শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির শাখামঠ শ্রীগোপালজী গোড়ীয় প্রচারকেন্দ্র
 (ভদ্রকের নিকট বাউদপুর) পৌঁছি। রাত্রি এই মঠেই বাস করি। এখানে
 শ্রীশ্রীগৌর-রাধাবিনোদবিহারীজীউ সেবিত হইতেছেন।

শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র

২৯শে অক্টোবর, ১১ই কান্তিক, শনিবার শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচার-কেন্দ্রে আমরা মঙ্গলারতি দর্শন করিলাম। শ্রীমন্দির-পরিক্রমা ও শ্রীচরিত্র-বৈষ্ণবগণের জয়ধ্বনি ও দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াছিলাম। আমরা তীর্থক্ষেত্রে নানা দেবদেবীর মন্দির দর্শন করিতে যাইব। কিন্তু আমরা কি ভগবানের অপ্রকৃত স্ত্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে পারি? অপ্রকৃত ভগবান ত দূরের কথা প্রত্যহ যে সূর্যকে আমরা দেখি, তাহাও যখন তখন আমাদের চোখের দিয়া যায় না; গভীর রাত্রে কেহ যদি সূর্য দেখিতে চাওন যেমন দেখা সম্ভব নহে, প্রভাতের জন্য তাকে অপেক্ষা করিতে হয়। পূর্ণাকালে সূর্য উদিত হইয়া তাহার আলোক আমার চক্ষুগোচর হইলে সূর্যালোকেই সূর্য দর্শন সম্ভব। শ্রীনিগ্রহ ও তীর্থ দর্শন ও ঠিক হইল। অর্থাৎ অতীত সাধী-মণ্ডীদের পশ্চাতে রাখিয়া সবাব আগে যাটখাঠাকুর দর্শন করিব, এ বুদ্ধি থাকিলে, ঠাকুর দর্শন সম্ভব নহে। ঠাকুর আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলে তাঁহার কৃপাদৃষ্টি অপ্রকৃত আলোকে ঠাকুরকে দেখা যায়। চক্ষু থাকিলেই দেখা যায়, এ বুদ্ধিবৃত্তি যাহার সে নিশাচর মুখ। রাত্রি হইতে আলোক নিভিয়া গেলে কেহ তাহার আলোক-স্বজন বিষয় সম্পদ কি দেখিতে পারে? তাই মদীয় পরম গুরুদাদ-পন্ন নিত্যসীলপ্রবর্তিত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ আমাদের স্ত্রীবিগ্রহের মঙ্গলারতি দর্শন-শিক্ষা দিচ্ছিলেন—

“তোমার মিত্র জীব মিহিত প্রায়। তবে জাগরণে বিশ্ব জাগরিত হয়।
 শুভদৃষ্টি কর পুত্র জগতের প্রতি। আগুণ স্বয়ং মোর সুমঙ্গল রতি।”

এ প্রার্থনায় সমগ্র বিশ্বের হিতাকাঙ্ক্ষা আছে। ঠাকুর অপরকে দর্শন করুন, অপর দর্শনের সুযোগ-সুবিধা লাভ করুক, আমাদের এ বুদ্ধি থাকিলে সকলেই সুস্বরূপে তীর্থ দর্শন করিতে পারিব। এ মঠের বক্ষক ত্রিদণ্ডিহাগী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবন্দ্য চরিত্র মণ্ডারাজ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির তীর্থধাম পরিভ্রম-বিষয়ে প্রাচীন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি আমরা তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম ও ব্রহ্মসীলবাদ প্রার্থনা করিয়া প্রভাত হটার সময় ভুবনেশ্বর অতিমুখে যাত্রা করি।

ভুবনেশ্বর

আমরা সকাল ৮টার সময় ভুবনেশ্বর পৌঁছি। উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বর। উড়িষ্যার ইতিহাসে নানা উৎসব-পাণ্ডুর সাংঘে মনে জাগে চন্দ্রচন্দ্র মৌর্যের উৎকল ভূমি জয়ের আশা। দ্রুত অ.পাকের কলিঙ্গ বিজয়,

তারপর বৌদ্ধধর্মের প্রচার, চেদীরাজাদের রাজত্ব, তাঁহাদের আমলে জৈন ধর্ম। রাজা শশাঙ্ক, হর্বর্ষক্কিনের রাজত্বকাল। চীন-পরিব্রাজক হিউ-এন্ সাঙ-এর ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত। তারপর ১৫৬৮তে শেষ হিন্দু সম্রাট মুকুন্দ-দেব পরাজিত হন কালাপাহাড়ের কাছে। কোণারকের সূর্য্য-মন্দির এই কালাপাহাড়ের অপরীক্ষিত বিজ্ঞানিক নিদর্শন। আফগানদের শাসন। মোগল শাসনাঙ্কে ভারতে আসে ব্রিটিশ-শাসন। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা। পর ২৬টি স্বাধীন রাজ্যের যুগ হয়—তন্মধ্যে অপরাজা উড়িষ্যা। নূতনরূপে সংজ্ঞিত হয় উড়িষ্যার রাজধানী—এই ভুবনেশ্বর। দিল্লীর মত ভুবনেশ্বরও দুই ভাগে বিভক্ত; একদিকে ১৬শ শতাব্দীর মধ্যে গড়িয়া উঠা বিশ্ববিখ্যাত মন্দিরাদি ও অপর দিকে নূতন রাজধানীর অফিস-কাছারী, ঘরবাড়ী।

লিঙ্গরাজ—আমাদের চর্চনীয় মন্দিরগুলি মোটামুটি লিঙ্গরাজকে কেন্দ্র করিয়া। উড়িষ্যার প্রাচীন রাজ্য যযাতি কেশরীর মৃত্যুর পর তাহার আত্মোদ্ভিত ও পরিকল্পিত এই মন্দির গড়িয়া তোলেন ললাট কেশরী। মন্দিরে নূতন জগন্মোহনের রূপ দেন কোণারকের সূর্য্য মন্দির নির্মাতা নরসিংহদেব।

বিন্দু-সরোবর—অতীতে এই জায়গার নাম ছিল একাত্রকানন। পার্বতীর খুব প্রিয় ছিল। একদা পার্বতী কাননের পথে ‘দত্তি’ ও ‘বাস’ নামে দুই দৈত্যের সামনে পড়েন। তাহারা পার্বতীকে বিবাহ করিতে চাহিলে একটি শর্ত হইল। উভয়ে মিলিয়া দেবীকে কান্দে বহন করিতে হইবে। দুই দৈত্য রাজী হইয়া কানে তুলিলেন পার্বতীকে। দেবীর ভাবে দুই দৈত্য শেষাই হইয়া গেল। পার্বতী ক্লান্ত ও পিপাসার্ত হইলেন। সেট সময় হাজির হইলেন শিব ঠাকুর। পার্বতীর পিপাসা মিটাইবার জন্য তিনি তৈরী করিলেন এই সরোবর। শিবের আহ্বানে সমস্ত নদ-নদী-সরোবর বিন্দু বিন্দু করিয়া জল নামে পূর্ণ করিলেন এই সরোবরকে। পরম পবিত্র এই জল, স্নানে পুণ্য হয়। স্বয়ং শ্রীশ্রীজগন্নাথও স্নান করিতে আসেন এই বিন্দু সরোবরে।

ভানুম্ভ বামুদেব মন্দির—বিন্দু সরোবরের পূর্বপারে ইহার অবস্থান। বহু প্রাচীন এই মন্দিরের একটি শীলা-লিপিতে ভগদেব ভট্টের নাম পাওয়া যায়। সম্ভবত তিনিই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। ভানুম্ভ বামুদেব শ্রীভগবৎ-ভক্ত। আর লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বর শিব ভক্ত-মহত্ম। ভক্ত ও ভগবান্ অভিন্ন। অভিন্ন নামে—ছাড়া নহেন। ভক্ত ভগবান্ ছাড়া নহেন। ভগবান্ও ভক্ত-

ছাড়া থাকেন না। শ্রীভগবানের সেবালাভ ও তাঁহার চরণামৃত-প্রসাদেই ভক্তের পরিতৃপ্ত। “হরিদেব সনারাধ্য সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।” আমরা যাহাকে দেবাদিদেব মহাদেব বলি সেট ভুবনেশ্বর শিবও এখানে অনন্তবাসুদেবের আরাধনা করেন। অনন্তবাসুদেবের প্রসাদ দ্বারা ভুবনেশ্বরের সেবা হয়। শ্রীহরির নির্মালা প্রসাদ দ্বারা সমস্ত দেবদেবীকে পূজা বা শ্রদ্ধা করাই শাস্ত্রীয় বিধান।

সিদ্ধান্তঃ—এখানে কেন্দারগৌর বা গৌরীকুণ্ড। ইহার পাড়ে মুক্তেশ্বর শিব। “বৈষ্ণবানাং যথা শত্ৰু” আমরা তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিয়া অত্র প্রদেশের সিংহাচলগের দিকে যাত্রা করিলাম। রাত্র ৭ ঘটিকায় আমরা সিংহাচলমে পৌঁছিয়া দেবস্থানম্ ধর্মশালায় প্রসাদ গ্রহণান্তে রাত্রি বিশ্রাম করি।

সিংহাচলম্—৩০শে অক্টোবর (১২ই কার্তিক), রবিবার সিংহাচলমে ভোর ৫টায় আমরা সাড়ি দিয়া টিকেট সংগ্রহ করিয়া সর্ববিঘ্ন-বিনাশনকারী শ্রীনৃসিংহদেবকে দর্শন মানসে মন্দিরের বাসে ২৫৫ মিটার উচ্চ পর্বত শিখরে অবস্থিত শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমরা সুবর্ণ-আবৃত সিংহবদন চতুর্ভুজ মূর্তি দেখিয়া ভক্ত প্রহ্লাদের উপর শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপার কথা মনে স্মরণ করিতে পারিলাম। পূজাপাদ নগরির প্রভু ও শ্রীপাদ কমলাপতিপ্রভু স্থান-মাতাঙ্গী কীর্তন করেন। যাহারা ভগবানের প্রপত্তি স্বীকার করেন ভগবান্ তাঁহাদিগকে সন্তোষাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়া ভক্ত প্রহ্লাদকে অসুরের অন্যায় আচরণ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। যুগে যুগে ধর্ম সংরক্ষণ ও অসুর দলনের জন্য ভগবান্ মংস্ত্র-কুর্ষাদি লীলা-বিসাঙ্গ করেন। আমরা প্রাণান্তে শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, যেন আমরা নির্বিঘ্নে দীর্ঘান দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারি। দর্শনান্তে “দেবস্থানম্ ধর্মশালায়” ফিরিয়া প্রসাদে সেবা করিয়া মাত্রাজ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। মাত্রাজ তাইওয়ে বস্তায় প্রসিয়া গিয়াছে, তাই রাত্তা বন্ধ। প্রায় ২৫০ কিঃ মিঃ পথ ঘুরিয়া আমরা রাজমন্ডী পৌঁছিলাম। (ক্রমশঃ)

—নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিভ্রমণ

[সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্তনযোগে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও
তৎপার্বদবৃন্দের পদাঙ্কপূত স্থানসমূহ দর্শনের সুযোগ]

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
(রেজিটার্ড) তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;

ফোন : এন্-ভি-ডি - ২৪৭

জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ) ।

যথাবিহিত সন্মানপূর্ব্বকৈয়ম—

আগামী ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৯০ (ইং ১৯৩৮৪) শহর নবদ্বীপস্থ
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রথম পর্য্যয়ে পদব্রজে (১)
শ্রীগৌড়মদ্বীপ, (২) শ্রীমধ্যদ্বীপ, (৩) শ্রীকোলদ্বীপ, (৪) শ্রীঋতু-
দ্বীপ, (৫) শ্রীকৃষ্ণদ্বীপ, (৬) শ্রীমোদক্ৰমদ্বীপ, (৭) শ্রীকৃষ্ণদ্বীপ,
(৮) শ্রীসীনন্দদ্বীপ ও (৯) শ্রীঅনন্দদ্বীপ প্রভৃতি নববিধা ভক্তি-
পীঠস্থানসমূহ দর্শন হইবে।

এতদ্ব্যতীত এই চৈত্র, ১৩৯০ (ইং ১৯৩৮৪) সোমবার হইতে
আরামপ্রদ (Luxury) বাসযোগে নিম্নস্থান সমূহও দর্শনের ব্যবস্থা
হইয়াছে। যথা,—

- ১০ : কাটোয়া—শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সমাসগ্রহণ-লীলাস্থলী ও
শ্রীমাদাষ্টেয় সমাধিস্থান।
- ১১ : শ্রীখণ্ড—শ্রীল নন্দরি সরকার ঠাকুরের পাট।
- ১২ : কেন্দুবিহা—শ্রীল অরদেব গোস্বামী প্রভুর প্রকটভূমি।
- ১৩ : একচাকা—শ্রীশ্রীমদ্বিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবস্থলী।
- ১৪ : রামকেলি—শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন গোস্বামীর
মিলনস্থল।
- ১৫ : নান্দুর—শ্রীচণ্ডীদাস ঠাকুরের জন্মস্থান।
- ১৬ : বীরনগর—শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-
স্থলী।
- ১৭ : কালনা—শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীগৌরীদাস গুণ্ডিতের মিলন-
স্থান।
- ১৮ : বিষ্ণুপুর—শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউ ও দলমাদল কামান।
- ১৯ : খানাকুল—শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের পাট।
- ২০ : ষরাহনগর—শ্রীভাগবত আচার্য্যের পাট।

- ২১: পানিহাটি — শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ভ্রমণ ও দণ্ডমহোৎসব-স্থান।
 ২২: ফুলিয়া — নামাচার্য্য শ্রীল চরিত্রদাস ঠাকুরের ভ্রমণস্থান।
 ২৩: হালিশহর — শ্রীল দীক্ষবপুরীপাদের ভ্রমণস্থান।
 ২৪: চাকদহ — শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের পাট।
 ২৫: বশড়া — শ্রীল ভগদীশ পণ্ডিতের পাট।

উপরোক্ত দর্শনীয় স্থান বাতীত বক্রেশ্বর, শাস্তিমিস্তেন, হাজারদুয়ারী (মুর্শিদাবাদ), তারকেশ্বর, দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ প্রভৃতি শ্রীমন্দির ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দর্শন করানো হইবে।

—ঃ নিম্নমানবলী :—

সংরক্ষিত (Reserved) ঝালে প্রায় একমণ্ডাকাল ভ্রমণ সময়ে যাত্রিগণের দুটবেলা এসাদ ও একবেলা জলযোগ, বাসভাড়া প্রভৃতির জন্য ৩৫৫'০০ (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা প্রত্যেক যাত্রীর জন্য ধার্য্য করা হইয়াছে। বাসের প্রথম দিকের ২৫টি আসনের জন্য প্রত্যেককেই অতিরিক্ত ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা দিতে হইবে। আসন সংরক্ষণ করিবার জন্য যাত্রীর একমাস পূর্বে অগ্রিম ১৫০'০০ টাকা এবং বাকী সম্পূর্ণ টাকা যাত্রার ৫/৫ দিন পূর্বেই কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে। (শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় প্রতিবৎসর সমিতির কর্তৃপক্ষ যেক্রপভাবে সেবানুকূল্য নির্দ্ধারিত করেন উহা শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমার যোগদানকারী যাত্রিগণের ক্ষেত্রেও তাহাই প্রযোজ্য থাকিবে। —ইতি

ভক্তভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সেবকবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিঃদ্রঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা পাঠাইতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জিলা নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)—ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য। অনিবার্য্য কারণে অনুমরনিকা পরিবর্তন স্বীকার্য্য এবং দৈব-দুর্ধিক্ষপাক বা কোনরূপ দুর্ঘটনার জন্য কর্তৃপক্ষ বা সমিতি দায়ী হইবেন না।

মহারীসহ বিহানা এবং হাঙ্ক খালা, ঘাট, বাঙ্গা, উর্ট প্রভৃতি সঙ্গে লইবেন।

। শ্রীশ্রীগোপালদেবো জয়তঃ ।

<p>❀</p> <p>ধর্মঃ ঈশুষ্টিতঃ পুংসাং বিধবসেন-কথাস্থ যঃ ।</p> <p>❀</p>	<p>স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।</p> <div data-bbox="134 318 849 806"> </div> <p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা স্প্রশসীদতি ॥</p>	<p>❀</p> <p>নোংপাদয়েদু যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥</p> <p>❀</p>
---	--	---

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি পরিশূন্য ।

অস্ত ধর্ম হৃষ্টরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩৫শ বর্ষ	}	২৬ নারায়ণ, বাসুদেব, ৪২৭ গোবিন্দ	{	১১শ সংখ্যা
		৩০ পৌষ, রবিবার, ১৩৯০ ; ইং ১৫।১।১৯৮৪		

সামুদ্রানন্দঃ

শ্রীশ্রীগোপাল-দেবায়কম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-বিরচিতম্]

মধুর-মৃদুল-চিত্তঃ প্রেমমাত্রৈকবিত্তঃ

স্বজন-রচিত-বেষঃ প্রাপ্তশোভা-বিশেষঃ ।

বিবিধ-মণিময়ালঙ্কারবান্ সর্বকালং

স্মরতু যদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥১॥

যাঁকার চিত্ত মধুর ও কোমল, প্রেমই যাঁকার একমাত্র মন, জননী প্রভৃতি
স্বজনগণ যাঁকার বেষ রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহাতে যিনি বিলক্ষণ শোভা

প্রাপ্ত হন, যিনি বিবিধ মণিময় অলঙ্কার ধারণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগোপালদেব আমার হৃদয়ে চিরকাল স্মৃতি লাভ করুন । ১॥

নিরুপম-গুণ-রূপঃ সর্বমাদুর্ঘ্য-ভূপঃ
 শ্রিত-তনু-রুচি-দাস্যঃ কোটিচন্দ্র-সুভাস্যঃ ।
 অমৃতবিজয়ি-হাস্যঃ প্রোচ্ছলচ্ছল্লিলাস্যঃ
 স্মরতু হৃদি স এব শ্রীগোপালদেবঃ ॥ ২॥

বাহার রূপ ও গুণের তুলনা নাই, যিনি সর্বমাদুর্ঘ্যের নৃপতি, সকলেই বাহার অসকাম্বর দাসত্ব করে, বাহার চাস্তে অমৃত ও শিক্ত হয়, বাহার বদনকমল কোটি কোটি চন্দ্র-কর্তৃক সুভ, বাহার জন্মভা সর্বতঃ উচ্ছলিত, সেই শ্রীল গোপালদেব আমার হৃদয়ে স্মৃতি প্রাপ্ত হউন ২॥

ধৃত-নব-পরভাগঃ সব্যহস্ত-স্থিতাগঃ
 প্রকটিত-নিজকক্ষঃ প্রাপ্তলাবণ্য-লক্ষঃ ।
 কৃত-নিজজন-রক্ষঃ প্রেম-বিস্তার-দক্ষঃ
 স্মরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ৩॥

যিনি কোন অপূর্ণ গুণোৎকর্ষ ধারণ করিয়াছিলেন, বাহার বামহস্তে শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরি শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল, যিনি নিজ পার্শ্বদেশ বাজ্র করিয়া-ছিলেন ও শত-সংস্রভাবে লাবণ্যমণ্ডিত হইয়াছিলেন, সজন-রক্ষক ও প্রেম-বিস্তারদক্ষ সেই শ্রীগোপালদেব আমার হৃদয়ে স্মৃতি লাভ করুন ৩॥

ক্রমবলদনুরাগ-স্বপ্রিয়াপাঙ্গভাগ-
 ধ্বনিত-রসবিলাস-জ্ঞানবিজ্ঞাপি-হাসঃ ।
 স্মৃত-রতিপতি-যাগঃ প্রীতি-হংসী-তড়াগঃ
 স্মরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ৪॥

উত্তরোত্তর-বর্দ্ধনশীল অনুরাগবতী ব্রজজনগণের অপাঙ্গ-চালনার বাহার রস-বিলাস-বিষয়ে পরিস্ফুট জ্ঞান-জনিত হাস্য সূচিত হইয়া থাকে এবং যিনি অনঙ্গ-বজ্র স্মরণ করিয়া থাকেন, প্রীতিরূপী হংসীর তড়াগ-স্বরূপ সেই শ্রীল গোপালদেব আমার হৃদয়ে স্মৃতি প্রাপ্ত হউন ৪॥

মধুরিমভরমগ্নে ভাত্যসবোহবলগ্নে
 ত্রিবলি-রসসবজ্জ্বাৎ যস্য পুষ্ঠানতজ্জ্বাৎ ।

ইতরত ইহ তস্মা মাররেথৈব রস্মা

স্মরতু হ্রদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥৫॥

যাঁহার মাধুর্য্যময় চক্ষু-কটিদেশে আলঙ্কৃত-হেতু ত্রিবলি লক্ষিত হইয়া থাকে এবং সেই ত্রিবলির বিপরীত দিকে কন্দর্পবেধার দ্বায় মনোহর রেখা লক্ষিত হয়, সেই শ্রীগোপালদেব আমার হৃদয়ে স্মৃতি লাভ করুন ॥৫॥

বহতি বলিতর্ষং বাহয়ংচানুবর্ষং

ভজতি চ সগণং স্বং ভাজয়ন্ যোহর্পণম্ স্বম্ ।

গিরি-মুকুটমণিঃ শ্রীদামবনিত্রতা-শ্রীঃ

স্মরতু হ্রদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥৬॥

যিনি চন্দ্রকূত বৃষ্টি নিবারণের জন্য শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন এবং বর্ষায় অভিভূত স্বপ্নমন্দিরকে গ্রন-পান দি প্রদান করিয়া যথোচিত স্থানে অর্থাৎ শ্রীদামের দ্বায় শ্রীগিরিবাজের সহিত মিত্রতার শোভা-সম্পাদনকারী সেই শ্রীল গোপালদেব আমার হৃদয়ে স্মৃতি প্রাপ্ত হউন ॥৬॥

অধিধরমকুরাগং মাধবেন্দ্রশ্রু তম্-

ভদমল-হৃদযোথাং প্রেমসেবাং বিবৃণন্ ।

প্রকটিত-নিজশক্ত্যা বল্লভাচার্য্য-ভক্ত্যা

স্মরতু হ্রদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥৭॥

সেই গোপালদেব স্বীয় শক্তি প্রকটনদ্বারা শ্রীবল্লভাচার্য্যের ভক্তি-শ্রীমাধবেন্দ্রপুত্রী অতুলনীয় অনুরাগ এবং তাঁহার নির্মল হৃদয় হইতে উদ্গত প্রেমসেবা আমাকে প্রকাশ করিয়া আমার হৃদয়ে স্মৃতি লাভ করুন ॥৭॥

প্রতিদিনমধুনাপি প্রোক্ষাতে সর্বদাপি

প্রণয়-সুরস-চর্যা যন্ত বর্যা সপর্যা ।

গগনতু কতি ভোগান্ কঃ কৃতি তৎপ্রয়োগান্

স্মরতু হ্রদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥৮॥

ভক্তগণ প্রতিদিন এখনও সর্বদা যাঁহার প্রণয়-রসের আচরণময়ী শ্রেষ্ঠ আরাধনা দেখিরা থাকেন, যাঁহার অকুণ্ঠান ও উপভোগ কোন পণ্ডিতই সংখ্যা করিতে সমর্থ হন না, সেই শ্রীল গোপালদেব আমার হৃদয়ে স্মৃতি প্রাপ্ত হউন ॥৮॥

গিরিধর-বরদেবস্রাষ্টকেনেমমেব

অরতি নিশি দিনে বা যো গৃহে বা বনে বা ।

অকুটিশ-হৃদয়স্ত প্রেম-দন্তেন তস্ত

স্মরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেব ॥৯॥

যিনি গৃহে বা বনে অবস্থান করিয়া দিবসে বা রাত্রিতে দেবোত্তম গিরি-ধারী শ্রীকৃষ্ণের এই অষ্টকদ্বারা তাঁহাকেই অরণ্য করেন, সেই সরল-প্রাণ ভক্ত হনো হৃদয়ে শ্রীগোপালদেব প্রেম-প্রদানপূর্বক বিদাজ করেন ॥৯॥

সজ্জন—অপ্রমত্ত (১৮)

সিপু-তাড়িত জড়-বিষয়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তিরই—প্রমত্ত
আর জড়ে উদাসীন কৃষ্ণেকশরণ-সজ্জনই—অপ্রমত্ত

কোন বিষয়ে অতিরিক্ত অভিনিবিষ্ট বিষয়ীকে প্রমত্ত বলে। কৃষ্ণের বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া বদ্ধজীব অনেক সময় প্রমত্ত হন। নির্বিষয়ী কোন জড়-বিষয়ে প্রমত্ত হন না। একমাত্র কৃষ্ণোন্মুখ জড়ে উদাসীন ব্যক্তিই অপ্রমত্ত, সজ্জন। বিষয়ীর ইন্দ্রিয়সমূহ জড়রূপ-বসাদিতে সর্বদা আবদ্ধ। তিনি সেই বিষয় সর্বদা অংশীলন করিতে করিতে লুক্ক হইয়া প্রমত্ত হন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ—এই পাঁচটি পারিপথ্য বিষয় আসিয়া বিষয়ী বদ্ধজীবকে প্রমত্ত করায়। সজ্জন সর্বদা কৃষ্ণেকশরণ, তজ্জন্ত অন্যাভিলাষী, কর্মী ও জ্ঞানীর দ্বায় কদাপি প্রমত্ত হন না। কৃষ্ণ-সবায় প্রমত্ত হওয়ায় তিনি বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অপ্রমত্ত।

অনাদি-বহিমুখ জীবের ভোগময় রাজ্যে বিচরণ এবং
ভগবৎকৃপায় তাহা হইতে উদ্ধার

কৃষ্ণ ভুলিয়া জীব অনাদি-বহিমুখ হইয়া কখনও বা নির্ভেদ-ব্রহ্মাংশসন্ধান, কখনও বা চতুর্দশ-লোকাকাজ্জায়ুক্ত ভোগময় রাজ্যে বিচরণ করেন। যে-কাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণ শ্রুণা কবিত্যা জীবকে আকর্ষণ না করেন, তৎকালাবধি জীব কৃষ্ণ-বিমুগ্ধ-রুচি-বিশিষ্ট হইয়া কৃষ্ণবাতীত বিষয়াস্তরে স্ব-ব চেষ্টা প্রদর্শন করে। কৃষ্ণের আকর্ষণ তাহার নিকট প্রবল না হওয়ায় তাহার প্রমত্ত ছাড়ে না।

প্রমত্ততা-বশে মাদক-দ্রব্যাদি ও প্রসাদ-ব্যঞ্জে তাহুলাদি সেবনকারিগণ হরিবিমুখ অহংগ্রহোপাসক

জীব কখনও নানাপ্রকার মাদক-দ্রব্য সেবা করিয়া চরিবিমুখ জীবনযাপন করেন এবং প্রমত্তাবশে নশ্ত গ্রন্থন, অতিফেন, গঞ্জিকা ও তাম্রকুট সেবন, ধূম-পান, কফি ও চা, সুবা প্রভৃতি পানে মত্ত হইলে সজ্জন হইবার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। কখনও বা তিনি তাহুল-বীটিকায় প্রমত্ত হইয়া কক্ষ অপেক্ষা অল্প বিষয়কে অধিক আদর করেন, কখনও বা প্রসাদ উপলক্ষণে তাহুল চর্কণ করিতে করিতে বিষয়াভিনিবেশের অধিনয় দেখান। কখনও বা বিচার-চাতুর্য্যে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া অহংগ্রহ-উপাসনায় প্রমত্ত হন। কক্ষ বাতীত অল্প যে কোন বিষয়ে অভিনিবেশ প্রমত্তার লক্ষণ।

স্থূলকথা এই যে, সজ্জন কোনও কক্ষেত্তর চেঁচায় প্রমত্ত নহেন। তিনি নিত্যকাল অপ্রমত্ত হরিসেবা করেন।



—ত্রীতীল প্রভুপাদ

সজ্জন—মানদ (১৯)

‘মানদ’-শব্দে মানদাতা ও মান-গৃহীতা উভয়কেই বুঝায়

সজ্জন বা বৈষ্ণব মানদাতা বলিলে, মানদাতা ও মানগৃহীতা—দুইটি বস্তু এবং তাহাদের উভয়ের মধ্যে মানের প্রদান ও আদান বুঝায়। এখানে বৈষ্ণবের মানদাতৃত্ব এবং গৃহীতার বৈষ্ণবের নিকট হইতে মানের আহরণ-ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। গ্রহণকারী বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব, দে-বিষয়ে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, বৈষ্ণবের নিকট হইতে যিনি মান গ্রহণ করেন, তিনি ‘বৈষ্ণব’ শব্দবাচ্য হইতে পারেন না। অবৈষ্ণবই বৈষ্ণবের নিকট হইতে মান গ্রহণ করিতে সমর্থ, যেহেতু গৃহীতা বৈষ্ণব হইলে সেইরূপ মান প্রদান করাও তাঁহা বৃত্তি। স্মৃতবাং বৈষ্ণব মানদ-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট হইয়া অপর বৈষ্ণবকে মান প্রদান করিতে গেলে কোনও তাঁতাকে মান প্রদান করিবেন। অবৈষ্ণব বৈষ্ণবের পদন্তু মান গ্রহণ করিয়া তাঁতাকে মান না দিতে পারেন। অবৈষ্ণবের স্বভাবে মানদাতৃত্ব-ধর্ম্ম অপরিচর্য্য ধর্ম্ম বলিয়। স্থিরীকৃত হয় নাই।

বৈষ্ণবের মানদ-ধর্মের সুযোগ লইয়া অসজ্জন-কর্তৃক

উহার অপব্যবহার

মান দ্বিবিধ—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। অবৈষ্ণব যদি মানের গুণীতা হন, তাহা হইলে তিনি অপ্রাকৃত হইতে পারেন না। সুতরাং বৈষ্ণবের নিকট যাচাবা মানের ভিক্ষু বা প্রত্যাশী, তাহাবা অবৈষ্ণব বা অসজ্জন। বৈষ্ণব সকলকেই স্বতঃপর্বতঃ মান দিতে প্রস্তুত। এক বৈষ্ণব অন্য বৈষ্ণবের নিকট মান লাভ করিয়া তাঁহাকেও মান দিয়া থাকেন। অবৈষ্ণব বৈষ্ণবের নিকট মান লাইয়া তাণী আত্মসাৎ করেন এবং প্রত্যাশ করি দূরে থাকু সেই মানে আপনাকে স্লাঘাঘিত মনে করিয়া স্বীয় সর্বনাশ করেন। বর্তমানকালে বৈষ্ণবের মান লাভ করিয়া অবৈষ্ণব-সমাজ কিরূপ অপরাধ-সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, তাণী আর আমাদের কষ্ট স্বীকার করিয়া দেখাইতে হইবে না। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, বৈষ্ণব কোন অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে মান প্রদান করিলে ব্রাহ্মণ আপনাকে অবৈষ্ণব জানিয়া উহা কেবল গ্রহণ করেন এবং বৈষ্ণবে বিদ্বেষ করিয়া স্বীয় উচ্চ পদবী হইতে অধমচ্যুত হন। এইরূপে বর্তমানকালে বহির্ভূত শৌকসমাজ-দৃষ্টিতে কি-প্রকার পরমহংস-বৈষ্ণবের স্তুত পদবী অধঃপাতিত হইয়াছে, দেখিতে আর কাহারও বাকী নাই।

অপ্রাকৃত দৈন্ত ও মানদ-ধর্মবিশিষ্ট বর্ণাশ্রমাতীত

পরমহংস-বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি নিরয়প্রাপক

বৈষ্ণবকে সর্ববর্ণের গুরু বলিবার পরিবর্তে শৌক-ব্রাহ্মণ-বর্ণকে বর্ণের গুরু বলিতে অনেকে বাস্ত। পরমহংস-বৈষ্ণবকে মুখ্য অবৈষ্ণবগণ শূদ্রসাম্য দর্শন করিয়া শূদ্রজ্ঞান করে এবং তজ্জন্ত অপরাধবশতঃ নিরয়গামী হয়। আবার বর্ণাশ্রমের বিশৃঙ্খলকারী জর্ন্যদ জর্ন্য ও পর মুখ্য শূদ্র-চণ্ডালাদি অবৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে পরমহংস-বৈষ্ণব বলিয়া অভিমানপূর্বক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিম্নকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। বর্ণাশ্রম অপেক্ষা পরমহংস-ধর্ম উন্নত ও শ্রেষ্ঠ না বলিয়া পরমহংস বৈষ্ণবকে বর্ণাশ্রমের বিশৃঙ্খলকারী অবৈষ্ণবগণ ও ঘৃণিত বলিয়া অসম্মান করেন। ব্রাহ্মণ-বর্ণ বা সম্মান-আশ্রম, বর্ণ ও আশ্রমের পরমোচ্চ পদবী জানিয়া পরমহংস-বৈষ্ণবকে বর্ণাশ্রমের অজ্ঞভূক্ত করিবার বিচার করেন। বাস্তবিক পরমহংস-বৈষ্ণব আপনাকে কর্তব্যকল্যোপী ও হজ্জানী প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করিলেও তাঁহাকে কোন বিবেকী সজ্জন তাদৃশ ঘৃণা

করেন না, কিন্তু অজ্ঞের মুখ্যতার হস্ত হইতেও বৈষ্ণব মুক্ত হন না। পরমহংস-বৈষ্ণব অনেক সময় আপনাদিগকে শৌক্য অবরবর্ণ বলিয়া পরিচয় দেন, কখনও জগৎকে মান দিবার জন্ত আমি বৈষ্ণব নহি, ভোগপর কর্মী বা বর্ণাশ্রমী বলিয়া আজ পরিচয় দেন। মুখের নিকট তাদৃশ পরিচয়ে মানব-ধর্ম নাই বলিয়া প্রতীত হইলেও, বৈষ্ণব-পরমহংসের পক্ষে উহাই মানদ-ধর্ম—(ইহা) বুঝিতে কাহারও বাকী থাকে না।

বর্ণাশ্রম-ধর্মের অবস্থিত হইয়াও শ্রীমদ্ব্যাক্রান্তুর পারমহংস-ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন

শ্রীগৌরসুন্দর জীবশিক্ষা দিবার জন্ত শৌক্য ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অচরণে বর্ণাশ্রম পরিত্যক্ত হয় নাই বলিয়া পারমহংস-বৈষ্ণবধর্ম তদপেক্ষা অল্পপাদেয়, এরূপ কাহারও ধারণা করা উচিত নহে। তিনি বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়াও আবার বলিয়াছেন ;—

নাহং বিশ্রো ন চ নরপতিনাপি বৈশ্রো ন শূদ্রো

নাচং বর্ণী ন চ গৃহপতিনো বনস্থো বতীর্কবা।

কিন্তু প্রোক্তংমিখিল-পরমানন্দপূর্ব্যমুতাক্রে-

গোপী ভর্ত্ত্বঃ পদকমলয়োদাসদাসামুদাসঃ ॥

উক্তভক্ত মধুর রসে-প্রবিষ্ট হইলে বর্ণাশ্রম ভাব ও আশ্রম-মিশ্র অভিমান, মন ও দেহাতিরিক্ত আত্মায় মিশ্রিত নাই—একথা জানিতে পারেন। জগৎকে মান দিবার জন্ত জীব-স্বরূপের উচ্চতা অবরণ করিয়া বর্ণাশ্রমীর বেশ প্রদর্শন করেন। শ্রীগৌরসুন্দর ‘শূদ্র বা গৃহস্থ হওয়াই সর্বোত্তম’—এরূপ প্রার্থনা জীবের কর্তব্য, তাহাও প্রচার করেন নাই।

বৈষ্ণবের মান-দাতৃত্ব-ধর্ম নিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ

শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু, আপনাকে পরমহংস বৈষ্ণবদাস অভিমান করিয়া সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণকে মান দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মনঃশিক্ষায় তিনি ভূম্বর ব্রাহ্মণে সর্কদা দস্তকীন হইয়া অপূর্ব রতি করিবারই উৎদেশ্য দিয়াছেন। ইহাই বৈষ্ণবের মানদ-ধর্ম। আবার শ্রীরসিকানন্দ-দেব শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুদত্ত যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিয়াও মানদ। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ভূম্বরগণকে শিক্ষিতে গ্রহণ করিয়াও মানদ-ধর্ম ছাড়িয়া দেন নাই। তুলাসা ঋষি অদ্বৈতের পাদ-গ্রহণকালে অদ্বৈত-রাজা তাঁহাকে মান দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। গুরু-

প্রদত্ত যজ্ঞ-সূত্রাদি ধারণ যদি মানদ-ধর্মের ব্যাঘাতকারী হইত, তাহা হইলে পরম-ভাগবতগণ তাহা গ্রহণ করিতেন না। সূত্রপ্রদাতা গুরুকে অবজ্ঞাপূর্বক বৈষ্ণৱ কখনও মানদ-ধর্ম পালন করিতে পারেন না।

বিষ্ণু-দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যকে অত্রাক্ষণ বলি এবং শিষ্যের

পক্ষে গুরুপ্রদত্ত বর্ণাশ্রম অস্বীকার—চুইই

মানদ-ধর্মের ব্যাঘাতকারী

গুরুপদাসীন বৈষ্ণৱ. গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাক শিষ্যকে অত্রাক্ষণ বলিয়া মানদ-ধর্ম রক্ষা করিতে পারেন না। “যজ্ঞ যজ্ঞকণং প্রোক্তং” শ্লোক, “তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং” বাক্যও অবজ্ঞা করিতে পারেন না। বৈষ্ণৱকে ত্রাক্ষণেতর ক্ষত্রিয়-বৈষ্ণ-শূদ্র, এমন কি, প্রাকৃত ত্রাক্ষণ বলিলেও মান করা হয় না। তিনি অপ্রাকৃত বস্ত, কিন্তু শিষ্যত্ব অমুৎসন্ন লৌকিক ভাবে স্বীকার করা সত্ত্বেও তাহাকে প্রকৃত্যাতীত ত্রাক্ষণেতর মনে করা মানদ-ধর্মের ব্যাঘাতকারী। শিষ্যও মানদ-ধর্ম পালন করিতে গিয়া গুরুপ্রদত্ত বর্ণাশ্রম স্বীকার করিবেন। না করিলে তিনি পরমহংস বৈষ্ণৱ হওয়ার উচ্চবেশ গ্রহণ করা অপরাধে মানদ না হইয়া অবৈষ্ণৱ হইবেন। “সর্বমহাশূন্যগণ বৈষ্ণৱ-শরীরে” জানিয়া বৈষ্ণৱকে মান দিতে হইবে এবং অন্তর্জনে মান দিলে তাহাদের বৈষ্ণৱাপরাধ হইবে না; সুতরাং তদ্বারা বন্ধজীবে দয়া করাই হইবে।

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শিক্ষাষ্টক

(শিক্ষাষ্টক-বঙ্গভাষা)

পরমহংস এক ও অদ্বিতীয়। সেই তত্ত্ব সর্বদা-সর্বাবস্থায় স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই অচিন্ত্যশক্তিক্রমে ঐ তত্ত্ব যুগপৎ সবিশেষ ও নির্দিশেষভাবে প্রতীত হয়। সবিশেষতা নির্দিশেষতা যুগপৎ সিক্ত হইলেও সবিশেষ প্রতীতিই বলবতী। নির্দিশেষ প্রতীতি উপলব্ধ হয় না, কেবল স্বীকার্য্য হয়, এই মাত্র।

দেই সংবেশেষ প্রকৃতিমাধ পরমতত্ত্ব স্বীয় প্রতিজ্ঞাশক্তিবলে সতদা স্বরূপ, তত্ত্ব-বৈশেষ্য, জীব ও জীবন এই চারিধাপ অৱস্থিত। স্বর্ধামূল্যাস্তঃস্থিত তেজ, তমোগুণ, যত্ত্বল-বর্জিত তেজ-বর্ণি এবং তেজ-প্রতিচ্ছবি স্বরূপ এক স্বর্ধাতত্ত্ব দর্শনঃ চতুর্ধা অৱস্থিত, তত্ত্বপ পরমতত্ত্বের চারি প্রকার রূপ নিত্য-মিত। প্রতিমাস তত্ত্ব স্বরূপঃ এক হটলেও চারি প্রকার ভেদময়। অতএব তেজ ও মনোহর বর্ণনঃ নিত্য-সত্য। পরমতত্ত্বের অতিজ্ঞাশক্তি নিচিহ্ন-বিবরণঃ। তাহার অনন্ত প্রভাবের মধ্যে তিনটি প্রভাব আমরা জানিতে পারি। দেই তিন প্রভাবের প্রত্যেকটি প্রভাববৃত্ত হটয়া তত্ত্বের পরাশক্তি বৃত্তিঃ অস্তরঙ্গা ও চিহ্নিত, তটস্থ বা জীবশক্তি ও বৈশেষ্য বা মায়াশক্তি-রূপে নিত্য-দেখা-মান। অস্তরঙ্গা শক্তিসহকারে অনন্তমাত্মক রাশি-স্বরূপ-স্থানীয় সেই তত্ত্বের স্বীয়রূপ নিত্যমিত। চিহ্নিত সহকারে সেই তত্ত্বের প্রতিচ্ছবিতত্ত্ব বর্ণনঃ স্থানীয় মায়াবৈশেষ্য; নিত্যমিত স্বরূপা-পরমাধা-এই। স্বরূপ অনন্ত হটলেও বিশেষ পার্শ্বতত্ত্ব স্বর্ধা, মধুনা ও উদাৰ্য্য—এই তিন নিত্যমাত্মক-ভেদে ভগবৎস্বরূপ ত্রিবিধ অর্থাৎ নারায়ণস্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপ ও কণ্ঠৈতত্ত্বস্বরূপ। কণ্ঠৈতত্ত্ব অনন্ত হটলেও পরমোম, গোলোক-ব্রহ্মাণ ও নারায়ণ—এই তিন সাময়িক বৈকুণ্ঠরূপ চিহ্নিত এবং এই স্বরূপের মধ্যমাধ্য তত্ত্বিতত্ত্ব মনস্ত লীলোপকরণঃ স্বরূপৈতত্ত্ব। ভগবৎ-সূর্য্যের বিভিন্নরূপ চিহ্নপরাশক্তি জীবের সংখ্যা অনন্ত। জীব স্ব-বহা স্বরূপ ও বর্জিত এই তত্ত্ব বৈশেষ্যের মধ্যমাধ্য। তটস্থ শক্তি-ধারার তত্ত্ব বৈশেষ্যের মায়া-তানিশিষ্ট; অনাদ স্বরূপ-বৈশেষ্য-মাত্মঃ মায়াবৈশেষ্য-মধ্যমিত; মায়াবৃত্তি-রূপা অবিজ্ঞা-বর্ণন-মিতত্ত্বন স্ব স্বরূপ-ভেদ-মিত ভাতিমানদ্বারা জ্ঞান-রূপ কণ্ঠমার্গে ভ্রমণীয়। অতএব তিনি সতদা সংসার-জা-খাজন। অনন্ত জ্ঞান এক ব্রহ্মাণ-নিচয় তত্ত্ব। ব্রহ্মজীবগণের স্থানীয়-শরীরদ্বয়বিশিষ্ট মায়াবৈশেষ্য পরমতত্ত্বের অতিচ্ছবিতত্ত্ব বর্ণ-বৈচিত্র্যরূপ তত্ত্বিতত্ত্বের অতি দেয় চতুর্থপদ মাত্র।

ঐশ্বর্য্যপ্রচুর ভগবৎস্বরূপ বৈকুণ্ঠস্থ পরমোমে চতুর্ধা-ভুক্তিতে দাস্তরমাপিত নিত্যমিত-জীবগণ-কর্তৃক পরিদেবিত।

মাধুৰ্য্যপ্রচুর ভগবৎস্বরূপ বিভূতত্ত্বিতে বৈকুণ্ঠের অস্তঃ-প্রকোষ্ঠে নিত্য দাশ্য, মধ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে অনন্ত লীলার বিস্তারক। দেই অস্তপরেদ্বয় দুইটি প্রকোষ্ঠ। এক প্রকোষ্ঠে গোলোক, যেখানে মধুর রস নিত্য স্বকীয়-

ভাবান্নক। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ বৃন্দাবন ; যেখানে মধুর রস নিক্ত পারদীয়-ভাবান্নক।

ঔদার্য্যপ্রচুর ভগবৎস্বরূপ দ্বিভূজ, কদাচ যড়ভূজ মূর্তিতে বৈকুণ্ঠ-মধো নবদ্বীপ-প্রতোষ্ঠে অকৃত্যবান্নক ঔদার্য্যরসাবশেষে স্বীয় রসযোগ্য পরিকর-সহিত জীবাচার্য্য-স্বরূপে নিত্য বিরাজমান।

১৪০৭ শকাব্দায় কাল্চনী পুণিমায সন্ধ্যার পর ঔদার্য্য-প্রচুর ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব গৌরদেশে গঙ্গাভীরে প্রপঙ্কগত স্বীয় ধাম নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণমাখ মিশ্র-পদ্মী শ্রীশচীগর্ভে অবতীর্ণ হন। শিশুকালে বয়সোচিত বালচারণা, শৌগণ্ড-বয়সে বিজ্ঞা ভ্রাসাদি, কৈশোর-বয়সে বিবাহ, মাধব-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব শ্রীদ্বৈতপুরীর নিকট দাঁড়াগ্রহণ ও কীর্তন-প্রচারদ্বারা সমস্ত গৌরভূমির আনন্দ বিধান করেন। চক্ষিণ বংলর বয়সে কেশবদ্বারীর নিকট সম্যাস গ্রহণ করিয়া প্রথম ছয় বৎসরে পাশ্চাত্য, ওড়ী, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশে পাবক হরিভক্তি প্রচার ও গুরুহরিভক্তি বিরুদ্ধ সমস্ত মত খণ্ডন করেন। শেষ অষ্টাদশ বংলর শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে স্বীয় পার্যদগণ-সহিত অবস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন প্রভৃতি প্রচারক দ্বারা বহু দেশে স্বীয় অচিন্ত্য-ভক্তান্তেদ মত প্রচার করেন এবং নিজকৃত শিষ্যষ্টকের পরমরস আদান করত জীবের কর্তব্যত্যাগিনাম করেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোপালা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অঙ্কলোপা বিংশতি পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন ;—

পূর্বে অষ্ট শ্লোক করি' লোক শিক্ষা দিল।

সেই অষ্ট শ্লোক আপনে আদাদিল।

প্রভুশিক্ষা অষ্ট শ্লোক যেই পড়ে শুনে।

কৃষ্ণে প্রেম ভক্তি তার বাড়ে 'দিনে দিনে'।

প্রভু-যে অষ্ট শ্লোক প্রচার করিয়াছেন তাহার ভাবার্থ্য বাখ্যা করিতেছি,—বে শ্রীকৃষ্ণ-সকীর্তনদ্বারা জীবের চিত্তদর্পণ মার্জিত হয়, ভবরূপ মহাদাবাধি নির্মাণ প্রাপ্ত হয়, প্রয়োজন কুমুদবিকাশক ভাবচন্দ্রিকা বিতরণ হয় এবং বাহ্য বিজ্ঞাবধূর জীবনস্বরূপ আনন্দসমুদ্র-বর্দ্ধনকারক, পদে পদে পূর্ণায়ত্তের আদানদায়ক এবং গুরু জীবের সমস্ত স্বরূপ সিদ্ধকারী সেট শ্রীকৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-সকীর্তন সর্বোপরি জয়যুক্ত হউন।

এই শ্লোকদ্বারা প্রথম ঔদার্য্যবিগ্রহ নিখিলজীবাচার্য্য শ্রীগঙ্গা প্রভু সমস্ত জ্ঞানবর্দ্ধনপূর্বক জীবগণকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। পূর্বেক্ত পরম-স্বৈর

অতীত তটস্থশক্তি-প্রসূত জীবের স্বরূপান-সিদ্ধির নিমিত্ত “সেতাদর্পণ-
মার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্দীপণম্” এই চরণের উক্তি হইয়াছে। জীব
স্বভাবতঃ তটস্থ অর্থাৎ স্বরূপানন্দরূপ বৈকুণ্ঠ ও বিরূপানন্দরূপ মায়াবৈভব উভয়
অবস্থার যোগে। পরেশবৈমুখ্যবশতঃ তাহার মায়া-প্রবেশ ও বিস্তৃত চিদভিমান-
রূপ বিস্তৃত অহঙ্কার বিকৃত হইয়া জড়ায়ানভিক্রম বিকার-দ্বারা শুদ্ধ চিত্তত্বের
জড়মল-ভুক্ত অচ্ছন্নতা হয়। কৃষ্ণ-নুশীলদ্বারা চিত্তের অবিদ্যামল দূরীভূত
হইলে চিত্তদর্পণে স্বরূপতত্ত্বের বিস্তৃত-দর্শন হয়। ইহারই নাম স্বরূপসিদ্ধি।
সেই সিদ্ধির অবাস্তব ফলস্বরূপ সংসারভুক্ত নাশ হয়। জীব তাহাতে মায়া-
স্বরূপ বৈধর্ম্য পবিত্রাগ ও স্বরূপশক্তির আশ্রয় লাভ করেন। ভগবৎস্বরূপ,
জীবস্বরূপ, মায়াস্বরূপ ও মায়াস্বর্গত ভূতভবিষ্যৎকাল ও কালস্বরূপ-
জ্ঞানের নাম স্বরূপজ্ঞান। “শ্রেয়ঃকৈরবচস্মি কাবিতরণম্” এই অর্দ্ধপদ-দ্বারা
আদ্যৈয়ৎস্বরূপ সাধনক্রিয় উল্লেখ। কণ্ঠ-জ্ঞানাদির দ্বারা জীবের নিত্য-
মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। কেবল হরিভক্তি-দ্বারাট সাধিত হয়,—এইরূপ
শাস্ত্রার্থবোধাবলম্বনা শ্রদ্ধা সংবদ্ধ হইতে উদ্ভিত হইলে জীব সাধুগুণদাশ্রয়-
পূর্বক শ্রবণ, কীর্তন, বিষ্ণুস্মরণ, পানসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও
অন্যান্যবেদন এই প্রকার নববিধা ভক্তি অবলম্বন করত শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ণ করিতে
থাকে। এই কীর্তন ভক্তিতে পরিস্কার পরমজ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া জীবের
শ্রে : সাধন করে। সাধনাতে পূর্নজাত-শ্রদ্ধা বা ভগবদ্ভাষণ-লোভ বধন
পালিমা ও প্রাপ্ত হইয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি প্রভৃতি অবস্থা অতিক্রম করত
ভগবৎতে পরিণত হয়। তখন স্বরূপতঃ জড়োদ্ভূত জুললিঙ্গরূপ ঐশামিক
দেহদ্বয়ে প্রায়োচিত্তমানশূন্য হইয়া স্বকীয় পূর্বসিদ্ধ চিংস্বরূপ এবং রসামিকার-
নিশ্চয় সেযোগ চিহ্নে লাভ করেন। মধুররসাবিস্ট জীবগণ স্বীয় রসযোগ্য
গোপীদেহ লাভ করত মধুরীময় শ্রীকৃষ্ণাবনামমে কুললীলার উপকরণ হইয়া
থাকে। অন্তরে স্বরূপশক্তির বিজ্ঞাপনাবে জীবের গোপীভাব-প্রাপ্তিই
স্বরূপতঃ নিজাবধূত লাভ। তখন জীব বিজ্ঞাবধূ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে জীবন-
স্বরূপ বোধ করেন। ভাবদশা ক্রমশঃ চিত্তামের বিভাব, অজ্ঞাব, সাহিত্য ও
কামিভাবিরূপ চিংসাময়ী-দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া চিদেকরসভা লাভ করে। ৩৭-
কালে জীবের আনন্দাধুনি স্বভাবতঃ পরিবর্তিত হয়। চিদ্রসের নিত্যতা-
ধর্ম্মশক্তি : স্বয়ং ভূতভবিষ্যৎকাল জড়মল-দূষিত কাল থাকে না। সর্বকালেই
এইগান ও নূতন। অতএব অমুরাগলব্ধ জীবের পদে পদে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ণত্ব

পূর্ণমূর্ত্যাদিনবরূপ হয়। তদবস্থায় গুণগুণীভেদাভাবজনিত বিজ্ঞানচন্দ্র-
তত্ত্বাত্মক জীব বিজ্ঞক হৃদয়ঃ, চিত্ত, মন, বুদ্ধি, দেহ, ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জগুটৈঃপ্র-
সরূপে অবস্থিত। অবস্থূত অবস্থায় যে কৃষ্ণকীর্তন 'তাতা' সর্গীরূপস্বরূপ
অবস্থা অর্থাৎ স্বরূপসংস্কার সময়ে ব্রহ্মস্ব বা স্বীয় সন্তোষণস্বরূপত
সক্তিদানন্দ-যুগল-সেবাই জীবের সিক্তস্তার অভিগ্ন সংস্কার। ইহাই প্রয়োজন-
তত্ত্ব। এইরূপ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞান মার্জিত। গুণভক্তি-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-
সঙ্কীর্ণনই সর্বত্র প্রয়োজন। অতুলে স্নোকেব চতুর্পাশে 'পরং' শব্দদ্বারা
ভুক্ত ও মুক্তিসাধক বস্তুজ্ঞানাত্মগত হরি-কীর্তন অনাদৃত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ণন চারিপ্রকার। নাম-সঙ্কীর্ণন, রূপসঙ্কীর্ণন, গুণসঙ্কীর্ণন ও
লীলাসঙ্কীর্ণন। পরমার্থরূপ বস্তুর নামই তদুত্তমের মূল। নাম পূর্ণরূপে
উদিত হইলে রূপের উদয় হয়। রূপ পূর্ণরূপে উদিত হইলে গুণসমূহের উদয়
হয়। গুণ সম্পূর্ণরূপে উদিত হইলে লীলা বোধ হয়। অতএব নামই
সর্বমূল এবং সমস্ত সিদ্ধির একমাত্র কারণ। নামই ক্রমশঃ রূপ-গুণ-লীলা-
রূপে পরিণত হয়। অতএব নাম-ব্যতীত এক ও মুক্ত উভয় প্রকার জীবের
গত্যন্তর নাই। প্রকুর উপদেশ সমস্তই নামকে লক্ষ্য করে। শ্রীমদ্ভাগবত-
বলিতেছেন,—“হে ভগবান্! আপনি জীবের প্রাতঃ অপার করুণা প্রকাশ
করিয়া অনেক নাম প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণ, গোবিন্দ, অচ্যুত প্রভৃতি
মুখ্য নামসমূহে যাহাদের অধিকার হয় নাই, তাহাদের লক্ষ্য পরমাত্মা, শান্তা,
নিরন্তরা, ব্রহ্ম প্রভৃতি অনেক গৌণ নামও প্রকাশ করিয়াছে। সেই সমস্ত
নামের মধ্যে মুখ্য নামে সমস্ত শক্তি এবং গৌণ নামসমূহে বহুবিধ পাপ-
নাশক ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রাপক শক্তি অর্পণ করিয়াছে। জীবের স্বেচ্ছাশ্রিত্য
দৃষ্টিপূর্বক স্থায়ী নামপ্রদানে দেশ-কালানির কোন নিয়ম কর নাই। এসমস্তই
তোমার কৃপা। কিন্তু আমার হৃদয়ের কথা কি বলিব? তোমার মধু-
মাখা নামেও আমার অল্পরোগ জন্মিল না।” নামের সমস্ত শক্তি আছে বটে,
কিন্তু দশবিধ নামাপরাধরূপ হৃদৈব দূর না হইলে, জীবের নামে রূচ হয় না।
সাবুনিন্দা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাবদুত্তি শিবাদি দেবতাতে ভেদবুদ্ধি, গুরুর
প্রতি অবজ্ঞা, বেদ ও তদনুগত-শাস্ত্রনিন্দা, হরিনামে অর্থবাদ, নাম-বলে
অসৎপ্রযুক্তি, অসৎ গুণকর্মের সাহিত্য হরিনামকে সমান-জ্ঞান, বহিঃশ্রুতি ও
অনধিকারীকে নামোপদেশ, নামমাহাত্ম্য গুনিয়া তাহাতে প্রীতির অভাব

—এই কথেকটি অপরাধ মার্জনা-পূর্বক নাম গ্রহণ করিলে নামের স্বরূপ উদ্ভিত হয়। অতএব কথ্যকৃত বাক্য শীতল হইতে নানকল্প প্রাপ্ত হইয়া নিঃপাথে প্রত্যেক লক্ষণের পরিচয়। নামগ্রহীতার পক্ষে কল্যাণশ্রুত পাপক্ষয়-চেষ্টা বা পুণ্যপঞ্চম-চেষ্টার পয়োজন নাই, যেহেতু শ্রদ্ধা উদ্ভিত হইবার সময়েই কল্যাণিকারূপে দূর হইয়া থাকে। অস্বস্থিযুক্তী প্রকার উদয়কালেই তদিতর-বিষয়িনী অশ্রুত সত্যজ্ঞ উদিত হয়। তৎকালে পাপ-পুণ্যমাত্র আর থাকে না। প্রকারান্তে পুত্রব যতাবতঃ যতাবতঃ কারয়া থাকেন এবং যে যে বিবর্তিত পদার্থ করেন, সে সমুদায়ই বিবর্তিত হইয়া পুণ্য অপেক্ষা মার্যক ও নির্মল। কিন্তু পুণ্যোক্ত নামাপরাধ থাকিলে শ্রদ্ধা ক্রমশঃ নির্ভী দূরে থাকুক অবশ্য হইয়া পড়ে। চিবজীবন সাধন করিয়াও নামান্তর অস্বস্থ উন্নতি লাভ করে না। অতএব শাস্ত্র (পদ্যপুণ্যে) একরূপ উক্ত হইয়াছে,— “নামাপরাধযুক্তানাং নামান্তরং বরজীবন। অবিশ্রান্ত-প্রযুক্তানি ভোগ্যবার্থ-করাণি চ।” নামাপরাধ পরিভ্রাণের জন্য বাহুল্য চিত্তে কিছুদিন অনবরত নাম করিলে ঐ ঐ অপরাধের অপরাধ-অভাবে ভরণপাশ-শূন্য হইয়া পড়ে। তখন নামবলে শ্রদ্ধা, রুচি, আসক্ত, ভাব ও শ্রেয় পর্যন্ত অবস্থা অনারামে উদ্ভিত হয়।

নিরপরাধে প্রকারান্তে বাক্য যখন পুণ্যমাত্র অংশে সন্নিবেশিত, তখন তাঁহার স্বভাবতঃ চারিটী লক্ষণ অনুভূত হয়। অতএব শিষ্যগণ কহিলেন,— ‘ও জীবসকল! যিনি আত্মনাশে তৃণাপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিয়া জানেন, যিনি তরু অথবা সহস্রগুণে অবলম্বন করেন, স্বয়ং কমানী হইয়াও সমস্ত লোককে যথাযোগ্য সম্মান করেন, তিনিই হরিকীর্তনের অধিকারী। এই জড়-জগতে তুমি অতি তুচ্ছ বস্তু হইলেও তাহাবৎ এই বিশ্বের একটী বস্তু বলিয়া অভিমান অহঙ্কার হয় না, কিন্তু চিত্তপদার্থরূপ জীবের এই জড়-জগতে কিহমাত্র অভিমান করা উচিত নয়, যেহেতু জীবের চৈতন্যমানস হৃদয়পরা, জড়ভিমান নিতান্ত আরোপিত ও মিথ্যা। সংচেতুর্ভূত হইয়া হইলেও রক্ষ সর্বকালে ছায়া ও ফলদানে পরাভূত নয়। কিন্তু জড়বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ-ধর্মবিশিষ্ট জীবের উপকর্ত্তা উন্মেষের প্রতি সর্বদা দয়ামূল্য থাকা বাস্তবিক, যেহেতু জীবের দয়ার্হ জীবের স্বার্থরূপ ভক্তির অন্তর্গত ধর্মবিশেষ। নাম-গ্রহীতা স্বয়ং জড়ভিমানতমত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, সন্ন্যাসাদি আশ্রম, ধন, ক্রপ,

বল, বীৰ্য্য, অধিকার, পদ ইত্যাদি সম্বন্ধে নিরর্থক-অভিমানশূন্য হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবমাত্রের প্রতি পরমাদররূপ মান দান করিবেন। শুগব-রূপায় যে-সকল আধিকারিক সম্মুগণ ব্রহ্ম-শিবাদি পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করেন। এই কয়েকটি লক্ষণ না দেখিলে পুরোক্ত অপরাধ এখনও দূর হয় নাই, এক্ষণ মনে করিতে হইবে।

উক্ত লক্ষণ-চতুষ্টয়-যুক্ত নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিলে অহৈতুকী, উত্তমা, কেবলা, শুদ্ধা, অমিশ্রা, অকিঞ্চনা, নিগুণা ইত্যাদি বিশেষায়ুক্তা নামের অধ্বয়গত লক্ষণ হয়। কিন্তু জীবের বদ্ধাবস্থায় দুইটী বাতিরেক লক্ষণ আছে। সেই লক্ষণযুক্তা হইলে ভক্তি শুদ্ধা হয়। অজ্ঞা-নিশাম-শূন্যতা ও জ্ঞানকর্ষ্যত্বনাবৃততাই ভক্তির বাতিরেক লক্ষণ। সেই ক্ষুদ্র পরিহাররূপে শিখাইবার জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কহিয়াছেন,—‘হে জগদীশ! আমি ধন, জন, বা সুন্দরী কবিতা প্রার্থনা করি না, কিন্তু জন্মে জন্মে যেন প্রাণেশ্বররূপ তোমাকে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদন্ত ধর্ম্ম অর্থ, কাম-ধনই—ধন, শ্রীচাই না। দেহ ও দেহাহুগত স্ত্রী, পুত্র, কলত্র, প্রজাদিরাগ জনও আমি চাই না। কৃষ্ণভক্তিপোষিকা দিগ্ধা ব্যতীত সামান্য ব্যাকরণ ও অক্ষর-প্রতিষ্ঠিত কাব্য-নাট্যাদি-রচনা-শক্তি (উপলক্ষে কোন বচিসুখ বিদ্যা) আমি চাই না। কেবল ফলাশুসন্ধানরহিতা শুদ্ধা ভক্তিই আমার প্রার্থনা। ‘সংসার-দুঃখনাশ এবং চিৎস্বরূপলাভরূপ মোক্ষ ভক্তের পক্ষে অনায়াসলভ্য অবাস্তব ফল। তজ্জন্ত প্রসাদ বা প্রার্থনাদ্বারা ভক্তের স্বরূপকে দূষিত করা উচিত নয়। যে-সময়ে জীবের জড়মোচনের যোগ্যতা উপস্থিত হইবে তখন কৃষ্ণরূপাক্রমে তাহা অবলম্বি হইবে। অতএব শুদ্ধগণ ‘জন্মে জন্মে যেন অহৈতুকী ভক্তি লাভ করি’,—এইমাত্র বাসনা করিবেন অন্য বাসনা করিবেন না।

সংসারদুঃখ-বিষয়ক আলোচনা কি নিত্যান্ত অকর্তব্য? না। ভক্তিভাবে কে বিশুদ্ধরূপে বাগিয়া যতদূর সংসারমোচন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউতে পারে, সাধক ততদূর তদ্বিষয় আলোচনা করিতে পারেন। শিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীকৃষ্ণের নিকট সংসারদুঃখ-মোচন-প্রার্থনা কদাচ করিবেন না, কেবল এই প্রকার প্রার্থনা করিলে কোন দোষ হইতে পারে না,—‘হে মধুরসামিষয় শ্রীনন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্যদাস। তোমাকে বিস্তৃত হইয়া মায়া-

বৈভবে প্রবেশপূর্বক কর্মজালময় বিষম ভবসমুদ্রে পতিত হইয়াছি। এই অবস্থায় আমি যতই চেষ্টা করি ততই তোমার চরণাশ্রয় জুড়ুওবর্তী হইয়া পড়ে। তুমি কৃপা না করিলে আর তোমার অকৃত্রিম দাস্যরূপ মম স্বধর্ম আমার পক্ষে অলভ্য হয় না। হে কক্ৰণাময়! আমাকে তোমার পাদপদ্মাস্থিত ধূলি-সদৃশ করিয়া রাখ। তাহা হইলে আমি আর তোমার বহিঃস্থিতাক্রম মায়াভিনিবেশে আবদ্ধ হইব না। এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে সেই কক্ৰণাময় যখন আমাদিগকে তাঁহার চরণাশ্রয় দান করেন, তখন আর জীবের ক্লেশ থাকে না।

পূর্ব পঞ্চ শ্লোক সংসঙ্গক্রমে কৃষ্ণাশ্রয়ীলনকারী শ্রদ্ধা, তাহার পর সাধু-গুরুচরণাশ্রয়, তৎপরে শ্রবণকীর্ত্তনাদিময় ভজন, তাহা হইতে স্বরূপোপলব্ধি-জনিত অবজ্ঞারূপ অনর্থনাশ, তদন্তর নিষ্ঠা, তাহা হইতে রুচি, তাহা হইতে আসক্তি এবং আসক্তির পরিণামে ভাব বা রস হ্লাদিনীসারবৃত্তিকে আশ্রয় করত উদিত হয়; এই ক্রমটী প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাবদশায় ভক্তির অংগ একস্বরূপত্ব সিদ্ধ হয়। নাম-কীর্ত্তন তখন অশাস্ত প্রবল হয়। ক্ষান্তি, অনার্থ-কালঙ্ক, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবদ্ধ, সমুৎকর্ষা, নামগানে রুচি, কৃষ্ণ-গুণাখ্যানে আসক্তি ও কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি ইত্যাদি রত্নির লক্ষণস্বরূপ হইয়া পড়ে। ভাব বা রতি শুদ্ধসঙ্ক-বিশেষস্বরূপ প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণপরিমাণ অর্থাৎ প্রেমের প্রথমাবস্থা। তদ্বদ্যে নৃত্য, গড়াগড়ি, গীত, চৌৎকার, শরীর-মোটন, হুকার, হাই, প্রতৃপ্ত্যাস, লোকাপেক্ষাশূন্যতা, লালোচন্য, অটুতাস, ঘূর্ণা ও হিক্কা এই সকল অনুভাব এবং স্তম্ভ, বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রণয়রূপ অষ্ট সাংখ্যিক বিকার কিঞ্চৎপরিমাণে লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে নৃত্য, গীত, অশ্রু, পুলক, স্বরভেদ এই কয়টি বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। অতএব তদ্রূপা-প্রার্থনাস্থলে সাবধ এইরূপ লালসা করিয়া থাকেন,—“হে গোপীজনবল্লভ! তোমার অমৃতময় নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ক-দিনে আমার নয়নদ্বয়ে অশ্রুধারা বিগলিত হইবে, আমার বদন গদগদভাবে স্বর ভঙ্গরূপ বিকার লাভ করিবে এবং আমার সমস্ত বস্তু পুলকিত হইবে? হে নাম! আমি ভোগমোক্ষ প্রার্থনা করি না, সেই সর্বদানদ-বিস্তারিণী ভাবদশা প্রার্থনা করি।”

রত্নকর্ণা দ্বায়ায়িষ্যৎ কচ্ছি প্রেমদশায় বিহারে, অনুরাগে, সান্ত্বিত্যে ও
 বাহ্যচারিণ্যে ভাবচতুষ্টয়ের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া প্রকৃতিসম্মান লাভ করিবে।
 তখন পুরোক্ত অলুভাব ও সান্ত্বিত্য বিকারসকল সম্পূর্ণ লক্ষিত হইবে। সমান্তরাল-
 শয় দ্বারা ভক্তের অন্তঃকরণ সম্যক্ মসৃণ ও ঘনীভূত হইয়া প্রেমের
 পীঠস্থান হয়। তখন ভক্তিবাদের আশ্রয়ে যে ভক্ত ব্যক্তি বিষয়-যুক্ত হইয়া পদে
 মুখা সম্বন্ধ-বুদ্ধিভেদে শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখ্য, প্রেমসংগ ও মধুর এই পঞ্চপ্রকার
 মুখারস এবং গুণভেদে গৌণ সৰ্বক্ৰমেণে হাস্ত, অহঙ্ক, বীর, সুরূপ, বৌদ্ধ
 ভয়ানক, নীচত্বস এই একাদশ সপ্ত গৌণরস দেলীল্যমান হয়। যজৌবের
 যে রসে কচি তাহার পক্ষে সেই রসই আশ্রয়ণীয়, কিন্তু মধুর রসও সর্বোৎকৃষ্ট।
 তাহাতে প্রেম, প্রণয়, মান, দ্রোহ, রাগ, অনুরাগ ও মহাত্ম্য সম্পূর্ণ-
 রূপে অবস্থিত। শাস্ত্ররসে উল্লাসময়ী শ্রী রত্ন অবস্থায় লক্ষিত। তদবস্থায়
 তদ্বিষয়-ব্যতিরিক্ত অলুভা তুচ্ছ-বুদ্ধি। রত্ন সমান্তরালযুক্ত হইলে প্রেমরূপে
 দাস্ত্ররসে লক্ষিত হয়। সে অবস্থায় শ্রীতিভঙ্গকারী ভেতসকল কার্য করিতে
 পারে না। নিত্যকাল বিশ্বাসময় প্রেম প্রণয়রূপে দেখে লক্ষিত হয়। সে অবস্থায়
 বিষয়ের সত্ত্বমযোগাত্মা থাকিলেও সত্ত্বম থাকে না। প্রিয়ত্বের আতিশয়াপযুক্ত
 কোটিল্যভাসময় ভাববৈচিত্র্যের নাম মান। তদবস্থায় ভগবান্ ও প্রেমময়
 ভক্তকে স্বীকার করেন। চিত্তের অতিশয় দ্রবতাবসর প্রেমকে স্নেহ বলে।
 তদবস্থায় মহাত্ম্যাদি বিকার দর্শনে অতৃপ্তি, বিষয়ে ঐশ্বর্যাসক্তে
 অনিষ্টাশঙ্কা হইয়া থাকে। মান ও স্নেহ বাৎসল্য হইতে লক্ষিত, অর্থাৎ
 শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখ্যে লক্ষিত হয় না। অমিলাবাত্তক স্নেহের নাম রাগ।
 তদবস্থায় ক্ষণিক বিরহও অসহ্য। সংযোগপর হৃৎপঙ্খ। সেই রাগ
 অনুগুণ নিজ বিষয়ীভূত তত্ত্বকে নূতন নূতনরূপে অনুভব করাইয়া স্বয়ং
 নবনবভাবে অনুভূত হইয়া অমুবাগ বলিয়া পরিচিত হয়। সেই অবস্থায়
 আশ্রয় ও বিষয়ের পরস্পর অত্যন্ত বশভাব। বিবন্ধ-সম্বন্ধে অলু প্রাণীতে
 জন্মগ্রহণ লাগিয়া হয়। বিশ্রামস্তে অত্যন্ত বিস্মৃতি হয়। অসমোদী চমৎকার
 উন্মত্ততাময় অনুরাগকেই মহাত্ম্য বলে। তদবস্থায় সংযোগসময় নিমেষেব
 অসহ্যতা ও কল্লের কণ্ড উপলব্ধ হয়। বিয়োগে ক্ষণকে কল্পপ্রায় মনে হয়।
 যোগে ও বিয়োগে উদ্দীপ্ত অশেষ সান্ত্বিত্য বিকারাদি উদ্ভিত হয়। এই
 সমস্ত লক্ষণের দিগ্‌দর্শন মাত্র শ্রীমদ্ব্যাক্ত্যবস্থাকে দৃষ্ট হয়। “অহো!
 গোবিন্দবিরহে আমার নিমেষকে যুগ পরিমাণ বোধ হইতেছে, চক্ষু হইতে

যেন বর্ষাকালের ধান। নির্গত হইতেছে এবং সমস্ত জগৎ শূন্যবৎ বোধ হইতেছে।” প্রত্যেক জীবের পক্ষে পূর্বসংসার বিপ্রলভ অত্যন্ত উপযোগী ইহাই কথিত হইল।

প্রেমদশা প্রাপ্ত জীবের এইরূপ ভাব,—আমি ঈকমুপাদপদ্ম বাতীত আর কিছুই জানি না। তিনি কৃপা করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করুন বা পদতলে আমাকে মর্দন করিয়া খুঁচী হউন অথবা অদর্শন দ্বারা আমাকে মর্ষাহত করুন। তিনি প্রেমলপ্পট। আমাকে যেকোন বিধান করিয়া তিনি সুখ-লাভ করেন আমার সেই অবস্থাই স্বীকার, যেহেতু তিনি আমার প্রাণনাথ বই অপর কেহ ম'ন। প্রেমদশায় ভক্তগণ কৃষ্ণকজীবন হইয়া পড়েন। তখন ভক্ত ও কৃষ্ণ উভয়ের মধ্যে আকর্ষণরূপ একটা উত্তমসম্বন্ধনিষ্ঠ পরম-ধর্ম দীপ্ত হয়। আকর্ষণ ও লোহ যেমত পরস্পর যথাবিহিত অবস্থিত হইয়া লোহ আকর্ষের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ ঈকমু-প্রতি মার্জিত চিত্ত বিহিত হইয়া থাকেন। ইহাই জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে পূর্বসিদ্ধ ধর্ম। জীবের বৈমুখ্য-বশতঃ ঐ ধর্ম লুপ্তপ্রায় বিবর্ষ ও অশ্রয়ে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সামুখ্য উদ্ভিত হইলেই সেই ধর্মের ফ্রিডা-পরিচয় লক্ষিত হয়। সেই ধর্মসাধনকার্যে জীবের ঐ ধর্মের উদয় বাতীত অস্ত্র ফল নাই। ঈকমু-গোপীপন্থকে বলিয়াছেন, যথা,—

ন পারহেহং নিরবজসংযুক্তাং স্বসাধুকৃত্যং নিবুধ্যস্বাপি বঃ ।

যা মাতকন্ দুর্জয়-গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্য তথঃ প্রতিযাতুঃ সাধুনা ॥

(ভাঃ ১০।৩২।২২)

এই শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভৃ সপদ্ধান্তিধেয়-প্রযোজন স্বরূপ-জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে সাধনভাবপ্রেম-অনুসন্ধানরূপ পরমতত্ত্ব আলোচনার উপদেশ করিয়াছেন,—ও জীব! যদি তোমার ভাগ্যোদয় হইয়া থাকে, তবে সমস্ত কর্মচেষ্টা, জ্ঞানচেষ্টা পরিত্যাগপূর্বক তুমি বিশেষ যত্নসহকারে এই শিক্ষাক্ষেত্র অনুভব কর।

শ্রীচৈতন্যার্চনমস্ত ।

—জগৎগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীপীতার নন্দাবলী

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭০ পৃষ্ঠার পর)

সপ্তদশ অধ্যায়

[শ্রদ্ধাভঙ্গ-বিভাগযোগ]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—৬ ।

সত্ত্ব, রজ, তমগুণে

শ্রদ্ধা হয় ভিন্ন ।

ভিন্ন রুচি ভিন্ন শুচি

চিন্তা ভিন্ন ভিন্ন ॥১॥

প্রকৃতির অনুসারে

শ্রদ্ধা হয় স্থির ।

কেহ হয় ধীর স্থির

কেহ বা অধীর ॥২॥

সত্ত্বগুণী নম্র অতি

রজ না তদ্রূপ ।

তমোভরা তমোগুণী

ধরে নানা রূপ ॥৩॥

সত্ত্বগুণী করে পূজা

দেব ও দেবীকে ।

রজগুণী করে পূজা

যক্ষ-রক্ষাদিকে ॥৪॥

তামসিক জনে পূজে

ভূত প্রেতাদিকে ।

উহারা আনন্দ দেয়

অঙ্গ তামসিকে ॥৫॥

কঠোর তপস্তা করে

অবিবেকী জন ।

দম্ভ আশ্ফালন ভরা

অহঙ্কারী মন ॥৬॥

এইরূপ তপস্তায়

যেবা হয় রত ।

কষ্ট দেয় নিজ দেহে

প্রভুও বিরক্ত ॥৭॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৭—১০)

সাত্ত্বিক আহার করে

সত্ত্বগুণী জন ।

বৃদ্ধি পায় আয়ু সত্ত্ব

রোগে উপশম ॥৮॥

সুরভিত রুচিকর

ঐ আহারে তৃপ্তি ।

সাথে আনে বল শক্তি

দেহের সমৃদ্ধি ॥৯॥

রাজসিক খাদ্য হয়

অতি লবণাক্ত ।

অতি উষ্ণ অতি তেজ

রক্ষ অধিকার ॥১০॥

কটু খাড়া রাজসিক

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৪—১২)

অন্ন অতিশয় ।

শারিরীক তপস্মাকে

রোগ আনে পরিণামে

রহে সবলতা ।

হয় বিপর্যয় ॥১১॥

ব্রহ্মচর্যো হয় ব্রতী

ভাগসিক আহারাদি

দেহের সুরক্ষা ॥১৬॥

অভক্ষ্য উচ্ছিষ্ট ।

বাস্তব তাপস বড়

বাসি পাচা শুক ইহা

কহেনা অযথা ।

করয়ে অনিষ্ট ॥১২॥

ধর্মশাস্ত্র করে পাঠ

(শ্লোক-সংখ্যা : ১১—১৩)

জাহে আবণ্ডতা ॥১৭॥

সাত্বিক যজ্ঞেতে হয়

মানস তপস্মা আনে

সিদ্ধির বন্দনা ।

চিত্তে প্রসন্নতা ।

ফলাকাজ্ঞা নাহি করে

সৌম্যভাব হয় দৃষ্ট

হয় এক মন ॥১৩॥

সংযত কথা ॥১৮॥

রাজসিকে করে যজ্ঞ

এই তিন তপস্মাকে

ভরা দাস্তিকত্ব ।

কহয়ে সাত্বিক ।

প্রচার করিতে চাহে

কাষ্ঠ মন বচনেতে

অসার কর্তৃত্ব ॥১৪॥

সত্যের প্রতীক ॥১৯॥

ভক্তিশূন্য যজ্ঞ যাগ

রাজসিক তপস্মাতে

তাহা তামসিক ।

দত্তের প্রচার ।

মন্ত্রশূন্য তম-পূর্ণ

প্রতিপত্ত চাহে দক্ষী

শাস্ত্র বিপরীত ॥১৫॥

অমিতা অসার ॥২০॥

তামসিক তপস্ব্যতে

দেহ হয় স্নিগ্ধ ।

উদ্দেশ্য আহত কর।

অন্যকে অতিষ্ঠ ॥১১॥

শুভ কর্ম অনুষ্ঠানে

এ বাণী মহৎ ॥১২॥

ব্রাহ্মণ বেদ ও যজ্ঞ

স্বকনের সাথে ।

(শ্লোক-সংখ্যা : ২০—২২)

দানে রত তাৎপর্য

বিবিধ দানেতে ।

বিনা স্বার্থে দেয় কেহ

কেহ নিজ স্বার্থে ॥২২॥

নাহি চাহে প্রতিদান

সে দান সাত্ত্বিক ।

দেশ-কাল পাত্র তাহে

শাস্ত্র মতে ঠিক ॥২৩॥

প্রতিদান চাহে দানে

রাজসিক দান ।

স্বর্গ চাহে অর্থ চাহে

চাহে যশ-মান ॥২৪॥

অবজ্ঞাপ্রসূত দান

উহা তামসিক ।

দেশাচার মাত্র তাহা

পাত্র নহে ঠিক ॥২৫॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৩—২৮)

ব্রহ্মের ঘনিষ্ঠ অতি

ওম্ তৎ সৎ ।

ওম্ তৎ সৎ বাণী

বিদিত জগতে ॥২৭॥

ওঁ মন্ত্রের উচ্চারণে

দুর্গতি খণ্ডন ।

যজ্ঞদান কর্মাদিতে

পবিত্র বচন ॥২৮॥

তৎ শব্দ পুণ্য অতি

ফলাকাজ্ঞা শূন্য ।

যেই জন বলে ইহা

হয় সেই ধন্য ॥২৯॥

সৎ শব্দ উচ্চারিত

হয় যথারীতি ।

মাদুলিক কর্ম যথা

বিবাহ প্রভৃতি ॥৩০॥

যজ্ঞদান তপকর্ম্মে

শ্রদ্ধা প্রয়োজন ।

নতুবা বিফল হয়

সব আয়োজন ॥৩১॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভূ-বিভাগের পদস্থ অফিসার,
নিউ দিল্লী ।

উদ্ধারের পথ

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৬৪ পৃষ্ঠার পর)

শাদু-গুরু-মুখেই ভাগবতী-কথা শ্রবণ করা কর্তব্য। শ্রীল শিবজী পার্বতীর নিকট বলেছেন,—“ভক্তা ভাগবৎ গ্রাহং ন মেধয়া ন চ চীক্షা।”—(ভাগবত) শাস্ত্র আরও বলেন,—“যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।”—(১৫: ১৫:) জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতায় পাঠ,—“শাদুগণের বৃত্তি battery-র action-এর (ব্যাটারীর কার্যের) মতন। উহা অসদ্বস্তকে repel (প্রতিরোধ) ও সদ্বস্তকে attract (আকর্ষণ) করে। শাদুদিগের সচ্চরিত্রা শাদুবৃত্তি লাভ হয়। অসদ্বস্ত ভাগ ও সদ্বস্ত গ্রহণের পরামর্শ ব্যতীত শাদুগণ অক্লপ পরামর্শ প্রদান করেন না।”

শাদু-বৈষ্ণব-সঙ্গ ও শাদু-বৈষ্ণব-সেবা ছাড়া ভক্তি বৃদ্ধি হয় না। নিজে লঘু হয়ে বৈষ্ণবের সেবা ও গুরুদেবের সেবা কর্তে হয়। কুশীন গ্রামবাসী ভক্তগণের নিকট মহাপ্রভু গৃহস্থের কৃতা সঘন্নে বলেছিলেন,—“কৃষ্ণ-সেবা, বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সঙ্কীর্্তন।” কৃষ্ণ-সেবা, কাক্স-সেবা তথা বৈষ্ণব-সেবা ও শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্্তন সহজপথ গণিত হওয়ায় তৎ-তাৎপর্য্য সম্পর্কে জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের উপদেশ বিশেষ অরণীয় ;—“কৃষ্ণ-সেবা, কাক্স-সেবা ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্্তন তিনটি পৃথক্ অভ্যাস হ'লেও তিনটিই এক তাৎপর্য্যাপন্ন। নাম-সঙ্কীর্্তনের দ্বারা কৃষ্ণ ও কাক্স-সেবা হয়। বৈষ্ণবের সেবা করলে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্্তন ও কৃষ্ণ-সেবা হয়। কৃষ্ণ-সেবা করলেই নাম-সঙ্কীর্্তন ও বৈষ্ণবের সেবা হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করলে কৃষ্ণ-সেবা ও নাম সঙ্কীর্্তন হয়। সংসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠেও তাহাই লভা হয়। অর্চনেও এই তিনটি কাঁচা হ'তে থাকে। নামভজনেও তাহাই স্পষ্টভাবে হয়।”

সদগুরু চরণাশ্রয় লাভ করে শ্রদ্ধা সহকারে কৃষ্ণ-নাম রূপ-গুণ-লীলা-বিষয়ক কথা শ্রবণের ফলে শ্রীনাম-ভজন-কীর্তনের অধিকার হয় এবং ভজনের উন্নতিক্রমে প্রেমভক্তি লাভ হয়। সদগুরু চরণাশ্রয় ব্যতীত ভজন হয় না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলেছেন,—

আশ্রয় পইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আব সব মরে অকারণ ॥

সদগুরুদেবের কাছে প্রথমে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র গ্রহণ কর্তে হয়। তৎপরে গুরুদেবের আশীর্বাদ-পুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ যন্ত্রের দীক্ষা নিতে হয়। তবেই দীক্ষা সফল হয়। শাস্ত্র নির্দেশ দিয়েছেন,—

“দ্বাভিংশদক্ষণাণ্যোব বলৌ নামানি সৰ্গদম্ ।

এতন্মহৎ স্তম্ভশ্রেষ্ঠ প্রথমে শৃণুহান্নরঃ ॥

শ্রদ্ধা গুরুমুখ্যং পুত্র দক্ষ কণে তপোদন ।

দীক্ষাং কুৰ্য্যুঃ সূতশ্রেষ্ঠ মতাবিত্যসু হৃদবঃ ॥

হরিনাম্মা বিনা পুত্র দীক্ষা চ বিফলা ভবেৎ ।

নারী বা পুরুষো বাপি ভৎক্ষণাগারকা ভবেৎ ॥”—(শ্রীরাধাতন্ত্র)

কৃষ্ণ-মন্ত্র অপেক্ষাও কৃষ্ণ-নামে অধিক শাক্ত বিদ্যমান। কৃষ্ণমন্ত্রের প্রভাবে ভগবানের সহিত মন্ত্র-দীক্ষিত বাজুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয় মাত্র, কিন্তু কৃষ্ণনামেই পরমপুরুষার্থ প্রেম লাভ হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমদ্ব্যাহপ্রভুর বানীতে পাই,—

“কৃষ্ণ-মন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন ।

কৃষ্ণ-নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥”

এই প্রসঙ্গে শ্রী শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর ‘শ্রীভক্তসমুদ্র’ গ্রন্থে (২৮৪ সংখ্যায়) লেখ আছে,—“ততো মন্ত্রেষু নামতোহপ্যধিকসামর্থ্যেহলন্ধে কথং দীক্ষাতপেক্ষা ? উচ্যতে যত্বপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ সম্ভাবতো দেহাদি সম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং ভক্ত্যংকোচীকরণায় শ্রীমদৃষি প্রভৃতিঃ স্তোত্রাচ্চনামার্গে কচিৎ কাচৎ কাচিৎ কাচিৎমর্য্যাদা স্থাপিতাতি ॥”

অর্থাৎ—মন্ত্র অপেক্ষা যে-নাম অধিক সামর্থ্য লাভ করেছে, সেই নাম কীৰ্ত্তনকারীর পক্ষে মন্ত্র-দীক্ষার অপেক্ষা কেন ? তদ্বত্তরে বল্হেন,—যদিও নাগগ্রহনকারীর দীক্ষার অপেক্ষা স্বরূপতঃ নাই, তথাপি প্রায়ঃ সম্ভাবিক ভোগপর দেহাদি-সম্বন্ধ থাকায় কদর্য্যশীল ও বিক্ষিপ্তচিত্ত মানবগণের সেই সেই কদর্য্যস্বভাব ও চিত্তচাক্ষুশ্য সঙ্কোচের জন্য শ্রীনারদাদি ঋষিগণ অর্চন-মার্গে কোথাও কোথাও মন্ত্রে কিছু কিছু মর্য্যাদা স্থাপন করেছেন ॥”

ভক্তগণ সাধন ও সিদ্ধি—সকল অবস্থাতেই শ্রী গুরুপাদপদের আনুগত্য স্বীকার করেন। শ্রী গুরুপাদপদের আনুগত্য ব্যতীত ভগবৎ দর্শন হয় না। শুদ্ধভক্তির প্রকৃত বিচার বুঝতে না পারলে অছাভিলাষিত্রা বশে ভোগী বা ত্যাগী হয়ে পথভ্রষ্ট হ’তে হবে। জাগতিক সকল বস্তুই ভগবৎ সেবার উপকরণ; ভগবৎ সেবার বস্তু নিজে ভোগ করাও যেমন অপরাধ, তেমনি ত্যাগ করাও অপরাধ। অতএব আমরা কোন কিছু ভোগ করব না এবং ত্যাগও করব না। সব কিছু ভগবান্ ও উক্তকের সেবার নিয়োজিত করব—

এই বাজুট ভক্তগণ পোষণ করেন। ভক্তির পরিপন্থী ক্ষুদ্রতৈব্যাগ্য পবিত্রতাগ্ৰহণ করে যুক্তবৈরাগ্য আচরণই হরিসেবার অনুকূল। যুক্তবৈরাগ্যের সংগ্রহ নির্দেশ করে শাস্ত্র বলেছেন,—

“অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্থমুপযুক্ততঃ।

নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসদ্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্চ্যতে ॥”

(অঃ ৮ঃ ১ঃ পূর্বনিভাগ ২।২৫৫)

অর্থাৎ—“কৃষ্ণের বিষয়াসক্তিশূন্য হয়ে এবং কৃষ্ণ-সদ্বন্ধে নির্বন্ধ করে তদীয় সেবা-অনুকূল বিষয়মাঝে গ্রহণ এবং তাহাকেই যুক্তবৈরাগ্য বলে।”

আবার ভক্তি-বিরোধী হয় প্রকার দোষ বর্জন ও ভক্তির অস্বতুল ভয়প্রকাব গুণ গ্রহণ করাও ভজনপিতৃস্বর্ণের আশ্রয় কর্তব্য। ভক্তি-পাথের কষ্টক, যথা—

“অভ্যাসাবঃ প্রায়শ্চ প্রভলো নিয়মাগ্রহঃ।

জনসঙ্গশ্চ বৌল্যঞ্চ যত্ভূতভক্তিঃ শিন্মতি ॥”

(শ্রীল রূপ গোস্বামীকৃত উপদেশামৃত ২ শ্লোক)

অর্থাৎ,—“অধিক সংগ্রহ বা সঙ্গ-চেষ্টা, ভক্তিবিরোধী চেষ্টা ও বিষয়োত্তম, অনাবশ্যক প্রায়শ্চ, নিয়মাগ্রহ অর্থাৎ ভক্তিপোষক নিয়মে অনাদর অথবা ভক্তিপোষক নিয়ম বাতীত অল্প নিয়মে আদর, ভক্ত বাতীত অল্প-জনসঙ্গ এবং নানা যত্নবাদীর সঙ্গে অস্থির সিদ্ধান্ত অর্থাৎ চাঞ্চল্য—এই ছয়টি দোষ হ’তে ভক্তি বিনষ্ট হয়।”

ভক্তির অনশীলনের অনুকূল কার্য, যথা—

“উৎসাহান্নিঃস্রাবৈর্দ্যায়ং যুক্তং কর্মপ্রবর্তনাৎ।

সঙ্গত্যাগাৎ সন্তোষভূতঃ যত্ভূতভক্তিঃ প্রসঙ্গতি ॥”

—(শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদকৃত ‘উপদেশামৃত’ ৩য় শ্লোক)

অর্থাৎ,—“ভক্তির অনশীলনে উৎসাহ, দৃঢ় বিশ্বাস, অতীষ্ট লাভে বিলম্ব দেখেও বৈরাগ্যবলধন, প্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তাস পালন ও কৃষ্ণ-প্ৰীতার্থে ভোগ বর্জন—এইরূপ ভক্তিপোষক কার্যাহুষ্ঠান, অর্থাৎ শ্রী সঙ্গ, যোষিৎসঙ্গ-সঙ্গ এবং কৃষ্ণভক্তরূপ ভূঃসঙ্গ তাগ, সাধুসহাজনগণ যে সদাচার অনুষ্ঠান করেছেন এবং যে-বৃত্তিদ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছেন—তদনুরূপ সদাচার বা সদ্বৃতি ; —এই যত্ন হ’তে ভক্তি সিদ্ধ হয়।” যাতে ভক্তি-পথে থেকে ‘চূ’ না হয় এবং সাধনায় বিস্তৃতা সঙ্কার হয়, তজ্জন্য সাসনে পক্কাদ সতর্ক থাকতে হবে। সাধনাজের বিধি ও নিষেধ সদ্বন্ধে আরও শিক্ষা সাধুজন ও গুরুদেবের নিকট জেনে নিতে হয়।

শব্দব্রহ্ম নিষ্কাত সৎগুরুদেব ভগবান্ কৃষ্ণের প্রতিনিধি, তিনি সাধুগণের হরিকথামৃত-দ্বারা সাধক জীবের কষিত হৃদয়-ক্ষেত্রে কৃপা করে ভক্তিলতার বীজ ‘শ্রদ্ধা’ বপন করেন এবং বৈষ্ণবাপরাধ, জী-সঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্ত সঙ্গরূপ নিষিদ্ধাচার, কণ্টকতা সংশয় প্রভৃতি কুটীনাটী, জীব-চিংস্যা প্রবৃত্তি, লাভপুচ্ছা-প্রতিষ্ঠাদি অনিষ্টকর বিষয়গুলি বুঝিয়ে দিয়ে তাহা নির্মূল করার জন্য উপদেশ দেন।

“অনন্ত ভাবেতে কর শ্রবণ কীর্তন।

নাম-রূপ-গুণ-ধ্যান কৃষ্ণ-আরাধন ॥

সঙ্গে সঙ্গে অনর্থ নাশের যত্ন কর।

ভক্তিপত্রা ফল দান করিবে সত্ত্বর ॥”

সাধু-গুরু কৃপালব্ধ ভক্তিলতার বীজ সাধু-গুরুব নিকট শ্রুত শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথার কীর্তনরূপ জ্ঞান-সেচনে অধুরিত হায়ে ক্রমে লতার পরিণত হয় এবং তৎপরে বদ্ধিত হইবে গোলোক-বৃন্দাবনে পৌঁছে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-রূপ কল্পবৃক্ষ আশ্রয় করে প্রেমফল প্রদান করে। শরণাগত বৃদ্ধ সাধু-সঙ্গে ঐ ভক্তিলতা পালন করেন এবং তৎসঙ্গে বৈষ্ণবাপরাধ, কুটীনাটী, নিষিদ্ধাচার, কুসিদ্ধান্ত প্রভৃতি ক্ষতিকারক আগাছাগুলি হৃদয়-ক্ষেত্রে থেকে সমূলে উৎপাটন করে ভক্তির ফল কৃষ্ণপ্রেম লাভের দৌভাগ্য পান। শুদ্ধ ভক্তিলতার গোলোক-বৃন্দাবনে গমনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে স্থানপ্রাপ্তি সম্পর্কে জগৎগুরু শ্রীশ্রীমদ ভক্তি-সিদ্ধান্ত দরশন শ্রী গোষামৌ প্রভূপাদের যুক্তির্পর ভাষণের কিয়দংশ এস্থলে বিবৃত করছি :—

“পরীক্ষিত মহারাজের বিচার যেক্রম, সেক্রম বিচার আবশ্যক।

‘উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি’ যায় :’

কৃষ্ণ-পাদপদ্মের সেবা কর্ত্তে হবে। চিত্তিয়ার সেবা কার্য্যে বাস্তব হতে হবে না। ভক্তিপত্নী-বীরে শ্রবণ-কীর্তন জল-সেচন করে লাভবান হওয়া আত্মার পক্ষে একান্ত আশংক। শরীর পালন করা পশুরও ধর্ম্ম। নিচা মজলের অমৃৎসন্ধান না করলে মনুষ্য-জন্মের কার্য্য হলো না। আত্মবাতী পশুপ্রকৃতি অপ্রাকৃত বস্তুর শ্রবণ-কীর্তন করে না। যখন ভক্তিলতা বাড়ে, তখন লতা একটা মাচা চায়। কেন্ জিনিষটা মাচার কার্য্য করে? শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম মাচার কাব্য করবে। কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতি বা আশ্রয় গ্রহণ এতুলেই লতা প্রফুল্ল ও পরিবর্দ্ধিত হ’তে থাকে। সত্য, জনঃ, মহঃ, ওপঃ ইত্যাদি লোকে

গেলে লতা জ্বলি যায়ে! জ্বলি গেলে পণ্ডপরিশ্রমে পর্যাবসিত হবে—খোলে কেবল চাটি দেওয়া জাই মার হ'বে।

জগতে যে-সব বিভিন্ন মনোধর্মের বিচারযুক্ত ব্যক্তি আছেন, তাঁদের সকলের ঐক্য প্রত্যাশা হ'বে। উজ্জ্বলতা এই ব্রহ্মাণ্ড ভেদ ক'রে যায়। ব্রহ্মাণ্ডের পর বিরজা—একটা গড গডখাই। তা'তে জল—কারণ-বারি আছে। কারণ-বারি থেকে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হ'য়েছে। সেখানে রজোবর্ণ নাই—তমস্বর্ণ আছে—গুণসাম্যাবস্থা আছে। রজঃ, তমঃ ও সত্ত্ব একটা জিনিষ তিনভাবে বিভক্ত ক'রে ত্রিধা চূর্ণ ক'রে পড়ে—বিরজাতে neutralised (ক্রিয়াশূন্য) হয়। এখানে সৃষ্টি বস্তুর কারণ প্রকৃতি বর্তমান।

খানিকটে প্রগতি (Progress) দেখিয়ে স্তম্ভ-তাব এনে দেওয়া ব্রহ্মাণ্ডের স্বভাব। এখানে অধিষ্ঠান পাওয়া যায় না—সেবা করার বস্তু পাওয়া যায় না।

বিরজার অপর পারে ব্রহ্মলোক বা জ্যোতির্ধাম। বিরজা-জলধির মধ্য দিয়ে লতা চল্লো। ব্রহ্মলোক নির্বিশেষ জ্যোতির্ময় স্থান। সেখানেও লতা এমন কোন বস্তু পেল না—বা'র সেবা করতে পারা যায়।

ব্রহ্মলোকের পরে সবিশেষ ভগবদ্ধাম—মহাবৈকুণ্ঠ। সেখানে গৌরবের সহিত সেবা—শাস্ত্র, দাস্য ও সখ্যের নিয়াজি বিরাজমান। মর্যাদা-পথে নারায়ণ-সেবাতে আড়াইটা বস আটক পড়ে যায়। ইহজগতে দেখু'তি রস পাঁচ প্রকার। কিন্তু ঐকুণ্ঠে আড়াই প্রকার দেখা যা'চ্ছে, আর বাকী আড়াই প্রকার দেখা যাচ্ছে না। গোলোক-দর্শন—সমগ্রতার দর্শন—সেখান থেকে উপরের অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে—সখ্যের উত্তরার্ধে অর্থাৎ বিশ্রান্ত সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। যে দিক্ থেকে দেখা যাচ্ছে, সে দিক্ থেকে অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে।

‘তছুপরি যায় লতা গোলোক-বৃন্দাবন।’

তা'র উপরে উঠে পাঁচটাই দেখতে পাওয়া যায়। আংশিক দর্শন ছাড়িয়ে পূর্ণ দর্শন। কৃষ্ণই পূর্ণ। বিষ্ণুর বাবলীয় অবতার—কৃষ্ণের অংশাংশ—কলা-পিকলা। মৎস্য, কুর্মা, বরাহ ইত্যাদি দর্শন—আংশিক দর্শন, পূর্ণ দর্শন নহে। গোলোকে কৃষ্ণ আছেন। অস্ত্রজ কৃষ্ণের বিলাস মূর্তি—কৃষ্ণের অপূর্ণ দর্শন।” সুতরাং নাম-সঙ্কীর্ণন-প্রধান। শুদ্ধভক্তিযোগ সাধনাতে নিকাম কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির অভীষিত গন্তব্যস্থল অতিক্রম করে সর্বোচ্চ স্থান গোলোক-

বৃন্দাবনে যাওয়া সম্ভব হয়। শ্রীমানপ্রভু কৃপাতেই ব্রজভাব লাভ হয়। কেবল গুরুভক্তিযোগে ভগবানকে যেভাবে আপন করে পাওয়া যায়, অল্প কোনও উপায়ে তজ্ঞপ পাওয়া যায় না। শ্রীমৎ বলেন,—“ভাক্ত্যেবৈনং নযতি ভক্তির্দেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবদ্যঃ পুরুষো ভাক্তিরেব ভূয়সী।”—অর্থাৎ “ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট নিয়ে যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদর্শন করান। সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্গশ্রেষ্ঠ।” ভাক্ত্যযোগের কি অদ্ভুত প্রভাব! ভক্তাধীন কৃষ্ণ ভক্তের কাছে ধরা না দিয়ে থাকতে পারেন না। ভক্তিযোগেই ভক্ত ও ভগবানের অপূর্ণ মিলন দৃষ্ট হয়। ভক্তিযোগের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-কথা স্মরণ হয়,—

“ভক্তিযোগে ভীষ্ম তোমা’ ভিনিল সমরে।

ভক্তিযোগে যশোদায় বান্ধিল তোমারে ॥

ভক্তিযোগে তোমারে বেচিল সত্যভামা।

ভক্তিবশে কান্ধে কৈল গোপ মে শ্রীদামা ॥”

আরও অসংখ্য উদাহরণ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। ভগবানকে লাভ করিতে ভক্তের জ্ঞতি, কুল, বিদ্যা, বৈভব প্রভৃতি কোন কিছুই প্রয়োজন নাই। ব্রজের যান্ত্রিক ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের তপস্যা, জাগতিক বিদ্যা প্রভৃতি কোন কিছুই গুণ ছিল না; তথাপি তাঁরা ব্রজের মালাকার ও তাবুলিকাদি ব্রজ-বনিতাদের কাছে কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-মালা-বিষয়ক কথাদি শ্রবণ করে ভগবানের কৃপা লাভ করেন। পক্ষান্তরে যান্ত্রিক স্পৃহাও মধ্যমোচ্চ ব্রাহ্মণদের কৃষ্ণ-ভক্তি না থাকায় কৃষ্ণ-দর্শনে পরাজুপ হ’লেন। সুতরাং ভজন পরায়ণ ভক্তরাই কৃষ্ণ-কৃপা পাবার সহজ উপায়।

ভগবান্ ভক্তের প্রদত্ত পত্র-পুষ্প, জল-ভূমসীতেই প্রীত হন এবং ভক্তের কাছে আত্মপর্যাপ্ত বিক্রয় করে দেন। তিনি বারংবার ভক্তের ঋণ স্বাকার কর্ত্তেও কুণ্ঠিত হন না।

শ্রীহরিভক্তিবিন্যাসে গৌতমীয়-তন্ত্রে উক্ত হয়েছে,—

“তুলসীদল মাত্রেণ জলস্ত চতুর্ভুজেন চ।

বিক্রীণীতে সমাস্তান্যং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥” (হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৬১)

অর্থাৎ—“একটি মাত্র তুলসীদল বা এক গণ্ডুষ জলদ্বারা কৃষ্ণের আরাধনা করলেও ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তবৃন্দের নিকট আত্মবিক্রয় করেন।”

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলেছেন,—

“পত্রং পুষ্পং ফলং তৈরং যো মে ভক্কা প্রযচ্ছতি ।

ভদ্রং তু ভক্কা পশু কৃষ্ণামি পয়কাশ্বনঃ ॥”

অর্থাৎ—“যিনি ভক্তিবৃত্তি চিত্ত আনাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রদান করে থাকেন, আমি শুকটিতে সেই ভক্তের ভক্তিপূজক প্রদত্ত সেই সমস্তই গ্রহণ করে থাকি ।

শুদ্ধভক্ত বা চীত শুদ্ধভক্তিব্যোমের মাহাত্ম্যকেই বা কে জানে ? ভগবান্ যেমন ভক্তের হৃদয়, তেমনি ভক্তও ভগবানের হৃদয় । ভগবানের অন্তরের খবর শুদ্ধভক্তই জানেন । শুদ্ধভক্ত স্বভাবতঃই পাপাচরণ প্রবৃত্তিশূন্য । শুদ্ধভক্তের পাপ-পুণ্যের চিন্তা নাই । ভগবানের সবাই ভক্তের জীবাত্ম ; ভগবান্ সেবককেই স্বাকর্ষণ করেন । ভগবান্কে ভালবাসলে তাঁর ভালবাসা পাওয়া যায় । শুদ্ধভক্তিমাগেই ভগবৎ লেখা সমস্ত এবং বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা ব্রহ্ম-ধামেই স্বর্গ সোণা হয় । ব্রহ্মধামে মৎস্য, গোরুর ও সস্ত্রমাদির লেশমাত্র নাই । সেখানকার বিশ্রুত-সখা, বিহুত বাৎসল্য ও মর্ষোপবি কাষ্টারদের চমৎকারিতা বাগমার্গের ভক্তগণ নির নির অধিকার অনুসারে আস্বাদন করেন ।

“বাগভক্ষ্যে ব্রজে যয়ং ভগবানে পায় ।

বিধিভক্ষ্যে পার্শ্বদেহে বৈকুণ্ঠে তে যয় ॥”—(চৈঃ চঃ)

শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রেই ভগবত্তার পূর্ণ বিকাশ হেতু শ্রীকৃষ্ণ-স্বয়ংকরণের সেবা ও শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্গীষণ । এই প্রসঙ্গে পদ্যসংস্কুলচুড় যিনি ও বিদ্যুৎপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিনিকায় সর্বস্বতী গোয়ামৌ প্রভৃপাদেব বিচার-ধারার কিঞ্চৎ প্রসঙ্গ উত্থাপিত করুছি ;—

“সমস্ত শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণেই পরমেশ্বর বলে স্থব কর্ণেও যশোমতী তাঁকে তাঁহার সামাজ্য পুর মাকুর্ভ চিটার করেছেন । যিনি নিখিল বিশ্বের পালক-গণেরও পালক সেই কথাকে নন্দ-বংশাদি তাঁদের পাল্যজ্ঞান করেছেন । সখাগণ অতিশয় বিশ্রুত সত্কাবে শ্রীকৃষ্ণের স্বক্লেব উপর আরোহন ক’বে নানাবিধ ক্রীড়া করেছেন । ব্রহ্মদেবীগণ কৃষ্ণকে দেবগণের দ্বারা বন্দিত দর্শন করেও তাঁকে কান্তজ্ঞান করতেন । শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রেই একমাত্র পরিপূর্ণতা রয়েছে । ইহাই মূল আদর্শ । শ্রীকৃষ্ণে কোনও প্রকার ছেয়তা আরোপিত হ’তে পারে না । ব্রজগোপীগণের সহিত যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা, তাহা প্রাকৃত রাজ্যের অন্তর্গত নহে । প্রাকৃত রাজ্যের বিন্দুমাত্রও অভিনিবেশ থাকলে, তাহা আমাদের বুদ্ধির গোচরীভূত হয় না ।”

এই কলিকালে কোন ভক্তজ্ঞ যাচনকালে শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন সহযোগে তাহা কবার জন্য শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বলেছেন,—

“এতাবানৈব লোকেইন্দ্ৰিন্ পুংসাং ধর্ম্যঃ পরঃ স্মৃতঃ ।

ভক্তিয়োগো ভগবতি তন্মাম-গ্রহণাদিভিঃ ।”—(ভাঃ ৬।৩।২০)

অর্থাৎ—“নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনাদি দ্বারা শ্রীভগবান্ বাগ্‌দেবে যে ভক্তিয়োগ তাহাই এই জগতে জীব সকলের ‘পরমধর্ম্য’ বলে কথিত হয়।”

জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভাষণে এখানে উল্লেখ করুতি,—“ভগবত্বের যতপ্রকার অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তনই একমাত্র প্রধানতম ও পবন প্রয়োজনীয় অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তন পরমার্থ জীবন-যাপনের সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ্যতা লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণনামে সর্বশক্তি, সর্বশোভা ও সর্ব আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ত্তি, সর্বসাধনের চরমফল ও সিদ্ধি চিহ্নিত আছে।

* * * * *

শ্রীকৃষ্ণনামেই ভক্তিপথে সকল বাধা অনায়াসে তিরোচিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-নাম কেবলমাত্র সাধন ব্যাপার নহেন, তাহা সাধনের ফল সাধাবস্থ ও বটো। কৃষ্ণনাম গুৰ্ব্বানুগতো পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে হবে। শ্রীকৃষ্ণনামে সর্বপ্রকার শ্রেয়ঃ প্রস্ফুটিত হয়। শ্রীনামের সেবাব দ্বারাই জীবের বাবজীয় মঙ্গল হবে। একমাত্র কৃষ্ণনামই আমাদের নিত্যানন্দ-সাগরে নিমজ্জিত করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের নাম অখিল রসময়।

শ্রীগৌরসুন্দরই পরমোপাস্ত্র বস্তু—জগতের সকলেরই শেষ উপাস্ত্র বস্তু—জগতে যত উপাস্ত্র বস্তু আছে, সেই সকল উপাস্ত্র বস্তুরও পরমোপাস্ত্র বস্তু। শ্রীগৌরসুন্দর সাংক্ষাৎ কৃষ্ণ হয়েও ভাগবতধর্ম্য স্বয়ং আচরণ করে জগৎকে জানিতে দিয়েছেন—শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তনই ভাগবতধর্ম্যের পরাকাষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তনই মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ ও মহার্চন। কৃষ্ণের ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চন—সাধারণ মাত্র। কৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তনরূপ মহাধ্যানে, মহাযজ্ঞে, মহার্চনে তত্ত্ব-বিষয়ে পরিপূর্ণতা। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

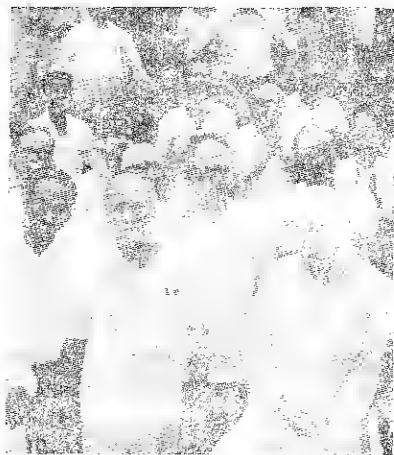
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সৌজন্যে ববছীপে দাতব্য চক্ষু অপারেশন শিবির

‘শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি’ একটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক মুক্ত সম্মানসংস্থা। মানব সমাজের পারমাণবিক কল্যাণ, চেতনা ও ইচ্ছা ইত্যাদি ইহাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু ইহা তৎপরের বাস্তব সমস্যাকে বাদ দিয়ে নহে—এই ভাবনাকে কেন্দ্র করিয়া বিহীন সময়ে কামলাটিত পরিস্থিতিতে লক্ষ্য করে জনসাধারণের ইচ্ছা ও পরকালের কল্যাণের জন্ম এই প্রতিষ্ঠান দরদী হৃদয় ও উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়া আসিতেছেন। তাহারই এক সংস্থা বিশেষ এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

আধ্যাত্মিক বা অন্তর্দর্শনের প্রচেষ্টা ভারতীয় আৰ্য্য ঋষিগণ ধেরূপ ভাবে ইহাৰ প্রেরণা বেগোইয়া গিয়াছেন। তৎসহ সমাজ জীবনের ভাবনাকেও তাহারা প্রতিষ্ঠা করেন নাই। এরূপ আধ্যাত্মিকতাবাদকে বাস্তব কপায়ণ করিতে গেলে সামাজিক পরিস্থিতিতে অসুবিধা করিতে পারিলে নিম্নাভীত পতিত, উপেক্ষিত, বঞ্চিত সমাজকে সুস্থ ও ব্যাপকহারে অগ্রগামী করা সম্ভব নহে। তজ্জন্যই প্রাচীনকালেও এখনও ঋষি-মুনিবৃন্দ পাহাড়ের গর্ভের বা গুহা পরিত্যাগ করিয়া জন-সমক্ষে মিলিত হইয়াছিলেন। জনসাধারণকে হৃদয়ের বাগী, কনাইয়া তাহাদিগের হৃদয়ে বাধিত হইয়া তাহা অপনোদনে সহায়ক হইয়াছিলেন। সেই ঐতিহাসিক স্মরণীয় কালের বাস্তবায়নরূপে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অবদান সীকায়া।

তাই দীন-দরিদ্র, অনাথ-অতুরগণের কল্যাণের জন্য বিনা খরচায় চক্ষু-হীনদিগের চক্ষুচিকিৎসায় অস্ত্রপ্রয়োগ (Eye operation)-এর সুব্যবস্থার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই কার্য-সফলতার আধানে স্থানীয় ডাক্তার প্রমথভট্টাচার্য্য শ্রীমূলী দুয়ার চৌধুরী, M.B.B.S.—সুহৃদ মহাশয় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়া এগিয়ে আসেন। তাহার মুখ্য প্রচেষ্টা ও অর্থও কয়েকজন চক্ষুচিকিৎসকের সৌজন্যে বিগত ৮৮ আশ্বিন (২৫.৯.৮০) অত্যন্তাতিক বা তদন্যায় চক্ষুচিকিৎসক ডাঃ আই. এস. রায় (Dr. I. S. Roy, M. B. B. S., D. O., M. S., F. R. C. S. & D. O.)-এর অধি-

নায়কহে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির (রেজিঃ) মূল আশ্রম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের নবনির্মায়মান রহং ধর্মশালা (যাত্রানিবাস) গৃহে প্রায় ৬০ জন দৃষ্টিহানের চক্ষে অস্ত্রোপচার করা হয়।



ক্রিয়াক্রিয়ামী শ্রীমৎ ভক্তিবাদান্ত তপস্বী মহারাজ

ডাঃ আই, এস, রায় মহাশয়কে শিবিরের

ব্যবস্থাপনা প্রদর্শন করাইতেছেন।

উক্ত কার্যের বিভিন্ন পরণের তদারকি (Supervision) বাপারে ডাঃ পি. মুখার্জী (Dr. P. Mukherjee, M. B. B. S., D. O., M. S.), ডাঃ এ. সরকার (A. Sarker, M. B. B. S., D. O.) ও ডাঃ এস, কে, ভৌদিক (Dr. S. K. Bhowmick, M. B., B. S.) প্রমুখ পুরোভাগে সহায়তা করেন। অস্ত্রোপচারকারী চিকিৎসকগণের (Doctors) মধ্যে সর্বশ্রী পি. এন্ বিদ্যাস, পি এল. সাহা, এস. দাসগুপ্ত, কে, বর্দন, ডি, বাকচী, এ. কে, ব্যানার্জী, ডি, কে. বাকচী, এস. কে. বৈজ্য, এস. পি. সেনগুপ্ত, এস পি, মুখার্জী প্রভৃতি এবং ডাক্তার আই, এস, রায় মহাশয়ের সহ-গামী আরও কিছু চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত নদীয়া জেলার



নির্যাতন দ্বারা অন্ধের ছবিতে
দেব-দেবীরা স্বামীজী মহারাজ
ব্যাভাষ্য চিকিৎসক ডাঃ আই.এস.
বায়ের দ্বারা দর্শিত কলিকাতার
অধ্যাপক কল্যাণকর এবং
এবং বার অংশে চিকিৎসক
বোম্বাইকে অধ্যাপক করিওছেন।

মুখ্য দাতব্য-চিকিৎসক (C. M. O.) মহোদয়ও উপস্থিত হইয়া পরিচিতি দেখা-ভুল করেন। তৎপরি ভাকার এ. কে. মৈত্র (চক্ষু চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ), ভাকার এম. কে. নন্দী, এম. বি. বি. এম. ভাকার এম. এন. মুখার্জী প্রভৃতি অভিজ্ঞ চিকিৎসকসকলও ষোল্ল ঘর নিয়োগিত এবং নবদীপ পৌরপতি মহোদয়ও চক্ষু অধ্যাপকের দিন উপস্থিত হইয়া ব্যবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করেন।

অধ্যাপকদের পূর্ক (ইং ২৪৯৮৩) দিবসেও ব্রাহ্মণদের গোষ্ঠীয় মঠের আবাসস্থলে থাকি প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সুন্দর ভাবে করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আর তিন সপ্তাহ পূর্ক হইতে ব্রাহ্মণদেরকে ভাকারগণ ২৩ বার ওয়েজলীয় পরীক্ষা করিয়া গিয়াছিল। অধ্যাপকদের (ইং ২৪৯৮৩) দিন সকালে প্রথমে চিকিৎসক ডাঃ আই. এম. রায় মহোদয় তাঁহার সপলবলে কলিকাতা হইতে গাড়ির মুখ্য কেন্দ্রস্থল ব্রাহ্মণদের গোষ্ঠীয় মঠে উপনীত হন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনেক অগ্রমবাসী সাধু-সংজনগণসহ এ্যাটর্নী ও সহঃ সেবাসচিব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্রিবেদান্ত ভাচার্য্য মহারাজ সমিতির পক্ষ হইতে চিকিৎসক দলকে সুযোগ্য ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ইতিমধ্যেই নদীয়া জেলার দুখা প্রাস্ত্যাদিকারিক ও নবদ্বীপ শহরের পৌরপতিও আসিয়া উপস্থিত হন। সমিতির পক্ষ হইতে সকলকেই বিশেষ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়।

শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ ডাঃ সুশীল কুমার ভৌমিক মহাশয়সহ রোগীদিগের থাকা ও অপারেশনের হলঘর এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক ব্যবস্থাাদি প্রদর্শন করান। চিকিৎসকগণ ব্যবস্থাপনা ও সুন্দর পরিবেশ দর্শনে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। এর একটু পরেই প্রবীণ ও হনামথ্যাত ডাঃ রায় অপারেশনের কার্য্য উদ্বোধন করতঃ অভিজ্ঞ ও সূচিকিৎসকগণকে উক্ত কার্য্যের যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করেন।

দিবা প্রায় দ্বিপ্রহরে ডাক্তার সুশীল কুমার ভৌমিক মহাশয় ও আরও কয়েক গন্যমান্য ব্যক্তিগণের সাহায্যে সারা দিয়া ডাঃ রায় মহাশয় অনতিদূরে অবস্থিত মণিপুর ঘাটরোডে শ্রীমন্ত্রি রাধাবল্লভজীয়ার মণিপুর প্রতীকাত্ম-অদ্বৈত শ্রীমৎ তিনকড়ি গোস্বামী প্রভুজীর চক্ষু অপারেশন করার জন্য উক্ত আশ্রমে গমন করেন এবং তাহাও সুচারুরূপে সমাধা করেন। তদন্তর পুনঃ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় সমিতি উপস্থিত হইয়া চক্ষু অপারেশন কার্য্যগুলি তদন্ত করেন। তাহার অমায়িক ব্যবহার ও কর্ম্মকুশলতা সকলকে বিমুগ্ধ করিয়াছে।

একসপ্তাহাদিকাল সমিতির উল্লিখিত নবনির্ম্মাণমান যাত্রীনিবাসে রোগীগণ অবস্থান করেছিলেন। বিভিন্ন দিনে ও বিভিন্ন সময়ে দায়ী নিবন্ধ সূচিকিৎসকগণ রোগীগণকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এতদ্ব্যতীত শুশ্রূষা-কারিগীগণও (Nurse) যথাযোগ্য ভাবে তাহাদের কর্তব্য পালন করায় সমিতির সদস্তুগণ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ অভিজ্ঞ কুমার মৈত্র (Eye specialist) মহাশয় প্রত্যাহ অতিরিক্ত ভাবে (Special) সমিতির পক্ষ হইতে দেখা শুনা করায় রোগীগণের আরও মনের বল বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৫ই আগষ্ট (ইং ২১.১০.৮৩) ডাক্তারগণের নির্দ্ধারিত সূচী অনুযায়ী রোগীগণকে ছাড়িয়া (Release) দিবার ব্যবস্থা ছিল। তৎপরি আরও

প্রায় একদশ কাল ২১৩ বার পরীক্ষা করার জন্য ডাক্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রোগীগণের উক্ত অপারেশনের জন্য অস্থানকালীন পাওয়া ঔষধ ও পথাদি প্রভৃতি বিনা খরচায় ব্যবস্থাপনার জন্য সমিতির মহৎ সহানুভূতি স্মরণীয়। এই প্রভৃতি লেব ব প্রায় ১১/২ মাস পূর্ণ হইতে প্রচার-পত্র বিলি এবং নবহীপ শহরে উচ্চ শব্দকারী (Loud-speaker) যত্নসহযোগে প্রচার-ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া উক্ত সুযোগ গ্রহণ করিতে যত্নসহায় ও অভাবগ্রস্থ জনসাধারণের প্রতি অস্বাভাবিক জানাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই চক্ষু অপারেশন-শিবির সম্পর্কে সরসারা কর্তৃপক্ষকে অস্বাভাবিক জানান যাইতেছে যে, অন্ততঃ বৎসরে একবার এই চক্ষু অপারেশন শিবির যাহাতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে সংঘটিত হইতে পারে তজ্জন্য অভিজ্ঞ সুচিকিৎসক-গণ তথা প্রয়োজনীয় সাহায্য-সরঞ্জাম দিয়া সহযোগিতা করিলে দীন দরিদ্র অসহায় জনসাধারণ বিশেষ উপকৃত হইতে পারিবেন। সমিতির উদার চিন্তাশীল ও মর্মান্বিতা তথা নির্মূল পরিবেশ উচ্চ প্রদর্শনের দাবী রাখে। তজ্জন্য এই সমিতি যদিও মুখ্যতঃ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান,—কিন্তু ইহার অবদান সুদূরপ্রসারী।

— প্রিন্সিপাল মুখোপাধ্যায়

সভাপতি,

নবহীপ স্মারকিনী সভা

সাধুসঙ্গে দক্ষিণভারত পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭৪ পৃষ্ঠার পর)

কুন্তকোণাম্—চিদাহরম্ হইতে ৬৮ কিঃ মিঃ কুন্তকোণাম্। কাবেরীর তীরে পুরাণ-প্রসিদ্ধ এই শহর। শোনা যায় প্রলয়ের সময় অমৃতকুন্তের কানা পড়েছিল এখানকার মহামবম্ সর্বোত্তরে। প্রতি দ্বাদশ মাসে মেলা বসে এখানে। ১২ বৎসর অন্তর বসে কুন্তমেলায় আসার। পরবর্তী পূর্ণকুন্ত ১৯২২-তে। বিষ্ণু ও শিবের মিলিত বিগ্রহ এখানে রয়েছেন চক্রপাণি, অষ্টভূজ, ত্রিনেত্র প্রভৃতি নামে সুবিদিত।

তাঞ্জোর—৬ই নভেম্বর (১২শে কার্তিক) রবিবার সকাল সাড়ে ছয়টায় আমরা তাঞ্জোরের দিকে যাত্রা করিলাম। কাবেরী উপত্যকায়

সাংস্কৃতিক নগরী গড়িয়া উঠিয়াছে তাজোরকে কেন্দ্র করিয়া। অতীতে চোল রাজাদের রাজধানীও ছিল এই তাজোরে। দশম হইতে চতুর্দশ শতাব্দীতে চোল রাজারা ছিল খুবই প্রথিতযশা। মোট ৭৪টি মন্দির আছে এই তাজোরে। এগুলি চোল রাজাদের অবিনশ্বর কীর্তি।

মন্দিরগুলির মধ্যে বৃহদেশ্বর মন্দিরটির তুলনা হয় না। এমনকি ব্রহ্মানিকা এনসাইক্লোপিডিয়াতে ভারতের অষ্টম মন্দির বলিয়া খ্যাতি পাইয়াছে। আর শিল্পীদের নির্মাণ পারদর্শিতাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু পরিভ্রাজক ও বৈজ্ঞানিক ভারতের প্রাচীন মন্দিরগুলির শিল্পনৈপুণ্যতার কথা চিন্তা করিয়া এদেশের বিজ্ঞান-মন্ডিত প্রাণী সভাচার নিদর্শনে আশ্চর্য্যাবৃত হন। মূল মন্দিরে উপাস্ত দেবতা শিব। মন্দিরের সম্মুখে একটি মণ্ডপ। মধ্যস্থলে একখণ্ড গ্রেনাইট প্রস্তর খোদিত শিবলিঙ্গ বৃষব চরণ মুড়িয়া বেলীর উপর উপবিষ্ট আছেন। বৃষটির কলেবর ১৬ ফুট লম্বা, ১২ ফুট উচ্চ এবং ৭ ফুট বেড়-বিশিষ্ট ওজন ২৫ টন। যখন এই বৃষব প্রস্তুত হয় সে-সময় বর্তমান যুগের ভার্য টলেক্সট্রিক বা হাইড্রলিক ক্রেন বা ব্যপ্পান ছিল না। কিছুর উপায়ে গদূর পদ্ধতিতে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিয়া এই বিপুল দেহাধিনিষ্ট রথ গঠন করিয়া নিম্নাতাগল শিল্প ও স্থাপত্য বিজ্ঞার অদ্ভুত পরিচয় দিয়াছেন?

তাজোর নগরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, তাজোর নামে কোন দৈত্য এই স্থানে বাস করিত। তাহার অত্যাচারে পার্শ্বাঞ্চলী গ্রাম-সমূহের জনমণ্ডলী প্রসিদ্ধিত হইয়া ভগবৎ আরাধনায় নিযুক্ত হন। ভগবান্ বিষ্ণু তাহাদিগকে রক্ষার্থে স্বয়ং আসিয়া দৈত্যকে সংহার করেন। দৈত্য তাজোর মৃত্যুকালে ভগবানকে অনুরোধ করে যে, স্থানটি যেন তাহার নামে অভিষিক্ত করা হয়। ভগবান্ মুমূর্ষু দৈত্যের অনুরোধ বক্ষা করিয়া এই স্থানটির নামকরণ করেন তাজোর। হারাঠা স্থিতির নিদর্শন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে তাজোবের দুর্গ। রাজ্য বিজয়রাসব এর নির্মাণ। প্রাসাদের দু-ধারে দুটি মিনার। একটি হইতে শ্রীরঙ্গমের ভগবান্ রঙ্গস্বামীকে প্রণাম করিতেন রাজা। আর দ্বিতীয়টি ব্যবহৃত হইত শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার।

শ্রীরামেশ্বরম্

৭ই নভেম্বর (২০শে কালিক) সোমবার সকালে আমরা কান্তিকব্রত বা নিয়মসেবা মাসের প্রভাতী-কীর্তনাদি করিয়া শ্রীরামেশ্বর শিবকে দর্শন

করিতে যাই। দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দু তীর্থগুলির মধ্যে রামেশ্বরম্ অগ্রতম। দক্ষিণ ভারতের উপকূলের প্রান্তভূমি এই রামেশ্বরম্ একটি ছীপের আকার। মন্দিরকে কেন্দ্র করিচাই শহর। জাবিড় স্থাপত্য রীতিতে দীর্ঘ সাড়ে তিনশ বছরে গড়িয়া উঠিয়াছে দক্ষিণ-ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম এই মন্দিরটি। কথিত আছে (যদিও মূল রামায়ণে এষ্ট পূজা-সম্পর্কে জ্ঞান যায় না) রামায়ণের রামচন্দ্র লঙ্কার পথে পূজা করিয়াছেন এই শিবের। সদ্ধ কংসম উভয় প্রকারে 'রাম' ও 'শিব'র সঙ্গে রামই ঈশ্বরতত্ত্ব। রাম+ঈশ্বর=রামেশ্বর বা রাম বাহার ঈশ্বর, রামেশ্বর। কেহ যদি প্রশ্ন করেন, রাম যদি ঈশ্বর ও শিব যদি সেবক হন, তবে রামচন্দ্র শিবের পূজা করিয়া তাঁহার সাক্ষ্য চাহিয়াছেন কেন? তাহার উত্তর—ক্ষুদ্র কার্যে তদুপযোগী সৈনিক নিযুক্তকরণ। এস্থলে একটি উপমা অর্থাৎ। কোন এক সময়ে পরীতকন্দরে এক শায়িত সিংহের কেশর একটি ইঁদুর কাটিয়া লইত। সিংহ জাগ্রত হইলে ইঁদুরটি একটি সরু গর্তে প্রবেশ করিত। সেখানে সিংহ তাহার শক্তি প্রয়োগ করার সুযোগ না পাইয়া গ্রাম হইতে একটা বিড়াল আনিয়া পালন করে। পরে ইঁদুর সেই গর্তের গায়ে আসিয়া পুনরায় কেশর কাটিতে আরম্ভ করিলে—অসনিই কন্দরে লুক্কায়িত বিড়াল লাফ দিয়া তাহাকে ধরিয়া বিনাশ করিল। শিক্ষা কি? ক্ষুদ্র শত্রুভেদে বস্ত্র বিক্রমণীবন লভ্যতে। তমাইতুং পুরস্কার্য গদ্যস্ত সৈনিকঃ ॥ প্রয়োজনানুসারে সৈনিক নিযুক্ত করা কর্তব্য। মণা মারিতে কি কামান দাগা টাটং? অথবা পিতামাতা বা মণিবের পুত্র কিংবা চাকরের আদর পক্ষ্যে মিন্দনীয় নহে, উহা মহামুভবতা। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত্যগ্নের পূজাও তদ্রূপ ভগবন্তা বা ভক্তবাংসল্য। মন্দিরের কারুকাব্য খুঁই মনোহারী। পৃথিবীর সব চাইতে দীর্ঘতম অলিন্দ আছে এই মন্দিরে। মন্দির চত্বরে বেশ কয়েকটি কুণ্ড আছে। তীর্থযাত্রীদের বিশ্বাস এখানে স্নান করিলে পুণ্য হয়। রামেশ্বরমের সমুদ্রও শান্ত। উৎসাহীগণ গজমাদন পরীত পরিক্রমা করিতে পারেন। শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন পূজিত হন এখানে। আমরা স্নান-মন্দির দর্শন করিলাম। বৈকাল ১টার সময় আমরা ট্রেনযোগে Mandapam এ পৌছি। সেখানে আমাদের পরিভ্রমণ বাসে কঙ্কাকুমারী যাত্রা করি। পথে রামনাথপুরমে রাতি যাপন করিয়া পরের দিন ত্রিচূন্দুর খাত কাঠিক মন্দির দর্শন করিয় বৈকাল ৫টার সময় কঙ্কাকুমারীতে পৌছি।

কল্যাকুমারী

৮ই নভেম্বর (২১শে কার্তিক) মঙ্গলবার কল্যাকুমারীতে অবস্থান। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তভূমি এই কোণ কমোরিন বা কল্যাকুমারী। বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর আর আরব সাগর—এই তিনের মিলন এখানে। মন্দিরের চত্বর হইতে জলের রঙ দেখিয়া সচেতন পৃথক্ কথা যায় উভাদের। ৭ রঙের বাণী পাওয়া যায় কল্যাকুমারীতে। তবে কল্যাকুমারীতে পুরো সমুদ্রের মত স্রোতের উপযোগী 'সী-বীজ' নাট, জলে নাগাও বিপজ্জনক। স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞানের সাধনায় তৎপরা করেন সমুদ্র স্রোত এক শিলাপেতে। সেই হইতে তাহার নাম হয় বিবেকানন্দ শিলা। ১৯৭০ সালে সেই শিলা উপর গড়িয়া উঠিয়াছে বিবেকানন্দ রক সৌন্দ। এই শিলার কল্যাকুমারীর পদচিহ্ন আছে। লঙ্ঘ্য পারাপার হওয়া যায়। সমুদ্রপারেই নিশ্চিত হইয়াছে গান্ধীস্মৃতি-সৌধ। ইহা এমনই ক্যামাটিক তকে তৈরী, প্রতি ২৪ অক্টোবরের দুপুরের স্মরণার্থে সরাশরি গান্ধী স্মৃতির মুখে পড়ে।

কল্যাকুমারীর মন্দির—অনেক পৌরাণিক কাহিনী জড়াইয়া আছে এ মন্দির সম্বন্ধে। প্রবাদ আছে পাক্তীর আর একরূপ—এটা দেবী। ব্রহ্মাণ্ড বরে বাণাসুর পুরুষের হাতে অবধ্য। এখন বিষ্ণুর পরামর্শে ইন্দ্র খজ্ঞ করিলেন। সেই যজ্ঞের হোমার্থে এইতে আবির্ভাব দেবী কল্যাকুমারীর। নারদের চক্রান্তে শিবের সঙ্গে বিবাহের লগ্ন অতীত শুণ্যায় আজও তিনি কুমারী। দেগিতে খুবই সুন্দরী তিনি। দিনের বিভিন্ন লগ্নে পূজা হয় তাঁহার। শাক্ত ও বদল হয় প্রতিবারই। ভাঙ্গা, গেঞ্জী চাদা মুতি বা প্যাণ্ট পরে মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। গম্বুজ আছে মন্দিরে, উজাতে আঘাত করিলে মৃদল, বেগু, বাঁশ ও জলতরঙ্গের সুব উঠে। মন্দির চত্বর হইতে স্বযোদয় ও স্বযাক্তের দুই সুন্দররূপে দেখা যায়। কোজাগরী পূর্ণিমাস্তে একই সময়ে সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয় দেখা যায় কল্যাকুমারীতে। রাত্রি পাঠ-কীর্তনকালে আমাদের ন্যায় গল্পবাট চলে আসত একটি পাঠ আমাদের সতিত যোগদান করেন ও খুবই আনন্দিত হন। সাধুসঙ্গে দীর্ঘ দর্শনেনব মহিমা-কীর্তন হয়। ৯ই নভেম্বর এ আমরা কল্যাকুমারীতে অবস্থান করিয়া ভালভাবে দর্শন করি। ব্যক্তিগণ আত্মীয়-বন্ধনদের স্ত্রী নানা দ্রব্য ক্রয় করেন।

১০ই নভেম্বর (২৩শে কার্তিক) বৃহস্পতিবার কল্যাণমারীতে আমাদের সাথের ঠাকুরের মধ্যাহ্ন ভোগরাগ করিয়া প্রসাদ পাঠিয়া আমরা বৈকাল ২টার সময় রওনা হইয়া ত্রিবাঙ্গম শ্রীঅনন্ত পদ্মনাভ ভগবানকে দর্শন করিলাম। ইনি গর্ভোদকশায়ী হয় পুরুষ। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে একজন শ্রীঅনন্ত পদ্মনাভ গর্ভোদকশায়ী ভগবান আছেন। ইঁহা'ব নাভিদক্ষ হইতে উৎপিত মুণাল অন্তর্ভাগে চতুর্দশ লোক ও সর্বোপরি শ্রীব্রহ্মা উপবিস্ত। এ বিগ্রহ এতট বৃহৎ যে তিনটি দরজা দ্বারা শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে হয়। যাত্রীগণ প্রত্যেকে দীবে স্নেহে ভালভাবে দর্শন করেন শ্রীঅনন্ত পদ্মনাভকে। ত্রিবাঙ্গুর রাজ্যে গৃহদেবতা। এই পদ্মনাভস্বামী ১৭২৯ সালে একের পর এক যুদ্ধ জয়ের পর রাজা মার্ত্তণ্ড ভার্মা সমগ্র রাজ্যকে দেবতার নামে উৎসর্গ করেন। অতুপনীয় ভাস্কর্য্যমণ্ডিত সাততলা গোপুরমূর্তি দ্রাবিড় স্থাপত্য রীতির নিদর্শন হইয়া আজও পর্য্যটকগণের আকর্ষণ করেন। কথিত আছে ঋষ্ট জন্মেরও ৩০০০ বৎসর পূর্বে ৪০০০ রাজমিস্ত্র, ৬০০০ শ্রমিক আর ১০০ চাতী'র দীর্ঘ ৮ মাসের শ্রমে গড়িয়া উঠে এই মন্দিরটি। রাজি ১০টার সময় প্রসাদ পাঠিয়া আমরা মাতরাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

মাতুরা

১১ই নভেম্বর, (২৪ কার্তিক) শুক্রবার সকাল ৬ ঘটিকায় মাতুরা মীনাক্ষী মন্দির ও মাতুরাস্থিত মীনাক্ষী দেবীকে দর্শন ও মন্দিরের কারু-কার্য্যাবলী দর্শন করিয়া আমরা বিদ্রিষ্ট হই। তদনন্তর কালে নিভার এই সুন্দর কারুকার্য্য খচিত মন্দিরগুলি নির্মাণ সম্ভব হইতাহিল তাহা বিস্ময় কর।

মীনাক্ষী মন্দির—দ্রাবিড় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের অপূর্ব নিদর্শন মাতুরাষ্ট-এর মীনাক্ষী মন্দির। আয়তনে দক্ষিণ ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মন্দির। কারুকার্য্য খচিত ৯টি গোপুরম্ আছে ইঁহা'ব। পূর্বদিকের গোপুরম প্রবেশ-পথ। মন্দির দেবালয় ২টি—একটিতে শিব দ্বিতীয়টিতে শিবজয়া মীনাক্ষী দেবী। দেবীর চন্দ্রের মংসের ন্যায় বলিয়া নাম মীনাক্ষী। প্রবাদ আছে মন্দিরের পোল্ট্রেন লোডাস টাংকে সাহিত্য মূলা আছে এমন নোঁন পাণ্ডুলিপি মে'লিলে ডুবেনা; আর সাহিত্য-মূলা যাত্রার মত তাহা ডুবিয়া যায়। কল্পগুলিতে আবাত করিলে সঙ্গীতের হরলিপি সজ্জ্বলিত হয়। আর একটি প্রবাদ—দেবরাজ ইন্দ্র আবিষ্কার করেন এই মন্দিরক। লিঙ্গটিও জঙ্গল হইতে ইন্দ্রেরই পাওয়া। তাঁহারই হাতে প্রতিষ্ঠা পান দেবতা। মন্দিরের আর এক আকর্ষণ তামিল নববর্ষে পালিত হয় দেব-বিবাহ বাষিকী। সন্ধ্যার সেই মিছিলে দেবতারোও বাহির হয়। (ক্রমশঃ)

— নিজস্ব সংবাদদাতা

॥ শ্রীশ্রীগুরুপোরাঙ্গো জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(রেজিষ্টার্ড)

ফোন—২৪৭

শ্রী দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

২৯শে পৌষ, ১৩২০ ; ইং ১৪/১১/১৮

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘাধ্য-বেদান্তবিজ্ঞানশিষ্যে—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ২রা গোবিন্দ, ৪৯৭ শ্রীগোরাব্দ; ৬ই ফাল্গুন, ১৩২০ সাল (ইং ১৯১৮৪), রবিবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্দবর নিত্যলীলা-প্রবিন্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব, মাঘী-কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথি হইতে ব্যাসভিন্ন জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিন্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসন মাঘী-কৃষ্ণা-পঞ্চমী ৪ঠা গোবিন্দ, ৮ই ফাল্গুন (২১/১৮৪) মঙ্গলবার পর্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, শ্রীব্যাসপঞ্চক, শ্রীমধাদি-আচার্য্যপঞ্চক, শ্রীসনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্তন, শ্রীমন্তাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তোত্র-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্যপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যানুষ্ঠানে সবাঙ্কব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবানুখী সুকৃতি অর্জিত হইবে।

বৈষ্ণবক্যানুগত্যাভিলাষী—

সত্যব্রন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

জ্যৈষ্ঠ ১৪—৬ই ফাল্গুন, রবিবার ব্রাহ্মমুহুর্তে যথারীতি মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরুমহিমামুচক-বন্দনাদি মহাজন-গীতি-কীর্তন, পূর্বাঙ্কে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলিপ্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোজ্যারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা, কীর্তন এবং প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা।

৭ই ফাল্গুন, সোমবার পূর্বাঙ্কে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান সম্পর্কে ভাষণ।

৮ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার পূর্বাঙ্কে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীমন্তাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

। শ্রী শ্রী মদনগোপালো জয়তঃ ।

<p>❀ ধর্মঃ সংলিখিতঃ পুংসাং বিম্বকসেন-কথাসু যঃ ।</p>	<p>স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।</p>  <p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়ান্না স্প্রসীদতি ॥</p>	<p>❀ নোংপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥</p>
---	---	---

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরমর ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিদগ্ধত ।

অতঃ ধর্ম অষ্টরূপে পালে বেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পাত সেই শ্রম ।

<p>৩৫শ বর্ষ }</p>	<p>২৬ মাঘ, সপ্তমী, ১৯৭৭ গৌরাদ ২৯ মাঘ, সোমবার, ১৩৯০ ; ইং ১৩/২/১৯৮৪</p>	<p>{ ১২শ সংখ্যা</p>
-------------------	---	---------------------

সান্নিধ্যান্তঃ

শ্রী শ্রী মদনগোপাল-দেবাষ্টকম্

[শ্রীল-বিধনাথ-চক্রবর্তি-ঠাকুর-বিরচিতম্]

মুহুর্তলারুণা-জিত-রাচর-দাদ-প্রভং

কুশিলা-কঞ্জারি-দর-কলস-বায়-চিহ্নতম্ ।

হৃদি যমাধায় নিজ-চরণ-নরমী-রুহং

মদনগোপাল ! নিজ-মদনমজুরক্ষ মাম্ ॥ ১ ॥

হে মদনগোপাল ! আপনার প্রকোশল চরণতলের অরুণ-বর্ণধারা আঁত
মনোরম হিঙ্গুলপ্রভা তিরস্কৃত ; আপনি শঙ্খ, চক্র, বজ্র, পদ্ম, কলস ও মাঙ্গ
প্রভৃতি চিহ্নে চিহ্নিত সেই নিম্ন চরণমল আমার হৃদয়ে সংস্থাপন-পূর্বক
আমাকে নিজ সমীপে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

মুখর-মঞ্জির-নখ-শিশির-কিরণাবলী-

বিমল-মালাভিরূপদমুদিত-কান্তিভিঃ ।

শ্রবণ-নেত্র-শ্রবণ-পথ-সুখদ ! নাথ ! হে

মদনগোপাল ! নিজ-সদনমহুরক্ষ মাম্ ॥২॥

হে নাথ ! আপনি স্বীয় চরণযুগলের অমধুর শব্দযুক্ত নুপুরদ্বারা শুভ্রগণের কর্ণদ্বয়ের ও নখচজ্রাবলীর দ্বারা নেত্রদ্বয়ের এবং চরণপর্যন্ত দোলায়মান মনোহর বনমালার অঙ্গজের দ্বারা নাসিকার পরমসুখ প্রদান করিয়া থাকেন । হে মদনগোপাল ! আপনি আমাকে এই সকল সুখ প্রদান করিয়া নিজ সমীপে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥২॥

মণিময়োক্ষীষ-দর-কুটিলিঃমণি লোচনো-

চলন-চাতুর্য্য-চিত-লবণিমণি গণ্ডয়োঃ ।

কনক-তাটঙ্ক রুচি-মধুরিমণি মঞ্জয়ান্

মদনগোপাল ! নিজ-সদনমহুরক্ষ মাম্ ॥৩॥

হে মদনগোপাল ! আপনার দীর্ঘং বক্রযুক্ত মণিময় উক্ষীষে, ইত্যন্ততঃ সঞ্চালিত নয়নযুগলের মনোহর ভঙ্গিমায় এবং কনক-বিনির্মিত কর্ণভূষণের কিরণছটায় মাদুর্য্য-মণ্ডিত গণ্ডরয়ে আমার চিত্ত নিমগ্ন করত আপনি নিজ সদনে আমাকে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥৩॥

অধর-শোণিগ্নি দর-হসিত-স্নাতমাচ্ছিতে

বিজিত-মাণিক্য-বদ-করণগণ-মণ্ডিতে ।

নিহিতবংশীক ! জন-দুরবগম-লীলা ! হে

মদনগোপাল ! নিজ-সদনমহুরক্ষ মাম্ ॥৪॥

হে প্রভু ! আপনি দীর্ঘং হাস্যবিত বদনের শুভ্রবর্ণ শোভিত ও মাণিক্য-বিজয়ী দস্তানিকরের কিরণনিচয়ে বিভূষিত রক্ষিমাগরে বংশী ধারণ করিয়া থাকেন এবং আপনার লীলা জনসাধারণের হৃৎকোষে । হে মদনগোপাল ! আপনি নিজ সমীপে আমাকে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥৪॥

পদক-হারালি-পদকটক-নটকিঙ্কলী-

বলয়-তাটঙ্কমুখ-নিখিল-মণিভূষণৈঃ ।

কণিতনব্যাভ ! নিজ-রূচত-তনু-ভূষিতৈ-

মদনগোপাল ! নিজ-সদনমহুরক্ষ মাম্ ॥৫॥

হে মদনগোপালি ! আপনি কর্তৃভূষণ, হারশ্রেণী, পদবলয়, কটিভূষণ, কয়-
বলয় ও কর্ণাঙ্গকার প্রভৃতি নিবিল মণিময় আভরণে অনির্কচনীয় শোভা ধারণ
করিয়াছেন । এই লক্ষ্য উজ্জ্বল স্বীয় দেহান্তরণে বিভূষিত আপনি আমাকে
নিজ সমীপে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥৫॥

উভূপকোটী-কদন-বদন-রুচি-পল্লবৈ-
মর্দনকোটী-গথন-নথর-কর-কন্দলৈঃ ।
দ্যুতরুকোটী সদন-সদয়-নয়নেক্ষণৈ-
মর্দনগোপাল ! নিজ-সদনমহুরক্ষ মাং ॥৬॥

হে মদনগোপাল ! আপনার মুখচন্দ্রের রুচি-বিস্তারে কোটিচন্দ্র বিনিমিত
ও নথরূপ কর-মবাক্ষুবে কোটিমদন মথিত হয় এবং কুপার্দনয়ন-মুগলের ঈক্ষণ
কোটিকল্পতরুর আলয়-স্বরূপ । আপনি নিজ সমীপে আমাকে নিরন্তর রক্ষা
করুন ॥৬॥

কুতনরাংকার ! ভবমুখ-বিবুধ-সেবিত !
দ্যুতি-সুধা-মার পুরু-করুণ ? কর্মপি ক্ষিতৌ ।
প্রকটয়ন প্রেমভরমধিকৃত-সনাতনং
মদনগোপাল ! নিজ-সদনমহুরক্ষ মাং ॥৭॥

হে নরদেবধারিণি ! হে মহাদেশ প্রভৃতি দেবগণ-সেবিত ! হে দ্যুতিসুধা-
মার ! হে ভক্তাভীষ্টপুরুষ ! বাহ্য চির-মিত্য এরূপ কোনও অনির্কচনীয় প্রেম-
সমূহকে পৃথিবীতে প্রকটন করত হে মদনগোপাল ! আপনি আমাকে নিজ
সমীপে রক্ষা করুন ॥৭॥

তরনিজা-তীর-ভূবি তরণি-কর-বারক-
প্রিয়ক-ষণ্ডস্থ-মণিসদন-মহিত-স্থিত !
ললিতয়া সার্কিমলুপদ-রমিত ! রাধয়া
মদনগোপাল ! নিজ-সদনমহুরক্ষ মাং ॥৮॥

হে প্রভো ! আপনি শ্রীযমুনা-তীরবর্তী দিবাকরের আতপ-নিবারক কদম্ব-
তরুর মূলস্থিত মণিময় ভবনের শোভা বর্ধন করিয়া অবস্থান করিতেছেন এবং
ললিতাসহ শ্রীরাধা কর্তৃক নিরন্তর সেবিত হইতেছেন । হে মদনগোপাল !
আপনি নিজ সমীপে আমাকে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥৮॥

মদনগোপাল ! তব সরসমিদমষ্টকং ৩
 পঠতি যঃ সায়মতিসরল-মতিরাশু তম্ ।
 স্ব-চরণান্তোজ-রতি-রসঃতরসি মজ্জয়ন্
 মদনগোপাল ! নিজ-মদনমমুরক্ষ মাম্ ॥৯॥

হে মদনগোপাল ! যিনি অকপট হৃদয়ে ভবদীয় এই মধুর অষ্টক সম্বাদ্যালে
 পাঠ করেন, তাঁহাকে অবিলম্বে স্বীয় চরণকমলের প্রেমরস-প্রবাহে নিমজ্জিত
 করত হে মদনগোপাল ! আপনি আমাকে নিজ সমীপে নিরন্তর রক্ষা
 করুন ॥৯॥

সজ্জন—অমানী (২০)

সজ্জন—সকলের সম্মানদাতা, স্মতরাং অমানী

বৈষ্ণব, সকলের সম্মান-দাতা হইলেও তিনি নিজে অমানী । জগতের
 জীবসমূহ অনেকেই প্রাতিষ্ঠাশা-পরায়ণ ও নানাপ্রকারে অভাব-বিশিষ্ট ।
 অপরের দান গ্রহণ না করিলে তাঁহাদের পিপাসা মিটে না । বৈষ্ণবের নিকট
 মান লাভ করিয়া স্বয়ং বৈষ্ণবগুণসম্পন্ন না হইলে বৈষ্ণবকে সম্মান প্রত্যর্পণ
 করা তাঁহাদের সৌভাগ্যে কুলায় না । বৈষ্ণব যেমন সকলের মান বিধান
 করেন, তদ্রূপ নিজের যাবতীয় মান পরিহার করেন ।

বৈষ্ণব মাত্ৰাবদ্ধ জীবের ত্যায় স্থূল-সূক্ষ্মাভিमानে

জড়িত নহেন

অনিত্য জগতে নানাবিধ অভিमानে জীবগণ জড়িত । বদ্ধজীবের অস্থিতা-
 ভিमानে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয় আত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয় ।
 স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অভিমান হইতে কক্ষোন্মুখ বৈষ্ণব স্বাধীন । তিনি সর্বদাই
 অমানী ; স্মতরাং আভিভাত্যে, পাণ্ডিত্যে বা সদৃশ্যে তাঁহাকে প্রাকৃত
 অভিमानে আবদ্ধ করিতে পারে না । স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় জগৎই মায়াব অধিকৃত
 রাজ্য । তথায় কেবল অভিমানরূপ অন্ধকার বিরাজমান ।

জড়ভিমান-রহিত সজ্জনের অপ্রাকৃত কৃষ্ণদাস্তাভিমান

কৃষ্ণরাজ্যে কৃষ্ণভাস্বর আলোক বিস্তার করায় প্রাকৃত রাজ্যের স্থূল ও সূক্ষ্ম
 অন্ধকারের দ্বিবিধ স্থিতি তথায় থাকিতে পারে না । যেখানে হরিভক্তি

সেখানে কৃষ্ণস্বর্গালোক, যেখানে বিমুক্ততা সেখানেই অভিমান বা জড়াকল্প। সজ্জনের কোন জড়'নিমান থাকিতে পাবেন না, তিনি সর্বদা কৃষ্ণদাসরূপ অপ্রাকৃত 'অভিমায়ে' পরিচিত; নম্বর গুড়াভিমায়ে তিনি উদাসীন, মুক্তবাং অমানী। 'যে কিছু প্রাকৃত মান প্রাকৃত বাজে তাঁহার লজা হয়, তাহা তিনি থকায় বন্ধিয়া স্বীকার করেন না। উচ্চ নম্বর অভিমানীর সম্পত্তি বন্ধিয়াই লভেম। জড়-মান সজ্জনের নিমিত্ত নিতান্ত অতিক্রিয়কর বস্তু।

সজ্জন—গম্ভীর (২১)

আত্মবিশং সজ্জন-দেহ-মনোপার্শ্বের অতীত

সজ্জন 'আত্মবিশং বালায়' দেহ ও মনের সম্বল অনিত্য বস্তু জাশ্রয় করেন না। 'আত্মবিশং' নিঃসর, জড়বাং সজ্জনের বৃত্ত নিত্য ও মনের বিজ্ঞাপ্তিহীন অচ্ছাদন করিত ও আত্মাকে চিত্তিত্ত করিতে অসমর্থ। আত্মার যে মিতা নিচেষ্টতা, তাহা পরিবর্তন করিতে দেহ ও মন সমর্থ নহে।

মায়াবাদীর মাতঙ্গিক শৈথিল্য ও গান্ধার্যের বাঘাতকারক

মনের সাহায্যে মায়াবাদী যে স্বপ্নে আত্মপার্শ্ব আরণ করেন, তাহাও তাঁহার মায়াবাদ শিক্ষার পূর্বে বর্তমান ছিল না। পূর্বে এক অবস্থা ও পরে অবস্থান্তর, একরূপ ভাবদ্রয় গান্ধার্যের বাঘাতকারক। মায়াবাদী যদি নিত্য স্থির আত্মপার্শ্বের গুণে 'আত্মা'র পরিবার অবসর পাইতেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার হস্তজাল ও মূহ ম'দ-হস্তের সাহায্যে আত্মার নিত্যধর্ম স্থানে চাকলা দেখাইতেন না। মায়াবাদীর 'ভাবগান্ধার্যের' পূর্বে তদ্বিন্যাসিত বস্তু চাকলাই তাঁহার অহুষ্ঠানসমূহের মধ্যে পরিচালিত হয়। বৈষ্ণব বা সজ্জন সর্বদা নিত্য অবস্থানে অবস্থিত ওঁহঁহঁ নিত্য চিন্ময় বিগ্রহ করিসেবায় নিযুক্ত; অতরাং মানসিক যুক্তি-বিচার গান্ধার্যের হস্তদেবা হইতে তাঁহাকে বিচলিত করেন না।

অনাত্ম দর্শন গান্ধার্যের প্রতিকূল, আত্মস্থ বৈষ্ণবই গম্ভীর

কর্মফলপ্রার্থিগণের অভাবজন্মিত ফলকামনা চঞ্চলতার পরিচায়ক। ফল প্রাপক অনিত্য ফল-পালসায় অনিত্য কর্মসমূহের আবাকন করিয়া অস্থায়ী ফললাভ করেন। সজ্জন নিত্য, তিনি অনিত্য ফললাভের উদ্দেশ্যে কোন কার্যই করেন না। নিঃপ্রা হরি-সেবা বাস্তবত তাঁহার আর কোন নিত্য কার্য নাই। বৈষ্ণব নিজ অন্তর্ভুক্তিতে কোন অনিত্য উপাদানের সংযোগ করেন না। আত্মবৃত্তিতেই গান্ধার্য আবদ্ধ। দেহ ও মন পরিণামশীল, অনিত্য ও

অনায়াসে। দেহ ও মনের সাহায্যে অসজ্জনগণ ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ চেষ্টায় বাস্তব হন। অনায়াসে চেষ্টা থাকিলেই উহা জাহান্নামের গান্ধীর্থ্যের প্রতিকূল।

আত্মাশুগ দেহ-মন সর্বদা ভগবৎসেবার নিযুক্ত

দেহ ও মন অনিত্য এবং বহির্জাশক্তি-প্রসূত, আত্মার অন্তরঙ্গশক্তি হইতে পৃথক ও প্রতিকূল শক্তিসম্পন্ন। যে-কালে আত্মা সজ্জন নামে পরিচিত, তৎকালে মন ও তদনু কুলদেহ উভয়ই আত্মার শক্তিশালী অবস্থিত। যে-কালে আত্মাবৃত্তির প্রতিকূলে মনের ও দেহের চেষ্টা লক্ষিত হয়, সেইকালে অনায়াসে প্রবল হইয়া নশ্বর বাহ্যদর্শনে বাস্তব থাকায় আত্মার নিত্যবৃত্তি সুস্থ-প্রায়। সজ্জন বা বৈষ্ণব সর্বদা আত্মস্থিত বলিয়া প্রাকৃত দেহ ও মন তাঁহার বক্ষের উপর উদার প্রচণ্ড নৃত্য করিতে অসমর্থ, সেইজন্য ঠাকুর শ্রীবিষ্ণুজল লিখিয়াছেন,— “ভক্তস্যপি স্থিততয়া ওগবন্ যনি স্যাৎ

দৈবেন নঃ ফলতি দিব্য কিশোরমুত্তিঃ।

মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাজ্জলি সেনতেহস্মান

ধর্মার্থকামগতয়ঃ সমমপ্রতীক্ষাঃ ॥”

অর্থাৎ হে ভগবন্, যদি তোমার পাদপদ্মে আমার অচলা সেবা-গ্রন্থি প্রবল থাকে, তাহা হইলে ভাগ্যক্রমে অপ্রাকৃত কিশোর মুক্তি আমাদিগের ভজনীয় তত্ত্বরূপে উদ্ভিত হইয়া সফলতা নিধান করিবে। তাহা হইলে স্বয়ং মুক্তি আমাদিগকে বদ্ধযুগ্ম-করে সেবা করিবে এবং ধর্ম, অর্থ, কাম আদ্যাদিগের আত্মাবৃত্তী হইয়া সর্বদা অবস্থান করিবে।

সজ্জনের গান্ধীর্থ্য নিত্য ও অপ্রতিহত

সজ্জন শ্রীহরিদাস ঠাকুরের গান্ধীর্থ্য রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত বারবানতী অপসারিত করিতে সমর্থ হয় নাই, সজ্জন শ্রীদামোদর-স্বরূপের গান্ধীর্থ্য মায়াবাদী বাজাল কবি এবং গোপাল আচার্য্য বিচলিত করিতে পারে নাই; তাহাদের গান্ধীর্থ্যের বহু বর্ণনা-চেষ্টা প্রতিহত হইয়াছিল মাত্র। শ্রীসার্কভোম ভট্টাচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট বহুদিবসব্যাপী মায়াবাদ ব্যাখ্যা করিয়াও তাঁহার গান্ধীর্থ্যে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক স্থাপন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। রাবণ-কর্তৃক মারাসীতা অপহৃত হইলেও রামদাসগণ সীতাপতি রামচন্দ্রের অপ্রাকৃত সেবা পরিহাররূপ চঞ্চলতা প্রদর্শন করেন নাই। এই সকল ঘটনা সজ্জনের গান্ধীর্থ্যের পরিচয়। — অগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রীতি

প্রীতি—এটো শব্দটি বড়ই মধুর। উচ্চারণিত হইবামাত্র উচ্চারণকারী ও শ্রোতাগণের হৃদয়ে একটি তীব্র মধুময় ভাব উদয় করায়। সকলে ইহার স্বার্থ অর্থ বুঝিতে পারে না। তবুও বচনটি শুনিতে ভালবাসে। বচনমাত্রট প্রীতির বশীভূত। প্রীতির জন্ত অনেক প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করে।

প্রীতিই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অনেকে মনে করেন, স্বার্থ-লাভই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন। তাহা নহে। প্রীতিও জন্ম গানবগণ সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়। স্বার্থ কেবল নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতা প্রবেষণ করে, কিন্তু প্রীতি প্রিয়-বস্তু বা ব্যক্তির সুখ-স্বচ্ছন্দতাই জন্ত সমস্ত স্বার্থকে বিসর্জন করিয়া থাকে। যেখানে স্বার্থ ও প্রীতির বিরোধ হয়, সেখানে সমস্ত প্রীতিই জয় হয়। বিশেষতঃ স্বার্থ প্রবল চরমেও সর্বদা প্রীতির অধীন। স্বার্থই বা কিছু বাড়া নিজের প্রিয়—তাহার স্বার্থ। সুতরাং মানব-জীবন প্রীতির অধীন বলিলেও নিরর্থক বাক্য হয় না। স্বার্থাদি জীবনের তাৎপর্য হইলেও প্রীতিই জীবনের মুখ্য তাৎপর্য হইয়া উঠে।

পঞ্চম খণ্ড-জন্মে প্রীতির প্রাধান্য দেখা যায়। ইচ্ছা-প্রীতির জগতের স্বপক্ষে অমিত্য মনে করিয়া পারমার্থিক সুখের অন্বেষণ করেন, তাহারাই হয় যৌ-ভোগবাহুর পরবশ বা মুক্তি-বাহুর উত্তেজিত। ইচ্ছারা ভোগবাহুর বশীভূত, তাহারাই ইচ্ছাকালে ধনধান্য, রাজ্য-সম্পদ পুত্র-কন্যার অন্বেষণে রাস্তা, অথবা স্বর্গে চিত্তস্থ-দেবত্ব ব্রহ্মলোকান্তিতে হুগ্নে আত্মজিজ্ঞাসা করিবার বাসনায় বিভ্রত থাকেন। সেই সেই জোগ তাহাদের প্রীতির বলিয়া তাহাতে ধাবিত হন। আবার যাহারা মুক্তি-বাহুর উত্তেজিত, তাহাদের সেট সেট ভোগ-বিষয়ে প্রীতি হয় না। সেট সেট ভোগ হইতে বিমুক্ত হইয়াই বাসনাট তাহাদের ভাল লাগে। সুতরাং মুক্তির তাহাদের প্রীতি বলিয়াই তাহারা মুক্তির অন্বেষণ করেন। ভোগবাহু প্রিয় ব্যক্তিগণ ভোগে প্রীতি-লাভের আশা করেন। সুতরাং উভয়েরই পক্ষে প্রীতিলাভ শেষ প্রয়োজন। প্রীতিই পারমার্থিক সমস্ত চেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য।

বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস প্রীতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

পিরীতি বলিয়া

এ তিন আখর,

এ তিন জুগ-নার।

এই মোর মনে

হয় রাস্তি দিনে,

তহা বই নাই আর ॥

বিনি এক চিত্তে ভাবিতে ভাবিতে,
 নিরমাণ কৈল "প"।
 রসের সাগর মন্থন করিতে
 তাহে উপাঞ্জল "রী"।
 পুলক যথিরা অমিয়া হইল,
 তাহে ভিঁয়াইল "তি"।
 সকল স্থখের এ দিন আখর,
 ভুলনা দিব সে কি ?
 বাহার মরমে পাশিল যতনে,
 এ দিন আখর সার।
 ধরম করম সবম প্ররম,
 কিবা জাতি কুস তার ?
 এতেন পিরোতি না জানি কি রাগি,
 পরিণামে কিবা হয়।
 পিরোতি-বন্ধন বড় বিনয়,
 দ্বিহত ডীপাসে কব।

পদার্থ দুই প্রকার,—চিং ও জড়। চিদ্রস্তুই মূল পদার্থ এবং জড় তাহার বিকৃতিবিশেষ। জড়কে চিদ্রস্তুর প্রতিফলন বা ছায়া বলিলেও হয়। মূল বস্তুতে বাহ্য থাকে, ছায়াতেও তাহার কিয়ৎ স্বরূপে বর্তমান হয়। স্তরসং মূলবস্তুর রূপ চিত্তে বাহ্য আছে, জড়েও তাহা অবশ্য থাকবে।

চিং পদার্থে কি ধর্ম আছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, প্রীতিই চিদ্রস্তুর একমাত্র ধর্ম। সেই ধর্ম প্রতিফলিত-রূপে জড় বস্তুতেও কিয়ৎ স্বরূপে অবশ্য বর্তমান আছে। জড় যে রূপ চিদ্রস্তুর বিকৃতি, 'আকর্ষণ ও গতি' তদ্রূপ প্রীতিধর্মের বিকৃতি। সেই বিকৃতিই 'জড়ের ধর্ম' বাণীয়া পরিচিত। জড়ীয় পরমাণুমালাই আকর্ষণ ও গতিরূপ প্রীতির বিকৃতি-ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এখন দেখা যাউক, প্রীতির স্বরূপ কি ?

আকর্ষণ ও গতি বিস্তৃতভাবে চিদ্রস্তুতে প্রীতিরূপে লক্ষ্য হইবে। আত্মাই চিদ্রস্তু। আত্মা শব্দে পরমাণু অর্থাৎ বিভূচৈতন্য এবং জীবাত্মা অণুচৈতন্য উভয়কেই বুঝিতে হইবে। বিভূচৈতন্য এবং অণুচৈতন্য উভয়েই প্রীতিধর্ম বিশিষ্ট। বিস্তৃত প্রীতিধর্ম আত্মা বা তাঁহা আর কিছুতেই নাই। আত্মার ছায়া যে মায়াপ্রসূত জড়, তাহাতে সেই বিস্তৃত ধর্মের বিকৃতি মাত্র আছে, ধর্ম স্বয়ং নাই। এই কারণেই জড় জগতে কোন ভৌতিক বস্তুতে প্রীতির বিস্তৃত স্বরূপ নাই। প্রীতির বিকৃত স্বরূপ আকর্ষণ ও গতিমাত্র তাহাতে আছে। সেই-

বিকৃত ধর্ম-মূল্যে পরমাত্মনকল পরম্পর আকৃষ্ট হইয়া স্থূল হয় । আবার স্থূল বস্তুসকল পরস্পর আকর্ষণ দ্বারা পরস্পরের নিকটবর্তী হইতে থাকে । স্বতন্ত্র গতিশীল দ্বারা পৃথক্ চইয়া সুখাদি মণ্ডলসকলের ভ্রমণ-ক্রিয়া সম্পাদিত হয় । শক্তিকল্পিত বস্তু ও বস্তু ধর্মের দ্বারা 'দেখিতেছি, তাহাই আমার বস্তুসকল মূল বস্তুতে লক্ষ্য করিতে পারা যায় ।

আত্মাত্মন স্বল্পে ও আকর্ষণশীলতা সর্বত্র লক্ষিত হয় । আত্মা স্বল্পে বস্তু জীবকালে বর্তমান : জীবাত্মা বা অণুচৈতন্য সংখ্যায় অনন্ত । তাহা প্রীতি-নয়। বিশেষ : সেই প্রীতি-ধর্মের পরিচয় নষ্ট যে, প্রত্যেক আত্মা পরস্পর আকর্ষণ করে, অগতঃ প্রত্যেক আত্মা স্বতন্ত্রভাবে স্বতন্ত্র পৃথক্ হইয়া থাকিতে চায় । জড় জগতে অর্থাৎ শক্তিকল্পিত জগতে একবস্তুর অল্প বস্তু টানিয়া লইতে চায় এবং প্রত্যেক বস্তু স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র গতিক্রমে পৃথক্ চইয়া যাইতে চায় । বৃহৎ জড়, ক্ষুদ্র জড়ের টানে : অথবা বৃহৎ বস্তু, অল্পবস্তু আকৃষ্ট এই ও উপগ্রহগণকে আকর্ষণ দিতে চান, কিন্তু সেই সেই উপগ্রহগণ স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র গতিক্রমে অর্থাৎ চাইতে পৃথক্ থাকিতে গিয়া গোলমালে ভ্রমণ করে । আবার গ্রহদিগের পরস্পর আকর্ষণ ও গতিও সেই কালের সহায় চইয়াছে । বস্তুসকল শক্তিকল্পিত জগতে দেখিতেছি, সেইরূপ চিঞ্জগতে দেখ । ছান্দোগ্য শ্রুতি (চা. ১. ১৩) বর্ণিত—

স জ্জ্বাদ্য যাবান্ বা অযমাপাশস্তা বানেন্দোষোহনুর্হৃদর আকংগে উদে অস্মিন্ ছাবাপুথিবা অন্তরে সমাহিতে উত্তাপশ্লিষ্ট বায়ুশ্চ অগ্নাচ্ছন্দসাবুভো দিত্বান্নকজ্ঞানং যজ্ঞাঃ স্তোত্রান্ধি বস্তু ন্যস্তি সমং তস্মিন্ সমাহিত্যতি ।

শক্তিকল্পিত জগতে পঞ্চভূত, চন্দ্র, সূর্য, চিত্রা, নক্ষত্র প্রভৃতি দেখিতেছি । সে-সমুদয়ই আকর্ষণকল চিঞ্জগতে অর্থাৎ স্বকপূরে কল্পদ্রুমে বিরাজমান । সে-দ এই যে, চিঞ্জগতে সমস্ত বিচিত্র বস্তুসকল সমাহিত অর্থাৎ ছেয় পাবকজিহ্বা, শিক্ত ও আনন্দময় । জড় জগতে এই সমস্ত বস্তুসকল পরিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ ও দুখ-দুঃখজনক ।

এখন দেখুন, চিঞ্জগতের মুখমণ্ডল প্রীতি । অতএব কবি চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন :—

“ব্রহ্মাণ্ড বাণিজ্য
আইয়ে যে জন,
কেহ না দেখয়ে তারে ।
প্রেমের পিরীতি
যে জন জানয়ে
সেই সে পাইতে পারে ॥

‘পরিণতি’ ‘পরিণতি’

হিন্দি আখর

পরি-ণ-তি ত্রিবিধ মত।

ভজিতে ভজিতে

গীত হইলে

হইবে একই মত ॥”

চিন্ময় বৃন্দাবন-বিহারীই চিজ্জগতের সুখ। জীবসমূহ তাঁহার লীলা-পরিকর। কৃষ্ণ জীবকে পেমাকর্ষণ ধর্মের টানিতেছেন। কীৰ্ত্তিচয় নিক্ত স্বতন্ত্র গতিক্রমে তাঁহা হঠাৎ পূর্ণগুণাবে থাকিতে চেষ্টা করিতেছেন। ফল হইবে, বলবান্ আকর্ষণ জীবগণকে টানিরা ক্রমেও নিকট লটকা যায় ফুট ফুট জীবগতি পরাহুত হইয়াও জীবগণকে মণ্ডলাকার কৃষ্ণরূপ সূর্যের চতুর্দিকে ফিরাইতেছে। ইহাই কৃষ্ণের নিত্যরাস। তনামো কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিগত সহচরীগণ বিশেষ নিষ্ঠুহ। সাধনাসক্ত সহচরীগণ কিয়দূরে অবস্থিত। কৃষ্ণের চিন্ময় লীলাই শ্রী-ত-বর্ষের বিস্তৃত পরিচয়।

কৃষ্ণ কি সকল জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন? যদি তাহা করেন, তবে কেন সকল জীবই কৃষ্ণোন্মুখ নয়?

কৃষ্ণ সত্যই সকল জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে একটু কথা আছে। জীব দুই প্রকার স্বর্গ ও বদ্ধ। মুক্তজীব স্বীয় প্রীতিক্রমে স্পষ্ট অমুগ্ধ ও ক্রিয়াপর করেন। সুতরাং ইচ্ছাকর্ষণ, মুক্ত জীবের উপর প্রভাবতঃ বলবান্।

বদ্ধজীব দুই ভাগে বিভক্ত। বাহ্যরা একেবারে কৃষ্ণ হইতে বহিমুখ, তাঁহাদের প্রীতি-ধর্ম অগ্রান্ত জড়গত হইয়া বিকৃত। সুতরাং বিষয়-প্রীতি ব্যতীত আর তাঁহারা কিছু জানেন না। ইন্দ্রিয়দিগের বিষয়ে আনন্দ হইয়া তাঁহারা একান্তভাবে ইন্দ্রিয়-তর্পণে রত আছেন। আপনাকে আপনি ভুলিয়া জড়বৃত্তের অবেষণ করিতেছেন। আবার জড়বৃত্ত-সম্বন্ধিকারী জড় বিজ্ঞানকে বহুমানন দ্বারা জড়পূজার রত থাকেন। আল্লা কিছু নয়, আল্লাচিন্তা কেবল ভ্রম, আল্লোদ্ভূতি-চেষ্টা কেবল মানসিক পীড়া, এইরূপ প্রমাণবাক্যে আপনাদিগকে নিরন্তর বঞ্চনা করিয়া থাকেন। কেহ বা স্বর্গ-স্থানদিব অল্প বহুবিধ কর্মকাণ্ড প্রচার করতঃ আল্লা-জগতের স্মরণ হইতে বঞ্চিত হন।

বদ্ধজীবের মধ্যে কেহ কেহ বিবেক ও বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া আল্লাবিষয়ে শ্রদ্ধা লাভ করেন। সেই শ্রদ্ধাবলে তাঁহারা চিজ্জগতের স্বর্গ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধাকর্ষণ কিয়ৎ পরিমাণে অমুগ্ধ করতঃ কৃষ্ণাকৃষ্ট হন। বহুবিধ সাংসারিক,

বৈজ্ঞানিক ও পারলৌকিক চেটার মধ্যে সম্মিলিত হইয়াও কৃষ্ণ-মঙ্গলুখ ভোগ করেন। তাঁহাদের যেকোন ভাব, তাহা চণ্ডীদাস দর্শন করিয়াছেন, যথা:—

কাহ্ন যে সীবন, জাতি লাগধন,
এ দুটা নয়নের তারা।
হিমার মাঝারে পরাণ পুতলি,
নিমিখে নিমিখ তারা ॥
তোরা কুলপতী ভজ নিজ পতি,
যার মনে যেরা লয়।
লাগিয়া দেখিও শ্যাম-বঁধু বিনে
আম কেত মোর নয় ॥
কি জার বুঝাও ধরম-করম
মন স্বতন্ত্র নয়া।
কুলপতী হৈঞা পিরীতি-জারতি
তার কার জানি হয় ॥
যে মোর করম কপালে আছিল।
কিধি গিলাওল কায়।
তোরা কুলপতী ভজ নিজ পতি,
থাকু ঘরে কুল পই ॥
গুরু হুগুন, বশে কুণচন,
সে মোর চন্দন-চুয়া।
শ্যাম অমুরাগে এ তরু বেচিহু
তিল-তুলসী দিয়া ॥
পরনী হুজ্জন বলে কুবচন,
না যাব সে লোক, পাড়া।
চণ্ডীদাসে কয় কাহ্নর পিরীতি
জাতি-কুল-শীল ছাড় ॥

জীব-রাজ্যতে জড়ভিমান আপনার স্বরূপ ভুলিয়াছেন। এই সংসারে অনেক প্রকার সম্বন্ধ পাতাইয়া অনেক লোকের সহিত নানাবিধ ব্যবহার করিতেছেন। লিঙ্গ শরীরকে ‘আমি’ করিয়া নিজের মন-বুদ্ধি-অঙ্কুর-গতিভ একটি নূতন শরীর কল্পনা করিয়াছেন। সেই লিঙ্গ শরীর সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান ও পদার্থ-বিজ্ঞানকে সম্মান করতঃ নিজ সম্পত্তি বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন। আবার ভূতময় স্থলদেহে অহংজ্ঞান-প্রযুক্ত ‘আমি অমুক ভট্টাচার্য্য বা অমুক সাহেব’ মনে করিয়া কতই রঙ্গ করিতেছেন। কখন নবোন, কখন জন্মগ্রহণ করেন। কখন সুখে ফুলিয়া উঠেন, কখন বা দুঃখে শুকাইয়া যান, ধন্য পদ্বি-

বর্তন। স্বস্তি মায়াবর খেলা! পুরুষ হইয়া একটি মহিলাকে বিবাহ করিতেছেন,
আবার স্ত্রীলোক হইয়া একটি পুরুষের হস্তধারণ করতঃ একটি প্রকাণ্ড সংসার
পট্টন কাবতেছেন। সংসারে স্ত্রীকর্মের লেনা, পাশাজনকে শালন, রাক্ষসকে
জয় এবং শত্রুকে ঘৃণা করিতেছেন। কুলধনু হইয়া কতই লজ্জা ও লাভানন্দের
ভয় করিতেছেন। এই ছায়াবাজীর সংসারে মিথ্যা সহজে ভড়াভুক্ত হইয়া
আপনার নিজ পরিচয় হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছেন। অবশিষ্ট আরোপিত
সংসারে অবশিষ্ট ভাবেও কি চুড়ি। কতকগুলি সংসারে আরোপিত
বিবিধে স্বীয় স্বামী জ্ঞান কারয়া নিত্যপতি কৃষ্ণকে সন্তোষের ভুলিয়া
গিয়াছেন।

এস্থলে কৃষ্ণের সহস্র একটি ভাব উদয় হয়। মহাতত্ত্ব হিত হোকে এই
ভাবটী এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন,—

পরমহংসিনী নানী বাগ্রাপি গুণকর্ষুযু।

তমেবাসাদয়ত্যন্তনবমঙ্গলস্যংমু। (চৈঃ চঃ মঃ ১.২১১)

পরপুরুষাত্মক বংশী গুণকর্ষুসকলে বাগ্র প্রাক্ষাণ্ড নূতন মঙ্গলসম্বাদনা
ধরিতে থাকে।

সংসার-বিধিবদ্ধ জীবের শ্রীকৃষ্ণে বিশুদ্ধ প্রীতি উদয় হইবার পক্ষেই এক
প্রকার পূর্বসংগ হয়। ক্রমে অভিযার ও মিলন ঘটিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের
বিষয় শ্রবণ, শ্রীকৃষ্ণ-কৃষ্ণ কীর্তিত চাঁদে শ্রবণ, সেট বিচিত্র সচ্চিদানন্দ মূর্তির
চিত্র দর্শন এবং তাঁহার আবহুই শান্ত শ্রবণ, বংশী-বাদ শ্রবণ হইতেই পূর্বসংগ
উদয় হয়। উদিত-পূর্বসংগ বাজির স্বভাবতঃ সচ্চিদানন্দ সংসারতায়
মিলন হয়। ক্রমে সচ্চিদানন্দ পুরুষের সতি প্রীতি বহুতুল হইয়া উঠে।

চিজ্জগৎরূপ ব্রহ্মধামে সচ্চিদানন্দ লীলা মিতা। জীব চৈত্বকণ, অভ্যেব
সেই লীলার অধিকারী। মায়াবদ্ধ হইয়া জীবের চৈত্বকণের পরিচয় বৈকুণ্ঠ
লিঙ্গ শরীরে স্থলদেহের আন্তরূপে উদয় হইয়াছে, সেইরূপ চৈত্বকণ যে বিশুদ্ধ
কৃষ্ণ-প্রীতি, তাহা জড়-বিজ্ঞান প্রীতি বা স্থল-বিষয়-প্রীতিরূপে ভ্রান্তভাবে উদয়
হইয়াছে। অতরাং মাংসগত প্রীতি বা মানস-ভাবগত প্রীতি—গুণ প্রীতির
বিকৃতিমাত্র; ইহারা প্রীতি নহা। স্বীয় স্বরূপ-স্র-ক্রমে ইহাদিগকে প্রীতি
বলিয়া উক্তি করা যায়। এক আত্মায় অস্ত্র আত্মাতে যে অস্ত্রোক্তি, তাহাই
গুণ প্রীতি শব্দের অর্থ; যথা বৃন্দারণ্যকে (৪৫:৬)—

ন বা অরে পত্নাঃ কাম্যাব পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্ত কাম্যাব পতিঃ
প্রিয়ো ভবতি। (ইতু্যশ্রুতম্) ন বা অরে সর্বস্ত কাম্যাব সর্ব প্রিয়ঃ ভবতি

আত্মনন্দ কামায় সর্বত্র প্রিয় ভবতি। আত্মা বা অরে দৃষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোঃ মন্তব্যোঃ
নিদিধ্যাসিতব্যোঃ মৈত্রেয়্যাগ্নিনি বহু অরে দৃষ্টে ক্ষেতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্বং
বিদিতমিতি ।

যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ী জড় জগতে ও লিঙ্গ জগতে বিরাগ লাভ করতঃ
স্বীয় পতির নিকট গমনপূর্বক সত্বপদেশ জিজ্ঞাসা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন—
হে মৈত্রেয়ী । স্থীলোকদিগের তত্ত্বতঃ পতি কামনায় পতি প্রিয় হয় না, কিন্তু
সকলের প্রিয় যে আত্মা, তাঁহার কামনায় পতি প্রিয় হন। সমস্ত বিষয়ই
আত্ম-কামনায় প্রিয় হয়। সুতরাং জড় জগতে ও লিঙ্গ শরীরে বিরাগ-প্রাপ্ত
জীব পরম বস্তু যে আত্মা, তাঁহাকে দর্শন, মনন ও তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞান-লাভ
করিবে ; তাহা হইলে সমস্ত পরিজ্ঞাত হইবে। পরম প্রামাণিক এই বেদ-
বাক্যের তাৎপর্য এই যে, স্থূল ও লিঙ্গময় এই জড়ে প্রেম নাই। যে-কিছু
প্রেমের আভাস দেখা যায়, তাহা কেবল আত্ম-সম্বন্ধে অনুভূত হয়। শুদ্ধজীব
চিন্ময়—অতএব আত্মা। আত্মারই আত্মপ্রতি যে প্রেম, তাহাই বিত্ত্বা প্রীতি।
সেই প্রীতিই একমাত্র অদ্বৈতীয় বস্তু। বিশ্বপ্রেম অথবা মানুষে ও মানুষে
প্রেম, কেবল আত্মপ্রেমের বিকারমাত্র। আত্মা ও আত্মাতে যে প্রেম,
তাহাই একমাত্র আদর্শ। শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাগ্নানমখিলাগ্ননাম্। (ভাঃ ১০।১৪।৫৫)

অখিল আত্মার আত্মা সেই চতুষ্টয়টি মহাগুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ। সকল জীবের
কৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম, তাহাই নিরুপাধিক ও চরম। প্রীতির স্বরূপ না বুঝিয়া
বাহ্যের মনোবিজ্ঞান ও প্রীতিবিজ্ঞান-ইতি লিখিয়াছেন, তাহার। যতই যুক্তি
যোগ করুন না কেন, কেবল ভ্রমে ঘৃত ঢালিয়া বুঝা শ্রম করিয়াছেন। দণ্ডে
মত্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়াছেন নাত। জগতের কোন উপকার
করা দূরে থাকুক, বহুতর অমঙ্গল সৃজন করিয়াছেন। তাইসকল। দাস্তিক
লোকদিগের বাগাড়ম্বর পরিত্যাগপূর্বক শুদ্ধ আত্মরতি ও আত্মকীড় হইয়া
নিরুপাধিক প্রীতি-তত্ত্ব অনুভব করতঃ জীব-স্বভাবকে উজ্জ্বল করুন।

—ও বিষ্ণুপাদ জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশীতার মর্ম্মবাণী

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৭০ পৃষ্ঠার পর)

অষ্টাদশ অধ্যায়

[মোক্ষযোগ]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—৬)

দ্বিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয়

কৃষ্ণ-জনার্দনে ।

সন্ন্যাসী কাহাকে বলে

ত্যাগী কোনজনে ॥১॥

কহিলেন জনার্দন

উভয় লক্ষণ ।

সন্ন্যাসী না চাহে কর্ম্ম

ভারিয়া বন্ধন ॥২॥

ত্যাগী করে শুদ্ধ কর্ম্ম

ফলে নাহি আশা ।

কর্ম্ম করে ধর্ম্ম ভাবি

ধর্ম্মই ভরসা ॥৩॥

যজ্ঞদান তপকর্ম্ম

করিবে যতনে ।

চিন্তা হয় সুনির্ম্মল

করণীয় কর্ম্মে ॥৪॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৭—১২)

মোহবশে ত্যজে যদি

কর্ম্ম আবশ্যিক ।

জানিবেক সেই কর্ম্ম

করে তামসিক ॥৫॥

নাহি করে নিত্য কর্ম্ম

ভাবিয়া অসার ।

সেই ত্যাগ রাজসিক

ভুল সংস্কার ॥৬॥

কর্ম্মফল করি ত্যাগ

করে নিজ কর্ম্ম ।

ইহাই সাত্বিক ত্যাগ

ত্যাগ অগ্রগণ্য ॥৭॥

ফলের আকাঙ্ক্ষা করি

যেবা করে কর্ম্ম ।

ইষ্টানিষ্ট তথা মিত্র

ভোগে সেইজন্ম ॥৮॥

সম্মুখী ত্যাগীজন

করয়েক কর্ম্ম ।

করেনা ফলের আশা

সমর্পিয়া ধন্য ॥৯॥

কর্ম্ম বিনা দেহধারী

বাঁচিবে কেমনে ।

কর্তব্য ভাবিয়া কর্ম্ম

করে ত্যাগী জনে ॥১০॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৩—১৭)

অধিষ্ঠান তথা কর্তা

বায়ু প্রাণাপ্রাণ ।

কারণ ও দৈবশক্তি

কর্ম্মেতে প্রধান ॥১১॥

কর্ম্মে রহে পঞ্চ হেতু

সর্ববিধ কর্ম্মে ।

আত্মা নহে তাহে যুক্ত

রহে হৃদমর্ম্মে ॥১২॥

যেই জন কর্মফলে

রহে অনাসক্ত ।

করিলেও হত্যা কার্য্য

তবুও সে ভক্ত ॥১৩॥

মুক্ত যোগী করে কর্ম

ঈশ্বরের নামে ।

করে কর্ম শুদ্ধ চিত্তে

যায় পুণ্যধামে ॥১৪॥

(শ্লোক-সংখ্যা ১৮—২২)

জ্ঞান জেয় পরিজ্ঞাতা

ইহারাই হেতু ।

সকল কর্ম্মতে রহে

এই তিন বস্তু ॥১৫॥

কর্ত্তা, কর্ম্ম ও কারণ

ইহার আশ্রয় ।

কর্ম্মের আশ্রয় ইহা

তাহে কর্ম্ম হয় ॥১৬॥

হইলে সাত্ত্বিক জ্ঞান

অব্যয় দর্শন ।

পৃথক্ না দেখে জ্ঞানী

দেখে একজন ॥১৭॥

ভেদজ্ঞান বলবান

রাজসিক জ্ঞানে ।

জনে জনে ভিন্নভাবে

প্রভু স্থাপনে ॥১৮॥

ভিত্তিহীন যুক্তি বাহা

তামসিক জ্ঞান ।

তামসিক নিজে ভাবে

অতি জ্ঞানবান ॥১৯॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৩—২৫)

সদ্বৃণ্ডী কর্ম্ম কভু

কর্ত্তা নাহি সাজে ।

রাগ, দ্বেষ নাহি মনে

সানন্দে বিরাজে ॥২০॥

রাজসিক করে কর্ম্ম

চাহে শীঘ্র ফল ।

অহঙ্কার রহে মনে

কর্ত্তা সে সকল ॥২১॥

না বুঝিয়া করে কর্ম্ম

তামসিক জন ।

নাহি ভাবে ক্ষয় ক্ষতি

ধন পরিজন ॥২২॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৬—২৭)

সদ্বৃণ্ডী করে কর্ম্ম

নাহে ফলাসক্ত ।

নিজেকে না ভাবে কর্ত্তা

কর্ম্মে রহে রত ॥২৩॥

উত্তম রহয়ে মনে

ধৈর্য্য সমন্বিত ।

হর্ষ-শোক সমতুল্য

সম ইষ্টানিষ্ট ॥২৪॥

রাজসিক কর্ত্তা করে

অন্যকে শোষণ ।

পরশ্রীকাতর হয়

ফলাসক্ত মন ॥২৫॥

বিষয়ে আসক্তিপূর্ণ

কভু বা হষিত ।

ক্ষতি যদি হয় কভু

হয়েক ব্যথিত ॥২৬॥

তামসিক কৰ্ত্তা হয়
উজ্জম বিহীন ।

অন্তকে করয়ে হেয়
নিজেও মলিন ॥২৭॥

তামসিক অবিনয়ী
বড়ই অলস ।

গুরুজনে নাহি মানেন
হয় প্রবঞ্চক ॥২৮॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৯—৩২)

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ বুদ্ধি
ত্রিবিধ প্রকার ।

জনে জনে ভিন্ন ভাব
প্রভাব ইহার ॥২৯॥

যে বুদ্ধি বলিয়া দেয়
হিত বা অহিত ।

তাহাই সাত্ত্বিক বুদ্ধি
জানিবে নিশ্চিত ॥৩০॥

ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম সত্যাসত্য
নাহি জানা যায় ।

রাজসিক বুদ্ধি তাহা
প্রমাদ ঘটায় ॥৩১॥

অধৰ্ম্মকে বলে ধৰ্ম্ম
বুদ্ধি বিপরীত ।

তামসিক বুদ্ধি, তাহা
করয়ে অহিত ॥৩২॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৩৩—৩৫)

আছেয়ে ত্রিবিধ ধৃতি
সত্ত্ব, রজঃ, তমে ।

সাত্ত্বিক ধৃতি পবিত্র
রহে শুদ্ধ মনে ॥৩৩॥

করে প্রভু-আলাপন
প্রভুর কথন ।

ইন্দ্রিয়াদি রহে বশে
বশীভূত মন ॥৩৪॥

রাজসিক ধৃতি হয়
বিষয়ে অসক্তি ।

ধৰ্ম্ম অর্থ কামে মত্ত
তাহারি প্রস্তুতি ॥৩৫॥

তামসিক ধৃতি হয়
ভরা অবিবেক ।

নিজাতে আচ্ছন্ন থাকে
শোক ও ভয়েতে ॥৩৬॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৩৬—৪০)
প্রথমেই বিষয়

পরে মধুময় ।
ইহাই সাত্ত্বিক সুখ
শেষে ভাল হয় ॥৩৭॥

রাজসিক সুখ হয়
প্রথমে অমৃত ।

পরিশেষে হয় তাহা
বিষে অধিকৃত ॥৩৮॥

তামসিক সুখ হয়
আলস্যে লস্কৃত ।

তদ্রূপে ঘোর রহে সদা
মোহ বিজড়িত ॥৩৯॥

সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ
সর্ববস্ত্রে প্রখ্যাত ।

দেবতা মানবে জানে
সকলেই জ্ঞাত ॥৪০॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৪১—৪৪)

শম, দম, শৌচ, ক্ষমা

তপস্যা আস্তিক্য।

ব্রাহ্মণ বর্ণের গুণ

জ্ঞানেতে গরিষ্ঠ ॥৪১॥

ক্ষত্রিয় নহেক ভীত

রহে তাতে ধৃতি।

শৌর্য্য, বীর্য্য, রহে তাহে

দক্ষতা প্রভৃতি ॥৪২॥

কৃষিকর্ম করে বৈশ্য

করে গোপালন।

বাণিজ্য তাহার কর্ম

জীবন ধারণ ॥৪৩॥

শূত্রের নিদিষ্ট কর্ম

ত্রিবর্ণের সেবা।

নগণ্য নহেক ইহা

সেবা পরিচর্যা ॥৪৪॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৪৫—৪৯)

কর্ম কর সম্পাদন

ঈশ্বরের নামে।

হইবে তাঁহারই পূজা

কর্মের মাধ্যমে ॥৪৫॥

রাখহ ইন্দ্রিয় বশে

ভোগেতে স্তিমিত।

মিলিবে তাহাতে সিদ্ধি

জানিবে নিশ্চিত ॥৪৬॥

দোষ রহে কিছু কিছু

সকল কর্মেতে।

কর্ম কর শুদ্ধচিত্তে

সরল মনেতে ॥৪৭॥

কর্ম হউক যথা-তথা

করিবে যতনে।

কর্ম কর ধর্ম ভাবি

হরষিত মনে ॥৪৮॥

যদিও বা অঙ্গহীন

স্বধর্ম প্রধান।

পাপ নাহি হয় তাহে

রহে নিজ মান ॥৪৯॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৫০—৫৩)

নাহি রহে অহঙ্কার

যোগীর মনেতে।

স্থিরচিত্তে রহে যোগী

নিবিষ্ট ধ্যানেতে ॥৫০॥

অল্পভোজী হয় যোগী

সংযত বাক্।

যোগী চাহে নির্জ্ঞানতা

একান্তে নিবাস ॥৫১॥

পরিত্যাজে পরিগ্রহ

হয়েক নিরোভ।

কাম-ক্রোধে রহে মুক্ত

নাহি মনে ক্ষোভ ॥৫২॥

বিষয়ে আসক্ত নহে

মমতা বর্জিত।

সেই যোগী লভে ব্রহ্ম

যোগীজনোচিত ॥৫৩॥

আগে হয় সিদ্ধিলাভ

পরে লভা ব্রহ্ম।

এই গতি প্রাপ্ত হ'য়ে

যোগী হয় ধন্য ॥৫৪॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৫৪—৫৮)

সাধকের শুদ্ধচিত্ত

সদাই প্রসন্ন ।

সর্বভূতে সম-মতি

সম ভাবাপন্ন ॥৫৫॥

জানিয়া প্রভুর স্থিতি

তাহারি প্রকাশ ।

সানন্দে বিরাজ করে

প্রভূতে বিশ্বাস ॥৫৬॥

লালায়িত নাহি হয়

অধিক আশায় ।

হা হতাশ নাহি করে

বিয়োগ ব্যথায় ॥৫৭॥

করিলে নিষ্কাম কর্ম

প্রভুর ধ্যানে ॥

পাইবে প্রভুকে তুমি

প্রভু ঘনশ্যামে ॥৫৮॥

যে-চিত্ত নিবিষ্ট রহে

পরমাত্মা সাথে ।

হয়েক সঙ্কট-মুক্ত

তাহারি কৃপাতে ॥৫৯॥

কহিলেন ভগবান্

পার্থ ধনঞ্জয়ে ।

মানিবে প্রভুর বাক্য

অকুণ্ঠ হৃদয়ে ॥৬০॥

না করিও অবহেলা

রহি অহঙ্কারে ।

নিশ্চিত পতন তাহে

কে রোধিতে পারে ॥৬১॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৬১—৬২)

ধর্মযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের

করণীয় কর্ম ।

পার্থও করিবে তাহা

ভাবি নিজ ধর্ম ॥৬২॥

সকল হৃদয়ে প্রভু

আছেন বসিয়া ।

দৈবী মায়া রহে সাথে

বেষ্টন করিয়া ॥৬৩॥

মুক্ত রহে জীবকুল

ঈশ্বরী মায়াতে ।

মায়ার পুতলী চলে

যন্ত্রীর কথাতে ॥৬৪॥

অতএব যুক্তিযুক্ত

ঈশ্বর মনন ।

তবেই মিলিবে বস্তু

মনের মতন ॥৬৫॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৬৩—৬৬)

ছাড়িয়া সকল ধর্ম

বল ভগবান্ ।

বারে বারে কর নাম

হইবে কল্যাণ ॥৬৬॥

রহিবে না পাপ-তাপ

দহিবে না শোক ।

পাইবে মুক্তির স্বাদ

নবীন আলোক ॥৬৭॥

অঙ্গীকারে আবদ্ধিয়া

কহিলেন কৃষ্ণ ।

যজ্ঞরূপে কর কৰ্ম্ম

হইবারে ধন্য ॥২৮॥

ভক্ত কৃষ্ণ প্রভুবরে

কর নমস্কার ।

করিবেন কৃপা তিনি

ঘুচিবে আঁধার ॥৬৯॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৬৭—৭৩)

যেথা হয় গীতা পাঠ

কৃষ্ণ আরাধনা ।

তাহে তুষ্ট হৃদীকেশ

শুনি গুণপনা ॥৭০॥

গীতা শাস্ত্র বাখ্যাকারী

শ্রেষ্ঠ গুণীজন ।

শ্রবণ করেন যিনি

সাত্ত্বিক সজ্জন ॥৭১॥

গীতা পাঠ জ্ঞান-যজ্ঞে

ঈশ্বর অর্চনা ।

পাঠ ও শ্রবণে হয়

তাহারি বন্দনা ॥৭২॥

ভক্তি শ্রদ্ধাহীন যেবা

নিন্দে ভগবান্ ।

তাহাকে না শুনাইবে

শ্রীগীতার গান ॥৭৩॥

শুনিয়া এ উপাখ্যান

পার্থ ধনঞ্জয় ।

হইলেন মোহমুক্ত

স্মৃতি সমন্বয় ॥৭৪॥

স্থির করিলেন পার্থ

নিজের কর্তব্য ।

ক্ষত্রিয় সন্তান তিনি

করিবেন যুদ্ধ ॥৭৫॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৭৪—৭৮)

সজ্জয়েতে বিদ্যমান

মহতী স্মৃতি ।

শুনিলেন কৃষ্ণমুখে

তাহার বিবৃতি ॥৭৬॥

বারে বারে স্মরণীয়া

সে মহান বাণী ।

অতিমাত্রা হ্রষিত

সজ্জয় পরানি ॥৭৭॥

কৃষ্ণ আর অর্জুনের

অপূর্ব কথন ।

রোমাঞ্চিত করে দেহ

আনন্দ সঘন ॥৭৮॥

যেথা প্রভু যোগেশ্বর

সাথে ধনঞ্জয় ।

ধর্ম্ম-নীতি অভ্যাস

সুনিশ্চিত জয় ॥৭৯॥

শ্রীগীতা-মাহাত্ম্য

(উপরের লাইনে শ্লোক

নীচের লাইনে মর্থার্থ)

গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী

তিরোহিত কালরাত্রি ।

সীতা সত্য পতিব্রতা

সত্যো পূর্ণ পুণ্যকথা ॥

ব্রহ্মাবলি-ব্রহ্মবিদ্যা

গীতা-মাতা স্বয়ং সিদ্ধা ।

ত্রিমধ্য্য মুক্তিগেহিনী

ত্রিতাপ-জ্বালা-হারিণী ॥

অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা

মাতৃরূপা মধুছন্দা ।

ভবঘ্নী ভ্রাস্তিনাশিনী

আপদে বিপত্তারিণী ॥

বেদত্রয়ী পরানন্দা

মধুপর্ক পুণ্যগন্ধা ।

তৎস্বার্থ জ্ঞান-মঞ্জরী

জ্ঞানে পূর্ণ ধ্যানেশ্বরী ॥

—সমাপ্ত—

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল,

কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্ত-বিভাগের পদস্থ অফিসার,
মিউ দিল্লী ।

উদ্ধারের পথ

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪০৪ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীৰ্তনের মধ্যেই নববিধাভক্তি বিद्यমান । তাই কৃষ্ণনাম সঙ্কীৰ্তনই প্রধান অভিধেয় । শ্রীমদ্রহস্যপ্রভু আমাদিগকে ‘শিক্ষাক্ষেত্রে’ মাধ্যমে নাম-ভজনের শিক্ষাই দিয়াছেন, কিন্তু অর্চনের শিক্ষা দেন নাই । ‘অর্চন’ যদিও নববিধা ভক্তির অন্তর্গত, তথাপি ‘অর্চন’ অপেক্ষা ভজনের বৈশিষ্ট্য আছে । শ্রীগৌর-পার্বদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের উপদেশায়ুতে জানিতে পাই ;—

“নববিধা ভক্তির মূলে ‘ভজন’ সম্ভাবিত হ’লেও ‘অর্চন’ তদন্তর্গত হওয়ায় উহাও ভজনাদি বলে গৃহীত হয় । ‘সমগ্র ভজন’ ও ‘ভজনাদি’ এক তাৎপর্য্যাপন্ন নহে । সন্তম-জ্ঞান সহ অর্চনার উপাসনার অর্চন সংশ্লিষ্ট । উপাচার সহ প্রপঞ্চাগত বিচারে মর্যাদামূলে ভগবৎ-সেবা ‘অর্চন’ নামে অভিহিত । বিশ্রুত সেবায় গৌরব-জ্ঞানের প্রথর রশ্মি ক্ষীণপ্রভ প্রতীত হ’লেও

স্নিগ্ধ কমণীয় চঞ্জিকালোকেব মাধুর্যোৎকর্ষ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। ‘অর্চনে’ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরগত সমস্ত নূনাধিক বিজড়িত, ভজন-রাজ্যে স্থূল ও সূক্ষ্মাতীত শরীরী ভগবানে সাফাভাব-সেবারত।

* * * * *

সকল সময়ে সর্বতোভাবে ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহ কৃষ্ণভজন বৈষ্ণবেরই সম্ভব। ইতরাশ্রিতায় সার্বকালিক ভজন সম্ভবপর হয় না। লব্ধস্বরূপ ভজনপর বৈষ্ণবগণই অষ্টকাল বা নিরন্তর কৃষ্ণসেবনপর।”

কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম একই বস্তু। জগতের কোন বস্তু ও তাঁর নামের মধ্যে যেমন ভেদ আছে, কৃষ্ণ ও তাঁর নামের মধ্যে সেরূপ কোন ভেদ নাই।

“যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি”।

নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীচরি।”

বাচ্যরূপ কৃষ্ণ ও বাচকরূপ কৃষ্ণনাম—উভয়ই একই তত্ত্ব, কিন্তু বৈশিষ্ট্য এই যে, নাম প্রভুই অধিক করুণাময় ও উদার। ‘কৃষ্ণ’ শব্দটি অপ্রাকৃত শব্দ (transcendental sound)। ঐ শব্দ প্রাকৃত জগতের নহে, গোলোক-ধাম থেকে ঐ ‘কৃষ্ণ’ শব্দ কৃপাপূর্বক এখানে অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে,—

“অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিन्द्रিয়ৈঃ।

সেবানুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব ক্ষুরতাদঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব বিঃ ২।১০৯)

অর্থাৎ,—“যতএব শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু হ’তে পারেন না। সেবানুখে অবস্থায় তদীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি ভক্তের অপ্রাকৃত জিহ্বা, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে আপনা হতেই প্রকাশ পেয়ে থাকে।”

প্রাকৃত শব্দ ও প্রাকৃত বস্তুতে মায়াব বাবধান আছে, কুষ্ঠা (limitation) আছে,—কিন্তু কৃষ্ণ-নামে তাহা নাই। যখন তৃণাপেক্ষা সূন্য ও তরু অপেক্ষা সন্তনশীল হ’য়ে কৃষ্ণকে ডাকা হয় বা ‘কৃষ্ণ’ শব্দ উচ্চারিত হয় এবং কৃষ্ণের স্মৃতি বা সেবাই একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে, তখনই কৃষ্ণ সাড়া দেন;—কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণের অভিন্নতা উপলব্ধি হয় এবং প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত নয়নে কৃষ্ণ দর্শন হয়। প্রাকৃত জগতে বহুদূর থেকে টেলিভিশনে চিত্র দর্শন যেমন সম্ভব হয়, তেমনি ওক্ত তাঁর হৃদয়-মন্দিরে ভগবৎকৃপায় ভগবানকে দর্শন করিতে সমর্থ হন।

নামের স্বরূপ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেছেন ;—

“নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্য-রসবিগ্রহঃ ।

পূর্ণঃ শুক্লো নিত্যমুক্তোহভিন্নহান্নামনামিনোঃ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ-পূর্ববিভাগ, ২য় লঙ্করী ১০৮)

অর্থাৎ,—“কৃষ্ণনাম চিন্তামণি-স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্য-রসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত । কেননা, নাম-নামীতে ভেদ নাই ।”

রাগমাগিয ভাষ-ভক্তির অহুণীলনে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্তিত । সত্যযুগে তপঃ, শৌচ, দয়া ও সত্য—এই চারিপাদ ধর্ম ছিল । তখন যুগধর্ম ছিল ‘দান’ । অতঃপর ত্রেতাযুগে তপঃ অবলুপ্ত হ’লে শৌচ, দয়া ও সত্য—এই ত্রিপাদ ধর্ম রইল ; তখন ‘যজ্ঞ’ যুগধর্মরূপে নির্ণিত হ’ল । দ্বাপরে ‘শৌচ’ অবলুপ্ত । অবশিষ্ট রইল দয়া ও সত্য—এই দ্বিপাদ ধর্ম । তখনকার যুগধর্ম ‘অর্চন’ হ’ল । এইবার কলিযুগে ‘দয়া’ লুপ্ত হ’ল ; ফলে একপাদ ধর্ম ‘সত্য’ রইল । এ যুগের ধর্ম ‘কৃষ্ণনাম’ । কলি-যুগধর্ম শ্রীহরি-নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন প্রসঙ্গে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী, যথা ;—

“কলিযুগ-ধর্ম—হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন ।

চারিযুগে চারি ধর্ম জীবের কারণ ।

অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার ।

আর কোন ধর্ম কৈলে নাহি হয় পার ॥

রাত্রিদিন নাম লয় থাইতে-ভুইতে ।

তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥”—(চৈঃ চঃ)

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তগণকে অত্যা আবার বলেছেন,—

“আপন সবারে প্রভু করে উপদেশে ।

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিশে ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

প্রভু কহে,—কহিলাম এই মহামন্ত্র ।

ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ ॥

ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার ।

সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥

কি ভোক্তনে, কি শয়নে, কিবা আগরণে ।

অহনিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে ॥”—(চৈঃ ভাঃ)

যজুর্বেদ বলেছেন ;—

“দ্বাপরাস্তে নারদো ব্রহ্মাণং জগাম, কথং ভগবন্ 'গাং পর্যাটন্ কলিং
সন্তরেয়মিতি । স হোবাচ ব্রহ্মা নাধু পৃষ্ঠোহস্মি সর্বশ্রুতিরহস্যং গোপ্যং
তচ্ছৃণু যেন কলিনংসারং তরিশ্যসি । ভগবত আদিপুরুষস্ত নারায়ণস্ত
নামোচ্চারণ-সাত্রেণ নিধৃতকপির্ভবতি । নারদঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ—তন্মাম কিমিতি ?
স তৌব চ হিরণ্যগর্ভঃ—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম
হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্পঘনানশনম্ ।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥ পুনর্নারদঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্ কোহসৌ
বিধিরিতি । তং হোবাচ নাস্তি বিধিরিতি ।”

অর্থাৎ,—“দ্বাপরাস্তে নারদ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—হে ব্রহ্মা ! কলি-
কালে সংসার হ'তে উদ্ধার লাভের উপায় কি ? তদুত্তরে ব্রহ্মা বললেন—
ভগবান্ শ্রীহরির নাম কীর্তনের দ্বারাই জীব অনায়াসে সংসার হ'তে মুক্তি
লাভ করিতে পারবে । নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন,—কলিকালে কি 'নাম'
করিতে হবে ? তদুত্তরে ব্রহ্মা বললেন,—কলিকালে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরা-
ত্মক 'মহামন্ত্র' তথা 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে
রাম রাম রাম হরে হরে ॥'—ইহা কীর্তন করিতে হবে । এই নাম কীর্তনের
দ্বারাই জীব 'বাবতীয় পাপ ও অপরাধ হ'তে মুক্তি লাভ করে ভগবানকে
অনায়াসে লাভ করিতে পারবে । ইহা ব্যতীত মঙ্গল লাভের অন্য কোনও
উপায় নাই । নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন,—এই নাম-কীর্তনের বিধি কি ?
তদুত্তরে ব্রহ্মা বললেন,—হরিনাম কীর্তনের কোন বিধি বা নিয়ম নাই । এই
হরিনাম কীর্তন গুটি, অগুটি, সর্কাবস্থায়, সর্বকালে ও সর্বদা করা যাবে ।

শ্রীমদ্ভাগতে উক্ত হয়েছে,—

“কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্য। গুণজ্ঞা সারভাগিনঃ ।

যত্র সঙ্কীৰ্ত্তনেনৈব সর্বঃ স্বার্থোহভিলভ্যতে ॥” (ভাঃ ১১।৫।৩৬)

অর্থাৎ,—“সারগ্রাহী জনগণ কলিযুগের প্রশংসা করে থাকেন । কারণ
কলিযুগে কেবল নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের দ্বারাই সমুদয় স্বার্থ অর্থাৎ ধর্ম-অর্থ-কাম-
মোক্ষ ও প্রেম সবই লাভ হয় ।”

বেদান্তে কথিত হয়েছে,—

“আবৃত্তিরসকল্পদেখাৎ ।” “অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তি শব্দাৎ ।”

অর্থাৎ, “পুনঃ পুনঃ হরিনাম কর ।”

উপনিষদে বর্ণিত ‘হরে কৃষ্ণ’ মহামন্ত্র, যথা—

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।

ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্যাণনাশনম্ ।

নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যতে ।”

—(কলি সন্তরণোপনিষৎ)

অর্থাৎ—“হরে কৃষ্ণ’ ইত্যাদি ষোড়শ নাম কলিকল্যাণনাশকারী, ইহা হ’তে শ্রেষ্ঠ উপায় সর্ববেদের মধ্যেও দৃষ্ট হয় না ।”

পুরাণে ‘হরে কৃষ্ণ’-মহামন্ত্রের মহিমা, যথা ;—

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ।”—(শ্রুগ্নিপু্রাণ)

অর্থাৎ—“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।”—এই মহামন্ত্র যারা অবহেলাপূর্বক উচ্চারণ করেন, তাঁরা কৃতার্থ হন । ইহাতে কোন সংশয় নাই ।”

সকলের পক্ষেই সর্বক্ষণ শ্রীমাম কীর্তন কর্তব্য । এই কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তনই সকল সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধন । এই নামের মাহাত্ম্য সর্বাধিক । এই প্রসঙ্গে কয়েকটি শাস্ত্র-বচন ও মহাজন-বাণী উদ্ধৃত করছি ;—

শ্রীপরাক্রিয় মহারাজের প্রতি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুর উক্তি ;—

“এতদ্বিকীর্ণমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্ ।

যোগিনাং নৃণাং নির্ণীতং হরেন্নামানু কীর্তনম্ ।” (ভাঃ ২।১।১১)

অর্থাৎ,—“হে রাজন ! বাহারা সংসারে নির্বেদপ্রাপ্ত একান্ত ভক্ত, বাহারা স্বর্গ-মোক্ষাদি কামনা করেন এবং বাহারা জাহ্নারাম যোগীপুরুষ, সকলের পক্ষেই হরিনামগুণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ—এই তিনটি পরমসাধন ও সাধা বলে পূর্ব আচার্য্যগণ কর্তৃক নির্ণীত হয়েছেন ।”

‘গর্গসংহিতা’-বাক্যে পাঠ,—

“রাধাকৃষ্ণেতি হে রাজন্ য়ে জপন্তি পুনঃ পুনঃ ।

চতুর্পদার্থাঃ কিং তোয়ং সাক্ষাৎ কৃষ্ণোহপি লভ্যতে ॥

অর্থাৎ,—“প্রভাহ রাধাকৃষ্ণ-নাম জপ করলে মহাপুণ্য হয়, অর্থলাভ হয়, নানাপ্রকার বিষয়স্বপ্নও লাভ হয় ; যাবতীয় কামনা পূর্ণ হয়, সংসার হ’তে মুক্তি হয়, ভক্তি হয়, প্রেমলাভ হয় এবং ভগবৎ প্রাপ্তিও হয়ে থাকে ।”

‘বৃহত্তাগবতামৃতে’ আছে,—

“কৃষ্ণস্ত্র নামাবিধ-কীর্তনেব্ .

তন্মাম-সঙ্কীৰ্ত্তনমেব মুখ্যম্ ।

তৎ প্রেম সম্পজ্ঞানে স্বয়ং দ্রাক্

শক্ন্ত ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ ॥”

অর্থাৎ,—“কৃষ্ণের নামকীর্তন, কৃপ-কীর্তন, গুণ-কীর্তন, লীলা-কীর্তন প্রভৃতির মধ্যে কৃষ্ণনাম সঙ্কীৰ্ত্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ বা মুখ্য । কারণ ইহার দ্বারা শীঘ্রই কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় ।”

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-১১, বিঃ-২৩৪ সংখ্যাপ্রত স্কন্দপুরাণ-বাকা ;—

“মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং

সকলনিগমগরী-সংফলং চিৎস্বরূপম্ ॥

সকদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা

ভুক্তবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥”

অর্থাৎ,—“এই শ্রীহরিনাম সর্ববিধ মঙ্গলেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলস্বরূপ, মধুর হ’তে স্তমধুর, নিখিল ক্রটিগতিকার চিন্ময় নিত্যফল । হে ভার্গব শ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় হউক, কিংবা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকটরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্তন করেন, তাহা হ’লে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করে থাকেন ।”

শ্রীধর স্বামীপাদ বলেছেন,—

“জ্ঞানমস্তি তুলিতঞ্চ তুলায়াং

প্রেম নৈব তুলিতং তু তুলায়াং ।

সিদ্ধিরেব তুলিতাত্র তুলায়াং

কৃষ্ণনাম তুলিতং ন-তুলায়াং ॥”

অর্থাৎ,—“জ্ঞান এবং সিদ্ধি তুলাদণ্ডে ধরে মাণা যায়, কিন্তু কৃষ্ণনাম ও প্রেমকে তুলাদণ্ডের দ্বারা মাণা যেতে পারে না ।”

শ্রীমন্নহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে বলেছেন,—

“নান্নানকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তি-

স্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্রবণে ন কালঃ ।

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মামপি

হৃদৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ (শিক্ষাষ্টক ২য় শ্লোক)

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।

অমানিনা মানদেন কীৰ্ত্তনোয়া সদা হরিঃ ॥”

(শিক্ষাক্টক, ৩য় শ্লোক)

অর্থাৎ,—“হে ভগবন্ ! তোমার নামই জীবের সর্বমঙ্গল বিধান করেন, এইজন্ত তোমার ‘কৃষ্ণ’ ‘গোবিন্দাদি’ বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করেছ । সেই নামে তুমি দ্বীপ সর্বশক্তি অর্পণ করেছ এবং সেই নাম স্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নাই । প্রভো, জীবের পক্ষে এক্রূপ কৃপা ক’রে তুমি তোমার নামকে স্মরণ করেছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দৈব এক্রূপ করেছে যে, তোমার স্মরণ নামেও আমার অনুরাগ ক্রমিতে দেয় না ।

যিনি আপনাকে তৃণাপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, তরুর শাখ সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য হন, ও অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সদা হরিকীৰ্ত্তনের অধিকারী ।”

শ্রীগৌর-পার্বদ পণ্ডিত শ্রীল জগদানন্দ এভু “প্রেমবিবর্ত্ত” গ্রন্থে লিখেছেন,—

শুন হে ভক্তবৃন্দ ! কলিকালের ধর্ম ।

শ্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তন বিনা তার নাহি কন্ম ॥

কন্ম-জ্ঞান-যোগ-ধ্যান ছুঁকিল শাধন ।

অপ্রাকৃত সম্পত্তি লাভের নহে ক্রম ॥

ধর্ম-ব্রত, ত্যাগ, হোম সকলই প্রাকৃত ।

অপ্রাকৃত তত্ত্বলাভে নাহি করে হিত ॥

কৃষ্ণনাম উচ্চারণে, স্মরণে, শ্রবণে ।

অপ্রাকৃত সিদ্ধি হয়, বলে শ্রুতিগণে ॥

শ্রীনাম-রহস্য সর্বশাস্ত্রেতে দেখিবা ।

নাম উচ্চারণ মাত্র চিৎসুখ লভিবা ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন,—

“বর্ণাশ্রমধর্ম আর সাংখ্য-যোগ জ্ঞান ।

কলিজীবে উদ্ধারিতে নহে বলবান্ ॥

গোবিন্দ গোপাল-রাম শ্রীনন্দনন্দন ।

রাধানাথ হরি যশোমতী প্রাণধন ॥

মদনমোহন শ্যামসুন্দর মাধব ।

ব্রজনাথ ব্রজগোপ রাখাল যাদব ॥

এইরূপ নিত্যশীলা প্রকাশক নাম ।
 এসব কীৰ্ত্তনে জীব পায় কৃষ্ণধাম ।
 “নামাশ্রিত জনে নাম সদা রক্ষণ করে ।
 অপরাধ কভু তার না হইতে পারে ।”
 নামে দূঢ় হৈলে নাহি হয় পাপে মতি ।
 পূর্ব পাপ দক্ষ হয়, তিত্ত শুদ্ধ অতি ॥”

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেছেন,—

“বেদশাস্ত্র শ্রুতি বা কীৰ্ত্তন-মুখে এসেছে । এখন কলিকাল—বিবাদ-যুগ ;
 যে-কোন কথা বলি না কেন, সঙ্গে সঙ্গে তর্ক প্রতিবাদ হ'য়ে থাকে । হরি-
 কীৰ্ত্তনই একমাত্র শ্রোত-পথ ।”

সাধুসঙ্গ দ্বারাই শুদ্ধনামের উদয় হয় । শাস্ত্রে সাধুসঙ্গেই নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের
 বিধ কথিত হয়েছে,—

“মমাহমিতি দেহাদৌ হিত্বা মিথ্যার্থবীৰ্মতিম্ ।
 ধ্যাস্তে মনো ভগবতি শুদ্ধং তৎকীৰ্ত্তনাদিভিঃ ।
 ইতি জাতস্থানির্বেদং ক্ষণঙ্গেন সাধুযু ।
 গঙ্গাদ্বারমুণেয়ায় মুক্ত সৰ্ব্বানুবন্ধনঃ ॥”—(ভাঃ ৬।২।৩৮-৩৯)

অর্থাৎ—“অজামিল বললেন,—‘আমার বুদ্ধি এখন সত্যস্বরূপ পরমার্থ
 বস্তুতে উদিত হয়েছে, এখন আমি দেহাদিতে ‘আমি ও আমার’ এইরূপ মতি
 পরিত্যাগ করে ভগ্নামকীৰ্ত্তনাদি দ্বারা শুদ্ধ (সেবোন্মুখ) মন শ্রীভগবানে
 নিয়োগ করব।’ তে রাজন! অজামিলের ক্ষণকালমাত্র সাধুসঙ্গ হয়েছিল,
 তাহাতেই তাঁহার ঐ প্রকার স্তম্ভের নির্বেদ জন্মিল । তিনি পুত্রাদি স্নেহরূপ
 সমস্ত বন্ধন মুক্ত করে হরিভক্তিনার্থ গঙ্গাদ্বারে গমন করুলেন ।”

পণ্ডিত শ্রীল জগদানন্দ প্রভু ‘প্রেমকিবর্ত্ত’ গ্রন্থে লিখেছেন,—

“অসাধু-সঙ্গে ভাই, কৃষ্ণনাম নাহি হয় ।
 নামাস্তর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয় ॥
 কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ ।
 এ সব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ ॥
 যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর ।
 ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাহু দূরে পরিহর ॥

‘দশ অপরাধ’ তাজ মান অপমান ।
 অনাসক্তে বিষয় ভুঞ্জ, আর লভ কৃষ্ণনাম ॥
 কৃষ্ণভক্তির অমুকুল সব করহ স্বীকার ।
 কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল সব কর পরিহার ॥
 জ্ঞান-যোগ চেক্টা ছাড় আর কর্ণসঙ্গ ।
 মর্কট বৈরাগ্য তাজ যাতে দেহবঙ্গ ॥
 কৃষ্ণ আমায় পালে রাখে জ্ঞান সর্বকাল ।
 আত্মনিবেদন দৈত্রে যুগাপ্ত জঞ্জাল ॥
 সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া ।
 সাধুভক্ত-রূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া ॥
 গোরাপদ আশ্রয় করত বুদ্ধিমান ।
 গোর বৈ সাধু-গুরু আছে কেবা আন ॥”

অতএব, আমাদের পথের সম্বল একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম মহামন্ত্র । এই নাম-সাধনই সর্ব সাধন-শিরোমণি । ভক্তিয়ার্গে গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য ও অনু-গমনই ভক্তির পথ । কৃষ্ণাবতার শব্দরূপ কৃষ্ণনামের ভজনই স্বরূপতঃ ভক্তি । শ্রীকৃষ্ণদেবের নিকট নাম-নামান্তাস ও নামাপরাধের পার্থক্য জেনে নিয়ে গুরু-দেবের আজ্ঞানুসারে সাধন-ভজন করিতে থাকিলে অনায়াসে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় । নামাপরাধে বিষয়-সম্পত্তি, ধন-দৌলত, ভোগ-সুখ ইত্যাদি পাওয়া যায় ; নামান্তাসে ভবক্ষয় বা অনর্থ নিবৃত্তি হয় বা সংসার থেকে মুক্তি হয় । নাম-কীর্তনের দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মার্থকাম-মোক্ষ লাভ হ’লেও তাহা অবান্তর ফল,—গুরুভক্তগণ তজ্জন লাগায়িত হন না । যেখানে বিষয়-ভোগাদি স্পৃহা বিদ্যমান, সেখানে কৃষ্ণ থাকেন না । সৌভাগ্যবশে সেবানুযায় অবস্থায় গুরুনাম উদিত হ’লে ক্রমে প্রেমাবস্থা লাভ হয়, তখন ভবনাশ বা স্বরূপ-সিদ্ধি হ’য়ে থাকে । গুরুভক্তের ভজন ভগবানের স্নেহের জন্ম ।

“সেই গুরু ভক্ত যেই ভজে তোমা’ লাগি” ।

“আপনার সুখ-দুঃখে হয় ভোগ ভাগী ॥” (চৈঃ চঃ)

নাম নিতে নিতে নামাপরাধ ক্ষয় হয় ও ক্রমে গুরু নামের উদয় হয়—তাই নামই উপায় ।

“নামে নামোপরাধ হইবেক ক্ষয় ।

অপরাধ নাশিতে আর কারও শক্তি নয় ॥” (প্রেমবিবর্ত)

খ্রীষ্টানাম প্রভুকে ধরে থাকলে যাবতীয় পাপ ও অপরাধ ক্ষয় হ'য়ে নামীর দর্শন মিলে। আবার নামই উপেষ। কৃষ্ণনামেই স্বয়ং ভগবান্ ও ভক্তির যুগপৎ অধিষ্ঠান। কৃষ্ণনামই আমাদের পরমগতি,—একমাত্র আশ্রয়। কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র আন্তি সহকারে সংখ্যা নির্বন্ধে জপ ও উচ্চৈঃস্বরে কীৰ্ত্তনীয়ও। উচ্চৈঃস্বরে কীৰ্ত্তনের দ্বারা নিজের যেমন কৃতার্থ হওয়া যায়, তেমনি শ্রবণকারীদেরও কৃতার্থ করা যায়। নাম-কীৰ্ত্তনও অন্যযুগে ছিল, তবে এই কলিযুগের তত্ত্ব ইহা একমাত্র শ্রেষ্ঠমন্ত্র।

“হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরনুধ্যা ॥ (বৃহন্নারদীয়-বচন)

উক্ত শ্লোকের বাখ্যায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত উক্ত হয়েছে,—

“কলিকালে নাগরূপে কৃষ্ণ-অবতার।

নাম হৈতে হয় সব জগৎ-নিস্তার ॥

দাড়া লাগি’ ‘কবের্নাম’ উক্তি তিনবার।

জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ ‘এব’-কার ॥

‘কেবল’-শব্দে পুনরপি নিষ্কণ্টক করণ।

জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কষ্ট-মিবারণ ॥

অনুধ্যা যে মানে, তার নাহিক নিস্তারা

নাহি, নাহি, নাহি,—তিন উক্ত ‘এব’-কার ॥”

আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী। কতদিন আর এ’জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক থাকবে? মৃত্যুর পর তো সব সম্বন্ধই শেষ হ’য়ে যাবে। আজ যাঁদের আপন ব’লে ভাবছি, মরণের পরে তাদের সাথে আর দেখা হবে না। কিন্তু,—‘নিতাই’র চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য;—শ্রীগুরুদেবের সহিত সংশ্লিষ্টের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নিত্যকালের, দে’ দ্বন্ধে কোথাও ছাদ নাই—পরিপূর্ণ খাঁটি। শ্রীগুরুদেব ও শ্রীভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হ’লে তাতার কোনকালে কোনদিন ছেদ হয় না। শিহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সহিত সম্বন্ধ হৃদয় রাখাই অবশ্য কর্তব্য। অনিত্য জীবনের অনিত্য মায়ায় সম্বন্ধগুলিতে আকৃষ্ট থেকে লাভ কি? সুতরাং আর কালবিলাস না করে সদগুরুদেবের আশ্রুগতো অসংসঙ্গ ত্যাগপূর্বক সরলতা ও প্রীতির সহিত গুরু-বৈষ্ণবের সেবা এবং হরি-ভজনে প্রবৃত্ত হওয়াই সম্ভব। হরি-ভজন বাণীত আমাদের উদ্ধারের সহজ ও সুলভ পথ আর নাই।

“এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব, না পায় দুঃখের শেষ ।

সাধু-সঙ্গ করি’ হরি ভজে যদি, তবে অন্ত হয় ক্রেশ ॥

বিষয় অনলে জলিছে জুদয়, অনলে বাড়ে অনল ।

অপরাধ ছাড়ি’ লয় কৃষ্ণনাম, অনলে পড়য়ে জল ॥”

সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ণনই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হউক ! গুরু-বৈষ্ণবের আত্মগতো আত্মবৃত্তি—ভক্তি-যাজনের প্রযত্নে আমাদের দিবারাত্র অতিবাহিত হউক ! হরিভজন করিতে যতই অভাব, অহুবিধা, বিপদ আসে আত্মক—তাহাতে আমরা ভীত নই ;—ক্ৰীতরি-কৃপা ব্যতীত যখন একটা তৃণ পর্যন্ত নড়ে না, তখন জাগতিক ক্রিতাপ সমুদয়ও মীহরিব কৃপা এবং তাহা হরিভক্তনের সহায়ক । লোকপি তামস ব্রহ্মা কর্তৃক “তত্তেহহু কৃপাং হুসমীক্ষা-মানো—” শ্লোকে ভগবানের স্তবে ভগবৎ সমুদয় কৃপা লাভের প্রস্তাব কর্তৃক মন্দ ফল ভোগ করিতে করিতে মন, বাঁকা ও অস্বাভাবিক দ্বারা ভক্তিবিশ্বাসের নিধন পেয়ে থাকি । আমাদের দেহ-মনোবর্ষের অচেতন বৃত্তি ঘুচে গিয়ে চেতনের বৃত্তি প্রকাশিত হউক এবং চেতনের বৃত্তিধারা চেতন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীচৈতন্য-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর সেবাই প্রধান ব্রত হউক । আমরা নিয়ত হৃদিরস-মদিরা পান ক’রে উন্মত্ত হ’য়ে মৃত্যু করিতে করিতে যেন বলিতে থাকি ;—

“ভাজন্ত বান্ধবাঃ সর্বৌ নিদন্ত গুরবো জনাঃ ।

তথাপি পরমানন্দো গোবিন্দো মম জীবনম্ ॥”

অর্থাৎ—“আত্মীয়-স্বজনগণ আমাকে পরিত্যাগ করেন করুন, গুরুজনগণ আমাকে নিন্দা করেন করুন ; তথাপি কৃষ্ণনামই আমার একমাত্র জীবন, কৃষ্ণনামই আমার একমাত্র আনন্দ ও আশ্রয় । কৃষ্ণনাম পরিত্যাগ করার সাধ্য আমার নাই—নাই—নাই ।”

পরিশেষে সাধু-গুরু-মহাত্মাগণের কৃপা প্রার্থনা ক’রে গাই,—

“এবে যদি সাধুজনে, কৃপা করি’ এ দুর্জনে,

দেন ভক্তি-সমুদ্রের বিন্দু ।

তা’ হইলে অনাধাসে, মুক্ত হ’য়ে উবপাশে,

পার হই এ’ সংসার-শিঙ্গু ॥”

—সমাপ্ত—

—শ্রীচিত্তরঞ্জন যশস্বল, কবিভূষণ

নিষাণ-সংবাদ

বিশেষ হুংখের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ৮ই মাঘ, ১৩৯০ (২৩শে জ'হুয়ারী, ১৯৮৩) সোমবার রাত্রি ১টা ২২ মিনিটে সজ্জাধে হরিনাম করিতে করিতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নিকটপট এবং নিষ্ঠাসংগল সেবক শ্রীপাদ সান্দীপালিদাস ভট্টাচার্য প্রভু চিরতরে আমাদেব সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে বিরহ-দাগরে নিমজ্জিত করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব সেবানিষ্ঠা, স্বাভাবিক দৈন্য, অমায়িকতা, উদারতা এবং সর্বোপরি শ্রীহরিনামে নিষ্ঠা প্রভৃতি বৈষ্ণবোচিত গুণ সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি হৃদঙ্গ-বাদনে বিশেষ প্রবীণ ছিলেন। নগর-সঙ্কীর্্তন আদিতে যৎ হৃদঙ্গ বাদন করিতে করিতে উদগুণ্ণাবে নৃত্য ও কীর্্তন করিতে করিতে মাতোয়ারা হইয়া পরিতেন এবং সকলকে মাতোয়ারা করিয়া তুলিতেন।

তাঁহার পূর্বোক্তম পশ্চিম বঙ্গের ২৪ পরগণা জেলার অদ্বৈত 'আধার-মাণিক' নামক গ্রামে ছিল। তাঁহার পূর্বোক্তমেব নাম ছিল শ্রীসুধারচন্দ্র আইচ। তিনি বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত পরোপকারী, সত্যবাদী, কর্তব্য-পরায়ণ, যত্নশীল এবং সর্বোপরি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। পরিণত বয়সে আধারমাণিক নিবাসী ভক্তপ্রবর শ্রীপাদ কল্যাণকল্পতরু দাসাধিকারীর সঙ্গে শ্রীধাম নবদ্বাপ পরিক্রমায় ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে যোগদান করেন। শ্রীপরিক্রমাকালে বৈষ্ণবদের নিকট প্রচুর হরিকথা শ্রবণ করিয়া মঠবাসের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। সেই সময় তিনি মঠে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদিবস্বামী শ্রীশ্রীমন্ত-বেদান্ত বামন মহারাজের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম-দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি কিছুদিন শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বাপে এবং শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ চুঁচুড়ায় সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ যথুরায় থাকিয়া ৭৮ বৎসর বাবৎ নিষ্ঠার সহিত বিবিধ প্রকার সেবার নিযুক্ত ছিলেন। স্থানীয় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত হইতে সাধারণ ব্যক্তিগণও সকলেই তাঁহার বৈষ্ণবোচিত গুণে এবং বাবহারে মুগ্ধ ছিলেন।

গত ২৩শে মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারী) মঙ্গলবারে শ্রীকৃষ্ণের বসন্তপঞ্চমী তিথিতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব, শ্রীল রত্ননাথদাস গোস্বামীর আবির্ভাব, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের তিরোভাব তিথিতে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় যঠ মথুরায় ত্রিদণ্ডিয়ামী শ্রীশ্রীমত্তজিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের সভাপতিত্বে একটি বিশেষ বিরহ-সভার আয়োজন করা হয়। তাহাতে ত্রিদণ্ডিয়ামী শ্রীশ্রীমত্তজিবেদান্ত গদ্যনাভ মহারাজ, শ্রীনন্দনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনকুমার ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বক্তৃতা তাঁহার পুত্র এবং আদর্শচরিত বর্ণনামুখে তাঁহাকে শ্রদ্ধাজলি অর্পণ করেন। সভার অন্তে বহু বৈষ্ণবগণ এবং স্থানীয় শ্রদ্ধালু জনগণকে মহাপ্রসাদ সেবন করানো হয়।

— নিজস্ব সংবাদদাতা।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির জনহিতার্থে অবদান

প্রায় ১৭ লক্ষ ভারতবাসী কি যাহুবলে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতি আকৃষ্ট ও আধৃত হল—সেইটি অবশ্যই বিচার্য। শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র ও জনসাধারণের প্রতি ‘সহানুভূতিপূর্ণ সেবা-প্রভাবে’। উক্ত দ্বিপঙ্খায় অল্প সময়ের মধ্যে আকর্ষণ করিয়াছিল এত বিপুল সংখক ভারতবাসীকে। জাতি-ধর্ম-নির্কিংশে সকল স্তরের মানুষ জ্যৈষ্ঠচন্দ্রমহাপ্রভুর নিম্নত পন্থায় নিজেকে ‘সেবাময়’ করিয়া তুলিতে পারেন। সামাজিক জীবন-ধারণ আদর্শ জীবন অতিবাহিত করিবার যে অবদান প্রদান করিয়াছেন এই সমিতির পথ-নির্দেশিকা, তাহা লক্ষ্যভ্রষ্টেরও জীবন-সাথী। উত্তর-পশ্চিমে ও পূর্বাঞ্চল ব্যাপীয়া ইহার শাখা-কেন্দ্রগুলি পরিসর লাভ করিয়াছে এবং প্রায় প্রত্যেক কেন্দ্রই অনির্ভরশীল।

শ্রীবিগ্রহ-সেবা, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দার্শনিক দিগ্‌দর্শন, শ্রীভগবানের নামগ্রহণ ও ভজন, আর্তের বিভিন্ন-মুখী সেবার জন্য দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র তথা মেধাধী ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা, দরিদ্র-ছঃস্থদের ক্ষুদ্রিহতির জন্য প্রসাদ এবং পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু সর্বোপরি

এর মুখ্য উদ্দেশ্য জীবজগতের পারমার্থিক কল্যাণ বিধান। কারণ পারমার্থিক কল্যাণের উদ্দেশ্য সাধিত হইলে তবেই জীবজগতের প্রকৃত মঙ্গল হইতে পারে। কেননা উহার ফলস্বরূপেই নিত্যশান্তি—সংঘাতমুক্ত নিত্য আনন্দ-মুখর জীবন লভ্য হয়। এই প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক কোন দৃষ্টিভঙ্গীর ভাবনা-চিন্তা করেন না; যেহেতু আধ্যাত্মিকতা দৃষ্টিভঙ্গী—সঙ্গীর্গতার উর্দে।

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য হইল সমাজ-জীবনকে আদর্শভাবে রূপদান করা। শুধু খাওয়া-দাওয়া কুণ্ঠি করিয়াই উন্নতমানের এই মানব-জীবনকে নষ্ট করা সমীচীন নহে। তাই সামাজিক জীবনের আদর্শ বজায় রেখে এই শরীরের ধারক ও বাহক সেই যে অবিদগ্ধর কাগ্নাতুভূতি তাহা অবশ্যই লাভ করিতে হইবে। এই জন্যই সামাজিক জীবনের আনুসঙ্গিক কার্যাদি করার সঙ্গে সঙ্গেই পারলৌকিক চিন্তন গুরুত্ব বাঞ্ছনীয়। কারণ পারমার্থিক বা ধর্মচিন্তাকে বাদ দিলে মানুষ যথার্থ লভ্য না হইয়া ইতর প্রাণী-সদৃশ হইয়া পড়ে।

যেহেতু আত্মতত্ত্ব-অনন্তিত্ত্ব ব্যক্তিগণ একমাত্র শরীরের চিন্তাকেই বহুমানন করে তজ্জন্মই সমিতি ইহকালের জনহিতকর কার্যমাধ্যমে জনসাধারণকে নৈতিক চরিত্র গঠনে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য আর্ন্ত, ঔংস্থ, পণ্ডিত, অবহেলিত, অসহায় প্রভৃতির প্রতিও সহাতুভূতিশীল হইয়া জ্ঞান উন্মেষণা প্রদানের জন্য বহুমুখী প্রচেষ্টার পরিকল্পনা (Scheme) গ্রহণ করিয়াছেন। তজ্জন্মই নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণে যত্নবতী হইয়াছেন।

শ্রীনিগ্রহ-সেবা বা ঠাকুরসেবা

সমিতি উহার বিভিন্ন কেন্দ্রস্থলগুলিতে শ্রীনিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করিয়া জনসাধারণকে বৈদিক শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করিয়া থাকেন। এই সেবার মাধ্যমে আগত জনসাধারণকে শুধু উদর পুষ্টির ব্যবস্থাই যে করেন তাহা নহে—পরন্তু উদরপুষ্টি ও তৎসহ প্রসাদসেবনের ফলে পারমার্থিক সুকৃতিও লাভ করিয়া থাকেন। এখানে শ্রীচৈতন্যদেবপ্রভুর আবির্ভাব-তিনি উপলক্ষে ফাল্গুনী পূর্ণিমার পঞ্চ দিবস পূর্ণ হইতেই নববের ধনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সমিতির সকল কেন্দ্রে এই উৎসব অধ্যুষিত হইলেও মূল আশ্রম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মহে সত্ত্বাহািকায় বিশেষ আড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। এই উৎসব উপলক্ষে সর্বদমেত প্রায় দেড় লক্ষাধিক ব্যক্তি

আকর্ষণ প্রসাদ পাইবার সুযোগ লাভ করেন। কেহবা আমন্ত্রিত, কেহবা আগন্ত, কেহবা রবাহত—এই ভাবেই দশদিন ব্যাপীয়া প্রসাদ পাইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীযং ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিকে কেন্দ্র করিয়া প্রায় ছাদশ দিবস ব্যাপীয়া ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয় এবং সহস্র সহস্র জনসাধারণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। তদুপরি শ্রীমূলনবাত্মা, শ্রীশ্রীজন্মানন্দের ও রাধাকৃষ্ণী, ও সনিতির প্রতিষ্ঠাতা-অচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসন্ন কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে দারদীয়া পূর্ণিমা-তিথিতে বিপুল-ভাবে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা থাকে। অন্নকূট-মহোৎসব উপলক্ষে দীপাবলি তার পূর্বের দিবসেও আগন্ত অজস্র ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এর পর রাসপূর্ণিমাকে কেন্দ্র করিয়া নবদ্বীপের প্রখ্যাত রাস-মেলা উপলক্ষেও সহস্র সহস্র আগন্তকে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা থাকে। ইহা ব্যতীতও আধুনিক বিদ্যে ধর্মজাগরণের বিপ্লবী কণজন্মা মহাপুরুষ জগদগুরু শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিকে কেন্দ্র করিয়া তিন দিবসব্যাপী মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হয়। মোটকথা ১০।১২টী উৎসবে এবং প্রত্যহ আতুর, দরিদ্র প্রভৃতিকে লইয়া শুধু নবদ্বীপের আশ্রমেই বৎসরে প্রায় তিন লক্ষ লোককে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই জনহিতকর ব্যাপারেই ইহার যাবতীয় অর্থাদি ব্যয়ীত হইয়া থাকে। শুধু যে ঠাকুর-সেবা বা বিগ্রহ-সেবা তাহাই নহে, পরন্তু উহার অন্তরালে জনগণকে প্রসাদ (অন্ন) বিতরণ অনুষ্ঠানও সনিতির কার্য্যসূচীর অন্যতম অঙ্গ।

দাতব্য চিকিৎসালয় : শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত শাখা-মঠসমূহের মধ্যে কলিকাতা, শিলিগুড়ি, পুরী, কোরট, তুরা, নথুরা এবং প্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে অভিজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োজিত করিয়া এক একটি দাতব্য চিকিৎসালয় করা হইয়াছে। প্রত্যেক স্থানেই অভিজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োজিত আছেন। ঐ চিকিৎসা-কেন্দ্রগুলিতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৯০ শত রোগী এই সকল চিকিৎসাকেন্দ্রে আসেন। তাঁদের ঔষধ ও চিকিৎসার পথ—এই সমিতি হইতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। তজ্জন্য সমিতি বৎসরে প্রচুর আর্থিক দান প্রভৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

শিক্ষা-ব্যবস্থা : ভারতীয় কৃষ্টির মূলধারক সংস্কৃত শিক্ষার জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠের সংলগ্ন শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী

রয়েছে। ইহা পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত। পরিষদ কর্তৃক যদিও দুইজন পণ্ডিতকে অনুমোদন করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির তরফ হইতে আরও ৩৪ জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বিভিন্ন বিভাগের জন্য নিয়োজিত রেখেছেন। এখানে প্রায় ১৭ জন আবাসিক ছাত্র আছেন—যাহাদের খাওয়া-পাকা প্রভৃতির যাবতীয় ব্যয়ভার সমিতি কর্তৃক বহন ও পরিচালিত হয়। এই তো কয়েক মাস পূর্বে সংস্কৃত পরিষদের পরিদর্শক (Inspector) ও শিক্ষা-বিভাগের উপ-পরিদর্শক (Sub-Inspector) এবং কয়েক বৎসর পূর্বে পরিষদের সম্পাদক (Secretary) শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় টোল (চতুষ্পাশী) পরিদর্শন করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়া যান।

এতদ্ব্যতীত পার্শ্বতা জনজাতিদিগকে হিন্দু সংস্কৃতির দিকে আকর্ষণ করার জন্য মেঘালয়স্থ তুরা শহরে সমিতির পরিচালিত শ্রীমেঘালয় গোড়ীয় মঠ-প্রাঙ্গণে শিশুশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। পার্শ্বতা জনজাতি ও স্থানীয় অনগ্রসর জনসাধারণকে হিন্দুধর্মে আদৃত করার জন্য সমিতির কর্তৃপক্ষগণের এই পদক্ষেপ। উক্ত তুরা শহরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি অর্থাৎ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে প্রতি বৎসরেই এক বিরাট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইহা কার্য্যত বুলন-উৎসব হইতেই আরম্ভ হয়, তবে জন্মাষ্টমী-কালে ব্যাপকরূপে ধারণ করে। ইহাতে তুরা শহরে এমনই সাড়া পরে যে, মনে হয় যেন সেখানকার জাতীয় উৎসব। ৩৪ দিন ধরিয়া সহস্র সহস্র জনগণের সমাগন, তুরা শহরকে এক অনাবিল আনন্দে মুখরিত করে। রাজ্যের মন্ত্রীমহল, সরকারী বিভিন্ন মহলের উদ্বৃত্তন ও প্রায় সর্বস্তরের পদস্থ অফিসার অনেকেই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া এই নিলন অনুষ্ঠানের যেমন সাফল্যতা আনন্দন করেন—সেভাবেই ইহা যে বর্তমান সমাজে বিশেষ প্রয়োজন তাঁহাদের উপস্থিতিতে উহাও প্রমানিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন-মুখে তুরা শহরের প্রধান প্রধান পথগুলি পরিক্রমা করেন। উক্ত শোভাযাত্রা যদিও ধর্ম্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর উদারদাময়-গম্ভীর সকলেরই কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার অবকাশ নাই। আত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রয়াস ও সংঘাতহীন বিশ্বভ্রাতৃত্ব রূপারণ-প্রচেষ্টাই ইহার বৈশিষ্ট্য। ইহাতে রাজ-নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সঙ্কীর্ণতার কোন সংশ্রব নাই।

ভ্রমণ-মাধ্যমে শিক্ষা

এতদ্ব্যতীত ধর্মীয় ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিভিন্ন তীর্থ তথা শহর, মহানগরী প্রভৃতিও দর্শনের সুবিধা প্রদানের জন্য সমিতির কর্তৃ-পক্ষগণ ও সেবকবৃন্দ কর্তৃক উৎসাহিত হওয়ার তাহা যথামতভাবে সম্পাদিত হয়। প্রতিবৎসরেই এই সমিতির বিভিন্ন প্রচার কেন্দ্র হইতে সাধু-সমাসীগণের পরিচালনায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে জনসাধারণ ভ্রমণ বা দর্শন করিবার সুযোগ লাভ করেন। ভ্রমণকালে তত্তৎস্থানের মহাত্মা বা ইতিবৃত্ত-বিষয় বর্ণনামুখে ভারতাত্মার বৈচিত্র্যাতার মধ্যে একা প্রতিষ্ঠার অনলস প্রচেষ্টা করেন। তাই ভ্রমণ যে প্রমোদ বা আনন্দ বিনোদনের জন্যই শুধু করা হইয়া থাকে তাহা নহে—পরস্পর সমাজের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব জাগরণের এক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

গ্রন্থাগার (Public Library)

দেশে সরকারী ও বেসরকারী অনেক গ্রন্থালয় বর্তমানে পরিদৃষ্ট হইলেও এই সমিতি শান্তি-গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীসূচক গ্রন্থাগারগুলি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহার মাধ্যমে মানব সমাজকে এমন আলো প্রদান করিতে চান—যাহা সুস্থ, সবল ও উদার মানসিকতার জাগরণ সৃষ্টি করিতে পারে তজ্জন্য সামাজিক বহুমুখী কল্যাণ প্রদানকারী গ্রন্থের সমাহার করিয়া ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন সুষ্ঠুভাবে রাখার জন্য সংগ্রহ-শিক্ষা প্রদানের এই প্রচেষ্টা। উচ্ছৃঙ্খল জীবন পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে মানব-সমাজ উদার ও সুশৃঙ্খল হইবার আগ্রহী হইতে পারে তজ্জন্মই ইহার বাবস্থা ও ইহাই ইহার প্রচার বৈশিষ্ট্য।

প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সমিতির আন্দোলন

এই সমিতির কার্যকলাপই সমাজের কল্যাণমুখী। সহজ সরল সুস্থ সমাজের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া মানব জীবনকে সহায় করা এই সমিতির মহৎ উদ্দেশ্য। এইজন্য সার্বিক ধর্মীয় চিন্তাধারা-মাধ্যমে মানব-সমাজের সহিত ওতপ্রোত সম্পর্ক রেখে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণার্থে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করিয়া চলিতেছেন।

যখনই কোন বিধ্বংসী বন্যা, এমনকি 'জনসংঘাত' ঝড়াকবলিত হইয়া ভীতি ও নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন—তখন ইহার সদস্যবৃন্দ জনগণের দ্বার প্রান্তে উপনীত হইয়া তাঁহাদের দুঃখকষ্ট লাঘব করার জন্য সেবার হাত প্রসারিত করেন তখন ইহকালের সহায়-সহায়িত্ব তঁা করেনই, পরস্তু যাহাতে

তাহারা নিরাশায় মুহূরান না হন তজ্জন্য তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করতঃ পারমার্থিক কলাণের জন্য উদ্বীপনাময় শাস্ত্রীয় উপদেশাবলী দ্বারা দৃঢ় ও উদ্বীপ্তরূপ করেন—যাহাতে তাহারা বিপদে দুসরে না পড়েন, অথচ জিহ্বাসার ব্যুত্তিও না হয়, এরূপ শিক্ষাদর্শই ইহার বৈশিষ্ট্য।

এই সমিতির কার্যকলাপ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল (His Excellency Shri Bhairab Datta Pandey) ও ভারতের রাষ্ট্রপতির (His Excellency Jnani Shri Jai Singh) অবগতির জন্য তথ্যাদিও (Report) প্রেরণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সময়ে সরকারী উদ্বৃত্তন কর্মকর্তাগণের সহিতও যোগাযোগ রক্ষা করিয়া থাকেন এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতেও জনসাধারণের যোগাযোগ রয়েছে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রাণকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ পরিদর্শন করিতে স্থানীয় অতিরিক্ত জেলা শাসক (Addl. District Magistrate, Nadia) শ্রীমান শ্রীমুণ্ডালকান্তি ব্রহ্মচারী (Shri M. K. Brahmachari, I. A. S.) মহাশয়কে সমিতির পক্ষ হইতে Attorney & Asstt. Secy. শ্রীমৎ আচার্য মহারাজ আগন্তুক করেন।

সমিতির সেবাসূচিব ত্রিদিগ্ভিষামী শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত আচার্য মহারাজের সহিত মাননীয় অতিরিক্ত জেলাধীশ শ্রীমুণ্ডালকান্তি ব্রহ্মচারী, আই, এ. এস্ মহোদয় দীর্ঘ সময় সামিতির বিভিন্ন বিষয়-সম্পর্কে আলোচনা ও পরিদর্শনাদি করেন। আলোচনা-কালে বিভিন্ন তথ্যাদিও প্রদর্শিত হয়। এক্ষেত্রে শুধু একটি বিষয়ে উল্লেখ সংক্ষেপে করিতেছি। সমরাস্তরে বিস্তৃতভাবে প্রকাশের আশা রহিল।

শ্রীব্রহ্মচারী মহাশয় কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী মহারাজকে প্রশ্ন করেন—
আপনারা সমাজের কোন সামাজিক (Social Work) সেবা করেন কি?

এতদ্ব্যন্তরে স্বামীজী মহারাজ একটু স্মিত হেসে বলেন,—নিশ্চয় তো আমরা সমাজের যেরূপ সেবা করি, এরূপ খুব কম সংস্থাই করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় বেনীর ভাগ মানুষ সমাজের কাজ সম্পর্কে উহার তথ্যগত কি ভিত্তি তাহা গভীর ভাবে পর্যালোচনা করিতে যান না। আপনারা তো সামাজিক (Social Work) কাজ বলিতে কিছু লোককে অজ্ঞবিশুর খাইয়ে দেওয়া ও বস্ত্রাদি বা অর্থাদি দান করা অথবা গৃহাদি কিছু করে দেওয়া বা কাহারও ছেলে-মেয়েদের বিবাহাদি সংযোজন ইত্যাদি কার্য। কিন্তু ঐগুলি জড়ীয় ইন্দ্রিয়-তোষণ-নীতি ব্যতীত আর কি? এইগুলির পরিণতি

কতটুকু শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূল হয় তাহা অবশ্যই বিচার্য ও সম্ম-সাপেক্ষ।
 আচ্ছা বলুন তো—খাওয়া, ভোগপর আকাঙ্ক্ষা, কাম-চরিতার্থ আর সীমিত
 গতির মধ্যেই স্থূলবিচার ছাড়া আর কি? যাহারা শুধু স্থূল বা শরীরের চিন্তা
 লইয়াই মগ্ন হইয়া থাকেন, ইতর ব্যতীত আর কি? কারণ এই শরীরের
 চিন্তাই যাহার বা যাহাদের মনোযোগ, তনি বা তাহারা তো গণ্ডীবদ্ধ ভাবনাতেই
 বাস্তব; এর পরিণতিতে ক্ষুদ্র স্বার্থের বাধাত ঘটিলে আত্মসম্বন্ধে বৃত্তি প্রকাশ
 পায়—যাহা পাশবিকতার নামান্তর মাত্র। ইহা, কথাগুলি শুনিলে আপনি
 হয়তো বলিবেন,—“এত রূঢ় কথা বলেন!” কিন্তু আপনাকে আমি অনুরোধ
 করে বলিতেছি যে, কথাগুলির বাস্তবতা অনুধাবন করিতে যেন উদাসীন
 না হন। আপনি শিক্ষিত, বিচক্ষণ ও সরকারী দায়িত্বশীল-পদে আসীন—
 এমতাবস্থায় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিলে জগতের অনেক কল্যাণ সাধিত
 হইবে, আর আপনার সংহতির বিকাশ-সাধনে আপনিও কল্যাণময় ফলভাগী
 হইবেন, এতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

আপনি ভারতীয়—বিশেষতঃ জন্মসূত্রে সনাতন হিন্দুসমাজে জন্মলাভ
 করিয়াছেন; সুতরাং জন্মসূত্রেই আধ্যাত্মিক ভাবনা হৃদয়ে কিছু না কিছু
 প্রতিফলিত হওয়া স্বাভাবিক। অতএব হিন্দু-শাস্ত্রের একটা উদ্ধৃতি না
 দিয়া পারিতেছি না। যে-শাস্ত্রকে মণ্ডিত করিয়া আধ্যাত্মিক ত্রিকাল ভ্রাত
 হইয়া জগতে কল্যাণময় বাণী দিয়ে গিয়াছেন তাহা অবশ্যই প্রশংসা-
 যোগ্য। কেন না সেই বাণীগুলির মধ্যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে
 যে-সমস্ত দিক্‌দর্শন করাইয়া গিয়াছেন তাহা অতীব বিস্ময় ও আশ্চর্যজনক
 হইলেও বাস্তব সত্যরূপেই সুবিদিত রয়েছে। হাজার হাজার বৎসর পূর্বে
 তাঁহারা যে-সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন তাহা ইদানিৎকালে উহার নিছক
 সত্যরূপায়ণে প্রমাণিত করিতেছে। তাঁহাদের সুদূরদৃষ্টির অমোঘ সত্যতা।
 তাঁহারা সময়কে কতগুলি কালে বিভক্ত করিয়া কোন্ কালে কিরূপ ঘটমান
 অবস্থা হইবে তাহা বিশদভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান কালে
 এই যে হানাহানি, কলহ-বিবাদ, নিরীশ্বরবাদীতা প্রভৃতির প্রকোপ হইবে
 তাহাও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

মানুষ যতদিন পর্যন্ত ধর্মকে আশ্রয় করে নাই—ততদিন নিজে যেমন
 নিকরদেগ শান্তি পেতে পারে না, সেইরূপ অন্যেরও শান্তি আনয়ন করিতে
 পারিবে না। আমরা পৌরাণিক যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে
 সুনিশ্চিত ভাবে অবগত হইতে পারি যে, যে-সকল রাজন্যবর্গ বা শাসকদল

ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না অর্থাৎ ঈশ্বর-বিবেচী তাহারা সমাজে শুধু বিভীষিকারই সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহারা নিজের স্বার্থ নিয়াই বাতীবাস্ত, আর তার পরিণতিই দেশ ও দশকে অশান্তির অনলে দন্ধিত করিত।

যাহারা ধর্ম মানেন না, তাহাদিগকে শাস্ত্রতো সোজানুজি পশু-পদবাচ্যে ভূষিত করিয়াছেন, যথা—

আহার-নিদ্রা ভয়-মৈথুনাঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভিনরানাম ।

ধর্মহি তেষাং অধিকোবিশেষো ধর্মোহীনা পশুভিসমানা ॥ (পদ্মপুরাণ)

[আহার-নিদ্রা-ভয় ও মৈথুন অর্থাৎ কাম-চরিতার্থ সকল প্রাণীতে বিদ্যমান। একমাত্র মানব 'ধর্মচিন্তা' করিতে পারেন, তাই তাহাদের উহাই বৈশিষ্ট্য; কিন্তু যে-মানব ধর্মচিন্তা করেন না তাহারা পশুতুল্য। কেন না পশুগণ ধর্মের ধারণা করে না।]

আমরা যদি একটু বিশদভাবে আলোচনা করিতে যাই তাহা হইলে দেখিতে পাই—আহার, নিদ্রা বাতীত মৈথুন অর্থাৎ সন্তোগ-কামনা পশুগণ অপেক্ষা মানুষের মধ্যেই বেশী উচ্ছৃঙ্খলভাব পরিলক্ষিত হয়। কেননা পশুগণ মৈথুন বা স্ত্রী-সন্তোগ করিলেও তাহারা সময় বা কালকালের কথা ভুলিয়া যায় না। কিন্তু মানুষের মধ্যে বেশী ইতরতা পরিলক্ষিত হয়। মানুষ কোন প্রকারে সুযোগ পেলেই মনে হয় তাহার ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন না বা সে-সুযোগ বর্জনে অনেকটা অনীহা প্রকাশ করেন। দিবা, রাত্রি, ক্ষণ, মাস, ঋতু প্রভৃতি মানুষ কোনটারেই অপেক্ষা করতে চায় না। কিন্তু পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ এমন কি বৃক্ষাদি পর্যন্তও তাহারা ঋতু-কাল প্রভৃতির বিচার করিতে ভোলে না। সুতরাং তাহারা কতটা সজাগ ও সংযমী তাহা সহজেই অনুমেয়। বিভিন্ন দিক বিচার-বিবেচনা করিয়া তাই শাস্ত্রকারগণ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীতে কোন্ দৃষ্টিক্রোণের বিচারে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে তাহা নির্ধারণ করিয়াছেন।

যাহারা শুধু ইঞ্জিয়-চরিতার্থ করা লইয়াই বাস্তব ও তাহার সর্বতোভাবে ইন্ধন ধোঁয়াইতে বহনপরিকর অথচ এই ইঞ্জিয়গণ যে কোন্ উৎসধারার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে তাহার দিকে দৃকপাত না করে, সেই অতবুদ্ধ ও অদূরদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সমাজে কি প্রকৃত মঙ্গল প্রদান করিতে পারেন? যাহারা নিজেরই মঙ্গল করিতে পারিল না—তাহারা কি করিয়া অন্যের মঙ্গল সাধন করিবে? কোন অদ্ব্যক্তি অন্যকে পথ দেখাইয়া দিবে কি করিয়া? কোন মূর্খ ব্যক্তি অন্যকে অধ্যয়ন করাইবেন কি করিয়া? যাহাদের দর্শন

শুধু স্থূল মাংসপেশীর উপর, যাহারা শুধু আজ-কালের কথামাত্র ভাবে—
তাহাদের বিচক্ষণতা কতদূর তাহা নিশ্চয়ই আপনার জজ্ঞানীয়।

এই জন্যই আমরা সমাজকে খাওয়া-পরা দেওয়া বাদেও আরও কিছু
দিতে চাই—যেটার কথা খুব কম লোকই চিন্তা করিতে সমর্থ। খাওয়া-পরা
তো ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং স্থায়ীবন্দোবস্ত করার প্রচেষ্টা যাহাতে করা যায় সেই
বিষয়েই আমাদের বক্তব্য।

অনেকে বলেন,—‘পেটে খাবার না থাকিলে তখন আর আনন্দ বা
ঈশ্বরে নাম কিছু ভাল লাগে না; সুতরাং খাবারটাই মুখ্য। কিন্তু
খাবারটাই যদি মুখ্য হয় বা পেট ভরা থাকিলে সব ঠিক হইতে পারে তাহা
হইলে ধনি লোক বা ধনি দেশতো নিশ্চয়ই শান্তিতে থাকা উচিত ছিল? অথচ
বাস্তবে তাহার কোন মূল্যায়ন আছে কি? যদি তাই হইবে আমেরিকা,
রাশিয়া প্রভৃতি দেশে তো অশান্তি থাকার কোন কারণ থাকিত না?

গণ্ডীবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী বা স্থূল দৃষ্টিতে নিবদ্ধ থাকার জন্য আমাদের মধ্যে
বেশী সংঘাত দেখা দেয়। সূক্ষ্ম বা আত্মদর্শন হইলে বা থাকিলে তবেই বিশ্ব-
ভ্রাতৃত্ব গঢ়া সম্ভব। সেই যে আত্মা, তাহা চিরন্তন ও কলুষমুক্ত। দেশ-
কালের বাবধানে তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। আশ্চর্যের বিষয় মানুষ
শ্রেষ্ঠ জীব হইয়াও উহার অনুসন্ধানে কতজনে ব্রতী?

বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয়, বহু সময়ের দরকার, তজ্জপার
শ্রোতার ধৈর্যেরও অনেক প্রয়োজন। আপনার সময় কম, এমতাবস্থায়
আপনার আর কত সময় লইতে পারি? তবে সমাজের প্রকৃতই যদি কিছু
উপকার করিতে হয় তাহা হইলে আধ্যাত্মিক জাগরণ বিশেষ প্রয়োজন।
যেমন শিক্ষার প্রসার না হইলে মানুষের বুদ্ধির বিকাশ ঘটিতে প্রতিবন্ধকতা
হয়, সেইরূপে আধ্যাত্মিক চেতনা না হইলে খাওয়া মলত্যাগ করাই একমাত্র
কার্য্য হইয়া দাড়ায়—নিতাশান্তি সুদূর পরাহত।

শ্রীমদ্রহস্যপ্রভু গৌরসুন্দর ভগবতের শিক্ষার জন্য লক্ষ্য করিয়া শ্রীল
সনাতন গোস্বামিপাদকে বলিয়াছেন,—

“নামে কচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-সেবন।

ইহা বিনা ধর্ম্মনাই,—ঐন সনাতন”

এস্থলে ‘নাম’ অর্থাৎ ‘শব্দব্রজ’—যাহা শব্দ-সামান্য বা যে কোন নাম
হইলেই হইল তাহা নহে। ‘জীবে দয়া’ অর্থাৎ জীবকুলের প্রতি সহানু-
ভূতিশীল। এই ‘জীব’ মানে শুধু মানুষকেই লক্ষ্য করা হয় না, পরন্তু সকল

প্রাণিগণকে বুঝাইয়াছেন। বৈষ্ণব-সেবার ‘অর্থ’—ঈশ্বারা ঈশ্বরে অনুরক্ত বা ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাসী এই ব্যক্তিগণের সেবা করিলে মনের কলুষতা বিদূরিত হইয়া মানুষ-নির্ম্মল হইবার সুযোগ পান। প্রতিটি ব্যক্তির যদি এই দৃষ্টি-ভঙ্গী থাকে তবে স্বার্থপরতার অবকাশ কোথায়?

আমরা প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পাই—ধনানি জীবিতকাল পরার্থে উৎসর্জ্য এই সুমহান বাণী নির্দেশিত হইয়াছে। আসুন্নিব বৃত্তিকে প্রদমিত করার জন্য দধিচী মুনি নিজের জীবনকে দেবতাগণের হিতার্থে উৎসর্গ করিয়া আনন্দের সহিত দেহতাগ করিয়াছিলেন। খট্টাপ রাজা অসুরকুলকে পর্য্যুস্ত করিয়া দৈবী-রাজ্য নিষ্কটক করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাহার মুখ্য কর্তব্য সাধিত হয় নাই বৃষ্টিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ স্বর্গকেও তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ঈশ্বর সাধনায় আত্মনিয়োগ করতঃ ধন্য হইয়াছিলেন। সুতরাং নিরীশ্বর জগতে কখনই শান্তি আসিতে পারে না। মরুর মরীচিকা তৃষার্ত ব্যক্তিকে যেমন ভ্রম উৎপাদন করিয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে, সেইভাবে শাস্তিরূপ আলোয়ার কুহক হাতছানিতে প্রধাবিত হইয়া এই দেহ-মনকেই ‘আমি’ প্রতীতি হওয়ার প্রতারিত হন। একমাত্র নিজের শরীর ও মনের সুখ-সচ্ছন্দতাকেই শ্রেয়ঃ ভাবিয়া তাহার ক্ষণিক সুখ-বিধানের জগুই অদম্য উৎসাহী হইতে থাকেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিজে যেমন প্রতারিত হইয়াছেন—সেইরূপেই অন্যকেও প্রতারিত করিতে থাকেন। অতএব এইরূপ অপরিণামদর্শিতার দ্বারা দেশ বা সমাজ বা ব্যক্তির যথার্থত সেবা করা অথবা মঙ্গল করা যায় কি?

এই হেতু আমরা আত্মকল্যাণের জন্যও দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যতার কথা চিন্তা করিয়া অন্ন বা খাদ্য-সামগ্রী ঈশ্বরে উৎসর্গ করতঃ প্রসাদরূপে জনসাধারণকে বিতরণ করি। তজ্জন্ম প্রসাদ বিতরণ আমাদের অন্যতম সমাজসেবা-বৈশিষ্ট্য। সমাজ-সেবার নামে ধান্দাবাজ তাহা কোনপ্রকারেই বাঞ্ছনীয় নহে।

সুতরাং সমাজ-সেবা, সমাজ-সেবা বলিয়া যদি আত্মকল্যাণের ক্ষেত্র হনন করা হয় তবে তাহার বিষময় ফল সমাজ-জীবনকে ক্ষয়রোগ-গ্রাসের কাঠামো গঠন ব্যতীত আর কি? এই জগুই চাই সুচিন্তিত ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি-ভঙ্গী। সমাজে কৃষক, মজুর, মেথর, মুচি, কলকারখানার কর্মী, শিক্ষক, চিকিৎসক, বুদ্ধিজীবী, এমনকি ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী প্রভৃতি সকলেই তো একটা না একটা সমাজের সেবা করিয়া চলিতেছেন। তবে অবদান-বৈদিক্তা নিশ্চয় এক ধরনের নহে, অথচ প্রয়োজন সকলকেই। তাহা না হইলে কোননা

কোন একটা গোষ্ঠীকে সমাজ হইতে নিশ্চিন্ন করার প্রসঙ্গ আসিবে। অতএব সমাজসেবা-প্রসঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কত সুদূর-প্রসারী তাহা ধীর স্থির-ভাবে চিন্তা করিতে অতুরোধ জানাই।

স্বামীজী মহারাজের সহিত বেশ দীর্ঘ সময় বিভিন্ন দিক্ আলোচনাতে সন্ধ্যায় শ্রীবিগ্রহের আরাতি দর্শন করেন। ঠাকুরের প্রসাদী চন্দন ও মালাদ্বারা মহারাজজী জেলাশাসক মহাশয়কে বিভূষিত করতঃ বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। পরবর্ত্তিকালে মাননীয় শ্রীব্রহ্মচারী মহোদয় সমিতির সভাপতি মহারাজের নিকট এক পত্র ও মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছেন; তাহার অনুলিপিও নিম্নে প্রদত্ত হইল।

—শ্রীনীলমণি মুখার্জী,

[অবসরপ্রাপ্ত সরকারীপদস্থ কর্মচারী]

নবদ্বীপ (নদীয়া)।



Shri M. K. Brahmachari, I.A.S.
ADDL. DISTRICT MAGISTRATE, NADIA
KRISHNAGAR

No. 34-CLR

6th February, 1984

To

The President,

Shri Goudiya Vedanta Samiti (Regd.)

Shri Debananda Goudiya Math,

P.O. Nabadwip, Dist. Nadia.

As impressive, I enclose a write-up in Bengali on my visit to your 'Math' at the time of last 'Rash Purnima' for for such action as you might think proper.

Thanking you.

Yours faithfully,

Sd./—Illegible

(M. K. Brahmachari)

Additional District Magistrate.

(Land Reforms), Nadia.

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ পরিদর্শনান্তে অতিরিক্ত জেলাশাসক মহোদয়ের মন্তব্য

শ্রীমৎ প্রামাণ্য ওস্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজের
আমন্ত্রণে আপনাদের নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়
মঠে আমার উপস্থিতি হইবার সুযোগ হইয়াছিল এবং
তাহার সংস্থিত দীর্ঘ আলোচনা করিয়া অনেক তথ্য
অবগত হইয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি।

এতদ্ব্যতীত রামসুনিম্ন উপলক্ষে আগ্রমের আনন্দ-
ময় ও পবিত্র পরিবেশে আরও কিছু সময় কাটানোর
সৌভাগ্য হইয়াছিল ; শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণ তখন শঙ্ক্যারতি
এবং নামমঞ্জীরের মূর্ছনার বিহবলপ্রায়। সেই ওষো-
ধ্যাদন্যর অন্যান্য শব্দগুলির মতই আমার মনকেও এক
অপ্যর্থিক উদ্দীপনার পূর্ণ করে দিয়াছিল। পরে প্রামা-
ণ্যের সঙ্গে আরও অনেক তাত্ত্বিক আলোচনা হয়।
আলোচনার আমার ভূমিকা অবশ্যই ছিল প্রোতর।
বলতে দ্বিধা নেই, সেই আলোচনা আমার চিন্তা ও
মননকে যথেষ্ট প্রভাববশিত করেছিল।

মঠের অতিথিশালাটি পরিদর্শন করে যথেষ্ট তৃপ্তি
লাভ করি। নবদ্বীপের মতো একটি প্রাচীন তীর্থস্থানে
এরকম একটি সুন্দর এবং আধুনিক অতিথিশালার
প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। আশা করি নবো উৎসব
উপলক্ষে আগত অনেক তীর্থযাত্রী এখানে এমনি আগ্রমের
আতিথ্য গ্রহণ করে আনন্দিত হবেন।

স্বাঃ-/ মৃণালকান্তি ব্রহ্মচারী

(শ্রীমৃণালকান্তি ব্রহ্মচারী)

অতিরিক্ত জেলাশাসক, নদীয়া।

—গ্রন্থ-বার্তা—

শ্রীবৈষ্ণব-জগতে যুগান্তর আনয়নকারী

সিদ্ধান্তরত্ন

—

গোবিন্দভাষ্যপীঠকম্

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য-ভাকর

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু

কর্তৃক

বিরচিত অষ্টীকাসম্বিত ভাষ্যপীঠকম্

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিজেরই
উক্তি এই স্থানে উদ্ধৃত হইল,—

“শ্রীব্রহ্মসূত্রের স্বরচিত গোবিন্দভাষ্য ও বটসন্দর্ভাদি গৌড়ীয়
দার্শনিক গ্রন্থরাজির সারস্বরূপ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সর্বদর্শন
সিদ্ধান্তের ব্যুৎপত্তি লাভ হয়।”

এই ভাষ্যপীঠ-প্রকাশনে প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মূল সূত্রগুলি
স্থূলান্বরে এবং বঙ্গানুবাদ সুন্দর হরফে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সমৃদ্ধ
রহিয়াছে। একরূপ মনোজ্ঞ অনুবাদ ও টীকা-সম্বিত প্রকাশন দুর্লভ।
বর্তমানে উক্ত গ্রন্থ টীকা-মূলানুবাদসহ একান্ত দুপ্রাপ্য। অতএব
প্রাণে কাম্যকাম্যসম্বিত ব্যক্তির ইহা অবশ্যই সংগ্রহ করা কর্তব্য।

সেবাসচিব,

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

শ্রীশ্রীগৌরভক্ত-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিস্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ;
জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির
নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা)
উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি নিত্যলীলা-
প্রবিন্দ ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী
মহারাজের শুভাশীর্বাদে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ৩০শে ফাল্গুন,
১৩৯০ (ইং ১৯৮৮) বুধবার হইতে ৪ঠা চৈত্র (ইং ১৮/৩/৮৮) রবিবার
পর্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই
মহদুষ্ঠানে প্রত্যহঃ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্তন, ইক্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা,
মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে শ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ
দর্শন, তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্যকীর্তন ও নগর সঙ্কীর্তন-মুখে যোলকোশ
শ্রীধাম-পরিক্রমা হইবে।

ধর্মপ্রাণ সম্ভজন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ ভক্ত্যনুষ্ঠানে স্নাতক যোগদান
করিলে সমিতির সদস্যগণ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন।
এই মহদুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও
বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যনুষ্ঠান
সুচলিত অভিজ্ঞত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরজ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং শ্রীনবদ্বীপধাম-
পরিক্রমা-পঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—তাং ১৯/৯/৯০

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভাপতি,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

জট্টবা :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে
ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিবস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন
মহারাজের নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ৩০শে ফাল্গুন (ইং ১৪।৩।৮৪,) বুধবার ;—(১) **শ্রীগোব্রহ্মদ্বীপ** (কীর্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশে দণ্ডায় প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** ; এবং—(২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদি, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন ।

২। ১লা চৈত্র (ইং ১৫।৩।৮৪), বৃহস্পতিবার ;—(৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি ; ও (৪) **শ্রীঅক্ষুদ্বীপ** (অর্চনাখ্য)—রাতুপুর ; তদনন্তর (৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জাহ্নগর (জহ্নু মুনির স্থান), বিজ্ঞানগর (সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এবং (৬) **শ্রীমোদক্রেমদ্বীপ** (দাস্তাখ্য)—মাংগাছি (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অকটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস) ।

৩। ২রা চৈত্র (ইং ১৬।৩।৮৪), শুক্রবার ;—সহর নবদ্বীপস্থ (কোলদ্বীপ) শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা (পোড়ামায়া-স্থান) দর্শনান্তে (৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর ও গাঞ্জেরডাঙ্গা ; ও (৮) **শ্রীনীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; এবং (৯)—**শ্রীঅম্বুদ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম-মায়াপুরে, শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট এবং চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্তন ।

৪। ৩রা চৈত্র (ইং ১৭।৩।৮৪), শনিবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব** ।

৫। ৪ঠা চৈত্র (ইং ১৮।৩।৮৪), রবিবার—**সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)** ।

জ্ঞাতব্য :—যাত্রিগণ হাকী পালা ও ঘটি এবং ঘাহারা মঠে বাসিবাসে ইচ্ছুক তাহারা মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন এবং ২৯শে ফাল্গুন (ইং ১৩।৩।৮৪) মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন । এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্বেই কেহ আসিলে মঠে থাকার ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না । পরিক্রমা ৩০শে ফাল্গুন (ইং ১৪।৩।৮৪) বুধবার হইতে—শ্রাবণ ৫টার সময় আরম্ভ হইবে ।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

- ১। "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।
- ২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সভাক বার্ষিক ভিক্ষা ১২'০০ টাকা, বাৎসরিক ৬'২৫ টাকা। ভারত ও বাংলাদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি. পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।
- ৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।
- ৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্বদা গ্রাহক-মন্তর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড লিখিবেন।
- ৫। শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন। নচেৎ কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।
- ৬। শ্রীমদ্বৈষ্ণবপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-মন্ত্রে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাতা দাদবে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। দীর্ঘমূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সং-আলোচনা সর্বদা আদরণীয়।
- ৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে "কার্য্যাধ্যক্ষ অথবা 'প্রকাশক' শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদীপ (মদীয়া) — ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী—

- ১। সিদ্ধান্তবত্স (ভাস্ক-শীঠকম্)—২৫-০০, ২। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী) বার্ষিক—ভিক্ষা—৬-৫০, ৩। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ—৬-০০, ৪। সাংখ্য-বাণী—০-০০-৬০, ৫। মায়াবাদের জীবনী—৫-০০, ৬। প্রেম-প্রদীপ—২-০০, ৭। প্রবন্ধাবলী—২-৫০, ৮। শরণাগতি—২-৫০, ৯। শ্রীমদ্বৈষ্ণব-ভাবতরঙ্গ—০-০০-৫০, ১০। শ্রীমদ্বৈষ্ণব-পরিভ্রম—২-০০, ১১। শ্রীশ্রীমদ্বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য (অংশগুণ্ড)—২-৫০, ১২। শ্রীশ্রীমদ্বৈষ্ণব-শতকম্—১-০০, ১৩। শ্রীমদ্বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য—২-০০, ১৪। শ্রীশ্রীমদ্বৈষ্ণবপ্রভুর শিক্ষা—২-৫০, ১৫। জৈবধর্ম (বাংলা)—১৫-০০, ১৬। ঐ (হিন্দী)—২০-০০, ১৭। বিজনব্রাহ্ম ও মন্যাসী—১-২৫, ১৮। শ্রীগৌর-কথামালা—৬-৫০, ১৯। শ্রীদামোদরষ্টকম্—২-৫০, ২০। অর্চন-দীপিকা—৩-০০, ২১। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠের নাক্ষত্র ইতিহাস—১-৫০, ২২। শ্রীমদ্বৈষ্ণবদীপ্তা—২-০০, ২৩। শ্রীশ্রীচৈতন্যলা ও শিক্ষা—৭-০০, ২৪। শ্রীগৌর—৫-০০, ২৫। শ্রীচৈতন্য-পত্রিকা—৫-০০, ২৬। Shri Chaitanya Mahaprabhu—3'00.

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত
শুকভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

- ১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ. (নদীয়া)।
- ২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ. (হুগলী)।
- ৩। শ্রীকেশবদ্বী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, মথুরা পোঃ. (মথুরা), ইউ. পি।
- ৪। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাটসাহি, পুরী পোঃ. (পুরী), উড়িষ্যা।
- ৫। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ২৮ নং হালদারঘাটবান লেন. কলিঃ-৪
- ৬। শ্রীগোলোকগঙ্গা গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঙ্গা পোঃ. (গোয়ালপাড়া), আসাম
- ৭। শ্রীপিচলদ্বী গৌড়ীয় মঠ ও শাদপীঠ—আশুভিয়ারাড পোঃ. (মেদিনীপুর)
- ৮। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিদ্ধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ. (বর্ধমান)।
- ৯। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয়প্রচারকেন্দ্র, রাঙ্গিয়াহাট পোঃ. (বালেশ্বর) উড়িষ্যা
- ১০। শ্রীকেশবগোষাযী গৌড়ীয়মঠ—শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ. (দার্জিলিং)।
- ১১। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ. (গোয়ালপাড়া), আসাম।
- ১২। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ—ভুয়া পোঃ. (গারো পাহাড়) মেঘালয়।
- ১৩। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুর্নামী—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ. (নদীয়া)।
- ১৪। শ্রীত্রিভাণ্ডীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ. (নদীয়া)।
- ১৫। শ্রীগৌড়ীয় দ্বাতব্য চিকিৎসালয়—দেবরাপাড়া রোড, নবদ্বীপ(নদীয়া)

BOOK-POST
To

Sl. No.

From—

Shri Goudiya-Patrika Office,

SHRI DEVANANDA GOUDIYA MATH

P.O. Nabadwip (Nadia), W. Bengal.

Pin-741302; Phone : NVD-247